পূজনীয় যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা।

সপ্তত্রিংশ বর্ষ।

বৈশাখ—চৈত্র।

১৩৩০।

সম্পাদক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

হাওড়া ৪নং তেলকল ঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে

শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৶০ আনা।

১৩৩০ সালের সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীকালীকান্ত্য় নমঃ।

আলোচনা।

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

[সপ্তবিংশতি বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩৩০ সাল। [প্রথম সংখ্যা।

কুন্তী (১)

(ব্রাহ্মণ গৃহ)

ব্রাহ্মণের প্রতি।

(শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায় এম্-এ)

শুনিয়াছি দ্বিজবর স্বকর্ণে আপনি
কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছ তোমা সবে
মিছা কেন প্রতারিছ অন্য কথা বলি
প্রাতঃকালে বলিরূপে হইবে যাইতে
তোমাদের একজনে রাক্ষসের কাছে।
হয় তুমি নয় পত্নী নয় শিশুসুত
নয় শিশুসুতা তব যাইবে তথায়
মৃত্যু আলিঙ্গিতে ঘোর নিশাচর মুখে।
যেই যাক্ মহানর্থ হইবে তাহার
তাই বলি কায নাই যেয়ে তোমাদের।

তুমি গেলে কে পালিবে এই পরিবার
অন্নবিনা মৃত্যুমুখে পড়িবে সকলে
কেবা শিখাইবে বিদ্যা তোমার তনয়ে
কেবা উপযুক্ত পাত্রে দিবে কন্যা তব?
পত্নী গেলে কেবা সেবা করিবে তোমার
কে পালিবে শিশু দোঁহে? মাতৃস্নেহ বি
উভয়েই অকালেতে যাবে যমপুরে।
পুত্র গেলে পিণ্ডলোপ হইবে তোমার
তব পিতৃগণ পিণ্ডাভাবে হবে ক্ষীণ
অবশেষে ভূপতিত হইবেন তাঁরা।

তোমাকেও সেই পাপে হইবে যাইতে
ঘোর নরকেতে। সুতারে পাঠান যদি
রাক্ষসের কাছে, পরম দৌহিত্র লোক
না পাইবে বিপ্র তুমি নিজ কর্ম্মদোষে।
তাই বলি কায নাই যেয়ে তোমাদের।
করেছি উপায় এক বলিতেছি শুন
মম এক পুত্র যাবে নিশাচর কাছে
পঞ্চপুত্রা আমি দেব! এক পুত্র গেলে
না হইবে পিণ্ডলোপ স্বামীর আমার
অথচ তোমার হবে কিছু উপকার।
তোমার আশ্রয়ে মোরা আছি মহাসুখে
উচিত মোদের করা তার প্রতিদান।
বিনশ্বর দেহ দানে যদি রক্ষা পায়
আশ্রয়দাতার প্রাণ কর্ত্তব্য সে কায।
যদি পারে নিজ প্রাণ দিতে কোন জন
রক্ষিতে পক্ষীর প্রাণ, না পারিবে কেন
মম সুত দিতে প্রাণ ব্রাহ্মণের তরে—
আশ্রয় দাতার তরে? মহাপুণ্য তায়।
যদি বল অতিথি আমরা তব গৃহে
আমাদের বিসর্জ্জিলে হইবে পাতক।
স্বইচ্ছায় প্রবৃত্ত আমরা এই কাযে
তবে কেন মহা পাপ হইবে তোমার?
ব্রাহ্মণ নহি আমরা বলি সত্য কথা
না করিও হৃদে তুমি ব্রহ্মহত্যা ভয়।
আশ্চর্য্য হ'য়েছে তব শুনি মোর কথা
কোন নারী দিতে পারে আপন তনয়ে
রাক্ষসের হাতে? মহা পুণ্যবতী তিনি
যাঁহা হতে এই কার্য্য হয় সম্পাদন।
আমি নহি তত পুণ্যবতী, অনায়াসে
সমর্পিব পুত্রপ্রাণ রাক্ষসের করে
আশ্রয় দাতার ঋণ শোধিবার তরে।
মহাবীর্য্য পুত্র মম রক্ষে সংহারিবে
অবহেলে। দেখিয়াছি ইতিপূর্ব্বে তারে
বিনাশিতে উগ্রতম ভীষণ রাক্ষসে।
হউন আশ্বস্ত দেব, নাহি দিও স্থান
বৃথা ভয় হৃদয়েতে। অবিলম্বে হবে
নিরাপদ এই ভূমি মম পুত্র হ'তে।
গাইবে তোমার যশ যতেক রমণী
যাহা হ'তে পরিত্রাণ পাইল তাঁদের
শ্বশুর আত্মজ স্বামী জনক সোদর।
এই পুণ্যে প্রবেশিবে তুমি স্বর্গপুরে।

প্রাচীন ভারত। *

অবতরণিকা।

(শ্রীসন্তোষকুমার দাস এম্-এ)।

আমরা ভারতবাসী ; আমাদের পক্ষে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ও সুবিধা আছে। নিজেদের দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা জাতীয় জীবনের বিশেষ ধারাটীর সহিত পরিচিত হইতে পারি, অতীতের ভুল ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া বর্ত্তমানে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারি এবং সাফল্যে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির সহিত পরিচয় লাভ করিয়া বর্ত্তমানে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারি। তবেই আমরা অতীতের স্মৃতি শুধু বোঝার মত বহিব না, তবেই আমরা অতীতকে আশ্রয় করিয়া সার্থক হইতে পারিব।

সর্ব্বাগ্রে ইতিহাস কি তৎসম্বন্ধে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা হওয়া উচিত। সন তারিখ ইতিহাস নয় ; সমগ্র জাতির উত্থান পতন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসববেদনা, চিন্তার ধারা ও ধর্ম্মসাধনার পরিচয় দেওয়াই ইতিহাসের লক্ষ্য ! আর এখানেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল না, বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে জাতির লীলাটুকুও অভিনয় করিয়া দেখাইতে হইবে। যুগে যুগে আমাদের দেশ, ভাবকে রূপ দিবার জন্য কিরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, তাহার সাহিত্য ও সমাজ, তাহার রাষ্ট্র ও ধর্ম্মে বিশ্বদেবতার কোন গম্ভীর রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে ঐতিহাসিক তাহারই ইঙ্গিত দিবেন। ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ জগৎকে কি দিয়াছে, তাহার প্রাণের কথাটী কি, কোন্ সুরে সে তন্ময় হয়, কোন্ মন্ত্র তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ ক'রে তাহাকে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করে, কোন্ অগাধ উৎস হইতে অনাদিকাল যাবৎ সে তাহার অনন্ত বীর্য্য ও সৃজনীশক্তি সংগ্রহ করিতেছে কয়জন ঐতিহাসিক তাহার আভাস মাত্র দিয়াছেন ? ইতিহাসে আমরা জাতির গান শুনিতে চাই, জগতের পুলকস্পর্শে শিহরিয়া উঠিতে চাই, সমস্ত অভ্যুদয় ও পরাজয়ের মাঝে নির্লিপ্ত নায়ককে ধরিতে চাই।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যেন ইউরোপীয় আদর্শের মাপকাঠীতে

* "কলিকাতা বিদ্যাপীঠে" অধ্যাপনাকালে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

ভারতীয় সভ্যতার বিচার না করি। ইউরোপের সভ্যতা প্রধানতঃ রাষ্ট্রকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেখানে রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতা লাভ মানুষের প্রধান আকাঙ্ক্ষার বিষয়; এই স্বাধীনতার ভিত্তির উপরই তাহার সভ্যতার ইমারত গড়িয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে যে ব্যাপারটী সব চেয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা হইতেছে—কেমন করিয়া এক একটী দেশ বিপ্লব ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহার রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে এবং অধিকার ও ক্ষমতা কেমন করিয়া প্রজাদিগের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া মানব-জীবনের সার্থকতার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। আর এখানে এই প্রাচীন ভারতে মানুষের সমস্ত চেষ্টা এককালে ধর্ম্মের জন্যই নিয়োজিত ছিল। জন্মগ্রহণ, বিদ্যার্জ্জন, পাণিগ্রহণ, রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য সমস্তই ধর্ম্মের কঠোর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম্ম-লাভ তখন ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাই কবি গাহিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণে যার অতুল ভক্তি,
গাভীরে যে গণে জননী তুল্য।
সন্ন্যাসী পদে লুটায় নৃপতি,
বিভবের যেথা নাহিক মূল্য॥
নামে রুচি আর জীবে দয়া যাঁর,
গুরুর দত্ত প্রথম দীক্ষা।
রাজা চাহে যার ব্রজের পথেতে
কাঁধে ঝুলি লয়ে করিতে ভিক্ষা॥
মোক্ষ না পাই দুঃখ আমার
নাহিক তাহাতে নাহিক বিন্দু,
লভিয়া ভক্তি হৃদয়ে শক্তি,
হই যেন আমি হইগো হিন্দু।"

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন সম্প্রতি ইউ-রোপের শিক্ষাগ্রহণে ন্যাশন্যাল মহত্বকে আমরা অত্যধিক আদর করিতে শিখিয়াছি! অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই! আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। ইউরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা জানি না। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে জীবিত নাই বলিয়া আমরা ইউরোপের ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবে মউজের বন্দুকে ও দমদম্ বুলেটের সাহায্যে বড় হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব। *

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

ভারতের যে শুধু এইটুকুই বৈশিষ্ট্য ও সৌভাগ্য তাহা নহে। এদেশে যে সভ্যতার অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা ঘরের কোণের প্রদীপটীর মত একটুখানি স্থান অধিকার করিয়া আড়ালে আলো দেয় নাই! হিন্দুসভ্যতা যে বহুমুখী ছিল তাহার কারণ তাহার পরিবেষ্টন বর্ত্তমান কাল হইতে সমস্ত দিক হইতেই বিভিন্ন ছিল। রাষ্ট্র-নৈতিক ও সামাজিক অচলায়তনের মধ্যে বাস করিয়া কখনও সভ্যতার এত প্রসার হইতে পারে না। বাস্তবিক যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে লুক্কাইত ছিল, যখন আধুনিক ইউরোপীয়-গণের পূর্ব্বপুরুষেরা জার্ম্মাণীর গভীর অরণ্যে অসভ্যাবস্থায় থাকিয়া নানা বর্ণে আপনাদিগকে অনুরঞ্জিত করিত—সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভাবের পর ভাব-তরঙ্গ ভারত হইতে প্রসুত হইয়াছে। আবার অন্যান্য দেশে যখন নবীন ভাবোন্মেষ হয়, নূতন নূতন অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠে। তখন সেই সকল ভাব, সেই সকল অনুষ্ঠান দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া—

"পাষাণ বাঁধন টুটি' ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা।"

সকল মানব সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু তাহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াই রূপান্তরিত হইয়া যায়, সেখানে তাহারা নব-জন্ম লাভ করে।† ভারতের এই আত্মরক্ষণ আত্মপ্রসারণ শক্তি ছিল বলিয়াই আজিও হিন্দু-সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে একা মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

[ক্রমশঃ]

† C. F. "Octopus of Hinduism"—V. A. Smith.

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ)

কখন যে আমার বিয়ে হয়েছিল, আমার যে আমার কখন স্বামী হ'য়েছিল, এ কথা আমার অনেক সময়ে মনেই প'ড়তো না। আমি যে বিধবা এও আমার বিশ্বাস হ'ত না। আমি
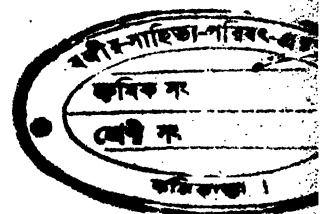
এমন ভাবে থাক্‌তুম যেন আমার কখন বিয়ে হয় নি। চোদ্দ বছর বয়স হ'লেও আমি যেন এখন অনূঢ়া। আমাদের মস্ত কুলীনের বংশ হ'লেও অত ছোট বয়সে আমি বিধবা ব'লে মা কিংবা বাবা কেউই আমার ওপোর বেশী জোর জুলুম কত্তেন না। আমি যেমন কমলদা'র সঙ্গে চিরকাল খেলা ক'রে এসেছি, তাঁর কাছে লেখাপড়া শিখে এসেছি, যখন তখন তাঁর কাছে গিয়ে গল্প গুজব ক'রে এসেছি, ঝগড়া ক'রে এসেছি, চোদ্দ বছর বয়স হ'লেও এখনও ঠিক সেই রকমই তাঁর সঙ্গে ব্যবহার কত্তুম। এর জন্যে বাবাকে আর মাকে গ্রামের লোকেরা অনেক সময়ে অনেক কথা, অনেক হাসি ঠাট্টা টিট্‌কিরী কত্ত। তাই মাঝে মাঝে তাঁরা আমাকে খুব বক্‌তেন এবং কমলদা'র সঙ্গে বেশী মেশামিশি কত্তে বারণ ক'রে দিতেন। আমি হিন্দু-সমাজের বাঙ্গালী-ঘরের বিধবা। যে কথাকে এখন মনে হ'লে আমার গা শিউরে ওঠে, যাঁর সমস্তটাই ভুলে গিয়ে শুধু গোঁফ জোড়াটা আর লম্বা দাড়ীটাই আমার এখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠি, যাঁকে বিয়ে করবার সময়ে আমি কিছুই বুঝতুম না, সেই স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার যা কিছু সবই মরে গ্যাছে—সাধ, আহ্লাদ, মনের বাসনা, আশা, ভালবাসা সব। কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইবার জো নেই, কারো সঙ্গে সরলভাবে হাসবার জো নেই, কাউকে দুটো প্রাণের কথা বলবারও ক্ষমতা নেই। এইটেই গ্রামের লোকে, কি বুড়ো, কি বুড়ী, সবাই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা কত্তেন। মা বাবাও সময়ে সময়ে ইচ্ছেতেই হোক্ কিংবা সমাজের চাপেই হোক্ আমাকে বোঝাতে চেষ্টা কত্তেন যে আমি বিধবা—কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা ছাড়া আমার আর যেন কোন ক্ষমতা নেই। যতই বড় হ'য়ে উঠতে লাগলুম ততই তাঁরা আমাকে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন, সহজে আর বাড়ীর বার হ'তে দিতেন না। কিন্তু স্রোত যখন অধোগামী হয় তখন সামনে হাজার শৈলরাশি প'ড়ে থাকলেও স্রোত ঠিক আপনার পথ করে নিয়ে ব'য়ে যায়। আমারও তাই হ'য়ে ছিল। আমারও প্রেম মন্দাকিনীর স্রোত ক্রমে নীচের দিকেই দ্রুত গতিতে ব'য়ে যাচ্ছিল। কাজে কাজেই সে কোন বাধা বিঘ্ন না মেনে ঠিক নিজের পথ ক'রে নিয়েছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একাদশ ইন্দ্রিয়ই যখন বেশ ফুটে উঠ্‌ল তখন একবার ভাল ক'রেই চারিদিকে চেয়ে দেখলুম; দেখলুম আমি আর সেই আট বছরের মেয়েটী নেই। ছেলে-

বেলাকার খেলা ধুলো, ঝগড়া ঝাঁটি, কান্নাকাটী ভুলে গিয়ে একটা যেন নতুন রাজত্বে এসে পড়েছি।

কমলদাকে দেখলে একটু যেন লজ্জা লজ্জা কর্ত্ত আমার সঙ্গে তিনি বেশীক্ষণ নির্জ্জনে কোথাও কথা বার্ত্তা কইলে তাঁরও যেন একটু কেমন কেমন ঠেকতো, আমারও বড্ড লজ্জা ক'ত্ত। অথচ পরস্পর পরস্পরকে দ্যাখবার জন্যে ছট ফট ক'রে মত্তুম। গ্রামের পড়া শেষ ক'রে যখন তিনি লেখাপড়া শিখতে ক'লকাতা যান তখন আমি কত কেঁদেছিলুম,তিনিও কত কেঁদেছিলেন এসব কান্না সেই আট বছরের অর্থহীন কান্নার মতন নয়। যত দিন না তিনি কোন একটা ছুটীতে বাড়ী আসতেন আমি খালি তাঁকেই ভাবতুম, তাঁরই কথা, তাঁরই হাসি ভাবতুম। কতবার চিঠি লেখবার জন্যে দোয়াত কলম নিয়ে ব'সতুম কিন্তু লিখতে পত্তুম না, লজ্জা কত্ত। তিনি আমায় মাঝে মাঝে কত বুঝিয়ে চিঠি দিতেন। সেইগুলো নির্জ্জনে কতবার পড়তুম, প'ড়তে প'ড়তে কত কাঁদতুম। পড়া হ'য়ে গেলে কপালে ঠেকিয়ে বুকের ভেতর রেখে দিতুম।

সময় সময় ভাবতুম আমি বিধবা। এ সব আমি কি কচ্ছি! আমার তো এসব সাজে না। কিন্তু এ ভাবের চি[illegible]আমার মনে স্থান পেত না। যার স্বামীকে মনে নেই, বিয়ে হ'য়েছিল কিনা তাই যার ভাল করে মনে নেই সে আবার বিধবা কিসের? তবুও আমি মাঝে মাঝে ভাবতুম আমি বিধবা। কিন্তু এ ভাবনাটা আমার মন থেকে একেবারে দূর হ'য়ে যেত তখন যখন কমলদা কোন ছুটীতে দেশে এসে সর্ব্বাগ্রেই আমার সঙ্গে দ্যাখা কত্তে ছুটে আসতেন,ক'লকাতা থেকে ভাল ভাল বই, সুতো পশম ইত্যাদি আমার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে হেসে বলতেন, "তোর জন্যেই আমার এই কর্ম্মভোগ।" কোত্থেকে লজ্জা এসে আমার সমস্ত মুখখানাকে রাঙা ক'রে দিত। আমি কিছু বলতে পাত্তুম না, শুধু মাটীর দিকে চেয়ে একটু হাসতুম। তিনিও বুঝতে পাত্তেন, আমিও বুঝতে পাত্তুম, দুজনে দুজনকে কতখানি ভালবেসে ফেলেছি, একদণ্ড দেখতে না পেলে আমিও অস্থির হয়ে উঠতুম,তিনিও অস্থির হ'য়ে উঠতেন। সব সময়ে আমি আজকাল তাঁর বাড়ী যেতে পাত্তুম না। কিন্তু কাজে অকাজে তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসতেন। এক একদিন এমন হয়েছে যে ছাতে উঠে আমি দেখেচি তিনি নিজের বাড়ীর ছাতে উঠে আমাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে আছেন।

ক্রমে ক্রমে এমন হ'য়ে দাঁড়াল যে, তাঁকে একলা ছাখবার জন্যে নির্জ্জনে ছাখবার জন্যে বড্ড ইচ্ছে হ'ত। কারুর সঙ্গে তিনি থাকলে তাঁর সামনে আমি বেরুতে পাত্তুম না। বড্ড লজ্জা কত্ত। যদিও বা বেরুতুম্ কথা কইতে পাত্তুম না। সেখান থেকে পালিয়ে আসতুম, সন্ধ্যা-বেলায় যখন কাপড় কাচতে যেতুম দুপুর বেলার বাসন মাজতে যখন ঘাটে যেতুম, তিনিও তখন পুকুর পাড়ে আসতেন। কত কথা কইতুম, কত কাঁদতুম। তিনিও মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলতেন। এমন অনেক দিন গ্যাছে, রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো আস্তে আস্তে খিড়কীর দরজা খুলে তাঁদের বাগানের পুকুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ছাখা ক'রে আসতুম। এতটা লুকোচুরী, এতটা ঢাকাঢাকি আমাদের হ'তনা যদি গ্রামের লোকেরা খালি খালি আমায় জানিয়ে না দিত, আমি বিধবা। একলা যখন রাত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতুম নিজেই শত চেষ্টা সত্ত্বেও বুঝতে পাত্তুম না কিসে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্চে কেন আমি যাচ্চি। এক একদিন ভাবতুম সমাজই তো, গ্রামের লোকেরাই তো আমাদের দুজনকে এমন ধারা লুকোচুরী কত্তে শিখিয়ে দিয়েচে। ছেলেবেলায় যখন আমরা দিন রাত খেলা ধুলো কত্তুম একসঙ্গে থাকতুম তখন তো কেউ কিছু ব'লতো না। আর এখনই বা কেন সব মানা করে, দুজনকে একলা কোথাও একসঙ্গে দেখলে অনেক কথা ব'লে যায়? আমরা তো দু বছর আগেও যা ছিলুম এখনও তাই আছি। তখন যেমন দুজনে দুজনকে না দেখে থাকতে পাত্তুম না এখনও তো তাই। তবে কেন তারা আমাদের স্বাধীন ভাবে মেলা মিশিতে বাধা ছায় তাইতো আমরা আজকাল লুকিয়ে চুরিয়ে ছাখা শুনো করি। তারা কি জানে না আমরা পরস্পরকে কত ভালবাসি, একদণ্ড না দেখলে কত ভাবি কত কাঁদি, দুদণ্ড কথা কইলে কত সুখ পাই! আমাদের এ সুখে কেন তারা বাধা ছায়?

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও দুবছর কেটে গেল। আমি ষোল বছরে পড়লুম। কারুর কোন কথা, কোন উপদেশই আমাকে পরিবর্ত্তন কত্তে পাল্লে না। আমি যে নারীর সমস্ত স্নেহ, প্রেম, মমতা, ভালবাসা দিয়ে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম। মাঝে মাঝে যখন ভাবতুম আমি বিধবা কে যেন আমায় ব'লে দিত আমি বিধবা কিসের? যার স্বামী আছে সে কখন বিধবা হ'তে পারে না। বিয়ে-করা, সমাজে-বলা স্বামী না হ'লেও তিনিই আমার স্বামী। আমার যা কিছু যাঁর শ্রীচরণে আমি ঢেলে দিয়েছি, যিনি আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে ব'সে আছেন যাঁর

সুখই আমার সুখ, যাঁর দুঃখই আমার দুঃখ, যাঁকে ছাড়া এতবড় পৃথিবীতে আমি আর কাউকে জানি না, কাউকে একদিনের জন্য ভাবিনি তিনি আমার স্বামী নয় তো আমার স্বামী কে? যাঁর জন্যে আমি হাসিমুখে আত্মহত্যা কত্তে পারি, যাঁর সঙ্গে আমি জীবিতাবস্থায় চিতায় প্রবেশ কত্তে দ্বিধা বোধ করি না, যিনি আমার ধ্যান, জ্ঞান, লক্ষ্য, তিনি আমার স্বামী নয়তো আমার স্বামী কে? যাঁকে ভাবলেও আমি সুখ পাই, যাঁকে হারাব মনে কল্লে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে, যাঁকে দেবতার মত পূজা করি, যাঁর বাক্য আমার কাছে পূজোর ফুলের মত পবিত্র, যাঁর অনুরোধ আমার কাছে আদেশ, যাঁকে দেখলে আমি শান্তি পাই, যাঁর সঙ্গে কথা কইলে তৃপ্তি পাই, তিনি আমার স্বামী নয় তো আমার স্বামী কে?

মানুষ আমার জন্যে যে স্বামী ঠিক ক'রে দিয়েছিল, সমাজ যে স্বামীর পায়ে আমাকে বলী দিয়েছে তাঁকে আমি কখন স্বামী ব'লে মানিনি, মানতে পারবও না। যাঁর সেই আকর্ণ বিস্তৃত গোঁফ জোড়া, আবক্ষ চুম্বিত দাড়ী মনে হ'লে এখনও গা কেঁপে ওঠে, যাঁর সঙ্গে আমার আট দিনের পরিচয়, সে কদিন যাঁকে আমি ভয়ই ক'রে এসেছি, তাঁকে আমি কখন স্বামী ব'লে মানতে পারব না। এর জন্য যদি আমার নরকেও যেতে হয় তাও যাব, যদি কলঙ্কের রাশি মাথায় নিয়ে আমায় এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয় তাও থাকব।

হঠাৎ একদিন মনে হ'ল কর্ত্তব্য ব'লেও তো একটা জিনিস আছে। অন্ততঃ তার খাতিরেও আমার সমাজ মেনে চলা উচিৎ। আমি বিধবা হয়েও যে রকম স্বাধীন ভাবে তাঁর সঙ্গে মেলামিশি কচ্চি এটা কর্ত্তব্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার অন্যায় বই ন্যায় হ'চ্চে না। এতে আমার বাপ মার মুখ হেট হ'তে পারে। বংশের নামে কলঙ্ক র'টতে পারে। কিন্তু একথা মনে হ'তেই আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হ'য়ে বলে উঠত, "সন্তানের যে রকম পিতামাতার ওপোর একটা কর্ত্তব্য আছে তেমনি পিতামাতারও কি সন্তানের ওপোর কোন কর্ত্তব্য নেই? কেন তাঁরা আমায় আট বছরে বিয়ে দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লেন? ওগো! তখন যে আমি কিছু জানতুম না, কিছু বুঝতুম না! তাঁরা তখন নিজের মান সম্ভ্রমের দিকে, সুনামের দিকে বংশ মর্য্যাদার দিকে চেয়েছিলেন। আমার দিকে তো একবারও চেয়ে দ্যাখেন নি! আমার ভবিষ্যৎ তো একবারও ভাবেন নি! একজন ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাঁরা

আমার কি সর্ব্বনাশ করচেন এটা তো তখন একবার ভেবে দ্যাখেন নি। আমারও যে একটা সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে, ইচ্ছে থাকতে পারে বোঝবার, অনুভব করবার, ভোগ করবার, কামনা করবার ক্ষমতা থাকতে পারে, এসব তো তাঁরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন নি। তারপর যখন বিধবা হ'লুম আমায়তো কেউ বিধবার মত থাকতে দ্যায়নি, আমার সমস্ত আশা, স্পৃহা, কামনা কেউতো অঙ্কুরে মেরে দ্যায়নি। যে বৃক্ষটাকে এতদিন আমি লতার মত জড়িয়ে উঠেছি গোড়ায় কেন কেউ এই বৃদ্ধিতে বাধা দ্যায় নি? শুধু মুখের বাগার কথা আমি বলচি না, কাজে তো কেউ আমায় বাধা দেয় নি? কেউ তো আমায় বিধবার কর্ত্তব্য ব'লে দ্যায় নি? শুধু তীরে দাঁড়িয়ে স্রোতের তীব্র গতি দেখে অনেকে হেসে ছিল, হা হুতাশ ক'রেছিল, কিন্তু স্রোতের গতি ফেরাবার কেউ তো চেষ্টা করে নি!

আমি মানুষ ছাড়া দেবতা নই। যারা আমার ওপোর কখন কর্ত্তব্য করে নি, আমিই বা কেন তাদের ও'পর কর্ত্তব্য ক'ত্তে যাব। না, না আমি তা পারবো না। আমি যে অনেকদূর এগিয়ে এসেছি আর আমি পেছুতে পারবো না। তাঁকে আমি কখনই ভুলতে পারবো না। আমি ভগবানের আশীর্ব্বাদ পেয়েচি। বিবেকের অনুমোদন পেয়েচি। সমাজ না মানুক, মানুষ না বলুক, তিনিই আমার স্বামী, আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, আমার ইহকাল, আমার পরকাল। ক্রমে এমন হ'য়ে উঠল যে, আমাদের দুজনকার মধ্যে যা কিছু একটু বাধা বিঘ্ন ছিল, একটু ব্যবধান ছিল তাও আমরা আর গ্রাহ্য কত্তুম না। কারুর কথায় কর্ণপাত কত্তুম না, কারুর হাসির দিকে চেয়ে দেখতুম না। অতীত ভুলে গিয়ে, ভবিষ্যতের নিমিত্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা না ক'রে শুধু বর্ত্তমানেই লিপ্ত থাকতুম্। চোক বুজলে, কিংবা চোখ চাইলে আমরা দুজনে দুজনকেই শুধু দেখতুম। নিভৃতে ব'সে আমরা পরস্পরকেই শুধু ভাবতুম। কথা কইতুম শুধু আমাদেরই বিষয়ে। আমাদের অন্য চিন্তা ছিল না, অন্য কথা ছিল না, অন্য কোন কাজ ছিল না।

আমরা তখন ভাদ্রমাসের নদ নদীর মত এক হ'য়ে গিয়ে প্রেম মন্দাকিনীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলুম। কোথায় ভেসে যাচ্চি, কোথায় গিয়ে এ খরস্রোতের অবসান হবে একদিনের জন্যেও তখন ভেবে দেখি নি। যৌবনে যৌবন মিশে গিয়ে আমাদের হৃদয় সাগরে একটা জলপ্লাবনের সৃষ্টি হ'য়েছিল, উত্তাল তরঙ্গে ভরে

গিয়েছিল। সমস্ত হৃদয়টা শুধু মাদকতায় পূর্ণ, মোহের নেশায় মুগ্ধ সৌন্দর্য্যে ভরপূর হ'য়েছিল। তখন আমরা মনে কত্তুম এমন সুন্দর পৃথিবীতে দুঃখ ব'লে কোন্ জিনিস্ নেই, নিরাশা ব'লে কিছু থাকতে পারে না। বিষাদ, কষ্ট, কান্নাকাটী অত্যাচার সব মিথ্যা। প্রবঞ্চনা, শঠতা, ছলনা, লাঞ্ছনা সব অলীক। যৌবনের আশা, যৌবনের ভরসা, যৌবনের একটা উদ্দাম, অদম্য মনের বাসনা, ইচ্ছা কামনা তখন আমাদের হৃদয়ে ভরা ছিল। সমস্ত পৃথিবীটা তখন আমাদের কাছে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, স্বর্গের চেয়েও সুন্দর, স্বর্গের চেয়েও মনোরম ব'লে মনে হ'য়েছিল। শুধু উপভোগই তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল, প্রেমের উচ্চশৃঙ্গে উঠে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে, আনন্দ করা, আমোদ আহ্লাদ করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। বৃক্ষের ওপোর চাঁদের আলো নিয়ে, প্রকৃতির কোলের ওপ'র বিনিদ্র অবস্থায় আমাদের কত নিশি কেটে গ্যাছে। তখন আমরা কল্পনার উচ্চতম শিখরে উঠে যেতুম, সমস্ত ভবিষ্যতটা কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকতুম আশার আলো দিয়ে রং কত্তুম, প্রেমের আবরণে ঢেকে রাখতুম। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, বাতাসের কোমল স্পর্শ, কোকিলের কুহুতান আমাদের আরও মাতিয়ে তুলতো, যৌবনের কামনাকে আরও প্রশ্রয় দিত, সত্যজগৎথেকে কল্পনার রাজত্বে নিয়ে গিয়ে ফেলতো। আমাদের তখন মনে হ'ত এমনি ক'রেই হেসে খেলে, এমনি করেই দুজ'নে দুজনকে আশ্রয় করে, চাঁদের আলো বুকে নিয়ে সমস্ত জীবনটা বুঝি কেটে যাবে; পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে, সৌন্দর্য্য সুধা পান ক'রে চিরকাল আমরা দুজনে দুজনকে ধ'রে থাকা'—আমাদের এ প্রেম তৃষ্ণা, এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা, মাদকতায়ভরা এ তীব্র কামনা বুঝি কখন মিটবে না; হৃদয়ের আন্তরিক মিলন গ্রন্থি, পবিত্র এ সম্বন্ধ, উভয়ের এ একাকার ভাব বুঝি কখন ছিন্ন হবে না, কখন লুপ্ত হবে না, কখন পৃথক হবে না। আমরণ কাল এমনি ক'রেই বেঁচে থাকবো, মরণের পরেও বুঝি কখন বিচ্ছেদ ঘটবে না।

(ক্রমশঃ)

দুইটী।

[পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব]

(১)

সাধ, যাহা প্রিয় বলি মানিবে জগৎ ;
যাহার প্রভাবে শান্তি পাইবে প্রকাশ।
যে কর্ম্ম সাধিলে তুমি হইবে মহৎ ;
কুবৃত্তির কঠোরতা হয়ে যাবে দাস ॥
আপনিই নিজগুরু গুরু কেহ নয় ;
উঠাইলে তম হতে আত্মাকে আলোকে।
অন্যথা আমিই শত্রু বলি খ্যাত হয় ;
কামনা করয়ে ক্ষিপ্ত যাহার আত্মাকে ॥
(তাই) আচরিবে শুভ, প্রাণে শান্তি যেন দিতে পারে।
যাহার অতুল দীপ্তি জগতের তম হরে ॥

(২)

মম সুত দারা মিত্র ঈশ্বরত্ব আর ;
মোহের ভিতর ইহা অনিত্য নিশ্চয়।
অনন্তে বিলায়ে অনু আমিত্ব আমার ;
উর্দ্ধেতে উঠিলে আমি অক্ষয় অব্যয় ॥
ফিরিয়াছ বহুদিন মোহের তাড়নে ;
নিজ পর বিচারিয়া হে সুধীর এবে।
ভাব দেখি এক আমি ছাড়া এ ভুবনে ;
কেহই নহেত দুই পর কেবা তবে ?
অনন্তে মিশায়ে দেয় মায়া তাই গরীয়সী।
গণ্ডীতে করে বিহার মোহরূপা সর্ব্বনাশী ॥

পাগলের কথা।

(শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাগত নবীন ! বিদায় প্রবীণ !

আমরা নবীনের পক্ষপাতী, নবীন প্রিয়, নবীন রসিক। পুরাতন যতই শ্রেয়ঃ ও প্রেয় হউক না কেন আমরা তাহা কিছুতেই পছন্দ করিব না, নবীন পাইলেই নির্ব্বিচারে সাদরে গ্রহণ করিব ; কেবল নূতন চাই—নূতন চাই। তাই পুরাতন বৎসর ! তোমার পূরাপুরি দ্বাদশ মাস ভোগ করিয়াছি, আর কি ভাল লাগে ? তুমি যাও। প্রবীণের স্থান নূতন আসিয়া পূর্ণ করুণ। ইহাই জগতের নিয়ম। "Old order ch..ngeth yielding place to the New." তা হোগ। আমরা কিন্তু নববর্ষের মধ্যে প্রবীন হইতে চলিয়াছি। তাহলে, ভাই, নববৎসর ! তুমি কি আমাদের সাদরে গ্রহণ করিবে ? না

আমাদেরই মত প্রবীন ত্যাগী হইবে ? তবে তো পুরাতন। একবার দাঁড়াও, এই নবীন ও প্রবীণের সঙ্গম স্থলে দাঁড়াইয়া আমাদের বিগত জীবনের কথা ভাবিয়া লই।

মনে পড়ে সেই বিশ্বধ্বংসী মহাযুদ্ধ যাহার ফলে পরমুখাপেক্ষী আমরা সহস্র অভাবের মধ্যে পড়িয়া দিবারাত্র হাবুডুবু খাইতেছি। ঝঞ্ঝাট ও পরিশ্রমের ভয়ে অশন বসন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের ভার বিদেশী বণিকের হাতে অর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে শোফায় আলু থালু অঙ্গ এলাইয়া দিয়া বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস খাইতেছিলাম। বিদেশীবণিকের দল সুখরাশী ঢালিয়া দিয়া আমাদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা 'হায়' করিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব তাহাদের পদে অর্পণ করিলাম। সহসা যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক বংশীরব থামিয়া গেল। মহাহবের ভয়ঙ্কর রোলে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। আমাদের সুখের নদী আমাদেরই রক্তস্রোতে পরিণত হইল। এতকালের সুখ-স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হইল। প্রধূমিত অভাব-শৈল সকল চতুর্দ্দিকে শৃঙ্গ তুলিয়া উঠিতে লাগিল। আমরা শিহরিয়া উঠিলাম কিন্তু নিরুপায়। এ নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে আমাদের কে রক্ষা করিবে ?

আমরা বাঙ্গালী। আমরা চিরকালই পর-প্রত্যাশী দুলালের দল। আমরা শিখিয়াছি, উপকারকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে, মহতের বুকে ছুরী বসাইতে দিতে বিপরিত করিতে, কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে, ভাইকে ঠকাইতে, প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে, নিজের দেশকে পরের হাতে তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতে ; আমরা জানি কেমন করিয়া আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইতে হয়, কেমন করিয়া নিজেদের ঘরের ছিদ্র পরকে দেখাইতে হয়, কেমন করিয়া পরপদ লেহন করিয়া ধন্য হইতে হয়। ভয় পাইলেই আমরা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত কাঁদিয়া উঠি, বিপদে পড়িলে আমরা পঙ্গুর মত পরের মুখের দিকে চাহিয়া কাতর প্রার্থনা জানাই ঘরে আগুন লাগিলে আমরা কুঁড়ের মত 'পিপু—ফিশু' করিয়া পুড়িয়া মরি বিজাতীয় যাহা কিছু দেখি, অমনি আমরা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া ভালমন্দ নির্ব্বিচারে তাহার অনুকরণে তৎপর হই ; এতদ্ব্যতীত আর আমাদের কিছুই নাই। এক্ষণে আমরা যে সঙ্কটে পড়িয়াছি তাহা হইতে উদ্ধার করিতে উক্ত কোন গুণটিই উপযোগী নহে। কাজেই এবার আমরা সত্য-সত্যই বিপদ গণিলাম। তাহার উপর বন্যা, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি

আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উৎপাত ভগবানের অভিসম্পাতের মত আমাদের বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। এখন বল মা তারা দাঁড়াই কোথা! আমাদের বলবুদ্ধি ভরসা চাকুরী এখন দুষ্প্রাপ্য। দলে দলে কেরাণীর দল সুখনীড় চাকরী হইতে বরখাস হইয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া পথে দাঁড়াইতেছে। আমদানী রপ্তানীর অসুবিধা হেতু কাজ কারবার নষ্ট হইতেছে। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য দিন দিন অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিতেছে। আয় নাই ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে ভিখারীর জাতি কয় দিন বাঁচিবে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এত তেও এ চিমড়া জাতটা মরেও মরে না।

মৃত্যু যেমন হৃদয় বিদারক তেমনি গরিমাময়! সূর্য্য যেমন সমস্তদিন কিরণ বিকীরণ করে গোধূলিকালে কার্য্য হতে অবসর গ্রহণ করে; সে দৃশ্য যেমন করুণ তেমনি গরিমাময়। সেইরূপ একটা আত্মা এই দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া কতপ্রকার কার্য্যই না করিয়াছে: আজ দেহীর মৃত্যু,—অর্থাৎ আবদ্ধ আত্মার মুক্তি;—কি করুণ, আর কি গরীয়ান্ আনন্দপ্রদ! হে পুরাতন বৎসর! তোমার উপর দিয়া দুনিয়ার ভালমন্দ কতকি হইয়া গিয়াছে; আমাদের জন্য তুমি লঘুগুরু কত ভারই না বহিয়াছ; অল্প বিস্তর কতনা আঘাত সহ্য করিয়াছ। তুমি কাহাকেও আনন্দে মাতাইয়াছ, কাহাকেও দুঃখে অভিভূত করিয়াছ। আজ তোমার ছুটির দিন আসিয়াছে এ বিশাল কর্ম্মভূমি হতে অবসর লইয়া আজ তুমি মহাপ্রয়াণ করিবে। তাই এ বিদায় দৃশ্যও হৃদয় বিদারক অথচ গরিমাময়। যাও প্রাচীন, পঞ্চভূতের অনন্তগর্ভে বিলীন হইয়া যাও! আমরা কিন্তু তোমায় ভুলতে পারিব না। তোমারি কবলে বাঙ্গালী দুর্দ্দশায় নিষ্পেষিত; তোমারি আমলে মহাত্মাগণের অমোঘ বাণী ধ্বনিত; তোমারি আঘাতে সরস্বতী বিদ্যামন্দির হতে অপসারিত আবার তোমারি কৃপাতে—কিজানি হয়ত বাঙ্গালী মহত্তের পথে উন্নীত হইতেছে। সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্মৃতি, তোমার সঙ্গে আমাদের বড় আদরের পরমায়ুর একবৎসর হ্রাস হইয়া গেল। তাই বলি, তোমায় ভুলিব কেমনে?

এস ভাই নূতন বৎসর! আমরা বুকভরা আশায় তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি। ধনধান্য-পুষ্পভার, শক্তি উদ্যম মহত্ত্ব, একনিষ্ঠতা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার মালাটি লইয়া তুমি এস! এস, দীন দুনিয়ার নবীন অধীশ্বর! এস অধঃপতিত জাতির নিয়াময় গুরো! এস পাগলের ভাঙ্গা বুকে আশার বুদবুদ! আমরা তোমায় আমাদের

নবীন সেনাপতির পদে বরণ করিতেছি। তোমার স্বর্ণভেরির তালে তালে পা ফেলিয়া আমরা যেন স্বাবলম্বনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

হে নববর্ষ, তুমি কি আমাদের অন্তঃকরণ হতে অসার বাবুআনার ইচ্ছা অপসারিত করিবে না? আমরা খাইতে পাই আর নাই পাই, একখানা কামিজ ও একটী পাঞ্জাবীকে প্রত্যহ সাবান দিয়া কাচিয়া গিলা দিয়া গায়ে দিতে হইবে. নচেৎ বৈকালিক বায়ুসেবন করিতে যাওয়া ঘটে কিরূপে? এমন সাধের চুলছাঁটা, এমন সখের সাবান এসেন্স মাখা দেহ খানা, এমন মনুষ্যজন্ম, সবই যে বৃথা হয়ে যাবে যদি সব চেয়ে নয়নাভিরাম সেই সাজগোজ না করিলাম! যদি এই নানা ব্যাধিগ্রস্ত ঘুনধরা ছিটাবেড়ার কাটামোটাকে দিব্যাভরণে না ঢাকিলাম! আর সে সজ্জাই বৃথা যাহা আরসিতে নিজে দেখিয়া নিজেই বিভোর না হইলাম! আহার জুটুক বা না জুটুক, বিড়িসিগারেটের বংশ লোপ পাওয়াইতে না পারিলাম তো ভবে আসিয়া করিলাম কি!

আমরা সুসভ্য। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতীব অসভ্য। তাঁহারা আমাদের মত 'কাছা খোলার' দল ছিলেন না? কারণ তাঁহারা পুরুষ হইয়া রমণীত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই। আমরা ট্রাম না হলে চলিতে পারি না, ছড়ি না নিলে কোমর টন টন করে, চসমা না হলে দেখ্‌তে পাই না, সিজার না খেলে পেট ফোলে, চা পান না করিলে কোন কার্য্যে মনোযোগ হয় না। আর তাঁহারা অক্ষুন্ন স্বাস্থ শান্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করে দীর্ঘ জীবন মহানন্দে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আফিসের বড় চাকুরিয়া না থাকিলেও শস্যপ্রসূ ক্ষেত্র, মৎস পূর্ণ জলাশয় এবং দুগ্ধদায়িনী গাভী এই সকলের স্বত্বাধিকারী ছিলেন; কাজেই আহার ও পরিধেয় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করিয়াও শত শত অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিতে পারিতেন। ঐসকল অসভ্য পুরুষদের বাবাসস্থল একসময়ে নীতি ধর্ম্ম ও একতার আদর্শ ভূমি ছিল। আমরা সেই সকল পবিত্র পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া আসিয়া সহুরে হইয়াছি। উচ্ছৃঙ্খল, নীতিধর্ম্মত্যাগী শিমূলফুল হইয়াছি। আমরা কায়ক্লেশে নিজেদের স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণটা পর্য্যন্ত করিতে পারি, পাঁচজনার কথা সুদূর পরাহত। তাহাদের জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তটুকু ঘড়ির কাঁটার অধীন ছিল না। জলহাওয়াটা পর্য্যন্ত পরহস্তগত ছিল না। তাঁহারা স্বভাবের শিশু, স্বভাবের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হয়ে স্বভাবেরই ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়েছিলেন। এখন ভাবিয়া

দেখ সুখী কাহারা—সুসভ্য না অসভ্য? তবে আর কেন ভাই সভ্যতার মরীচিকায় মুগ্ধ হয়ে অহর্নিশ হাহা করে বেড়াও। আবার সেই পরিত্যক্ত নীড়ে ফিরিয়া যাও! আবার সেই পুণ্যাত্মাগণের কীর্ত্তিপুত পুণ্যভূমির দিকে মুখ ফিরাও! আবার সেই Sweet Home পল্লীগ্রামের মুক্তক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে আপনাদের হর্ষ বিষাদ মিলাইয়া দাও! তার চিরশ্যামময়ী নিসর্গ সুন্দরীর পূত সুষমায় স্নান করিয়া সহরের মলিনতা ধৌত কর। সহর যেমন কর্ম্মস্থল আছে, প্রমোদ ও বিলাসের রঙমহাল হইয়া আছে, তেমনি থাক। কর্ম্মসূত্রে আমরা সহরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিব,কিন্তু বাস করিব সেই দেশে যেথায় ধানের গাছায় রোদের আভায় সোনা চিক্ চিক্ করে? যে দেশ আপনার রক্ত দিয়া সহরের রসদ যোগাইতেছে, যে দেশ নিজ গর্ভজাত রত্ন সমূহ দান করিয়া সহরের মুখোজ্জ্বল করিতেছে, সেই সেই দেশে স্বর্গ— সেই স্বর্গাদপি গরীয়সি অমৃত সদনে। যদি বল এখন পল্লীগ্রাম মনুষ্যবাসের অযোগ্য। সত্য, কিন্তু কে পল্লীর এ দশা করিয়াছে? পূর্ব্বকালে তো এরূপ ছিল না। অধিক দিনের কথা নহে, বৃদ্ধ পিতামহদের মুখে শুনিতে পাই পল্লীজননীর অঙ্কে তখন পূর্ণ দিব্যশ্রী বিরাজমান ছিল।

তখন বাঙ্গালার নাম ছিল 'সোনার বাংলা'। গৌড়ের সিংহাসনে তখন মহাতেজা বিচক্ষণ নৃপতি বল্লালসেন বিরাজিত! তাঁহার সুশাসনে এদেশ প্রকৃতই সোনার বাঙ্গলা হইয়াছিল। রাজা প্রজার পিতা, গুরু, বন্ধু,শাসক ও পোষক। বল্লাল সর্ব্বতোভাবেই রাজা হইবার যোগ্যপাত্র ছিলেন॥ অনেকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নানা নীতি ও প্রথার জন্য তাঁহাকে অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন। বোধহয় তাঁহারা বল্লালসেনের প্রবর্ত্তিত মূল ব্যাপার ও মহৎ উদ্দেশ্যের বিষয় যথাযথ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল আজকাল সেকালের প্রথার দোষণীয় বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য করিয়াই সে সকলের কল্যাণকারিতার বিষয় ভুলিয়া যান। বাঙ্গালী কোন ভাল জিনিষটার না অপব্যবহার করিয়াছে? বাঙ্গালী অনুকরণ করে মন্দটি;—যাহাতে নিজের ক্ষতি হইবে, আর দেয় ভালটি;—কেননা, পাছে তদ্দ্বারা দেশের লোকের কোন শুভ হইয়া পড়ে। বাঙ্গালি নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রা ভঙ্গ করে; সতীনের বাটী অপবিত্র করিবে বলিয়া তাহাতে বিষ্ঠা গুলিয়া খাইতেও কুণ্ঠিত নহে এতই হিংসপ্রবণ। বাঙ্গালীর মেধা আছে, বিচক্ষণতা আছে, শক্তি আছে, ভালমন্দ জ্ঞানও আছে, নাই কি! তবে ও সকল আপনার বা

স্বজাতির অহিত প্রচেষ্টাতেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু বিদেশীয় বা বিজাতীয় লোকের পায়ে বাঙ্গালী তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লুটাইয়া দেয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, আমরাও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে করিতে সকায়ে স্বর্গে গমন করিতে যাইয়া ত্রিশঙ্কুরের মত অর্দ্ধপথে ঝুলিতে থাকি। আমরা দায়িত্ববোধহীন আয়াসবিমুখ জাতি। যাহারা আমাদের ঘাড়ে প্রকৃত দায়িত্ব না চাপায়, আমরা তাহার গোলাম। তাহার উপর যাহারা আমাদের হইয়া ঝঞ্ঝাটের বোঝা নিজের স্কন্ধে লইতে পারে, তাদের পায়ে আমরা জাত কুল মান সব বিকাইতে পারি। তাহাদের উচ্ছিষ্ঠ ছোবড়া পাইলেই কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে; পরন্তু ভূমিকর্ষণ, ফসল রোপণ তাহার পর কষ্ট করিয়া সে ফসলের রসগ্রহণ, এতগুলি ঝঞ্ঝাট করিতে নারাজ।

ইহার জন্য পৈতৃক জমি জমাও ছাড়িতে হয়, দুঃখ নাই। দেখ দেখি আমরা কেমন বুদ্ধিমান। কেমন সর্ব্বস্ব পরের হাতে সঁপিয়া দিয়া কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়া আসিতেছি। আবার যোতাতী মরদ কমলাকান্ত শর্ম্মার ইতিহাসে দেখা আছে যে, বাঙ্গালী ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে দড়! অর্থাৎ আমার মতে বেকার ও গতরখেকো কেতাবী পুরুষ! আর কোন গুণ না থাকিলেও ধাপ্পাবাজী ও কলমবাজী করিবার মহৎ গুণটি সতের আনা বর্ত্তমান থাকে। যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা শুধু কাজ করিয়া যান, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন না। আর আমার মত ঘ্যান্ ঘ্যানের দল অনর্গল ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়াই গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে! যাঁহারা মহাপ্রাণ, যাঁহারা কর্ম্মবীর, তাঁহাদের এক একটী উক্তি ভগবদ্বাণীর মত ধমনীর রক্ত নাচাইয়া তোলে, অগ্নিগোলকের মত অন্ধকারে পথ দেখাইয়া দেয়, চুম্বকের মত কর্ম্মে আকৃষ্ট করে। হায় এরূপ মহাত্মা কয়জন? জন কয়েকের ডাক ঘ্যান্ ঘ্যানানির মহারোলে চাপা পড়িয়া যায়। আবার অনুকূল বাতাসের দ্বারা যাঁহারা কিছু শুনিতেও পান, ঝঞ্ঝাটের ভয়ে তাঁহারা কাণে আঙ্গুল দিয়া থাকেন এবং অন্যান্য পাঁচজনে কি করেন তাহা দেখিবার অপেক্ষায় তাকাইয়া থাকেন। হে নব বৎসর! তুমি কি আমাদের এই সকল বহুকালগত কলঙ্কের দাগ মুছাইয়া দিয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা দিবে? তুমি কি আমাদের বুঝাইয়া দিবে—"সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্। সর্ব্বংপরবশংদুঃখম্॥"

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জঙ্গল কাটিয়া নগর বসাইয়াছিলেন, পল্লীসমাজ গড়িয়াছিলেন, ঊসর ভূমি কর্ষণ করিয়া উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া-

ছিলেন, আর তাহারই উৎপন্ন ফসলে সরল স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিয়া বারমাসে তের পার্ব্বণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মত কৃত্রিম জীবন যাপন করিতে হইত না, মিশ্র কদর্য্য খাদ্য আহার করিতে হইত না, সুতরাং অভাবের তাড়নায় ছট্‌ফট্‌ করিতে হইত না। অন্নচিন্তা বিরহিত হইয়া জ্ঞানে বৃহস্পতি ও স্বধর্ম্মে বলীয়ান ছিলেন। আমরা তাঁহাদের বংশধর হইয়া তাঁহাদের আবাস ভূমি কতকগুলা দীনহীন বর্ব্বরের হাতে সঁপিয়া দিয়া সহরের সমৃদ্ধি বাড়াইতে আসিলাম; আবার আমরা যদি সহরের মায়া কাটাইয়া পল্লী অভিমুখে গমন করি, পল্লী সংস্কারে সকলের মিলিত চেষ্টা প্রয়োগ করি তাহা হইলে পল্লীসকল আবার পূর্ব্বের শ্রী ধারণ করে। ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ভাই, কাহার দোষে অনশনক্লিষ্ট, ম্যালেরিয়া আক্রান্ত, অভাবগ্রস্ত পল্লীগ্রাম কঙ্কালসার প্রেতভূমিতে পরিণত? লক্ষ্মীর আবাস নরকণ্ঠ মুখরিত. আনন্দের লীলাভূমি পল্লীগ্রাম আজ পরিত্যক্ত প্রান্তর? হায় কি বলিব! সহরের আলেয়ার আলোয় আকৃষ্ট হইয়া আমরা নিজ বাসভূমি ছাড়িয়া প্রবাসী হইয়াছিলাম। আজ তোহাও নিশ্চিন্তে বসিয়াছে। "এখন কি মনে হয়—

"অধ্রুবং নষ্টমেবহি।"

এই অন্নসমস্যার দিনে ব্যয়সঙ্কোচ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে পল্লীবাস বিশেষভাবে সহায়তা করিবে। সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে সংসার খরচ অল্পতর ইহা সকলেরই জানা আছে। তথায় গোপালন অল্পব্যয় সাপেক্ষ। কিছু কিছু আবাদী জমি সকলেরই রাখা উচিত। তাহাতে অন্ন ও দুগ্ধের অভাব সম্পূর্ণ না হউক—অনেকটা মোচন হইতে পারে। সন্তান সন্ততিদের জলীয় অথবা কৃত্রিম দুগ্ধ খাইয়া আয়ুক্ষয় হয় না; আর স্ত্রীলোকদের আধপেটা খাইয়া শরীর নিস্তেজ হয় না। অবসর কালে চরকার সুতাকাটা প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্দারা বস্ত্রের অভাবও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। এরূপ ভাবে পল্লীজীবন যাপন করিতে পারিলে দুই এক মাস চাকুরী না থাকিলে বা কারবার দানীতে লোকসান হইলে, এমন কি ব্যাঙ্ক ফেল হইলেও একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয় না, অন্নাভাবে যেও কুকুর হইতে হয় না। হে নূতন বৎসর! তুমি কি আমাদের এরূপ মতিগতি করিবে? এ সুখের মুখর পিঞ্জর হইতে পরিত্রাণ করিয়া তুমি কি আমাদের পল্লীর উন্মুক্ত নিভৃতের মূক মাধুর্য্যে ডুবাইয়া দিবে?

এই ক্যাসানেবল্ গোপ দোরস্ত ভেলারাং বন্ধুবর্গের কবল মুক্ত করিয়া যাহাদের আমরা ইল্লিটারেট চাষাভূষা বলি সেই শ্রমপটু, কর্ম্মঠ স্বাধীন, আমাদের আশাভরসা এবং প্রাণদাতা, ভদ্রলোকের অবলম্বন, একই মায়ের গর্ভজাত আমাদের ভাই, তাদের ভালবাসতে শেখাবে না; কবে তাদের ব্যথা হৃদয়ঙ্গমকরে তাদের বুকে তুলে নেবে? কবে আমরা তাদের সঙ্গে একই রোদেজলে ভুগে, একই ফলশস্যে বর্দ্ধিত হব? ভগবান্, কবে—কবে সেদিন আবার বাঙলায় ফিরে আসবে! তারাই যে আজ পর্য্যন্ত আমাদের পিতৃ পিতামহের ক্ষেত গুলিকে বুকের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, স্বর্গগত মহাত্মাদের কীর্ত্তি স্মৃতির ক্ষীণ শিখা এখনও জাগিয়ে রেখেছে। আমরা তাঁদের নাম ডুবিয়ে দিয়ে চলে এসেছি, এমনকি নিজেদের নাম ও চালের রূপান্তর ভাষান্তর করে ফেলে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কটুকু পর্য্যন্ত মুছে ফেলবার চেষ্টা কর্‌ছি আর তারা—নিরক্ষর অসভ্য তারা—পূর্ব্বপুরুষদের নাম ধাম পদ্ধতি সব বজায় রেখেছে। বল দেখি ভাই মহৎ কে? আমরা না তারা? সুসন্তান কে? আমরা না তারা? উচ্চ কে? আমরা না তারা? স্বীকার করি পল্লীবাসীর অনেক দোষত্রুটি আছে। কিন্তু সে সকলের জন্য দায়ী আমরা, যাঁরাই মানুষ হলেন, বিদ্বান হলেন, বড় চাকুরে হলেন, তাঁরাই পল্লীগ্রাম ত্যাগ করে সহরে বসবাস করলেন। পল্লিবাসীদের শিক্ষা দেয় কে? তাদের মানুষ করে কে? কাদের আদর্শে তারা জীবন গঠন করবে? কাদের সাহায্যে তারা আত্মোন্নতি করবে? দোষী তারা নয়, দোষী আমরা। হে নূতন বৎসর, আমাদের মোহ ঘুচাও চক্ষু খুলিয়া দাও! আমরা যেন আবার উপেক্ষিতা পল্লীজননীর সেবায় নিযুক্ত হই।

অয়ি পরিবর্জ্জিতা মর্ম্মাহতা দীনা পল্লীজননী আমার! তোমার অগাধ স্নেহের বিনিময়ে যে বিষাক্ত শেল তোমার কোমল বুকে হানিয়াছিলেম আজ তাহার প্রায়শ্চিত্তের দিন আসিয়াছে। যে সুখের আশায় তোমায় ভুলিয়াছিলাম আজ তাহা মহাদুঃখে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এইবার কোলের ছেলে ধুলা ঝেড়ে বুকে তুলে নাও মা! আর এ গণ্ডিবদ্ধ সহর জীবনে কাজ নাই। তোমার কুটীরের মুক্ত আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আদব কায়দার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সহজ সরল প্রাণে ভায়ে ভায়ে হাত ধরাধরি করে তোমার বাগানের স্বাধীন দয়েল পাপিয়া কোকিলের ঝঙ্কার শুনি, কলকারখানার ধুম বর্জ্জিত অনাবিল সমীর হিল্লোলে কোট কামিজ পাঞ্জাবিহীন নগ্ন

দেহ ভাসাইয়া দিয়া বৈদ্যুতিক ফ্যানের হাওয়ার অসারত্ব হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করি।

শক্তিহীন,অর্থহীন,সহায়-সম্বল-হীন পাগলের কিছুই নাই, আছে শুধু বুককাটা হাহাকার শুধু কাতর প্রার্থনা! হে নবীন, তুমি কি তা শুনবে ?
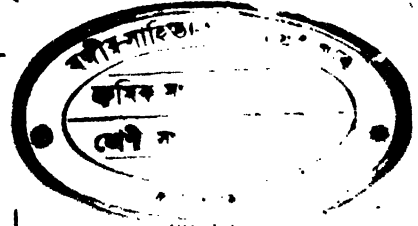
নববর্ষ।

(শ্রীদাশুরথি স্মৃতিতীর্থ বেদান্তভূষণ)

এস নবীন বরষ, বিমল হরষে পুণ্যপ্রভাত লইয়া।
এস সুনীল গগনে পাবন পবনে দীপ্ত কিরণ মাখিয়া।
এস শস্প শ্যামল তুষার বিমল শান্ত শীতল বরষ।
এস তটিনী উজায়ে, ভূধর কাঁপায়ে মূর্ত্ত্যভারত হরষ।
এস অনাবিল হৃদে, অবদাতবীণ্ মুখর মর্ম্ম তন্ত্রে।
এস মোহন মধুর গহন সুদূর বিশ্বজীবন যন্ত্রে।
এস সাধের সিদ্ধি তপের ঋদ্ধি ভ্রান্ত হৃদয় দলিয়া।
এস শুভ্র প্রভাতে শ্রান্ত ভারতে শান্তি সলিল সিচিয়া।
এস কাব্য সলিলে ফুটাতে পদ্ম ভাব কিরণ দানিয়া।
এস গগণে গহনে লতাতরু গণে বিহগকুজনে ফুটিয়া।
এস উটজ ক্ষেত্রে হোমধুমে মিশি মৃগের নৃত্যে ফিরিয়া।
এস তাপস কৃত্যে তাবের নেত্রে সামগানে পুনঃ ভাতিয়া।

আহ্বান।

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ)

১।

বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান শরৎকুমার কলেজ হইতে বাটী ফিরিয়া বলিল, "কলেজ ছেড়ে দিলাম মা। ও গোলাম খানায় আর যাব না।"

জননী তখন পুত্রের আহারের ব্যবস্থা করিতে ছিলেন। বিস্মিত হইয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি রে!"

কোন উত্তর না দিয়া শরৎ নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রে আহারের সময়ে জননীকে বলিল, "কাল থেকে এখন কিছুদিন এখানে আসব' না।"

জননী বলিলেন, "কোথায় থাকবি ?"

"আপাততঃ ক'লকাতায়। তার পর গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে।"

"গ্রামে! গ্রামে! ঘুরতে পারবি ? কখন তো ঘুরিসনি।"

"কখন ঘুরিনি ব'লে যে কখন তা পারব' না তার কিছু মানে নেই। স্বদেশ-মাতার ডাকে এখন আমরা সব কাজ ক'ত্তে পারি।"

"কার ডাকে! স্বদেশ-মাতার ?"

একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া শরৎ উত্তর করিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বদেশ মাতার। তোমরা কি বুঝবে আমাদের দেশের এখন কি অবস্থা!"

জননী দেখিলেন পুত্রের তখন অন্য মাতার কথা কানে তুলিবার মত মনের অবস্থা নহে। সে তখন স্বদেশ-মাতার উদ্ধার কল্পনায় ব্যস্ত। আর কিছু না বলিয়া তিনি আহারে নিরত পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

২।

তখনও ঠিক সকাল হয় নাই। একটু একটু অন্ধকার তখনও ছিল। একটী ব্যাগ ও একটী ছড়ি হাতে লইয়া সদর দ্বারের কাছে আসিয়া শরৎ দেখিল, জননী চৌকাঠের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বলিল, "আজ খুব সকাল সকাল উঠেছ তো মা! এত ভোরে তো কখন তোমায় উঠতে দেখিনি!"

ওকথার কোন উত্তর না দিয়া জননী বলিলেন, "প্রথম ট্রেনেই যাবি বুঝি ?"

"হ্যাঁ এই খানাতেই যেতে হবে।' এর পরের খানা তো কোন্নগরে দাঁড়ায় না।

আমাতে গেলে বড্ড দেরী হ'য়ে যাবে।" বলিয়া শরৎ মায়ের পাশ কাটাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

জননী বলিলেন, "একটা কথা শুনে যা।"

"কোন কথা শোনবার সময় নেই।"

শরৎ হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

জননী একটু উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মনে রাখিস্ শরো আমিও তোর মা।"

শরৎ কোন উত্তর করিল না। যেমন যাইতেছিল তেমনি দ্রুতবেগেই চলিয়া গেল।

হঠাৎ কি মনে হওয়াতে খানিকটা দূর যাইয়া পেছন ফিরিয়া শরৎ দেখিল তাহার জননী এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া তখনও চৌকাঠের উপর বসিয়া আছেন। অতদূর হইতে সে এই-টুকুও লক্ষ্য করিল যে তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলে ভরা। কি যেন একটা ঝড়ের মত আসিয়া সেই দিক হইতে শরতের দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহাকে ষ্টেশনের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

৩।

এক দিন দুপুর বেলায় আহারাদির পর প্রিয় চাটুযোর বাড়ীতে একটী মহতী সভা বসিয়াছিল। গ্রামের খুড়া মহাশয় স্বয়ং সভাপতিত্বের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হুঁকাটী বামার হাতে দিয়া তিনি বলিলেন, "অ্যা! শরতাটাও শেষকালে এই হুজুগে মাৎলো অমন ভাল ছেলে! এ সব হ'ল কি!"

একটিপ্ নস্য নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ের ভিতর প্রবেশ করাইয়া মোক্ষদা ঘোষ বলিলেন, "মাৎলো ব'লে মাৎলো খুড়ো! আজ দেখলাম ছোঁড়াটা গোলদিঘীর সামনে ফুটপাতের ওপোর বক্তৃতা দিচ্চে।"

আর একজন একটু কাসিয়া বলিলেন, "বিধবা মাগীটে এবার মরবে। বিপীন বাড়ুযো যখন মরে তখন ছোঁড়াটা মোটে চার বছরের। সেই থেকে কোলে পিঠে ক'রে, নিজে না খেয়ে দেয়ে পরের বাড়ী থেকে ভিক্ষে ক'রে মাগীটে ছোঁড়াটাকে মানুষ ক'রে এই জন্যে! কোথায় এবার ছেলেটা এল, এ, পাশ ক'রে বেরুবে, দুপয়সা রোজগার ক'রে এনে মাকে দেবে তা নয়—।"

বাধা দিয়া আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। আজ কাল কার ছেলে সব মনে করেন নিজেরাই খুব বুদ্ধিমান হ'য়ে প'ড়েচেন! মা বাপের পরামর্শ নেবার দরকার বোধ করেন না এতই সব লবজান্তা হ'য়ে উঠেচেন।"

শেষটান দিয়া হুঁকাটী অপর আর এক জনের হাতে দিয়া কাসিতে কাসিতে রামা

বলিলেন, "ছোঁড়া গুলো আবার বলে কিনা আমার বিবেক অনুসারে কাজ ক'চ্ছি।' আমর! সেদিনকার ছেলে সব! অর্ব্বাচিন্! গাল টীপ্‌লে দুধ বেরোয়! বলে কিনা বিবেক! তোদের আবার বিবেক কি রে। বিবেক মানে তোরা জানিস্?"

সভাপতি খুড়ো মহাশয় বলিলেন, "ঠিক কথাইতো বাবা। বলি, এই যে সব বক্তৃতে কচ্চিস্, এ বলবায় ক্ষমতাটা পেলি কোত্থেকে! গোলামখানায় লেখা পড়াটা শিখেছিলি ব'লেই তো? আর সরকারের ওপোর যদি তোদের এতই বিদ্বেষ তবে বাবা ইংরিজী বুকনি দিতে তো কেউ ছাড়চিস্ নি॥"

আর একজন চুপ করিয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাপ্ মাকে মানবে কেন! সব পাখা গজিয়েচে কিনা! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাপ্ বেটা রোজগার ক'রবে আর মা বেটী নিজে না খেয়ে ঐ অপগণ্ড গুলোকে খাওয়াবে, তার পর যখন অনামুখোদের ডানা গজাবে ঐ বাপ মার মুখেই লাথি মেরে উড়ে যাবে।"

খুড়ো বলিলেন, "আবার শুনচি মেডিক্যাল কলেজের ছোড়াগুলোও নাকি এই দলে মিশবে, আমর! তোরা কলেজ ছেড়ে দিলে রুগীদের দেখবে কে? তোদের কাজের দায়ীত্ব কত! লোকের মরণ বাঁচন তোদের হাতে। এই তো নশো পঞ্চাশটা ক'রে রোজই ক'ল্‌কেতায় খুন হ'চ্চে। তোরা কলেজ ছেড়ে দিলে তাদের সেবা সুশ্রুষা ক'রবে কে? সেটা বুঝি দেশের কাজ নয়?"

এইরূপে আরও অনেক আলোচনা চলিতে লাগিল।

কিন্তু গৃহস্বামী প্রিয় চাটুয্যে মহাশয় যখন তামাকু এবং পান যোগাইয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন একে একে সকলেই গাত্রোত্থানের ব্যবস্থা দেখিতে লাগিলেন। সেদিনকার মত সভাটী ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে লীন হইয়া গেল।

প্রিয় বাবু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

৪।

"তাহ'লে আসি শরতের মা, সন্ধ্যা হ'য়ে গেল" বলিয়া বিন্দি পিসি উঠিয়া পড়িলেন।

একটু অন্যমনস্ক ভাবে শরতের জননী বলিলেন, "এস।"

যাইতে যাইতে বিন্দিপিসি বলিলেন, "যাই বল বাপু ছেলেকে তোমার বারণ করা উচিৎ ছিল।"

আর্দ্র কণ্ঠে বিধবাটী বলিলেন, "সেদিন কি

আর আমার শরো এসেছিল পিসি! তার একটা ছায়া এসেছিল মাত্র। সে এলে কখন অমন ক'রে আমার পাশ কাটিয়ে একটীও কথা না ব'লে চ'লে যেত না।"

বিন্দিপিসি চলিয়া গেলে তিনি রান্না ঘরের দাওয়ায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ হইল শরৎ বাটী আসে নাই। সুতরাং তাহার জননীর কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছিল।

আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি কত কি ভাবিতেছেন এমন সময়ে হরিশ আসিয়া ডাকিল, "খুড়ীমা বাড়ী আছ ?"

সম্মুখে হরিশকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এস বাবা এস। ক'লকাতা থেকে আসচ ?"

"হ্যাঁ খুড়ীমা! শরতের যে বড্ড অসুখ।"

তিনি শুধু একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নির্ব্বাকের মত প্রথমটা কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না।

একটু সামলাইয়া লইয়া কি একটা বলিতে সামান্য চেষ্টা করিতেই অশ্রু আসিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

হরিশ বলিল, "এই বৃষ্টিতে জল কাদার ওপোর ফুটপাতে শুয়ে শুয়ে নিউমনিয়মে প'ড়েচে।"

দ্রুত স্পন্দিত হৃদয়কে একটু সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "কোথায় আছে? কে দেখচে? যারা তাকে আমার বুকের ভেতর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তারাই দেখচে তো?"

হরিশ বলিল, "সে কথা আর বল কেন খুড়ীমা! ফুটপাতেই দুদিন বেহুস অবস্থায় প'ড়েছিল। আমি তাকে দেখতে পেয়ে আজ হাসপাতালে দিয়ে এসেচি।"

তখনও কান্না চাপিয়া কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এখানে নিয়ে এলে না কেন বাবা? আমি তো তাকে রাস্তায় ফেলে রাখতে পাত্তুম না। আমি যে তার মা।"

"সে ব'ল্লে মার অনুমতি না নিয়ে এ কাজে আমি ব্রতী হ'য়েচি হরিশদা'। তাঁর কাছে আমি ফিরে যেতে পারব' না।' তার ওপোর খুড়ীমা ও অবস্থায় ওকে এখানে তো আনতে পাত্তুম না।"

"তাহ'লে শরো আমার এখন বেঁচে আছে হরিশ? তারা তাকে মেরে ফেলতে পারেনি তাহ'লে?"

হঠাৎ উন্মাদের মত এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য এবং উত্তর কি হরিশ কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

শরতের জননী তখন ভাবিতেছিলেন সেদিন যথার্থই তাঁহার পুত্রের ছায়া আসিয়া বলিয়াছিল, "কলেজ ছেড়েদিলুম মা।" আর আজ তাঁহার পুত্রই বলিয়াছে, "মার অনুমতি না নিয়ে একাজে আমি ব্রতী হ'য়েচি হরিশদা'। তাঁর কাছে আমি ফিরে যেতে পারব' না।"

৫।

হাঁসপাতালে একটী লোহার খাটের উপর শুইয়া নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে শরৎকুমার শুনিল স্বদেশ মাতা যেন বলিতেছেন, "মায়ের চোখের জল ফেলে মাকে তো কখন উদ্ধার ক'ত্তে পারবে না বাবা। সেদিন যখন আমারই পাশ কাটিয়ে আমাকেই উদ্ধার ক'ত্তে ছুটে এসেছিলে তখনই বুঝেছিলুম যাকে বিবেক ব'লে মনকে বুঝিয়েছিলে সেই আবেগই তোমায় টেনে নিয়ে যাচ্চে। তখন বারণ ক'ল্লে হয়তো পাশ না কাটিয়ে আমার মাথা টপকেই চ'লে আসতে। তাই সে দিন কিছু বলিনি।

আমারই আহ্বানে তোমরা আজ জেগে উঠেচ, আমারই সাড়া পেয়ে ছুটে চ'লেচ। কিন্তু ঘুমের ঘোর তোমাদের এখনও কাটেনি, চারিদিকে চেয়ে ছোটবার মত ক্ষমতা এখনও তোমাদের হয় নি। উদ্ধার আমাকে তোমরাই ক'রবে—আমার মুক্তি তোমাদেরই স্বার্থত্যাগের উপর নির্ভর ক'চ্চে, এবং তার আরম্ভের সময়ও ঠিক এখনই হ'য়ে উঠেচে। তাই তোমাদের ডেকে ছিলুম। কিন্তু তোমরা যে এত তাড়াতাড়ি সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে পথে দাঁড়াবে, এটা আমি কল্পনাও করি নি।

যে মহাযাত্রা আরম্ভ ক'রবে ব'লে তোমরা সব বদ্ধপরিকর হ'য়ে দাঁড়িয়েচ, সে যাত্রার পাথেয় তো তোমরা এখন সব যোগাড় ক'রে উঠতে পারনি। যে টুকু পাথেয় নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্চ, সেটুকু তো দুদিনে ফুরিয়ে যাবে। তারপর কি ক'রবে? যাদের কাছ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা ক'চ্চ, আবার কি তাদের কাছে গিয়ে হাত পাতবে? ছিঃ ছিঃ তার চেয়ে ঘেন্নার জিনিষ আর তো কিছু হ'তে পারে না। আমি তো তাহ'লে আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।

ত্যাগ তোমাদের কত্তেই হবে, এবং এখন থেকেই তার ভিত গাঁথতে হবে। ভিতটাকে শক্ত ক'রে তোলবার জন্যে একটু একটু ক'রে তোমাদের এগুতে হবে। এক পা এগিয়ে সেটুকুকে বেশ দৃঢ়ভাবে জয় ক'রে নিয়ে তারপর আর এক পা এগুবে। এমনি ক'রে মা এগিয়ে একেবারে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নিঃস্ব

হ'য়ে যেমন ক'রে তোমরা সব দাঁড়াচ্চ তাতে আমার ভয় হয়, শেষকালে তোমরা ভায়ে ভায়েই খেয়োখেয়ী ক'রে মরবে।

তোমরা এত দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েচ যে, এত লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি তোমরা এখনই সহ্য কত্তে পারবে না। অবশেষে যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে, তখন হয়তো অপর একজন কেউ এসে তোমাদের পায়ে ঠেলে বুকে চড়ে বসবে। তাই বলছিলুম সবই তোমাদের কত্তে হবে কিন্তু আরও আস্তে আস্তে, আরও সংযত ভাবে।

আমার আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে তোমরা যে কাজেই এখন হাত দেবে তাতেই সফল হবে। তাই বলচি আত্মবলি করবার আগে আত্মাটাকে ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা ক'রবে। ছোট ব'লে যাকে অবহেলা ক'রে একটা বড় কাজের জন্যে ছুটে যাবে সেই ছোটটার দিকেই আগে ভাল ক'রে চেয়ে দেখবে বাস্তবিক সেটা ছোট কি না।

আর একটা কাজ করবে—আবেগকে যেন বিবেক বলে ভ্রম ক'রো না। এ অবস্থায় তোমাদের দুএরই দরকার, কিন্তু দুটোকে যেন এক ক'ত্তে চেষ্টা ক'রো না। আমারই চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে যেন আমাকেই চোখের জলে ভাসিও না। আমারই আশীর্ব্বাদ নিতে গিয়ে যেন আমাকেই পাশ কাটিয়ে চলে এস না।"

স্বপ্নেই শরৎ কুমার চাহিয়া দেখিল সে, যে স্বদেশ-মাতা এতক্ষণ তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে এত কথা বলিতে ছিলেন তিনি তাহারই স্ব-মাতার স্বরূপ প্রতিমূর্ত্তী।

স্বপ্নেতেই শরৎ 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং স্বপ্নে দৃষ্টা স্বদেশমাতার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আর তোমার অনুমতি না নিয়ে কোথাও যাব না মা; আমায় ক্ষমা কর"

শরৎকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। দেখিল সে তাহার জননীর পা জড়াইয়া কাঁদিতেছে এবং তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছেন।

মায়ের ক্লিষ্ট শুষ্ক বদন এবং শীর্ণ দেহ দেখিয়া শরৎ আরও বিস্মিত হইয়া গেল। এক সপ্তাহে এত পরিবর্ত্তন!

আবার বলিয়া উঠিল 'মা, মা।'

জননী বলিলেন "এই যে বাবা, আমি এখানেই আছি।"

নীরবে।

[শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।]

নীরবে হৃদয় কোণে, নীরবে জ্বলিত বাতি,
নীরব প্রণয় জ্বালে, নীরবে উঠিত ভাতি ;
নীরব নয়ন কোণে প্রেমের অমিয়া ধারা,
নীরবে নয়ন জলে ভাসিত প্রণয় তারা ;
নীরব হৃদয়াসনে, নীরবে বসায়ে তায়,
নীরবে পূজিত সদা নীরব ভালবাসায়।
বসন্ত মধুর প্রাতে, নীরব মলয় বায়,
নীরবে কহিত কানে প্রেমের বারতা—হায়,
নীরবে পঞ্চম তানে, ডাকিত কোকিল কালা,
নীরবে উঠিত প্রাণে নীরব বিরহ জ্বালা।
শারদ চাঁদিমা রাতে, নীরবে গাহিত গান,
নীরবে আকুল হৃদে ছুটিত প্রেমেরি বাণ ;
নীরবে গাঁথিত মালা, প্রেমের আসনে বসি,
নীরবে পরাতে গলে সদা মন অভিলাষি
প্রাণে প্রাণে বিনিময়, নীরব লুকান কথা,
ভেঙ্গে দিত অভিমান নীরব বিরহ ব্যথা।
সহসা বহিল প্রাণে, নীরব নিরাশা বায়,
নীরবে নিভিল বাতি প্রেমফুল সুখে হায় ;
নীরব চাঁদিমা রাতে, দুখের বারতা আনি
কহে গেল অলিকুল কঠোর কটাক্ষ হানি॥

আবাহন।

(শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী, তালুকদার, কবিকুসুম, কাব্যনিধি।)

(১)

এস বর্ষ!
আসিছে ভারতবর্ষ অধিবাসী নর,
বলহে ভবিষ্য ভাগ্য বজেট্‌ আমার।
বল গত-বর্ষফল, বল কত অশ্রুজল
কত পদাঘাত বক্ষে, কত হাহাকার,
প্লীহা ফাটা মৃত্যু হ'ত, কত বন্য পশু হত,
নিরন্ন দুর্ব্বল প্রজা সোদর আমার—
লইয়া আসিলে বল কত, অত্যাচার!
কত শালগ্রামশিলা, হারাইবে দেবলীলা
কত সুরেন্দ্রের ভোগ হবে কারাগার!
ভারতের কত ছাত্র, বেত্রাঘাতে ছিন্ন গাত্র,
সহিবে শৈশব প্রাণে যাতনা অপার।

(২)

বল বর্ষ! তব আগমন ফল, বলহ বিশেষ,
সেদিন নাহিক আর, তেজ বীর্য্য গরিমার,
আগে ছিনু সিংহরাশি, আজি মোরা মেষ!

ভারতের বীর্য্য বল, সব গেছে রসাতল,
কলঙ্কিত শশধর পতিত দীনেশ।
কারে সিংহাসন দিয়া, কহিনুর পরাইয়া,
কাহারে বসালে তুমি করিয়া নরেশ।
কারে বা করিলে মন্ত্রী, কোন শনি ষড়যন্ত্রী,
আরো কি নূতনে কিছু প্রজা হবে শেষ!
কোন অমঙ্গল গ্রহ, শয্যাধীপ হন কহ,
আরও কি দুঃভিক্ষে তুমি পোড়াইবে দেশ।
ধলহে বৈঙ্গের ফল, কাঁপিতেছে বক্ষঃস্থল
কি হবে উপায় বল কি হ'ল প্রবেশ।

আরো কি চাষার প্রাণ, নিত্য করি বলিদান,
তুষিবে কি জমিদারে অশেষ বিশেষ!
আরো কি ভারতবর্ষ হবে ভষ্মশেষ!

(৩)

এস বর্ষ! দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ আমি, সরল হৃদয়।
তোমার এ আগমনে সুখ কি হইবে মনে?
সতত শঙ্কিত আছি, কিসে, কি যে হয়।
বঞ্চণায় নিত্য নিত্য, বিশ্বাস করে না চিত্ত,
স্মরিয়া অতীত বর্ষ মনে বড় ভয়;
যদি হে কুশলে রাখ, যদি শুভ এনে থাক,
দিব ধন্যবাদ তোমায়, যাবার সময়!

বর্ষ বিদায়।

(সম্পাদকীয়)

কালের স্বরূপমূর্ত্তি হে বর্ষ! তোমাকে নমস্কার! আজ আমরা তোমার পুরাতন স্বরূপকে বিদায় দিয়া নূতনের আহ্বান করিতেছি। ১৩২৯ সাল পুরাতন হইয়া মহাকালসাগরে ডুবিল, ১৩৩০ সাল নব কলেবরে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত— তাহার মোহনমূর্ত্তি, দেখিয়া তাই আমাদের এত আদর-অভ্যর্থনা, তাহার শুভাগমনে তাই আমাদের এত মঙ্গল প্রার্থনা! নূতন শব্দটীই আমাদের কাছে বড় প্রীতি ও সুখপ্রদ বলিয়া তাহার প্রতি এত অনুরাগ-সোহাগ, তাহার আনন্দ-আবাহনে আমাদের এত আগ্রহ-উল্লাস।

কিন্তু কালের আবার নূতন পুরাতন কি, যাওয়া আসাই বা কি? সে কোথায় যায় আর কোথাই বা আসে, সে ত আবহমান কাল ঠিক একই ভাবে, এক স্থানে রহিয়াছে। মানুষ যায় মানুষ আসে, সৃষ্টি যায়, আবার হয়, কিন্তু তাহাতে কালের কি— তাহাতে তাহার কি বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে? সে যেমন আছে, যেমন চলিতেছে, একটানা স্রোতে জাগতিক সমস্ত বস্তুর পরিণাম

প্রবর্ত্তিত করিয়া চিরদিন যেমন মহাকাল সাগরে মিশিতেছে, আজও তেমনি মিলন সুখে মগ্ন। সে কখন পুরাতন হয় না, কখনও নূতনত্বের ছাপ গায়ে মাখিয়া আদর-অভ্যর্থনার ধারও ধারে না, কোথাও যায় না—আসেও না। ইহার সৃষ্টি নাই, ধ্বংস নাই, ইহা অনাদি-অনন্ত। যাহা সৃষ্ট, তাহারই হ্রাস বৃদ্ধি পরিণাম আছে, নূতন-পুরাতন, মরণ-বাঁচন, যাতায়াত তাহারই সম্ভব! মহাকালের আবার পরিণাম কি? সৃষ্ট বস্তু তাঁহারই তেজে পরিণামী হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আসা-যাওয়া করিয়া কখন পুরাতন কলেবর পরিত্যাগ করতঃ সুদৃশ্য সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নূতন রূপে নূতন আকার ধারণ করে। কালের এ সকল কিছুই নাই, অথচ বিশ্বসংসারের যাবতীয় কার্য্য সমস্তই কালের অধীন, এই মহাকালই যে জগতের সৃষ্টি, সংহার ও পালন কার্য্যে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে—এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন ঃ—

কালাদুৎপদ্যতে সর্ব্বং কালাদেব বিপদ্যতে।
ন কাল-নিরপেক্ষং হি কচিৎ কিঞ্চন বিদ্যতে॥
যদাত্মান্তর্গতং বিশ্বং শশ্বৎ সংসার মণ্ডলম্।
স্বর্গ সংহৃতি মুদ্রাভ্যাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥
ব্রহ্মা হারশ্চ রুদ্রশ্চ তথান্যে চ সুরাসুরাঃ।
যৎ কৃতাং নিয়তিং প্রাপ্য প্রভবো নাতি বর্ত্তিতুম

এই জন্য মহাকাল ও পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্ম বস্তু একই পদার্থ। ব্রহ্মের যেমন আদি-অন্ত-মধ্য নাই, বিরাট-বিশ্ব-ব্যোমব্যাপী কালেরও তেমনি কিছু নাই। এইজন্য শাস্ত্র কখন অনন্তের ধারণা করিতে পারে না। অর্জ্জুন হেন সাধকই যখন সেই বিরাট পুরুষের অব্যক্ত ধারণাতীত মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়চকিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

অদৃষ্ট পূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্টা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন
সহস্র বাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥

তখন স্বল্প শক্তি হইয়া আমরা সে স্বরূপ কেমন করিয়া উপলব্ধি করিব! সেই জন্য গুণাতীত পরমাত্মাকে আমরা আনন্দময়, চৈতন্যময় প্রভৃতি শব্দ দ্বারা গুণবিশিষ্ট অথবা কালী, দুর্গা, শিব, নারায়ণ প্রভৃতি মূর্ত্তির দ্বারা সেই অসীমকে সসীম করিয়া কতকটা হৃদগত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।

কালের পক্ষেও সেই নিয়ম—আমরা অনন্ত কালের ধারণা করিতে পারি না বলিয়া তাহাকে

বৎসর, মাস, সপ্তাহ, দিন, দণ্ড, পল প্রভৃতি দ্বারা পরিমাণ করিয়া লই। শান্ত আমরা অনন্তের মাপকাটী এইরূপে কাটিয়া না লইলে জীবনের ক্রিয়া-কলাপ সমাধা হয় কই, আর আমরা তাহাকে ধারণার মধ্যে আনিয়া আমাদের জীবনের ঘটনা গণনার সুবিধা করিতে পারি কই ?

জগতে যখন আমরা আসিয়াছি—তখন যাইতে হইবে। প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু, এমন কি, ব্রহ্মাদি দেবতা পর্য্যন্ত যখন কালের অধীন, দুই দিন অগ্রে বা দুইদিন পশ্চাতে যখন সকলকেই মহাকালে মিশিতে হইবে, তখন জাগতিক কার্য্য গণনার জন্য, ছোট বড়, অগ্র পশ্চাৎ সীমা নির্দ্ধারণের জন্য, অসীম অনন্ত কালের মাপকাটী ত কাটিতেই হইবে। সেই হিসাবেই বৎসর, অয়ন, মাস, দিন, দণ্ড, পল গননা। আর সেই হিসাবেই পুরাতন ১৩২৯ সালকে বিদায় দিয়া নবাগত ১৩৩০ সালের বৈশাখকে এত আদর-অভ্যর্থনা করা।

একটী বৎসর গেল। সৃষ্ট বস্তুর পরমায়ু বাড়াইয়া প্রকারান্তরে কমাইয়া কালের কোলে টানিয়া ফেলিয়া—তাহাদিগকে বড় করিয়া তুলিল। আমাদের "আলোচনা"ও সেই হিসাবে গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গের সেবা করিয়া ১৩২৯ সালের পর ১৩৩০ সালে আনন্দময়ীর আনন্দ পসরা মাথায় করিয়া তাহার সপ্তবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। ছোটটী দেখিতে দেখিতে আমাদের সামান্য সেবা-শক্তিতে বড় হইয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আনন্দ-হৃষ্ট হইয়া পূর্ণানন্দময়ীর পূর্ণ পবিত্র অর্ঘ্যের উপযুক্ততা লাভ করিল।

পাঠক! আজ আমরা এই আনন্দ-অর্ঘ্য শিরে করিয়া তোমার দুয়ারের অতিথি, ইহাকে ভগ্ন মনোরথ করিও না।

ইহার স্থিতি-বিস্তৃতির জন্য—ইহার কান্তি-পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য—ইহার বার্ষিক সাহায্য দানে কৃপণতা পরিহার করুন, কারণ ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টি শক্তিই সকল উন্নতির মূল, এই জন্য প্রবাদ আছে—"দশের লাঠী একের বোঝা" দশের সাহায্য না পাইলে এসকল কার্য্যে উন্নতি সম্ভবপর নহে।

হাওড়ার মত একটী সহরে এতাবৎ কাল এই কাগজখানি জীবিত থাকিলেও আমরা সহরবাসীর আশানুরূপ সাহায্য পাইতেছি না। এবৎসর আমরা ইহার সেবায় কোনরূপ যত্নের ক্রুটী করিব না, এক্ষণে মহানুভব পাঠকবর্গ ইহার পৃষ্ঠপোষকতায় কোন প্রকার অবহেলা না করেন—তাঁহাদের নিকট ইহাই আমাদের সানুনয় নিবেদন।

শুক্রনীতি সার।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

[পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতির্ণর্ব।]

এই কারণ বশতঃ ইন্দ্রদেব দণ্ডক নৃপতি নহুষ রাজা ও রাবণ প্রভৃতি বহু রাজাগণ স্ত্রীগণে আসক্ত হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অহল্যা-হরণে ইন্দ্রের বিপত্তি উপস্থিত হয়। অজ্ঞাত-রজস্কা ভার্গবকন্যাকে ভার্গবাশ্রম হইতে হরণ করিয়া দণ্ডক নামক রাজা সপুত্রবলবাহনে ভার্গব শাপে ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন; এই দণ্ডকোপাখ্যানের বিষয় বাল্মিকী রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ৮০ সর্গ দ্রষ্টব্য। শচী লোভে নহুষ রাজার অগস্ত্যশাপে অজাগরত্বপ্রাপ্তি ইহার বিষয় মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য সীতাহরণ করিয়া রাবণের ধ্বংশ ব্যাপার রামায়ণে বিবৃত আছে।১১৪॥ যে ব্যক্তি অনাসক্ত অর্থাৎ ভোগাসক্তিশূন্য তাহার পক্ষে স্ত্রী সর্ব্বদাই সুখের কারণ হইয়া থাকে; কারণ সেই স্ত্রী ব্যতীত গৃহকার্য্যে (সন্তানোৎপত্তি লালন পালনাদি বিষয়ে এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিষয়ে) সাহায্যকারিণী অন্য আর কেহই নাই॥১১৫॥

অতিশয় মদ্যপানকারী ব্যক্তির বুদ্ধিনাশ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা মাত্রাধীন যথাযথ রূপে মদ্য পান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতিভা (বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা) নির্ম্মলা মতি, ধীরতা স্থিরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলি লাভ হইয়া থাকে। আর অযথাভাবে (মাতাল হইয়া) মদ্যপান করিলে মনুষ্য নাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ কাম ক্রোধ— মদ্যতম অর্থাৎ অতিশয় মাদক; ইহাদিগকেও যথোচিতরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। নচেৎ ইহারাও নাশেরই কারণ হইয়া থাকে॥১১৬।১১৭॥ জয়ার্থী রাজা প্রজাপালনার্থ কামের, শত্রুদমনার্থ ক্রোধের এবং সেনারক্ষার্থ লোভের যথোচিত ব্যবহার করিবেন॥১১৮॥ রাজাগণ কখনও পরস্ত্রী সঙ্গমার্থ কামের পরধনলাভার্থ লোভের এবং স্বীয় প্রজা ও পুত্রদিগের দণ্ডবিধানার্থ ক্রোধের ব্যবহার করিবেন না। মনুষ্য কি পরস্ত্রীসঙ্গমে গৃহী (শ্রেয়োলাভসমর্থ) হইতে পারে? সেইরূপ নিজের পুত্রাদির দণ্ডবিধানে কি বলবান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে? এবং অন্য ব্যক্তির ধনাদি অপহরণে কি ধনবান বলিয়া কথিত হইতে পারে? অর্থাৎ কখনই নয়॥১২০॥

যে রাজা প্রজাপালনে তৎপর নহেন, যে ব্রাহ্মণ তপস্যান্বিত নহেন এবং যে ধনীব্যক্তি দাতা নহেন—ইঁহাদিগকে দেবগণ বিনষ্ট ও অধঃপাতিত করেন ॥ ১২১ ॥ তপস্যার প্রভাবে মানুষ অনেকের প্রভু, দাতা এবং ধনী হইয়া থাকে। পাপের প্রভাবে মানুষ ভিক্ষুক, দাস এবং নির্ধন হইয়া থাকে ॥ ১২২ ॥

অতএব রাজা শাস্ত্র সমূহ সমালোচনা করিয়া চিত্তকে বশীভূত করতঃ পরকাল ও ইহকালের কল্যাণ কামনায় যথোচিত স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবেন ॥ ১২৩ ॥ রাজগণের কর্ত্তব্য প্রধানতঃ আট প্রকার যথা—দুষ্টনিগ্রহ, দান, প্রজাপালন, রাজসূয়াদি যজ্ঞানুষ্ঠান, ন্যায়তঃ ধনার্জ্জন, অন্যান্য রাজগণকে অধীন করতঃ করদ করণ, শত্রুজয়, এবং প্রচুর ভূমির উপর আধিপত্য ॥ ১২৪—২৫ ॥

যে রাজা সৈন্যাদি বলসংখ্যা বর্দ্ধিত না করেন, অন্যান্য রাজাগণকে কর আদান পূর্ব্বক বশীভূত না করেন, এবং প্রজাগণকে সম্যক্‌রূপে পালন না করেন, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য ॥ ১২৬ ॥

যে রাজা হইতে প্রজাগণ উদ্বিগ্ন হয়, যে রাজার কর্ম্ম সাধারণে নিন্দনীয় হয়, যে রাজাকে ধনিগণ ও বিদ্বানগণ ত্যাগ করেন সেই রাজা দুর্বল ॥ ১২৭ ॥ নর্ত্তক গায়ক গণিকা মল্লযোদ্ধা নপুংসক ও হীনজাতিতে যে রাজা অতিশয় আসক্ত (সর্ব্বদা ইহাদের সহবাসে কালাতিপাত কারী) সেই রাজা নিন্দনীয় হইয়া শত্রুমুখে অবস্থান করে ইহা নিশ্চিত (অর্থাৎ এবম্ভূত রাজা শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া শীঘ্রই রাজ্যভ্রষ্ট হয়) ॥ ১২৮ ॥

যে রাজা সর্ব্বদা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দ্বেষ করে, ধূর্ত্তের সহিত বন্ধুত্ব করে এবং নিজনিষ্ঠ দোষ দেখিতে পায় না, সেই রাজা শীঘ্রই বিনষ্ট হয় ॥ ১২৯ ॥

রাজা যখন পরধনলুব্ধ হইয়া লোক সকলের পীড়ক হয়, এবং গুরুতর দণ্ডদাতা হইয়া স্বকীয় দোষরাশি শ্রবণ মাত্রই বক্তাকে অপরাধী বলিয়া তাঁহার প্রতি গুরুদণ্ডবিধানে তৎপর হয়েন; তখন প্রজাবর্গ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব রাজা যে অনুষ্ঠান দ্বারা লোকের বীতরাগভাজন হইয়াছেন, (নিন্দনীয় না হইলেও) গুপ্তচর দ্বারা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবেন। অর্থাৎ কোন অমাত্যাদি তাহা দূষিত করিতেছে, অথবা কি ভাবে তাহা প্রশংসিত হইতেছে; আমার নিন্দা অথবা গুণবাদ সমূহ দ্বারা আমার প্রতি প্রজাগণের কিরূপ অনুরাগ বা বিরাগ এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চর (গুপ্তচর) দ্বারা অবগত হইয়া সুযশোলাভের নিমিত্ত স্বীয়

(ক্রমশঃ)

আলোচনা, সপ্তবিংশতি বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ সাল।

আহ্বান।

[শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী।]

আয় তোরা চলে আয়—ওপারে যাবি কে ?
ওই দেখ তরণী সিন্ধুতে দেয় খে'।
ডুবিবার ভয় নাই আয় না রে যাত্রী ;
হোক না রে ঘোর ঘটা হোক না রে রাত্রি।
জলধির কল্লোল ভৈরব গর্জ্জন ;
উত্তাল ঊর্ম্মির তাণ্ডব নর্ত্তন।
ভীত কেন শুনে ঐ প্রলয় হুঙ্কার ;
নির্ভয়ে উঠ্‌ নায়ে যদি হ'তে চাস্‌ পার।
ঝেড়ে ফেল শঙ্কারে আর কেন হায় হায়!

নিষ্ফল আক্ষেপ, কিছু লাভ নাহি তায়,
আঁখি মোছ্‌ অশ্রু নাহি ভয় বিন্দু,
অবহেলি হবি পার দুস্তর সিন্ধু।
আলোকের দেশে যাবি মুক্তির বন্দর ;
নাহি তথা শোক তাপ সবি সেথা সুন্দর।
আয় না রে পাপী তাপী ওপারের যাত্রী!
হোক্‌ না রে ঘোর ঘটা হোক্‌ না রে রাত্রি।
আয় তোরা দলে দলে ওপারে যাবি কে ?
ওই দেখ তরণী সিন্ধুতে দেয় খে'।

শিব ও শক্তি।

(সম্পাদক)

বেদান্তে যাহা ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যে যাহা পুরুষ ও প্রকৃতি— তন্ত্রে তাহাই শিব ও শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শিবই পরব্রহ্ম—এই জন্য আমরা তাঁহাকে "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং" বলিয়া ধ্যান করি ; তিনি বীজস্বরূপ, কিন্তু তাঁহার ক্রিয়াশক্তিই জগৎ প্রকাশক। পরব্রহ্ম শিব সকল গুণের আধার হইলেও নিগুর্ণ অথবা জীব শিবকে ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই গুণাতীত।

সকল প্রকার গুণ রূপ বা বর্ণ তাঁহাতে

সংস্থিত নিমজ্জিত বলিয়া তাঁহার রূপে কোন বিশিষ্টতা নাই—এই জন্ম তিনি শুভ্রাকার।

তাঁহার কোন ক্রিয়া নাই তিনি নিষ্ক্রিয়—সকল দ্বন্দ্ব, সকল বৈপরিত্য, সেই শিবসাগরে পড়িয়া সাম্যভাবাপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিনি স্থির ধীর নিস্পন্দ মৃতবৎ পতিত। যখন জগৎ ছিল না, তাঁহার সকল ক্রিয়া যখন রহিত হইয়াছিল, ব্রহ্মার যখন এইরূপ অবস্থা—যখন কারণরূপী—তিনি তখন তাঁহার শক্তিহীন শবাবস্থা। তারপর যখন কার্য্যের আবশ্যক হইল, যখন ইচ্ছা হইল সৃষ্টি হউক, তখনই শক্তিমানের উপর ক্রিয়াশীলা শক্তির আবির্ভাব, অমনই কারণরূপী শিবের শবের উপর কার্য্যকারিণী শক্তির তাণ্ডব নৃত্য। জান কি সাধক! মৃতবৎ শিবের বুকে ঐ নৃত্য-পরা, সারাৎসারা রমণী মূর্ত্তি কে? উনিই জগৎ প্রসবিনী আদ্যাশক্তি—শিবের বুকের উপর কেন জান? শক্তিমানের বক্ষস্থল ভিন্ন উঁহার দাঁড়াইবার স্থান কোথায়—কেইবা ঐ নৃত্যপরা রমার নর্ত্তনবেগ ধারণ করিবে?

শিব নির্গুণ—উনি গুণময়ী, শিব নিশ্চল—উনি চঞ্চলা, শিব নিষ্ক্রিয়—উনি ক্রিয়াবতী তাই উঁহার রূপ কাল। উনি কি কেবল ভীষণা বিকটদশনা—না না সাধক ও মূর্ত্তি তাহা নহে! ঐ মূর্ত্তির মধ্যে কোমলতা, কঠোরতা, পালন, বিনাশ, স্থিতি লয়, মাধুর্য্য রৌদ্র, প্রভৃতির একত্র সমাবেশ। এক হস্তে সৃষ্টি, এক হস্তে পালন আর দুই হস্ত কেবল সংহার কার্য্যে নিয়োজিত, ঐ মূর্ত্তিই আদ্যা মূর্ত্তি, উহার পূর্ব্বে আর কোন মূর্ত্তি ছিল না বলিয়াই উলঙ্গী। ঐ দেখ সাধক উহার যোনিদেশ হইতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইতেছে, পীনোন্নত পয়োধরে পীযূষধারা পান করিয়া জগৎ জীব জীবিত রহিয়াছে; আবার ঐ দেখ শেষে তাঁহারই করাল দংষ্ট্রে চর্ব্বিত হইয়া চির শান্তি লাভ করিতেছে। গুণাতীত নির্গুণ পরব্রহ্মের বুকে গুণময়ী আদ্যাশক্তির নৃত্য ক্রিয়া—ইহা জগতের প্রারম্ভ সৃষ্টির আদি লীলা।

অণো রণিয়ান হইতে মহতোমহিয়ান পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ এই শিব শক্তির অন্তর্ভুক্ত। এমন অচল সচল ভাবের অভিব্যক্তি কি আর কোথাও দেখিয়াছ? নির্গুণে সগুণে এমন মেশামেশি দেখিয়া কি কখন নয়ন সার্থক করিয়াছ? তন্ত্রের সাধক এই দুই শক্তি ভিন্নরূপে দেখিতে বা ভিন্নভাবে ভাবিতে চাহেন না বলিয়া তাহার মন্ত্র শক্তি ব্রহ্মময়ী আর তাহার মূর্ত্তি শিবযুক্ত শক্তি; মন তার শক্তিযুক্ত শিবময়—এই মন্ত্র মূর্ত্তি ও মন লইয়া তাহারা সাধনা করে বলিয়া, শাক্তের শক্তি জগদ্ব্যাপক মাতৃশক্তিতে প্রবুদ্ধ বলিয়াই তাহারা আবদারে ছেলের মত

বিনায়াসে ভক্তি মুক্তি করতলগত করিতে পারে.

তাহারা যে কুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান করে. যাহার উপাসনায় শক্তিমন্ত হইতে চায়—তন্ত্র যাহাকে শাক্তের প্রধানতম শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকার লিঙ্গমূলে অবস্থিত—সাধক প্রাণায়াম দ্বার অথবা গুরু নির্দ্দিষ্ট তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা তাহার উদ্বোধন করিলে সুষুম্না পথে ষটচক্রের প্রতি চক্রে শক্তিযুক্ত শিবদর্শনে ধন্য যখন সহস্রারে উপনীত হন, যখন মণি কোঠায় কূটস্থ চৈতন্যের সহিত চৈতন্যময়ী নিত্য লীলা বিহার দর্শন করেন—জগৎব্রহ্মাণ্ডের প্রতি কার্য্য যখন তাহার হৃদয় ভাণ্ডে সমাহিত হইতে থাকে—যখন মন্দার পর্ব্বতরূপ মেরুদণ্ডে কুণ্ডলিনীরূপা বাসুকীর উত্থান পতন, সংঘর্ষ ঘর্ষণে—সহস্রারে ব্রহ্মরন্ধ্রসাগরে যখন কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহিত পরম শিবের বা ব্রহ্মের মন্থন আরম্ভ হয় তখন তাহাতে যে সুধা সমুদ্ভূত হয় সাধক তাহা পানে অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন—আর যদি সাধকের অজ্ঞতা হেতু প্রাণায়াম বা তান্ত্রিক ক্রিয়ার * ব্যাঘাত ঘটে—ষট্চক্র ভালরূপে বিভেদ না হয় তাহা হইলে তাহা হইতে হলাহল উত্থিত হইয়া প্রাণনাশের কারণ হইয়া পড়ে—ইহাই পুরাণের সমুদ্র মন্থন অথবা শাক্তসাধকগণের পঞ্চতত্ত্বের মৈথুনতত্ত্ব। সাধক পাকা হইলে অমৃত পানে অমর হয় আর ব্যভিচারগ্রস্ত অজ্ঞ হইলে হলাহল পানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

পরব্রহ্মের উপাসনা ও শক্তির উপাসনা দেখিতে স্বতন্ত্র নহে—ব্রহ্ম ও শক্তি যখন অভিন্ন—তখন উপাসনাও অভিন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না। নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব। যে কেহ উপাসনায় রত হইবেন—তিনি সগুণ ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করেন না—ইহা স্থির নিশ্চয়। শক্তি রহিত হইলে ব্রহ্ম যখন মৃত, তখন মানুষ শক্তিহীনের সেবায় শক্তিহীন হইতে যাইবে কেন? যাহার শক্তি নাই অথবা যাহারা শক্তি মানে না তাহারা ত মৃত; জীবিত জীব—মৃত হইবার জন্য উপাসনা করে না, শক্তি সঞ্চারই তাহার উদ্দেশ্য। অতএব যেই উপাসনা করুন—বেদান্তের মতে ব্রহ্মও মায়াশক্তি উপাসনা, সাংখ্যের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির উপাসনা অথবা তন্ত্রের মতে শিবশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

---

*পানের জন্য সাধনা নয়--সাধনার জন্য পান; ভোগের জন্য ভোগ নহে—ত্যাগের জন্য ভোগ বিহিত হইয়াছে। এখানে মদ্য পানের ব্যবস্থা দিয়াছেন—মাতাল হইতে বা ব্যভিচার করিতে উপদেশ দেন নাই; যতটুকু পানে দৃষ্টি ও মন চঞ্চল না হয়, ততটুকু পান করিলে চিত্ত স্থির হয়। তেজঃ পদার্থ ভিন্ন যাহাদের কুণ্ডলিনী জাগে না—তাহাদের এই বিধি; যাহাদের কুণ্ডলিনী জাগিয়াছে. সুষুম্না পথ পরিষ্কার হইয়াছে তাহাদের আবশ্যক নাই।

সাংখ্য ব্রহ্মের সক্রিয় ভাব দেখেন, বেদান্ত তাহার নিষ্ক্রিয় ভাব দেখেন, তন্ত্র কিন্তু ঐ দুই ভাব একত্র দেখিয়া ধন্য হন—এইজন্য তান্ত্রিক সাধকের নিকট শিব-শক্তি অভেদ।'

জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই শিব-শক্তি বর্ত্তমান, তবে শিবভাব প্রচ্ছন্নভাবে আর শক্তিভাব প্রকট ভাবে স্ফুরিত হইয়াছে। যেখানে চাঞ্চল্য সেইখানে শক্তি, আর যেখানে স্থিরতা সেই খানেই শিব;—চাঞ্চল্য ছাড়িয়া একেবারে স্থির হইতে হইলেই মৃত্যু—এই শক্তিকে ছাড়িয়া শিবের উপাসনা অসম্ভব।

সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—মুক্তিপথের পথিক হওয়া। তবে বেদান্ত ও সাংখ্য—জ্ঞান-বিচার-যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা উদ্দেশ্য পথে ধাবিত হইয়াছেন—তন্ত্র সেই পথটীকে সরল করিয়া জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মাই আমার সব—তিনি যাহা করান তাহা করি—যাহা বলান তাহা বলি—আমি নিমিত্ত মাত্র; জগদীশ্বরী মাই আমার সব—আমরা সবই মায়ের; মা ভিন্ন জগতে কিছুই নাই—জগৎকার্য্যে মায়েরই অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান দেখিয়া তান্ত্রিক সাধক সোহংভাব পরিবর্জ্জন করেন।'

তন্ত্রে শিব-শক্তির সাধনা ব্যভিচার নহে—তন্ত্রকে বর্ব্বরোচিত অপকৃষ্ট ব্যাপার বলিয়া যাহারা ঘৃণা করেন—তাহারা তন্ত্রের কিছুই বুঝেন না, যাহারা তন্ত্রকে আধুনিক বলিয়া ছাড়িয়া দেন—তাহারাও ইহার সম্যক বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন না। তন্ত্র আধুনিক নহে, বেদের মাত্রা বিভাগই তন্ত্র। তবে অনধিকারীর হাতে পড়িয়া ইহার অনেক নিয়ম পণ্ড হইতেছে; তাই বলিয়া তন্ত্রের প্রতি ঘৃণা করা কাহারও উচিত নহে। সকল সম্প্রদায় মধ্যেই অধিকারী, অধিকারী আছে. এই জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করা যায় না।

শাক্ত তন্ত্রের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া মাতৃ-রূপেই মোহিত হইয়া পড়ে, মা ছাড়া সন্তানের আর কে আছে? আগে মা,. তারপর বাবা;—"মা" না চিনিলে বাবার অস্তিত্ব কোথায়? আগে ত্রিনয়না শক্তির পদমূলে বসিয়া কর্ম্ম কর—কর্ম্মে মতিমান হও, তারপর ত নিষ্ক্রিয় হইয়া শিবময়, ব্রহ্মভাবের ভাবুক হইবে—ব্রহ্মময়ীকে ছাড়িয়া ব্রহ্মলাভের জন্য হুড়াহুড়ি করিলে—ব্রহ্মদৈত্যের তাড়নায় প্রাণ অস্থির হইবে। শক্তিকে না ধরিলে-তাঁহাকে প্রসন্ন না করিলে—শক্তিধরের রাজত্বে পৌঁছান অসম্ভব। শক্তিহীনে শক্তি দিতে—অক্ষম পুত্রকে সক্ষম করিয়া সর্ব্বশক্তি সমন্বিত করিতে মা বিনা আর ক্ষমতা কাহার আছে।

বাঙ্গালী ও তাহার বর্ত্তমান অর্থ সমস্যা।

(শ্রীতিনকড়ি সরকার, এম্-এ, বি-এল্)

আজ কমবেশী প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরেই আর্থিক অস্বচ্ছলতা, আর্থিক দৈন্য। বেশীর ভাগ লোকেই আজ দুটী অন্নের জন্য লালায়িত। আমাদের "সুজলা সুফলা" বঙ্গমাতা আজ তাঁর সন্তানদিগকে দুবেলা দুটী পেট পুরিয়া খাইতে দিতে পারেন না। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কি মধ্যবিত্ত লোক, কি নিম্নস্তরের লোক, সকলেই যেন এক শাশ্বত দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট। আমাদের দেশের যাঁরা বড় বড় মাথা, তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, এই দারিদ্র্যের প্রধান এবং মূলীভূত কারণ হইতেছে—আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী। সকলেই Universityর উপর খড়্গহস্ত। কেহ বলিতেছেন যে, Universityর দ্বার অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক—কেহ বলিতেছেন যে, ছেলেদিগকে আর উচ্চশিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই; তাদিকে মোটামুটী ১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একটু লেখাপড়া শিখাইয়ে পৃথিবীতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, তাহ'লেই দেশের সব দুঃখ দূর হইবে, সকলেই পেট পুরিয়া খাইতে পাইবে।

আমার মনে হয় যে, মধ্যবিত্ত লোকের এই যে অন্নকষ্ট এইটার জন্য যে কেবল বর্ত্তমান শিক্ষা দায়ী তাহা নহে। কারণ দেখুন ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানি, সেখানেও Universityর শিক্ষা যে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন রকমের, একেবারে সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালা—তাহা নহে, তবুত সেখানে কই দারিদ্র্যের এমন প্রবল তাড়না লক্ষিত হয় না। ইহার কারণের জন্য আমাদিগকে বেশী দূর যাইতে হইবে না, একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমাদের স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, আমাদের এই দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হচ্ছে—রাজনৈতিক। যে দেশ থেকে বৎসর বৎসর একটা এতবড় "Economic drainage" অর্থাৎ, অর্থনির্গম হইতেছে, সে দেশে ধনবৃদ্ধি হইবার উপায় কোথায়? দেশ দরিদ্র হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি কিরূপে ধনসম্পন্ন হইতে পারে? তার উপর বিশেষ বাঙ্গালীকে আজ বাঙ্গালার ভিতরে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এখন আমেরিকার "Monroe doctrine" পুরামাত্রায় প্রদেশে প্রদেশে জাগিয়া উঠিয়াছে। বিহার বিহারীদের জন্য ইত্যাদি আন্দোলন বাঙ্গালা

ছাড়া সব প্রদেশেই প্রবল মাত্রাতেই চলিতেছে, ফলে বাঙ্গালীকে কোণঠেসা হইতে হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর আর অন্য প্রদেশে স্থান নাই, কিন্তু বঙ্গমাতা সকলের জন্যই তাঁর প্রশস্ত ক্রোড় বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

তার উপর শিক্ষিত বাঙ্গালার অর্থাগমের পন্থা খুবই সীমাবদ্ধ ও অল্প। সমস্ত শিক্ষিত ব্যবসায়-গুলিতে (learned professions) লোকের খুব ভীড় আর মুষ্টিমেয় চাকরী, কতজনই বা পাবে? ওকালতি—তার ত আর কথাই নাই। কতকগুলি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ছাড়া বেশীর ভাগেরই অর্থের অস্বচ্ছলতা। আজ কাল প্রত্যেক কোর্টের উকীলের দল কাতারে কাতারে বসিয়া রহিয়াছে। তার উপর আমাদের Universty র কৃপায় প্রত্যেক ছয়মাস অন্তর ইঁহাদের দল "arithmetical progression" এ বাড়িয়া চলিয়াছে, ফলে এ ব্যবসায়ের আর পূর্ব্বেকার মত আয়ও নাই আর মর্য্যাদাও নাই। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, সেও কালে এই রকম হইয়া দাঁড়াইবে। আমার মনে হয় যে আমাদের literary শিক্ষার সঙ্গে vocational training ও লইতে হইবে। তাহা হইলে অর্থ উপায়ের পন্থা অনেকটা সুগম হইবে। মহামতি গোখ্‌লে যা বলিয়া গিয়াছেন যে "সমস্ত ভারতের চিন্তাস্রোত বাঙ্গালা হইতে প্রবাহিত হয়" এই লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের ওতপ্রোত ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে মহাত্মা গান্ধির মহাবাক্যের যে "সমগ্র ভারতেরও কর্ম্মস্রোত বাঙ্গালা হইতে প্রবাহিত হয়,"—সার্থক হয়,—যাহাতে আমরা যথার্থ কর্ম্মবীর হইয়া উঠি।

তবে এটা বলা মোটেই ঠিক হবে না যে বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতি করিতে হইলে ইউনিভার্সিটী প্রদত্ত শিক্ষা একেবারে নিষ্প্রয়োজন বা অর্থের জন্য সমস্ত জাতটা কেবল ছুতার, কামার, জুতাশিলাই ইত্যাদি লোকেদের একটা মহাসঙ্ঘে পরিণত হইবে। আমার মনে হয় যে সেটা হ'তে দেওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। আমাদের দেশের লোকদিগকে যথেষ্ট শিক্ষা না দিলে এজাতির আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবার কোনও দিন সম্ভাবনা নাই। যদি কোনও দিন এজাতির উন্নতির আশা থাকে তাহা শিক্ষার দ্বারা। এই উপলক্ষে বোধ হয় আর একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে অনেকের মত হচ্ছে যে আমাদের দেশে, যে দেশের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের—যে দেশে অর্থের পূজা খুবই একটা তামসিক ব্যাপার ব'লিয়া গণ্য হয় যেখানে "অর্থই অনর্থের মূল" এই সব বাক্য

প্রচলিত, সে দেশে কেবল অর্থ পূজা করিলে চলিবে না। তবে কি আমরা বলিব যে ঘর বাড়ী ছেড়ে লোটা কম্বল নিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে বাহির হইয়া যাইবে এবং উচ্চশিক্ষাও পাইবে?

ইহার উত্তরে আমার অনেকগুলি কথা বলিবার আছে। আমাদের উচ্চশিক্ষাও দরকার এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খাবারও ব্যবস্থা করা দরকার। উচ্চশিক্ষা আমাদের চাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগকে পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘের মধ্যে স্থান পাইতে হইলে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে—জ্ঞানের দ্বারা আমাদিগকে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন নূতন জিনিষ সরবরাহ করা। তবেই আমরা যে একটা জাতি, আমাদের যে একটা জাতি-মর্য্যাদা আছে, সেটা অন্যান্য সব জাতিতে স্বীকার করিবে। আমাদিগের কেবল অন্যের নিকট হইতে লইলে চলিবে না আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে। অবশ্য হয় ত অনেকে বলিবেন যে তাহার দরকার কি? ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই—যে আজকালকার দিনে আমাদের কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিলে চলিবে না এবং আমাদিগকে অন্যান্য জাতির সহিত সংঘর্ষে আসিতেই হইবে এবং আসিতে হইলেই এইটীর দরকার। তা ছাড়া আমাদের জাতিমর্য্যাদা না বাড়িলে আমাদের অবস্থান্তরের কোনই সম্ভাবনা নাই। ইহা ছাড়া সকলেই দেখিতেছেন যে কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি কৃষি সকল বিষয়েই আমাদের বিজ্ঞানের সাহায্য দরকার। নচেৎ এই পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগীতায় বাঙ্গালীর স্থান হইবে না। পূর্ব্বেকার মত ইন্দ্রপূজা, বরুণপূজা করিয়া প্রকৃতিদেবীর সম্পূর্ণ অনুগ্রহাধীন হইয়া থাকিলে আজ আমাদের যা দুরবস্থা তাই থাকিয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে আমার বোধ হয় একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আমেরিকাতে বেশ বড়ভাবে চাষবাস করা (farming) একটা বেশ লাভজনক ব্যবসা এবং অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তা থেকে বেশ দুপয়সা রোজগার করছে। কিন্তু আমাদের দেশে চাষীদের কি শোচনীয় অবস্থা? তা ছাড়া আরও দেখতে পাব, যে সব দেশে শিক্ষা বেশী সে দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিও বেশী।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শিক্ষা বর্জ্জন করিলে চলিবে না, আমাদের শিক্ষা চাই – এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাও চাই। Rudyard Kipling সাহেবের মত "East is East & West is West, the twain can never meet" একথা বলিলে চলিবে না। আমাদের রবীন্দ্রনাথ যা অনেকবার বলিয়াছেন, যে দুটীর

সামঞ্জস্যতেই হচ্ছে আমাদের উন্নতির আশা, কেবল আমাদের দেশের জিনিষ, দেশের জিনিষ, বলে চীৎকার করলে, নিজের গণ্ডীর বাহিরে যাব না ও রামকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব এই করিলে, আমাদের এই বর্ত্তমান অর্থসমস্যার নিরাকরণ হইবে না। বরঞ্চ আমরা ক্রমশঃ পিছু হঠিতেই থাকিব—এবং বর্ত্তমান সভ্যজগতের সহিত সমগতিতে চলিতে না পারা হেতু আমরা ক্রমে ক্রমে আরও কোণঠেসা হইতে থাকিব, আরও নিরুপায় হইয়া পড়িব।

তবে আমি একথা বলিব—যে আমাদের শিক্ষার যেটী প্রধান অঙ্গ—অর্থাৎ চরিত্র গঠন—সেইটীর আমাদের অভাব, আমাদের adaptabilty র খুবই অভাব। এবং ইহার জন্য আমরা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী। আমরা এতই অনুকরণ প্রিয় যে আমরা বাইরের পারিপাট্যে সমস্তই ভুলিয়া যাই, আমরা মনে করি যে, বাহিরটাই আমাদের সব—ভিতর বলে একটা জিনিষ কিছুই নাই। এই অন্ধ অনুকরণের বশীভূত হইয়া আমরা আম'দের অভাব এতই দিন দিন বাড়াইয়া ফেলিতেছি যে আমাদের সীমাবদ্ধ এবং সামান্য আয়ে আর আমাদের সঙ্কুলান হইতেছে না। আমাদের এখন চেয়ার টেবিল না হইলে চলে না, সিগারেট চা না খাইলে এবং সময়ে পানবিশেষও না করিলে ভদ্রসমাজের যোগ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে না। পায়ে তালতলার চটী আর গায়ে উড়ুনী যা নিয়ে—বিদ্যাসাগর মহাশয় লাট সাহেবের কাছেও যেতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, সেকথা অধুনাতন শিক্ষিত যুবককে বলিতে গেলে তিনি শিহরিয়া উঠিবেন এবং বলিবেন সে একটা রুচিবিরুদ্ধ সেকালের অসভ্য জিনিষ। আমরা কি বলিব যে এর জন্য আমাদের ইউনিভারসিটী দায়ী, না আমরা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী? অতএব দেখা যাচ্ছে যে আমাদিগের দেশের আদর্শ অনুযায়ী, "Plain living and high thinking" এই মহাবাক্য অনুসরণ করে চল্‌তে হ'বে। আমাদের জাতিয়তা, আমাদের বৈশিষ্ট্য এ গুলি বজায় রাখিতে হইবে। ডাক্তার হালদারের কথায় বলিতে গেলে আমাদের পুরাণ ঘরে নূতন জিনিষ সাজাইয়া—তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতে হইবে; আমাদের সেই পুরাতন ঘরটীকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিলে চলিবে না। কিম্বা Woodroff সাহেব তাঁহার "Is India civilised" গ্রন্থে যাহা পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন 'Beware India, let there be political conquest

but let there be no cultural conquest. এই মহাবাক্যটী সততই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদের যে গ্রামকেন্দ্রী সভ্যতা তাহা বজায় রাখিতে হইবে। তা হ'লেই আমাদের খরচ পত্র খুব কমিয়া যাইবে, আমাদের এই দারুণ অন্নকষ্টের অনেকটা উপশম হইবে, আমাদের দুঃখের অবসান হইবে। তা না হ'লে আমরা আমাদের সমস্ত হারাইয়া একটা কিম্ভুতকিমাকার জীব হইয়া যাইব, আমরা আর আমরাই থাকিব না।

তাই আমি বলিতে চাই যে আমাদের এখানকার সভ্যতা, যাহার কেন্দ্র হইতেছে গ্রাম, আমাদের সেইটী বজায় রাখিতে হইবে। গ্রাম ছাড়িয়া সহরের দিকে ছুটিলে আর চলিবে না। আমাদের গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আবার গড়িয়া উঠিতে হইবে। আমাদের উচ্চ শিক্ষাও লাভ করিতে হ'বে এবং আমাদের চাষের ধান, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ, আর পল্লীগ্রামে বাস এই গুলি আমাদের আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে। তা না ক'রে তেড়ি কেটে, পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে, সহরে হ'য়ে গ্রামের নাম শুন্‌লে নাক সিট্‌কাইলে আমাদিগকে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হইবে, আমাদের অন্নের জন্য যে মহা হাহাকার তা আর ঘুচিবে না। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার বাসগৃহ।

(বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত)

বাঙ্গালার সব গিয়াছে,—ধর্ম্ম গিয়াছে, কর্ম্ম গিয়াছে; জল গিয়াছে, ফল গিয়াছে; ধন ধান্য, আচার বিচার, দেহ গেহ,—বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া যাহা কিছু ছিল, সবই গিয়াছে। সৎশিক্ষার অভাবে গিয়াছে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম; ধর্ম্মভাবের অভাব জন্য অনাবৃষ্টিতে গিয়াছে জল ও ফল; বিলাস-বাহুল্যে কমলার অকৃপায় গিয়াছে ধন ও ধান্য; সংসর্গদোষে গিয়াছে আচার ও বিচার; অনাচার কদাচার ও কদাহারে গিয়াছে দেহ; আর অবশেষ যাহা ছিল, বৃথা জলুসে সেই গেহও গিয়াছে। এ প্রবন্ধে সেই গেহ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বকালের বাঙ্গালায়—সেই পূর্ব্বকালের পল্লী-বাঙ্গালী কিরূপ আবাসে বাস করিত আর কিরূপ আবাস ভালবাসিত, এখানে তাহারই একটু আভাস দিতেছি। সেই আবাস সম্বন্ধে

একটী প্রাচীন গাথা এই ঃ—

"কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ঃ।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্ ॥"

বাসগৃহ যত প্রকার হইতে পারে, তন্মধ্যে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহই শ্রেষ্ঠ এবং নানাকারণে ইষ্টকর। কেননা, ইহা দেখিতে ভাল, অনেক দিন টিকে, ঝড়ে প্রায় নষ্ট হয় না, অগ্নি প্রায় গ্রাস করিতে পারে না; বিশেষতঃ ইহার ব্যবহারেও খুব সুখ—শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল। কিন্তু সে পাকা ঘর কয়জনের ভাগ্যে সম্ভবে? সেকালের লোক দেহ বা গেহ-সর্ব্বস্ব ছিলেন না, তাঁহারা নিজ অর্থের পরতাল করিয়া দেখিতেন—যদি দোল দুর্গোৎসব পিতৃ মাতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি দৈব পৈত্র যাবতীয় কার্য্য কলাপ ভূরি-ভোজনাদি জাঁকজমকের সহিত করা যায়; আর তাহা করিয়া যদি পাকাঘর নির্ম্মাণের মত অর্থ থাকে, তবেই তাঁহারা তাহা করিতেন। সুতরাং সেকালে পাকা গৃহ কোন সমৃদ্ধগ্রামে হয়ত একটি থাকিত, কোন স্থানে বা দু'দশখানা গ্রামেও একটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। সে কালের অনেক বড় বড় জমিদারও খড়ের ঘরে বাস করিতেন। সে সকল জমীদার বরঞ্চ বৎসরে এক একটা বড় বড় ক্রিয়া করিয়া বহু দূর দেশের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে পর্য্যন্ত প্রচুর দান ও স্বদেশ ও বিদেশের দরিদ্রদিগকে ভোজ্য বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন; আর তৃণের ঘরে বাসের অগৌরব তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া ভাসাইয়া দিতেন। একালের অনেকে ধর্ম্মকর্ম্ম বর্জ্জিত উদরসর্ব্বস্ব, আত্মম্ভরি, ঠিক পাকা গৃহের মত টাকাকড়ি হইলেই যা হউক করিয়া একটা পাকা ঘর করিয়া ফেলে। পূর্ব্বকালের লোক সকল দিকেই বড় উদার ছিলেন; ছোট খাট বাটী তৈয়ারীতে তাঁহাদের মন উঠিত না। আর একালের লোক আর কিছু হউক বা না হউক, অতিথি অভ্যাগত স্বজন বান্ধব কেহ থাকিতে পারুক আর নাই পারুক, মাত্র পত্নী পুত্র লইয়া থাকিবার মত কয়েকটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়, তাই এখন সহর নগরের ত কথাই নাই, পল্লী অঞ্চলেও—প্রত্যেক গ্রামে ত বটেই, পরন্তু প্রত্যেক পল্লীতে ছোটখাট অনেক পাকা বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। সহরে এইরূপ ছোট বাড়ীর বিভীষিকা খুব বেশী। ঠাকুর ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপ ত এখন প্রায় কাহারও প্রয়োজনই হয় না; সুতরাং সেদিক্ নিরাপদ্! কিন্তু পূর্ব্বে যে পায়খানার ব্যবস্থা ছিল, বাস্তুর দ্বিশত হস্ত দূরে, স্থানাভাবে সেই পায়খানা এখন পাকের ঘর বা শয়ন গৃহের পাশে

অনেককেই করিতে হয়। বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলেও কোঠা ঘরের মত আবরু রক্ষার অনুরোধে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালীগণকে আজকাল ছোট বাড়ীর পাশেই পায়খানা করিতে হইতেছে।

কেবল কি ইহাই!—সব দিকেই যে বিড়ম্বনা। এখনকার বড়লোক রাজা জমিদারই বা কি আর মধ্যবিত্তই বা কি, পাকা গৃহের প্রস্তুত-প্রণালী সকলেই বিদেশী আদর্শে অবলম্বন করিতেছেন, সুতরাং গ্রীষ্মে সম্পূর্ণ ত নহেই কোথাও বা একটু আধটু শীতল হইলেও শীত-কালে উষ্ণ একবারেই নহে—বরঞ্চ শীতলাতি-শীতলই হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের উষ্ণতার বা শীতের শৈত্যের কারণ একমাত্র মাল-মসলা। এখন আর কাঠের কড়ি বর্গার ব্যবহার হয় না, লৌহাদি দ্বারা সে সব কার্য্য করা হয়। কাঠ অচালক, আর লৌহ চালক; কাজেই, সেই লৌহ শীতে শৈত্য ও গ্রীষ্মে উষ্মা বাহির হইতে আকর্ষণ করে। তারপর একটী মহানিষ্টকর সিমেণ্ট অর্থাৎ বিলাতী মাটীর ব্যবহার চলিয়াছে। এই মাটী মোড়া মেজে শীতকালে কিরূপ হয়, তাহা আর কাহাকেও বলিতে হয় না; আবার যেস্থানের সিমেণ্টে রৌদ্র লাগে, সে স্থান যে কি দারুণ উত্তপ্ত হয়, তাহাও বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। তেমন উত্তপ্ত সিমেণ্টে পা দিলে যে পায়ে ফোস্কা পড়ে, শীতের শিশির-সিক্ত সিমেণ্টে পা দিলে যে পায়ে খাল ধরে এবং অনাবৃত-নিতম্ব শিশুকে শীতকালে সিমেণ্টের উপর কিছুকাল বসাইয়া রাখিলে যে তাহার সদ্য আমাশয় হয়, ইহা অনেকের প্রত্যক্ষ ফল কথা—ইহা যে দেশের চলন, সেই শীতপ্রধান দেশের লোক সর্ব্বঋতুতে সর্ব্বাবস্থায় পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত আবৃত রাখে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—বিশেষতঃ আচার অনুষ্ঠানের দেশে—ত্রিসন্ধ্যা স্নান আচমন পূজা পাঠ করার দেশে তাহা কি সম্ভবে? না উচিত? বলিতে কি, কালমাহাত্ম্যে এখন নর্দ্দমা তৈয়ারীর উপযুক্ত উপকরণে ঠাকুর ঘর তৈয়ারী হইতেছে। সিমেণ্টের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বে চণ্ডীমণ্ডপের মেজেয় পর্য্যন্ত কেহ ইট দিতেন না, কারণ মাটিতে পূজা-যাগাদি প্রশস্ত বলিয়া ঠিক ঠাকুর বসাইবার খাটালটি কাঁচা রাখিতেন! অবশ্য এখন সেই মেজে প্রায় সর্ব্বত্র পাকা হইলেও মাটির বেদী করিয়া অভাবপক্ষে মাটি ছড়াইয়া দিয়া প্রতিমা বসান বা যজ্ঞ বেদী করা হয়। কিন্তু যদি দৈবাৎ বেদী হইতে সিমেণ্টের উপর আগুন গড়াইয়া পড়ে, তবে বন্দুকের মত ফুটিয়া সিমেণ্ট চটিতে থাকে, তাহাতে চক্ষু কর্ণ নষ্ট

হওয়ার আশঙ্কাও বিলক্ষণ আছে। ঘরের মেঝে যে আমাদের দেশে পূর্ব্বে হইত না, তাহা নহে। চূণের সহিত নানা প্রকারের দেশীয় মসলা মিশাইয়া এক প্রকার পঙ্কের কার্য্য হইত, তাহাকে শান বাঁধান বলিত, তাহতে পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব কিছুই হইত না; পরন্তু—"শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্" এই উক্তিই প্রকৃত প্রমাণ করিয়া দিত। সে উক্তিকে এখন ব্যর্থ হইতে দেখিয়া বলিতে হয়—বাঙ্গালার গেহও গিয়াছে।

তার পর ছিল—তৃণের বা খড়ের ঘর। এই খড়ের ঘর সম্বন্ধে পশ্চিম ও পূর্ব্ববাঙ্গালার নির্ম্মাণ ও উপকরণ প্রণালীর কিছু পার্থক্য ছিল। পশ্চিম বাঙ্গালায় ছিল মাটির দেওয়াল বাঁসের বাঁখারীর চাল ও ধানের খড়ের ছাউনী; আর পূর্ব্ব বাঙ্গালায় কাঠের কিংবা ছেঁচা বাঁশ বা হোগলার বুনানো বেড়া আর উলুখড়ের ছাউনী। পূর্ব্ববাঙ্গালা ভাদ্রমাসে বন্যায় ভাসে, মাটীর আঁস বা আঁটা ভাল নহে, জলের সম্পর্কে গলিয়া পড়িয়া যায়; এজন্য অনেক স্থলে মাটীর দেওয়াল হয় না; আর ৮।১০ হাত জলের মধ্যে ধানগাছ লতার মত বাড়িয়া উঠে, অনেকদিন অনেকাংশ জলের মধ্যে থাকে বলিয়া তাহা পলে পরিণত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা ছাউনী হয় না। পশ্চিম বঙ্গে উলুখড়ের অল্পতা, তাই বিচিলী অর্থাৎ ধানের খড় দিয়া ঘর ছাওয়া হইয়া থাকে। যাহাই হউক, গৃহ-সম্বন্ধে এই উভয় ব্যবস্থাই স্বাস্থ্যকর ও অনায়াসসাধ্য ছিল।

সময়ের স্রোতে সম্প্রতি সেই তৃণাবাসেও বিকৃতি ঘটিয়াছে। অবশ্য পশ্চিম বাঙ্গালাও একবারে বাদ যায় নাই, তবে সেরূপ বিকৃতি অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু পূর্ব্ববাঙ্গালা একবারেই মজিয়াছে। পূর্ব্ববাঙ্গালায় উলুখড়ের ঘর আর নাই বলিলেই হয়, করগেট অর্থাৎ টীনের ঘরে বাঙ্গালা ভরিয়া গিয়াছে।

এইরূপ হইবার কারণ অনেকেই অনেকরূপ বলেন। তন্মধ্যে দুইটী প্রধান,—প্রথম জলুষ ও অপরটি উপকরণের অভাব। জলুষের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, যৎকালে আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রাদুর্ভাব, সেকালের একটি গ্রাম্য কারিকা হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য মর্য্যাদা-স্থাপক মহারাজ বল্লাল সেনের সময় একটী ঘটক-কারিকা প্রচলিত ছিল,—"পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁয়ী, এ ছাড়া আর বামুন নাই। যদি থাকে দু' এক ঘর, সাতশতী আর পরাশর॥" কালে সেই কারিকার অনুরূপ আর একটি গ্রাম্য-কারিকার সৃষ্টি হয় যে, "ইংরেজী গোত্র পাটকেল

গাঁয়ী, এ ছাড়া আর বামুন নাই। যদি থাকে দু'এক ঘর, কাঠের বেড়া টিনের ঘর॥" ইংরেজী না হইলে সমাজে যে মান হইত না বা পাটকেল অর্থাৎ পাকা ঘর কিম্বা টীনের ঘর না থাকিলেও যে প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইত, ইহা ঐ কারিকার আকার দেখিলে বেশই বুঝা যায়।

হায় রে! কি কুক্ষণেই আমাদের দেশে ধর্ম্মহীন—প্রাচীন আচারের সম্পর্কহীন কেবল বিলাস সাধক ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হইয়াছিল. যাহার ফলে আজ আমরা জাতীয় জিনিষ—নিজস্ব জিনিষ সবই বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। এই টীন এদেশে প্রথমে আমদানী হয় রেলের ষ্টেশনে ও বড় বড় গুদাম তৈয়ারীর জন্য। বিদেশীরা তখন স্বপ্নেও মনে করে নাই যে, ইহার এত ফালাও কারবার হইবে। বাঙ্গালী বেশ বকের পাখার মত সাদা দেখিয়া গুণাগুণ বিচারের অবসর পাইল না, সকলেই কিনিতে ও ঘর করিতে লাগিল, টিনের কারবারও বিপুলতর বাড়িয়া গেল। এখন এই টিনে আমাদের দেশ হইতে বিদেশে যে কত ক্রোর ক্রোর টাকা যায়. তাহার সংখ্যা হয় না। অথচ গৃহস্থ কোন্ গুণে যে টিনে এত টাকা নষ্ট করে, তাহা আমরা বুঝি না।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠফাটা রৌদ্রে টিন একবারে আগুন হয়, গৃহস্থ সমস্ত দিন সেই টিনের আগুনে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তারপর সেই উত্তপ্ত টিন ভূবাষ্প এতই আকর্ষণ করে যে, সমস্ত টিন ভিজিয়া রাত্রিশেষে সামান্য বৃষ্টিধারার মত টিনের গা দিয়া মৃত্তিকায় পতিত হয়। গৃহস্থ দিনে দারুণ তাপে দগ্ধ, আর রাত্রিতে শীতল ভূবাষ্পে সিক্ত হয়। খরতাপের সঙ্গে সঙ্গেই শীতল অর্থাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে কি হয়, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হয় না। তারপর গৃহস্থিত খাদ্য দ্রব্যাদির দশা;—গ্রীষ্মে নারিকেলের জল শুকাইয়া যায়, বর্ষায় চাউল ডাইলে ছাতা ধরে। যে স্থানে নারিকেলের জল শুকায় বা খাদ্যদ্রব্যে ছাতা ধরে সে স্থলে মানুষের মগজ যে শুকাইবে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া কঠিন জ্বর হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র কি? বহুকালের প্রবাদ ছিল, বাঙ্গালীর মত বুদ্ধিমান্ কুত্রাপি হয় না; এখন ত সেরূপ দেখিতেই পাওয়া যায় না। অবশ্য অন্যান্য অপচারের মধ্যে টিনের তাপে মগজ শুকান যে এক কারণ নহে, ইহা কে বলিতে পারে? আজকাল বাঙ্গালায় জ্বর হইলেই যে নিউমোনিয়া দেখা দেয়, মনে হয় ইহারও এক কারণ টিনের ঘর।

অনেকে মনে করেন এবং বলেন,—উলু-খড়ের দর দশ টাকার স্থানে বিশ টাকা, বাঁশ

একখানা চারি আনা স্থলে আট আনা ; এরূপ অবস্থায় কাঁচা ঘর কেমন করিয়া হয়। তারপর কাঁচা ঘরে আগুনের ভয় বেশী ইত্যাদি ইত্যাদি অজুহাতে অনেকে টিনের ঘর করেন। আমরা বলি,— দ্রব্য সস্তা বা মূল্য বোধ হওয়া নিজ নিজ সংযমের অধীন। দশ টাকা বিশ টাকা দামের জুতা না পরিয়া, অনাবশ্যক কোট কামিজ অলষ্টারে দেহ না সাজাইয়া, সেই টাকায় দেহরক্ষার উপযোগী গৃহের শুদ্ধ উপকরণ কিনিলে পড়তায় সমান পড়িয়া যাইবে এবং সস্তাও বোধ হইবে। ফলে দেহ সুস্থ থাকিবে, আয়ু ক্ষীণ হইবে না। আগুনের ভয় খড়ের ঘর অপেক্ষা টিনের ঘরে কোনও অংশে কম নহে। কারণ, আগুন কোথাও মানুষের ঘরে বারো মাস লাগিয়া থাকে না দৈবে কচিৎ কখনও হয় ; কাহারও দুর্ভাগ্যে সেরূপ কখন ঘটিলেও দেশী ঘরের দেশী আগুন সহজেই নির্ব্বাণ করা যায় ; কিন্তু বিদেশী টিনের ঘরের বিদেশী আগুনের উত্তাপের নিকট যায়, কাহার সাধ্য ? বিশেষতঃ আগুনের সংসর্গে টিন এত তাতে এবং এমন ভাবে ফুটফাট ফুটিতে ছুটিতে থাকে যে, তাহার কাছে একবারে যাওয়াই যায় না। ঝড়ে যে টিনের কি অবস্থা হয়, গত ১৩২৬ সালের আশ্বিনের ঝড়েই তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঝড়ে টিন খুলিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়া প্রায় শতাধিক হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

তাই বলি বাঙ্গালী! নানাবিধ ব্যাধির উৎপাদক জামা জুতার ব্যয় কমাও, ফরাসীকাট চুল ছাঁটা সাবান চুরুট চা ত্যাগ কর, সেই অর্থ জীবন ধারণের জন্য শুদ্ধ আহারে বিশুদ্ধ আবাসে ব্যয় করিয়া আবার সেই অচিরলুপ্ত—বাঙ্গালীর নীরোগ দীর্ঘজীবন, বাঙ্গালীর হাতীর বল,বাঙ্গালীর মেধা, বাঙ্গালীর বুদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধন কর। আর পরের সৌন্দর্য্যে মজিও না, পরের অনুকরণ করিও না, যদি বাঁচিতে চাও, প্রাচীন আচার সর্ব্বতোভাবে পালন কর। মা জগদম্বা! স্বসন্তানে সুবুদ্ধি দাও।

——

বাঙ্গালার প্রাণকথা

(কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন লিখিত)

বাজিছে কালের ভেরী—নাহিক নিস্তার,
সদা মৃত্যু বিভীষিকা—শুধু হাহাকার।

পৃথিবীর লোক সংখ্যা ৯৫০ কোটী, প্রত্যাহিক জন্মসংখ্যা ২ লক্ষ ২০ হাজার এবং মৃত্যু-সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার। সুতরাং পৃথিবীতে প্রত্যহ ৪০ হাজার এবং প্রতি বর্ষে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ বিপুলা বসুন্ধরার প্রায় সর্ব্বত্র এ লোক প্রবাহ নিয়ত বৰ্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালা দেশের ১০১৮ সালের জন্মসংখ্যা ১৬ লক্ষ ২৭ হাজার ১৭৩ এবং মৃত্যুর-সংখ্যা ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৩১ জন; সুতরাং বঙ্গে জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা০ প্রায় ১লক্ষ অধিক। এই মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া ১৯০৯ সালে ১ লক্ষ স্থলে ৩ লক্ষ ৯৬ সহস্রে পরিণত হইয়াছে! অর্থাৎ অধুনা বঙ্গে প্রতিবৎসর যত লোক জন্ম গ্রহণ করিতেছে, তদপেক্ষা প্রায় ৪ লক্ষ অধিক লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। হায়! কি ভয়াবহ পরিণতি।

১৯২০ ও ১৯২১ সালে জ্বরে বঙ্গে ১১৪৪৪২১ ও ১০৭০৩৬৮ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল; অর্থাৎ জ্বরে হাজারকরা মৃত দুই সনে ২৫২ ও ২৩৫ জন। উক্ত দুই সালের মোট মৃত্যু-সংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ লোকই জ্বরে মরিয়াছে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের স্বাস্থ্য। রিপোর্টে প্রকাশ:—১৯২০ এবং ২১ সালের মৃত্যু-সংখ্যা ১৪৮০১৬১২ ও ১৪০৩০৬০ কিন্তু জন্ম-সংখ্যা ১৩৫৯৯১৩ এবং ১৩০১০০০ মাত্র। জন্মের অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যাই অধিক, এ কিছুতেই শুভ লক্ষণ নহে।

১৯২০ সালে বাঙ্গালা দেশ সমগ্র ভারত-বর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর প্রদেশ। ডিরেক্টর অব্ পাবলিক হেলথ বলেন, আর্থিক হীনতাই নাকি এ অস্বাস্থ্যের কারণ।

দুঃখে কবি বলিয়াছেন,—

"পেটে ভাত নাই ফ্যাল ফ্যাল চাই
পর মুখ চেয়ে থাকি;
দেহে নাহি বল হৃদয় বিকল
মরিতে কেবল বাকী।"

১৯২০ এবং ২১ সালে ২৮২০৯০ ও ২৬৯১৬২ জন শিশু এক বৎসর না হইতেই মৃত্যু-মুখে

পতিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই দুই বৎসরের শিশু-মৃত্যুর হার প্রতি সহস্রে ২০৭ এবং ২০৬ জন। মুর্শিদাবাদ জেলার একটি পাঁচ হাজার লোকের ক্ষুদ্র সারকেলে যথাযথ গণনা রেজেষ্টারীর ফলে দেখা গিয়াছে যে, সেইখানে প্রতি হাজারে সাত শত শিশুরই মৃত্যু হইয়াছে। শতকরা ৫০ জন শিশুর মৃত্যু জন্মকালীন দুর্ব্বলতা হইতে হইয়া থাকে। শত করা প্রায় ১১ জন ধনুষ্টঙ্কারে মরিয়া থাকে।

লণ্ডনে শিশু-মৃত্যু-হার প্রতি সহস্রে ১শত মাত্র। কিন্তু বঙ্গে প্রতি সহস্রে ৬১০টি শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। এ দেশে প্রত্যহ গড়ে ১ হাজার শিশু অকালে কালকবলিত হয়। ইংলণ্ডে প্রতি সহস্র প্রসূতির মধ্যে ১ জন মাত্র প্রসূতি সূতিকাগৃহে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু এদেশে প্রতি ৪০ জনের মধ্যেই ১ জন প্রসূতির সূতিকাগৃহে মৃত্যু হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইংলণ্ডে যে স্থলে ১ জন মরে, বঙ্গে সে স্থলে ৫০ জন প্রসূতির মৃত্যু হয়। বঙ্গে প্রায় ৩ শিশু সূতিকাগৃহেই কাল-কবলিত হইয়া থাকে। উঃ! কি ভীষণ কথা!

জাপানে জন্ম শত করা ৩২'৮ এবং মৃত্যু ২০'৮ সুতরাং উদ্বৃত্ত '২, ভারতে জন্ম ৩৮'৫, মৃত্যু ৩৪'২ বৃদ্ধি ৪'৩ এবং বঙ্গে জন্ম ৩১'৬, মৃত্যু ৩২'৮, সুতরাং বৃদ্ধি শূন্য; অর্থাৎ মৃত্যুই বেশী। বঙ্গে ক্ষয় হাজারকরা ১০২ জন। ১৯১৮ সালে বঙ্গে শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেই ৪লক্ষ ৭৫ হাজার ১৩৮ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব সেনসাস কমিশনার মিঃ জেমার্টেন মহোদয়ের ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুরারী মাসের "রয়লে সোসাইটি অফ—আর্টসের" এক বিভাগের সম্মুখে পঠিত প্রবন্ধে প্রকাশ যে, ১৯১৮—১৯ খৃষ্টাব্দে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ৬০ লক্ষ ভারত বাসীর মৃত্যুর কথা ঠিক নহে; প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু সংখ্যা উহার দ্বিগুণ—প্রায় ১কোটি ২৫ লক্ষ। সমগ্র ভারতের লোক-সংখ্যায় ইহা শত করা ৪ ভাগ। যাহা উক্ত রোগে ভুগিয়া জীবনী শক্তি আংশিক হারাইয়াছে অতঃপর তাহাদের অনেকেই হয়ত অন্য রোগে প্রাণ হারাইয়াছে। ইউরোপীয় বিগত মহাকুরুক্ষেত্র যুদ্ধের লোক ক্ষয়ের তুলনায় এ ধ্বংস যজ্ঞ বড় সাধারণ নহে। বঙ্গের ন্যায় পৃথিবীর আর কুত্রাপি মৃত্যু-সংখ্যার এরূপ ভীষণতা পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ জাতীয় ধ্বংসের নাম জাতীয় আত্মহত্যা।

১৯২১ খীষ্টাব্দের আদমশুমারীর ফলে দেখা যায় যে, এবার আবার হিন্দু-সংখ্যা ১লক্ষ ৩৬ হাজার ২ শত ৩১ কমিয়াছে। মুসলমানের

সংখ্যাই যাহা কিছু বৃদ্ধি পাওয়ায় মোটের উপর লোক সংখ্যা শতকরা ২জন মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ বৎসরের বৃদ্ধির হার ছিল এবারের চারিগুণ; অর্থাৎ শতকরা ৮জন। পশ্চিম বঙ্গের অবস্থাই অধিকতর শোচনীয়।

বর্দ্ধমানে ৬-৫, বীরভূমে ৯-৪ বাঁকুড়ায় ১০-৪ মেদিনীপুরে ৫-৫, হুগলীতে ০-৯, নদীয়ায় ৮, মুর্শিদাবাদে ৮, যশোহরে ১, পাবনায় ২-৭, মালদহে ১-৮ এবং কোচবিহারে ০-১ জন। উঃ! কি ভীষণ ধ্বংস লীলা!—কি মহা বিভীষিকাময় চিত্র!

বঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু-সংখ্যা অতি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর হারই অধিক হইয়াছে। বঙ্গীয় কায়স্থের উক্ত ১0 বৎসরে বৃদ্ধির হার সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর হার শতকরা ৩ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গের ১৬টি জিলায় কায়স্থ সংখ্যা অতি দ্রুত গতিতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। বিগত ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসর কাল মধ্যে মেদিনীপুরে প্রায় অর্দ্ধাংশ, রাজসাহীতে এক তৃতীয়াংশ, ২৪পরগণায় এক চতুর্থাংশ এবং মুর্শিদাবাদে এক পঞ্চমাংশ কায়স্থ হ্রাস হইয়াছে। অন্যান্য জিলায় কায়স্থ ধ্বংশের পরিমাণ ও বড় সামান্য নহে। বঙ্গীয় মধ্যশ্রেণীর হিন্দু—সদগোপ, মালাকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, বেণে ও তাঁতি প্রভৃতি শিল্পিগণের সংখ্যাও ক্রমে হ্রাসের দিকেই অগ্রসর হইতেছে!

ইংলণ্ডে লবণ শুল্ক নাই। লর্ড কার্জ্জন লবণ শুল্ক হ্রাস করায় এদেশে প্লেগের প্রকোপ কমিয়াছিল। লবণ ব্যবহারের হ্রাস বৃদ্ধিতে পরমায়ু সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রতি বর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তি ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে ও আয়ার্ল্যাণ্ডে ৩৬ সের, মার্কিণযুক্ত প্রদেশে ২৪ সের, কানাডায় ২২ সের, এবং নরওয়ে ও সুইডেনে ২২ সের লবণ ব্যবহার করে, তাহাদের পরমায়ুর গড় ৪৫ বৎসর; ফ্রান্সে ও জার্ম্মণীতে প্রতি জনে প্রতিবর্ষে ১৭॥ সের লবণ ব্যবহার করে, তাহাদের পরমায়ুর গড় ৪০ বৎসর; রুষিয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি বর্ষে ১৬॥ সের লবণ ব্যবহার করে, তাহাদের পরমায়ুর গড় ২৪ বৎসর এবং ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিবর্ষে মাত্র ৬ সের লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে, ভারতবাসীর পরমায়ুর গড় ২৩ বৎসর মাত্র। উঃ! আমরা কি ভীষণ দরিদ্র! আমাদের যথাপরিমাণ লবণটুকু ও মিলে না! এক মাত্র রুষিয়া ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের জীবন কাল প্রায় অর্দ্ধ—শুধু ২৩ বৎসর! উঃ! কি শোচনীয়! হায়!

আমাদের!

হায়! আমরা—"দিনের দিন সবে দীন"

আমরা, "অনশনে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ!"

শুধু কি ভারতের লোক-সংখ্যাই হ্রাস পাইতেছে? না, তা নয়; ভারতের গোধনও অতি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে! বিগত ৪ বৎসরে ৪০ লক্ষ গরু হ্রাস পাইয়াছে! উঃ! কি ভীষণ ব্যাপার! নিম্নে তালিকা দেখুন,—

বৎসর।	বৃটিশভারতের গো সংখ্যা :
১৯১৭—১৮	১৪৯, ১১২,০০০
১৯১৮—১৯	১৪৮, ৯০১, ০০০
১৯১৯—২০	১৪৬, ১৬৬, ০০০
১৯২০—২১	১৪৫, ১০৩, ০০০

মানুষের মৃত্যুর তুলনায় ভারতের গো-ধন ধ্বংসের পরিমাণও বড় সামান্য নহে। ইহার প্রতিকারের কি কোনও উপায় নাই?

এ দেশের জন্ম-মৃত্যু-সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে—হৃদয় অবসন্ন হয়! জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর হার এরূপ তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাইলে বাঙ্গালী—বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুগণ যে অতি সত্বরই আমেরিকার রেড্-ইণ্ডিয়ান জাতির ন্যায় চির বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

চারিদিকে দুঃখ দৈন্য মৃত্যু হাহাকার,
বিলুপ্ত বাঙ্গালী জাতি নাহিক নিস্তার!

বঙ্গে চির দুর্ভিক্ষ যেন লাগিয়াই। এবার মোট ধান্যের চাষ হইয়াছে (আশুধান্য বাদ) ৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৮২ হাজার ১ শত ৭৯ বিঘা। উৎপন্ন ফসল ১৯ কোটি ৭৭লক্ষ ৭৫হাজার ১শত ২৫ মণ। যদি বঙ্গের লোক-সংখ্যা ৪ কোটি ৬২ লক্ষ ৮২ হাজার ৬ শত ১৭ জন হয়, তবে প্রত্যেকের ভাগে পড়ে মাত্র ৪ চারি মণ ২০ বিশ সের।

সরকারী কয়েদীর দৈনিক খোরাকী ১৩ ছটাক। একটুকু কম করিয়া ১২ ছটাক ধরিলেও প্রত্যেকের প্রতি বৎসর প্রয়োজন ৬ মণ ২৪ সের। ইহার মধ্যে শিশু ও আছে। সুতরাং প্রত্যেকের প্রতিবর্ষে মোট প্রয়োজন প্রায় ৫ মণ ৩০ সের। তন্মধ্যে আমরা পাই মাত্র ৪ মণ ২০ সের। সুতরাং প্রতিবর্ষে প্রত্যেকের কম পড়ে ১মণ ১০ সের। আশুধান্য বেশী হয় না, সে জন্য ২০ সের ছাড়িয়া দিলেও প্রতি বৎসর প্রত্যেকের কম পড়ে ৩০ সের। ইহার উপর আবার বিদেশীয় রপ্তানী! যেন গোদের উপর বিষফোট! ধনীরা অর্থবলে চিরদিনই উদর পুরিয়া খায়; সুতরাং দরিদ্রের অদৃষ্টে অর্দ্ধাশন অনশন অনিবার্য্য! হায়! তাদের—

"প্রাণাধিক প্রাণ, দয়িতা নন্দন,
দহে অনশন-দহনে আজ।"

শোকে-দুঃখে বাঙ্গালীর হৃদয়-দ্বার রুদ্ধ কণ্ঠ বিশুষ্ক! মৃত্যুর নিদারুণ কশাঘাতে –দুর্ভিক্ষ-দুর্ম্মূল্যতার ভীষণ পীড়নে শরীর মন-প্রাণ অবসন্ন! চারিদিকে মহা শ্মশান! শ্মশানে মহাশোকের ভীষণ দৃশ্য! শবচুল্লী অবিরত জ্বলিতেছে! কে এ চিতা নির্ব্বাণ করিবে? এস, সাধক! শ্মশানে শিবপ্রতিষ্ঠা–সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গল-মঠ স্থাপন করিবে ত শীঘ্র ছুটিয়া এস!

গুণের মাধুরী।

(শ্রীকমলকৃষ্ণ পাঠক)

(১)

লোভ যদি থাকে চিতে সর্ব্বগুণ হরে।
পিশুনতা থাকে যদি পাতকে কি করে॥
সত্য থাকিলে তপের নাহি প্রয়োজন।
শুচি মন হ'লে বৃথা তীর্থ পর্য্যটন॥

(২)

সদ্‌বিদ্যা থাকে যদি বিভবে কি কাজ।
কি করিবে মৃত্যু তার নাহি যার লাজ॥
অহিংসা থাকিলে ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন।
ত্যাগী যেবা বৃথা তার মস্তক মুণ্ডন।

(৩)

ক্ষমা গুণ আছে যার কবচে কি করে।
অরিভয় কিবা তার ক্রোধে যারে ঘেরে॥
জ্ঞাতি যদি থাকে তার বৃথা চিতানল।
সুহৃদ্ থাকিলে পরে দৈব সে নিষ্ফল॥

(৪)

অহিকুল কি করিবে বিষম দুর্জ্জনে।
ব্রীড়াশীলা রমনীর কি কাজ ভূষণে॥
সুকবি হইলে রাজা রাজ্য বিড়ম্বনা।
বধূ হ'লে প্রিয়তমা স্বর্গে কি বাসনা॥

(৫)

পুণ্যের আগারে যদি হয় তব বাস।
কল্পতরু ছায়া কভু না করিবে আশ॥
অতুলিত ধন রত্ন কেহ যদি পায়।
দীনে দয়া না করিলে সকলই বৃথায়॥

(৬)

পর উপকার ব্রতে ব্রতী যেই জনা।
সার্থক জানিবে তার রাজ উপাসনা॥
বন্ধ্যা নারী হ'ল যদি তোমার গৃহিণী।
নামে দার পরিগ্রহ করা হ'ল জানি॥

বিকলে যৌবন কাল কেটে যায় যার।
বিরহ ঘটয়ে যদি সাথে বল্লভার॥

(৭)

করী শোভে মদে সরোজিনী হ্রদে
রজনীতে পূর্ণচন্দ্র শোভে।
তুরঙ্গের বেগ শোভা রমণীর লজ্জা বিভা
গৃহ শোভে নিয়ত উৎসবে॥
শুদ্ধ বাক্যে শোভে পদ হংস মিথুন শোভে নদ
রাজা পেয়ে শোভে বসুমতী।
সুপুত্র কুলের শোভা ত্রিলোক বিষ্ণুর বিভা
শোভা করে পণ্ডিতে সমিতি॥

যমুনা।

(শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস)

যম ও যমুনা ভাই ভগ্নী। সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে ইঁহাদের জন্ম। সাধকগণ এই দুই জনকে অবলম্বন না করিলে ভগবানকে প্রাপ্ত হন না। যম ও যমুনা ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র সম্বল। একদা সূর্য্যদেব বিশ্ববিনিন্দন পুত্র কন্যা প্রাপ্ত হইবার মানসে কোন বিজন অরণ্যে একাসনে বসিয়া বহুকাল যাবৎ কঠোর তপস্যা করেন। শ্রীহরি তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রজাপতিকে কহিলেন "তুমি সংজ্ঞা নাম্নী একটী দুর্লভ রমণীরত্ন সৃজন করিয়া সূর্য্যের নিকট পাঠাইয়া দেও? প্রজাপতি শ্রীহরির আদেশানুসারে সংজ্ঞাকে সৃষ্টি করিয়া সূর্য্যদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সূর্য্যদেব সংজ্ঞাকে উপেক্ষা করিলেন। তখন আকাশ বাণী হইল যে "তুমি এই সংজ্ঞাকে উপেক্ষা করিও না। ইহাকে সাদরে গ্রহণ কর। ইহার গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যার জন্ম হইবে। তাহারাই জগতের পরম বন্দনীয় হইবে এবং তাহাদের অবলম্বন না করিলে কেহই আমাকে প্রাপ্ত হইবে না।" সূর্য্যদেব আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং সাদরে সংজ্ঞাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত দিবারাত্র রমণ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সংজ্ঞার গর্ভে যম ও যমুনার উৎপত্তি হইল। কোন কারণে যম শমনপুরীর অধিকারী হইলেন এবং যমুনা নদীরূপা হইলেন।

সাধক হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইলে সংজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ দুই জনের রমণে যম ও যমুনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যম সাক্ষাৎ

ধর্ম্ম যমুনা সাক্ষাৎ প্রেম। ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে হইলে ধর্ম্ম ও প্রেম ব্যতীত কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা সাধক মাত্রেই জানেন।

এই ধর্ম্ম ও প্রেমের বাসস্থান হৃদয়ে, তবে ধর্ম্মের কার্য্যাদি বাহ্য জগতে লৌকিক। প্রেমের কার্য্যাদি অন্তর্জ্জগতে।

যমুনার প্রিয় সহচরী শ্রীমতী সুমতি। সুমতির বিবাহ হয় নাই—চির কুমারী। যমুনা সুমতিকে সঙ্গে না লইয়া এক পদও কোথায় গমন করেন না। সাধকের সুমতিই প্রেম প্রকাশিত করিয়া থাকে, একথা সাধক মাত্রেই স্বীকার করেন।

ত্রেতা অবতারে যে সময় রামচন্দ্র অহল্যাকে উদ্ধার করিয়া মিথিলায় গমন করিবার অভিপ্রায়ে যমুনা নদী পার হইবার উদ্যোগ করিলেন--নাবিক বাধা দিয়া কহিলেন•"প্রভো! নৌকায় পা দিবেন না; কাষ্ঠ ও পাষাণে প্রভেদ নাই। আপনার ঐ পদরজে পাষাণ মানবী হইয়াছে। কি জানি আপনার পদরজ লাগিয়া যদি আমার এই সাধের তরণীখানি মানুষ হইয়া যায়, তাহা হইলে আমার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করা দায় হইয়া উঠিবে। আমার এমন সঙ্গতি নাই যে আর একখানি তরণী তৈয়ারী করিয়া লইব। অতএব আমি আপনাকে কিছুতেই পার করিতে পারিব না; আপনি সাঁতার দিয়া পার পার হউন।" রামচন্দ্র নাবিকের কথা শুনিয়া অতি সুধামাখা স্বরে পার করিয়া দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। সেই স্বর নাবিকের কর্ণকুহরে যেন সুধা সম প্রবেশ করিল। তখন নাবিক আনন্দে আত্মহারা হইয়া কহিলেন "প্রভো। যদি নিতান্তই আপনাকে পার করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে আপনার পদকমলের ধুলি ধুইয়া দিয়া পশ্চাৎ পার করিব। আমি আপনার ঐ পদরজের গুণ দেখিয়াছি। তাহাতে আমার অনুমান হয় আমার নৌকাও মানুষ হইতে পারে।" এই বলিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল আনিয়া রামচন্দ্রের পদ যুগল উত্তম রূপে ধৌত করিয়া দিলেন ও মস্তকের বস্ত্রদ্বারা ভালরূপে মুছাইয়া দিলেন। এবং কোলে করিয়া নৌকার উপর তুলিয়া কহিলেন "প্রভো! এই ছেউতির উপর পদ যুগল স্থাপন করুন; দেখিবেন যেন নৌকায় পা না ঠেকে!"

এই কথা বলিয়া জয় শ্রীহরি বলিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে নৌকা খানি সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া নাবিক ভয়ে অধীর হইয়া কহিলেন 'প্রভো! করেন কি! করেন কি! এই দেখুন আমার সাধের তরণী সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এখনি

মানুষ হইয়া যাইবে?" রামচন্দ্র অভয় দিয়া কহিলেন "আর ভয় নাই নাবিক। তোমার নিজ গুণে আজ নৌকা সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে— আমার গুণে নয় নাবিক!" তুমি যদি জয় শ্রীহরি বলিয়া নৌকা না ভাসাইতে তাহা হইলে কখনই সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিত না।" নাবিক কহিলেন "প্রভো! আমি প্রত্যহই জয় শ্রীহরি বলিয়া "না" ভাসাইয়া থাকি, কই অন্য দিন ত সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করিতে দেখি নাই, আজ ধারণ করার কারণ কি? অতএব বুঝিলাম আপনার চরণের গুণে নৌকা স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।" রামচন্দ্র কহিলেন "নাবিক! আজ যেমন মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া জয় শ্রীহরি বলিয়া নৌকা ভাসাইয়াছ, অন্য দিন এরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া নৌকা ভাসাও নাই, তাই অন্য দিন নৌকা সুবর্ণবর্ণ ধারণ করে নাই।" এইরূপ কথোপকথনে নৌকা পর-পারে আসিয়া ভিড়িল। এমন সময়ে নাবিকের গৃহিণী খেপী আহারাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ নৌকার উপর দৃষ্টি পড়াতে দেখিলেন, স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ আজ তরণীর উপর বসিয়া আছেন এবং তাঁহার পদ-কমল ছেউতির উপর রহিয়াছে—তাহা দেখিয়া নাবিককে সম্বোধন করিয়া শত শত ধিক্কার দিয়া কহিলেন "ওরে হতভাগ্য নাবিক! দেখিতেছিস্ না আজ তোর নৌকায় কে পার হইতেছেন? ওরে মহামূর্খ! তোর নয়ন থাকিতে তুই অন্ধ! তুই অহংমদে মত্ত হইয়া আজ ত্রিলোক নাথকে চিনিলি না?

যে চরণ বিধি মহেশ্বর নারদাদি ঋষিগণ প্রাপ্ত হইবার জন্য অহরহ ধ্যান করেন, সেই দুর্লভ চরণ তুই নিজ বক্ষে ধারণ না করিয়া অনাদর পূর্ব্বক ছেউতির উপর রাখিয়াছিস। ধিক তোরে শত শত ধিক। তোর কত দিনে জ্ঞান হইবে তাত বুঝিতে পারি না।" এই কথা শুনিয়া নাবিকের মন হইতে সমস্ত অন্ধকার দুর হইয়া গেল, তখন কহিলেন—"কি বলিলি খেপি? যে চরণ পাওয়ার জন্য আমি এত কাল যমুনার খেয়া ঘাটে পাটুনি হইয়া রহিয়াছি; সেই পরম আরাধ্য প্রভু আজ আমার নৌকায়! ওঃ হোঃ! আমি ঘোর পাপী, আমি ঘোর পাপী। আমার নয়ন থাকিতে আমি অন্ধ। খেপি? তুই ধন্য। তুইই জগৎ প্রভুকে চিনিয়াছিস! খেপি! খেপি! খেপি! তুই আজ আমার পরম গুরু! তুই আজ আমার প্রভুর চরণ চিনাইয়া দিলি? আয়, খেপি আয়। তোর ঐ চরণ আমি সাধে পূজা করি! এই বলিয়া নাবিক নিজ স্ত্রীর পদতলে পতিত হইলেন। খেপী 'করিস কি! করিস কি!" বলিয়া সরিয়া দাড়াইলেন এবং কহিলেন

"যা যা, শীঘ্র যা, ঐ পরম দয়াল প্রভুর পদ যুগল বক্ষে ধারণ ক'র। নাবিক তখন রামচন্দ্রের পদকমল বক্ষে ধারণ করিয়া মহানন্দে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। খেপিও সেই সঙ্গে পাগলের প্রায় হইয়া নাচিতে লাগিলেন।

এদিকে যমুনা নিজকে শত শত ধিক্কার দিয়া কহিলেন "আমার মত পাপী জগতে দুটী নাই। আমি ঘোর পাপী, আমি মহাপাপী, তাইতে মহাপ্রভু রামচন্দ্র আমার নীরে পদস্পর্শ করিলেন না।" এইরূপে যমুনা অধৈর্য্য হইয়া আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র যমুনার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন "যমুনে! ধৈর্য্য ধারণ ক'র! ক্রন্দন সংবরণ ক'র! জগৎবাসী মাত্রেই জানে আমি স্বাধীন নই—ভক্তের অধীন। ভক্ত যাহা করিয়া আনন্দ পায় আমি তাহাই করিয়া থাকি। ভক্ত আমার হৃদয়, ভক্ত আমার জ্ঞান, ভক্ত আমার ধ্যান, ভক্তের তরে আমি বলির দ্বারে দ্বারী হইয়াছি, ভক্ত আমাকে যাহা খাওয়ায় আমি তাহাই খাইয়া থাকি! আমি ভক্তের দাস—ভক্ত আমার দাস নহে। আমি ভক্তের তরে তোমার নীরে পদস্পর্শ করিতে পারি নাই। যমুনে! ধৈর্য্য ধর? ক্রন্দন সংবরণ কর? আমি দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" যমুনা ক্রন্দন সংবরণ করিয়া কহিলেন "প্রভো! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণ অবতারে মৎপুলিনে লীলাদি করিবেন।" রামচন্দ্র "তাহাই করিব" বলিয়া গমন করিলেন।

দেহে ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই তিনটী নাড়ী বিদ্যমান আছে। দক্ষিণ পার্শ্বে ঈড়া বা গঙ্গা, বাম পার্শ্বে পিঙ্গলা বা যমুনা এবং মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া সুষুম্না বা সরস্বতী নাড়ী। ঐ সুষুম্না নাড়ী মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বরাবর দ্বিদল পদ্মে যাইয়া ঈড়া ও পিঙ্গলার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ স্থানকে মহাজনগণ ত্রিবেণী বলেন। যোগীদিগের ঐ স্থান মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত। ঐ স্থানে অবগাহন করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গের ফল লাভ হইয়া থাকে—আর পুনঃ জন্ম হয় না। ঐ সুষুম্না নাড়ীতে সুর পদ্ম বিরাজ করিতেছে যথা চতুর্দ্দল ষড়দল, দশদল, শতদল মতান্তরে দ্বাদশদল, ষোড়ষদল ও দ্বিদল। অষ্টদল ও সহস্রার ঐ নাড়ীর সংলগ্ন নহে। অষ্টদল পদ্ম হৃদি বৃন্দাবনের অন্তর্গত নাভি মূলে প্রেম-সরোবর, এবং সহস্রার পরমাত্মার বাসস্থান, প্রেম-সরোবরে অবগাহন করিতে হইলে যমুনার পথে যাইতে হয়, সুষুম্না

না ঈড়া দিয়া যাওয়া যায় না। কারণ ঐ পদ্ম যমুনার অতি সন্নিকটে। যোগিগণ যোগমার্গে ঈড়া পিঙ্গলাকে বন্ধ করিয়া সুষুম্নার বদ্ধদ্বার উৎঘাটীত করিয়া লয়েন এবং কুল কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া মূলাধার হইতে জীবাত্মাকে উত্তোলন করেন। তৎপরে বীজ মন্ত্রের দ্বারায় প্রতিপদ্মের দলে দলে জীবাত্মাকে ঠেলিতে ঠেলিতে দ্বিদল পদ্মে উত্তোলন করেন। সেখান হইতে জীবাত্মাকে বীজমন্ত্রের দ্বারায় ঠেলিয়া সহস্রারে ফেলিয়া দিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। তখন জীবাত্মা পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত হ'ন। যোগ মার্গে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহকে নাশ করিয়া মোক্ষ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু প্রেম রস আস্বাদন করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণরতি ব্যতি-রেকে প্রেম-রস আস্বাদনের কোন উপায় নাই। তাহা হইলে সাধককে যোগমার্গ পরিত্যাগ করিয় একমাত্র ভক্তি পথ অবলম্বন করিতে হইবে। এবং যমুনার পথে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া প্রেম-রস আস্বাদন করিতে হইবে। প্রথমতঃ শ্রবণ কীর্ত্তন ও মনের দ্বারায় ভগবৎ ভক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। ঐ তিন জনের সহিত সহবাস করিলে ভগবৎ ভক্তি আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রেমকে আনয়ন করিয়া সাধককে আনন্দে আত্মহারা করিয়া তুলে। যখন সাধক-হৃদয়ে মহাপ্রেমের ঢেউ আসিয়া লাগিবে তখন মন পর্য্যন্ত লয় হইয়া, প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, প্রেম সরোবরে হাবু ডুবু খাইবেন।

এখন জিজ্ঞাস্য মনন যে করিব সেই মনের বাসস্থান কোথায়? অতি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে মন পিঙ্গলা বা যমুনার মধ্যে বাসস্থান করিয়া কার্য্যাদি করিতেছে। অতএব অনবরতঃ ভগবানের নাম প্রসঙ্গ; গুণাগুণ শ্রবন ও কীর্ত্তনের দ্বারায় দুর্ব্বার মন আপনিই বশীভূত হইয়া ভগবানের পাদ-পদ্ম দিকে ধাবমান হইবে। তখন ভগবানকে যথা সর্ব্বস্ব দান করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে, শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া; তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া যমুনার পথে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে হইবে। সেই সময় সাধক হৃদয়ে যে সকল উৎপাত হইবে ভগবান নিজ ভক্তকে রক্ষার্থে সে গুলিকে স্বয়ং বিনাশ করিয়া সাধককে নিষ্কণ্টক করিবেন।

ঐ যমুনার মধ্যবর্ত্তী হ্রদে সহস্র-ফণাধারী কালীয় নাগ তাহার সুরসা সুরূপা ভার্য্যা সহ বাস করিতেছে। তাহার প্রবল বিষে যমুনার জল এতই বিষাক্ত হইয়াছে যে বৃন্দাবনবাসী যদি সেই জল পান করেন তাহা হইলে তখনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। আরও ঐ হ্রদের এমনি

আকর্ষণ শক্তি যে যদি কেহ ভুলক্রমে তাহার তীরে গমন করেন অমনি পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া তাহার জল পান করেন এবং বিষে ছট্ ফট্ করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন—কোন ঔষধী খাটে না। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসীদের রক্ষার্থে, দুর্জ্জয় কালীয় দর্প চূর্ণ করিয়া এবং পদাঘাতে তাহার সমস্ত ফণাগুলি একে একে ভঙ্গ করিয়া, একটী মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, তাহার ভার্য্যাদ্বয়ের অনুরোধে, সেই ফণাতে নিজ পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া সপরিবারে রমণক দ্বীপে প্রেরণ করিয়া যমুনার বিষাক্ত জলকে অমৃত করিয়াছিলেন।

পাঠক মহাশয় ঐ বিষধর কালীয় নাগকে চিনিতে পারিয়াছেন? যদি না চিনিয়া থাকেন তবে আমার সঙ্গে আসুন আপনাকে চিনাইয়া দেই। মনই ঐ সহস্র ফণাধারী কালীয় নাগ। মন দেহীর পিঙ্গলা বা যমুনার মধ্যে সুরসা সুরূপা ভার্য্যা সহ বাস করিয়া সহস্রমুখে তীব্র বিষয়-বিষ অনবরত উদ্গীরণ করিতেছে। দেহী তীব্র বিষয়-বিষ পান করিলে তাহার হৃদ্বৃন্দাবনবাসী অর্থাৎ ভগবৎভাব ভক্তি রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি কেহই জীবিত থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তকে রক্ষার্থে ঐ দুর্জ্জয় মনের দর্প চূর্ণ করিয়া এবং সহস্র ফণা পদাঘাতে ভঙ্গ করিয়া একটী মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, সেই ফণাতে নিজ পদ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া স্বপরিবারে রমণক দ্বীপে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ মন তখন ভগবানের পাদ পদ্মে রমণ করিতে থাকে। আর এক পদও এদিক ওদিক গমন করে না। তখন বিষয় বিষ ছাড়িয়া স্বগণের সহিত প্রেম-সুধা উদ্গীরণ করিতে থাকে। পাঠক মহাশয় খুব স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবেন মন কখনও সুরসা ও সুরূপা ব্যতীত ধাবমান হয় না। যেখানে সুরস ও সুরূপ আছে মন ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। যেখানে সুরূপ বা সুরস নাই মনকে সহস্র চেষ্টায় কিছুতেই সেখানে রাখিতে পারিবেন না। তবে দেহী যে রূপ ও রসের প্রিয় মনও ঠিক সেই রূপ ও রসের অত্যন্ত প্রিয়। সাধক হৃদয়ে কৃষ্ণ পদ চিহ্ন ধারণ করিতে পারিলে তাহার আর কোন যোগ যাগের দরকার হয় না।

ঐ যমুনার তীরে শ্রীহরি যাবতীয় লীলা করিয়াছিলেন। ঐ যমুনার তীরে দ্বাদশটী মহা-বন * আছে। তন্মধ্যে পাঁচটী পূর্ব্বদিকে সাতটী পশ্চিম দিকে অবস্থিতি। পশ্চিম দিকের বন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বেশী লীলা করিতেন। ইহা

* ভদ্র, শ্রী, লোহ, ভাণ্ডির, মহা, তাল, খদির, বহুল, কুমুদ, কাম্য, মধু বা নিধু ও বৃন্দাবন এই দ্বাদশটী মহাবন।

ব্যতীত লীলা-রসের উপযোগী আরও ত্রিশটী উপবন আছে। ঐ সকল মহাবন ও উপবন * শ্রীকৃষ্ণের লীলারসের স্থান। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরে অষ্টাদল পদ্ম অবস্থিতি। ভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা ঐ পদ্মের কর্ণিকা স্বরূপা। এবং রতি ভক্তি রূপা অষ্টসখী ঐ পদ্মের অষ্টদলে অবস্থিত রহিয়াছে। এই মহাভাব স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকার উপর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন।

যেমন প্রেমের ধারে ধারে সমস্ত কৃষ্ণ লীলা হইয়া থাকে তেমনি এই যমুনার তীরে সম্পূর্ণ কৃষ্ণ লীলা। অতএব ইহাতে জানা যায় যে যমুনাই প্রেম।

* কদম্ব, খণ্ডিক, নন্দবন, নন্দীশ্বর, নন্দনা, নন্দখণ্ড, পলাশ, অশোক, কেতক, সুগন্ধি, মাদন, কৈল, অমৃত, ভোজনস্থল, মুখপ্রসাধন, বৎস হরণ, শেষ, শায়ন, শ্যামপুর, দধিগ্রাম, চক্র, ভাণ্ডীর, শঙ্কিত, দ্বিপদ, বালক্রীড়, ধূসর কেলিক্রম, সুললিত, কিংশুক ও নন্দন এই ত্রিশটী উপবন।

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ)

এমনি ক'রে আমাদের কতদিন কেটে ছিল আমার ঠিক মনে নেই। কতদিন যে মোহের নেশায়, যৌবনের খেয়ালে, প্রবৃত্তির তাড়নায়, কামনায় উদ্দীপনায় অচেতন হ'য়ে ছিলুম জানি [illegible] হ'লো সেই দিন, চেতনা ফিরিয়ে [illegible], যেদিন সমাজের কঠিন শৃঙ্খল, মানুষের [illegible], আমাদের কল্পনার রাজ্য থেকে টেনে এনে বাস্তব জগতে নির্দ্দয় ভাবে ফেলে দিলে এবং চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে আমরা কত দূর উঠেছিলাম এবং কত দূর নেমে গিয়েছিলুম। অস্বীকার করবার জো ছিল না, কেন না ভগবানের প্রেরিত সাক্ষী তাদের আরও উত্তেজিত ক'রে দিয়েছিল, তাদের হৃদয়ে আরও বল এনে দিয়েছিল। সমাজের বিচারে আমার আমরণ মৃত্যু যন্ত্রণার আদেশ হ'য়ে গেল, চিরনির্ব্বাসনের জন্যে কঠোর আজ্ঞা জাহির হ'ল; আর একজনকার ওপোর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে আদেশ হ'ল প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ—একটু জরিমানা দিলেই সমস্ত দোষ মাপ হ'য়ে যাবে। আমার দিকে কেউ ফিরে চাইলে না। আমাকেই সব দোষী সাব্যস্ত ক'রলে। আমি জমিদারের ঘরেও জন্মাইনি, পুরুষমানুষ হ'য়েও জন্মাইনি;

সাধারণ গৃহস্থের ঘরে সামান্ত মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মে ছিলুম। তার ওপর আমি বিধবা। সেই জন্যে কেউ আমার হ'য়ে ওকালোতি ক'ল্লে না, আমায় বাঁচাবারও চেষ্টা ক'ল্লে না। বিচারকদের ভয়ে আমার বাপ মাও আমায় তাড়িয়ে দিলেন। কাজে কাজেই তাদের শাস্তি, তাদের বিচার আমাকে নিস্তব্ধ ভাবে খুনে আসামীর মত মাথা পেতে নিতে হ'ল। অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ কত্তে লাগলুম।

এ দিকে আর একজনকার ওপোর তো কঠোর শাস্তি কিছুই হ'লই না, উপরন্তু বিচারকের দল তাঁর হৃদয় পট থেকে অতীতের সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলবার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগল। তার প্রথম কারণ তিনি বিচারকদের মত পুরুষ মানুষ দ্বিতীয় কারণ তিনি গ্রামের জমিদারের ছেলে এবং তৃতীয় কারণ, প্রায় সব বিচারকই তাঁর পিতার একান্ত অনুগত কেননা তারা অনেক সময়ে অর্থে, বলে, এবং নানা রকমে জমিদারের কাছ থেকে সাহায্য পেত। বিচারের একটু উনিশ বিশ হ'য়ে গেলেই তাদের বিচারকের পদ থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে এটা তারা বেশ জানত। তাই তারা যত কিছু গুরু শাস্তি আমারই ওপর চাপিয়ে দিয়ে অন্য দিকে একটু লঘু ক'রে দিলে—তাও আবার লোক দ্যাখানি। আন্তরিকতা তার মধ্যে একটুও ছিল না। আমি একাই সমস্ত দোষ মাথায় নিয়ে অন্ধকারে গা ভাসিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলুম। মনে কল্লুম যাবার সময়ে একবার তাঁর সঙ্গে দ্যাখা ক'রে যাই। এতে তাঁর তো কোন অপরাধ নেই। তিনি তো আর আমার নির্ব্বাসন দণ্ড দ্যাননি। তাঁর শ্রীচরণে দর্শন করে চির-কালের জন্যে শেষ বিদায় নিয়ে আসি। আবার ভাবলুম আমারই জন্যে সমাজে তাঁর মুখ হেঁট হোয়েচে, আমারই জন্যে তাঁর পবিত্র নামে কলঙ্ক র'টেচে। এ কালো মুখ, এ পোড়া মুখ আর তাঁকে দ্যাখাবো না। কিন্তু মন কিছুতেই মানতে চাইলে না, কিছুতেই অতীত কালের সে দিন কটা ভুলতে চাইলে না। তারপর একদিন যখন শুনতে পেলুম বিচারকদের পক্ষপাতিত্বে, তাঁর ওপোর লঘুশাস্তি দেওয়াতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট হননি; বিশেষতঃ আমার স্মৃতি তাঁর হৃদয়পট থেকে মুছে ফেলবার জন্যে যে পথ বিচারকেরা অবলম্বন করেছিল সে পথে যেতে তিনি কিছুতেই রাজী হননি তখন তাঁর জন্যে কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত প্রাণটা ভরে উঠেছিল।

কি জানি কিসের টানে, কিসের নেশায় আমি একদিন তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

বিচারের রায় বেরুবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আর দ্যাখা হয়নি। তিনিও দ্যাখা করতে আসেননি, আমিও যাইনি। সেদিন আমি কিছু আশা ক'রে যাইনি, কিছু নিতে যাইনি। শুধু কৃতজ্ঞতা জানাতে গিছ্‌লুম, বিদায় চাইতে গিছলুম। আশা করবার আমার আর কিছু ছিল না, নেবার কিছু ছিল না; দেবার তখন আমার অনেক জিনিস্ বাকী ছিল, করবার অনেক কাজ ছিল। কল্পনার উচ্চ শিখর থেকে প'ড়ে গিয়ে, স্বপ্নের রাজত্বথেকে প'ড়ে গিয়ে, স্বপ্নের রাজত্বথেকে ফিরে এসে, সমাজের কঠিন শৃঙ্খলের আঘাতে আমার দুর্ব্বল মনের সমস্ত আশার, আকাঙ্খার, বাসনার, কামনার হাত পা ভেঙে গিয়েছিল। তাদের আর উঠবার ক্ষমতা ছিল না কাজে কাজেই সেদিন তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাইনি। শুধু চোখের জল, শুধু হৃদয়টা নিয়েই তাঁর কাছে গিছলুম। মনে করেছিলুম সেই জলে তাঁর পা ধুইয়ে সেই পা ধোয়া জল মাথায় ক'রে তাঁর কাছথেকে বিদায় নিয়ে আসব—দিয়ে আসব তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা, চেয়ে আসব ক্ষমা, ব'লে আসব আমায় ভুলে যেতে।

ঘরে ঢুকে দেখলুম তিনি একটা খাটের উপোর শুয়ে আছেন। মুখটা একেবারে শুকিয়ে গ্যাছে, দেহটা খুব রোগা হ'য়ে গ্যাছে, চিন্তায় চিন্তায় খুব জর্জ্জরিত হ'য়ে প'ড়েচেন। একমাস আগে তাঁকে কি অবস্থায় দেখেছিলুম! আর আজ একি অবস্থা! সমস্ত শরীরে যেন তাঁর অবসাদের একটা ছায়া প'ড়েছিল, ক্লান্তির চিহ্ন মুখে ফুটে উঠেছিল, চিন্তার রেখা কপালে উজ্জ্বল হ'য়ে ছিল। তিনি চোখ বুঁজে শুয়ে ছিলেন, আমায় দেখতে পান নি! তাঁর এ অবস্থা দেখে আমি নিজেকে সামলাতে পাল্লুম না। পা দুটো জড়িয়ে কেঁদে উঠলুম।

কিছুক্ষণ ধ'রে দুজনেই খুব কাঁদলুম। কেউ কাউকে সান্ত্বনা দিতে পাল্লুম না। এ কান্নার মধ্যে অতীতের স্মৃতি ছিল, বর্ত্তমানের অবস্থা ছিল, ভবিষ্যতের চিন্তা ছিল। খানিক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে, তাঁর বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে, বল্লুম, "তুমি নাকি বিয়ে করবে না বলেচ—এ কথাকি সত্যি।" তিনিও অনেকটা সামলে উঠেছিলেন, বল্লেন "হ্যাঁ সত্যি।" আমি বল্লুম, "কেন?" উত্তরে তিনি ব'লে উঠলেন, "তোমার জন্যে। তুমি কলঙ্কের রাশি মাথায় নিয়ে সমাজ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে সমস্ত জীবনটা বিষাদ সাগরে ভেসে বেড়াবে আর আমি বিয়ে ক'রে সংসারী হব, সুখী হব, না, না, তা আমি পারব না।

আমায় যে যা বলুক, অত নিষ্ঠুর, অত অমানুষ আমি কখন হ'তে পারব না।"

"আমার জন্যে? আমার জন্যে তুমি তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রবে কেন? তোমার পায়ে পড়ি আমায় ভুলে যাও। তুমি পুরুষ মানুষ, একলঙ্ক তোমার চির দিন থাকবে না। বিয়ে কর, সুখী হও। আমায় ভুলে যাও। আমার এ কলঙ্কের রাশি মাথায় চিরকালই বইতে হবে। আমি যে মেয়ে মানুষ! আমার তো মুক্তি নেই, আমার তো বলবার কিছু নেই। লোকে যাকে কলঙ্কিনী ব'লেচে, সমাজ যাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আমার কাছে তো সেটা কলঙ্কও নয়, দোষও নয়; আমার কাছে সেটা খুব পবিত্র। খুব সুন্দর, খুব খাঁটি। তোমার স্মৃতি হৃদয়ে নিয়ে, তোমায় ভাবতে ভাবতে আত্মহত্যা কত্তে তো দ্বিধাবোধ হবে না। তুমি যে আমার সব। তোমার পায়ে পড়ি আমায় ভুলে যাও। বিয়ে ক'রে সুখী হও। আমি আজ তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, হাসি মুখে আমায় বিদায় দাও।"

"নিষ্ঠুরের মত একথা তুমি বলতে পাচ্চ? মুখে আটকাচ্চে না? প্রাণে কষ্ট হচ্চে না? তুমি যাকে কলঙ্ক বলে ধরনি, দোষ বলে গ্রাহ্য করনি—আমিও তো তাকে কলঙ্ক বলিনি, দোষ বলিনি। তোমার স্মৃতি, তোমার মূর্ত্তি আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসে আছে। আমি তো আর কাউকে এমন করে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারব না, বিয়ে করে তো আমি কখনও সুখী হতে পারব না!" এবার আর তার বুকের উপর থেকে, বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার কোন চেষ্টাই না করে বল্লুম,—"কেন তুমি আমার জন্য তোমার পবিত্র বংশে কলঙ্কের কালিমা ঢেলে দেবে? আমার জন্য তোমার বাপ-মার মুখ হেঁট করাবে? এখনও তোমার সামনে অনেক জীবন পড়ে আছে; কেন তুমি আমার জন্য তোমার সেই অমূল্য জীবন নষ্ট করবে? সংসারে কেউ তোমায় নিন্দে করবে না। আমার কথা কারুর মনে থাকবে না। সবাই আমাকে ভুলে যাবে। তুমি পুরুষমানুষ, আমার চেয়ে তোমার অনেক কর্ত্তব্য আছে, অনেক দায়িত্ব আছে, অনেক কাজ আছে। আমার জন্য আর তুমি নিজেকে নষ্ট করিও না, নিজেকে অপবিত্র করো না। তোমার মুক্তির পথ অনেক আছে। আমার জন্যে ভেব না, বলেচি তো, আমি মেয়েমানুষ, একবার পতন হলে আর উঠবার পথ নেই। যারা আমাদের ফেলে দেখে, তারাই আমাদের উঠবার পথ বন্ধ করে রেখে দেবে। কিন্তু তোমাদের বেলা

...সে নিয়ম খাটে না। তোমরা পড়লেও ...না। উঠবার পথ তোমাদের অনেক। ...াই তোমার, আমায় ভুলে যাও, আমার ...তুমি আর কর্ত্তব্যের আদেশ অবহেলা করো না।

"তোমাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করাই যে আমার এখন সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য। এটা কি ...একবারও ভেবে দেখচ না? যার জন্যে ...জ তোমার উপর এতটা শাস্তি দিয়েছে, আমিও তো তার জন্য তোমারই মত দায়ী, তোমারই মত দোষী। কলঙ্কের বোঝা তবে ...একাই কেন বয়ে মরবে? আমাকেও ...তে হবে। উঠবার পথ আমাদের আছে ...েই উঠব না। যেখানে তুমি আমি একসঙ্গেই ...েছি, সেখানে আমরা একসঙ্গেই পড়ে থাকব। যখন উঠব একসঙ্গেই উঠব। তোমাকে ফেলে উঠে গেলে আমার আত্মবঞ্চনা করা হবে—না, না, তা আমি পারব না। সমাজ ছেড়ে দিয়ে, আমার ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলে গিয়ে, ...ভুলে গিয়ে, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তোমাকে আগলে ধরে থাকাই আমার এখন সমস্ত কর্ত্তব্যের চেয়ে বড় কর্ত্তব্য।"

...আবার তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে ...—"ওগো, আমি বড্ড একা, বড় নিঃসহায়, সবাই আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে, আর ত আমায় কেউ উঠতে দেবে না। আমি চিরকাল একাই থাকব—দোহাই তোমার, আমায় ভুলে যাও।"

"সেই জন্যেই ত তোমায় আমি আরও ভুলবো না। সবাই তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে বলেই তো আমি তোমায় আগলে ধরে থাকব। একা তোমায় কখনও হতে দেব না, নিঃসহায় তোমায় আমি কখনই করবো না।"

আমি তেমনি করেই বলে উঠলুম—"তোমার পায়ে পড়ি, আমার জন্য তুমি ভেব না। যার কেউ নেই, ভগবান তাকে রক্ষা করেন।"

"শুধু তোমার আমার জন্যেই ত আমি ভাবচি না। আমরা শুধু দুজন হলে ত তেমন কোন ভাবনার কারণ ছিল না। তোমাতে আমাতে যা হোক্ করে জীবন কাটিয়ে দিতুম; কিন্তু আর একজনকার জন্যে যে আমাকে বেশী করে চিন্তিত করে দিয়েছে। সমাজের সমস্ত শাস্তি আমরা মাথা পেতে নিতে পারি—কিন্তু যার কোন দোষ নাই, যে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, সে যে পৃথিবীতে এসে আমাদের জন্য কষ্ট ভোগ করবে, সমাজ তাকে আমাদের বলে প্রত্যাখ্যান করবে, এই চিন্তাই আমাকে বেশী করে ব্যস্ত করে তুলেছে।"

এ কথার উত্তরে আমার মুখ দিয়ে কিছু

বেরুলো না। কোথেকে লজ্জা এসে আমার জিবটাকে চেপে ধরে সমস্ত মুখখানাকে রাঙা করে দিয়ে গেল। আমি শুধু তাঁর পায়ের দিকে চেয়ে রইলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দের রেখা, সন্তান-বাৎসল্যের একটা অপার্থিব স্নেহ, আমার সমস্ত হৃদয়কে আর্দ্র করে দিয়ে গেল। এত দুঃখ-কষ্টের ভিতরেও সেই ক্ষুদ্র জীবটার জন্য আমার মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সমস্ত ভুলে গিয়ে, এমন কি, আমার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত ভুলে গিয়ে যেন কিসের উত্তেজনায় আমি বলে উঠলুম—"চল না কেন তবে, আমরা এমন কোথাও যাই, যেখানে আমাদের কেউ চেনে না, যেখানে মানুষের কোলাহল যায় না, এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারবো—চলনা কেন সেইখানে আমরা যাই। কোন দূর দেশে, কোন পাহাড়ে অথবা কোন নদীর ধারে—যেখানে সমাজ বলে কিছু নেই, কলঙ্ক বলে কিছু নেই, এমন একটা স্থানে যাই চলনা কেন? আমি ভিক্ষে করে এনে তোমাদের খাওয়াব। বন থেকে কাঠ যোগাড় করে এনে রাঁধবো। তার কচিমুখের দিকে চেয়ে, সরল হাসির দিকে চেয়ে, আমরা সব দুঃখ ভুলে যাব। অতীতকালের স্মৃতি মন থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলে নূতন করে জীবন আরম্ভ করবো। ভগবানের দেওয়া দানটীকে, তাঁর দেওয়া ক্ষুদ্র আশীর্ব্বাদটীকে বুকে করে নিয়ে চল আমরা সমাজ ছেড়ে চলে যাই। সেই আমাদের মনে শান্তি এনে দেবে, জীবনে সুখ এনে দেবে। তার মুখের দিকে চেয়ে আমি সব কষ্ট সইতে পারবো, সমস্ত কষ্ট ভুলতে পারবো।"

বেশ গম্ভীরভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি বলে উঠলেন,—"তবে তাই হউক। দায়িত্বের উপর আরও দায়িত্ব বেড়ে আমাদের কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র আরও বেড়ে যাক্। পিতা মাতার স্থান অধিকার করে চল আমরা কোন দূরদেশে চলে যাই। সে যখন 'মা' 'মা' বলে তোমায় ডাকবে, তখন আমাদের সমাজের কথা কিছু মনে থাকবে না, মানুষের অবিচারের কথা ভুলে যাব। তখন এসব কদর্য্য কাহিনীর আমরা ঢের উপরে চলে যাব। ভগবানের এ আশীর্ব্বাদ, এ দান মাথায় করে চল আমরা চলে যাই।"

সেই রাত্রিতেই আমরা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে গ্রাম ছেড়ে চলে এলুম।

আমাদের অতীতকর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ ভগবান যদি এ ক্ষুদ্র দানটীকে না পাঠিয়ে দিতেন, তাহলে বোধ হয় এত কথা আমাকে বলতে হত না। আমরা দুজনে যেমন কষ্টে জীবন কাটিয়ে দিয়ে চলে যেতুম।
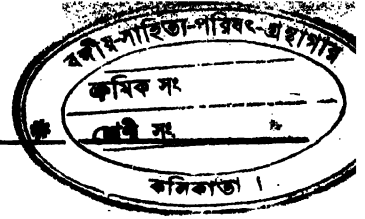
শুক্রনীতি সার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শাঁগুত শ্রীংগোষ যোতিষার্ণব।)

দোষ ত্যাগ করিবেন—প্রজাগণকে অসম্মানিত করিবেন না। "হে রাজন! লোক সমূহ আপনার নিন্দা করিতেছে"—চরপ্রমুখাৎ এইরূপ শ্রবণ করিয়া যদি প্রজাপীড়নার্থ রাজা কোপ করেন, তাহা হইলে এই রাজা নিজনিষ্ঠ দোষ রাশির গোপন কর্ত্তা হইয়া জন সাধারণের আরও বিরাগ ভাজন হইয়া থাকেন। দোষ থাকিলে তো কথাই নাই, মিথ্যা লোকাপবাদেও নির্দ্দোষ সাধ্বী সীতাকে রামচন্দ্র ত্যাগ করিয়াছিলেন; পরন্তু দণ্ডদানে সমর্থ হইয়াও মৃষাপবাদকারী রজককে অল্পমাত্রও দণ্ড প্রদান করে নাই। রাজা রামচন্দ্র সামান্য জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও অপবাদ শ্রবণ মাত্র স্বীয় দোষের সংশোধনার্থ রজককে অভয়ই প্রদান করিয়াছিলেন। (এসম্বন্ধে ইতিবৃত্ত এইরূপ এক রজক স্বীয় পত্নীর স্থানান্তর হইতে গৃহ প্রত্যাগমনে বিলম্ব হওয়ায় বলিয়াছিল "আমি আর তোমাকে গ্রহণ করিব না; আমি রাম ব্রহ্ম যে রাক্ষসের গৃহে স্থিতা জানকীকে গ্রহণ করা। স্থায় তোমাকে গ্রহণ করিব"—এই কথা গুপ্তচর মুখে রামচন্দ্র শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ব্বত্নী সীতাকে বিজন বনে ত্যাগ করিয়াছিলেন। রজক ক্ষুণ্ণ হওয়ায় দণ্ডদানের পরিবর্ত্তে হাঁসিমুখে তাহাকে অভয়ই দিয়াছিলেন)॥ ১৩০-৩৬॥

লোকসাধারণ রাজার গুরুতর দোষ দেখিলেও ভয়প্রযুক্ত সম্মুখে বলিতে সাহসী হয় না। যেহেতু নারায়ণাদি দেবগণও স্তুতিপ্রিয়—এইরূপ বেদবাক্য। মানবের বিষয় কি বলিব! অর্থাৎ স্তুতিবাদ দ্বারা সকলেই সন্তুষ্ট এবং নিন্দাবাদ দ্বারা সকলেই অসন্তুষ্ট। অতএব নিন্দা সর্ব্বদাই ক্রোধের জনক বলিয়া নিন্দা একেবারেই অকর্ত্তব্য। এই জন্য রাজা ন্যায়দণ্ডদাতা, অতিশয় ক্ষমাবান্ এবং সর্ব্বদাই লোকরঞ্জক হইবেন ॥১৩৭—১৩৮॥ যৌবন, জীবন, মন, ছায়া লক্ষ্মী এবং প্রভুত্ব এই ছয়টী চঞ্চল অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর। ইহাদিগকে এইরূপ জানিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্ম পরায়ণ হইবে ॥১৩৯॥

দ্রৌপদী (৩)।

(কুরুক্ষেত্র শিবির)

যুধিষ্ঠির প্রতি।

(শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ)

শীঘ্র রজ্জু মুক্ত কর দ্রোণের তনয়ে।
গুরুপুত্র পাশ বদ্ধ সম্মুখে তোমার
দেখিতেছ স্থিরচক্ষে প্রশান্ত অন্তরে!
মৃতগুরু তুল্য এঁরে ভাবহ সকলে।
আত্মা জন্মে পুত্ররূপে দয়িতা উদরে
এই জন্য জায়া নাম ধরে গর্ভবতী।
পুত্ররূপে দ্রোণাচার্য্য সম্মুখে তোমার।
উচিত এখনি তাঁর শৃঙ্খল মোচন।
ভ্রুকুটী কুটিল মুখে মধ্যম পাণ্ডব
চাহিছেন এঁর প্রতি গদা হস্তে করি
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ শম্ভু-নেত্র প্রায়
যখন কালপ্রেরিত মন্মথ দুর্জ্জয়
সম্মোহন বাণ হস্তে হলো ভস্মীভূত
সেই নেত্র জাত অগ্নি প্রখর শিখায়।
ইচ্ছা এঁর বধিবারে গুরুপুত্রে এবে
করিতে ব্রাহ্মণ হত্যা শোক-শান্তি তরে!
যদি হত্যাকরা ইচ্ছা ছিল তোমাদের
কেন না করিলে হত্যা ঘোর রণস্থলে
না হইত কোন পাপ প্রাণ হত্যা করি
অস্ত্রধারী আততায়ী ব্রাহ্মণ পুত্রের।
পুত্রশোকাতুর সবে শোকাতুরা আমি
তথাপি গর্হিত পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান
না হয় উচিত এবে হ'য়ে ক্রোধ বশ।
আততায়ী ইনি সত্য; ঘোর নিশাকালে
বধেছেন নিদ্রাগত তনয় সকলে
বধেছেন ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ভ্রাতারে
করেছেন বংশহীন পাণ্ড-দ্রুপদেরে
ক্ষমাযোগ্য পাপ এর নহে কদাচন
আততায়ী বধ শাস্ত্রে আছয়ে বিধান।
কিন্তু আততায়ী ইনি নন এই ক্ষণে
ব্রাহ্মণ জীবন প্রার্থী গুরু পুত্র তাঁর।
কালবশে মৃত্যু গ্রাসে পড়িল তনয়
সমুদ্র হইয়া পার গোষ্পদে ডুবিল
বীর্য্যবন্ত ভ্রাতৃদ্বয় সবই কালবশে।

উপলক্ষ মাত্র এই অভাগা ব্রাহ্মণ।
কাঁদিতেছি পুত্রশোকে ভ্রাতৃশোকে আমি
পূর্ব্বজন্ম পাপতরে দহিতেছে হিয়া
দিয়া ঘোর পুত্রশোক কত জননীরে।
না বাড়াব সেই পাপ। পূজ্যা গুরুজায়া
থাকুন পরম সুখী পুত্রমুখ হেরি
ভাসাবনা আমি তাঁরে আঁখিঅশ্রুনীরে।
এই পুত্র স্নেহ তরে নাহি সহ মৃতা
হইলেন পতিসহ। ইহাঁরে বধিলে
স্ত্রীহত্যা ব্রাহ্মণহত্যা হবে এককালে।
যাও গুরুপুত্র গৃহে। করিওনা আর
এ হেন কুৎসিত কাজ। অনুতাপতাপে
দহ নিজ পাপরাশি। হও পাপহীন
ছাড়ি পাপবুদ্ধি সব। লভিবে তখন
ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি। শোভিবে তখন
শোভে মেঘমুক্ত শশী যথা গগণেতে।

ত্রিবেণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ)

২৮।

সন্ধ্যার একটু আগেই সুরেশ ফিরিয়া আসিল। এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া সাবিত্রী বলিল, "এক্ষুণি ফিরিলে যে?" সাবিত্রী তখন দালানে বসিয়া একটা মোজা বুনিতেছিল। কোন উত্তর না দিয়া সুরেশ নিজের ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। হাতের কাজ ফেলিয়া সেও উঠিয়া আসিল, বলিল, "মাথাটা কি বড্ড ধ'রেচে?" গায়ের কাপড়টা আর জামাটা খুলিতে খুলিতে সুরেশ বলিল, "নাঃ, তেমন বিশেষ ধরে নি।"

"এখন আর পড়বার ঘরে যেও না। একটু শোও। জানলাটা খুলে দি। ঠাণ্ডা হাওয়া আসুক

"তা না হয় দাও।" সুরেশ আর কিছু না বলিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মাথার কাছে জানলাটা খুলিয়া দিয়া সাবিত্রী সেইখানে বসিয়া বলিল, "একটু অডিকলোম দিয়ে দেব?"

"না, থাক্। তুমি কি বুনছিলে বোনোগে যাও

সুরেশের মাথা টিপিয়া দিতে দিতে সাবিত্রী বলিল, "বোনা হ'য়ে গ্যাছে। গাটা গরম গরম

ঠেকচে যে! জ্বর হ'য়েচে নাকি?"

"বোধহয় একটু হ'য়েচে।"

"আজ ক'দিন থেকেই তো একটু একটু জ্বর হ'চ্চে। কথা তো শুনবে না। সমস্ত দিন খালি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে! অত নাই বা ঘুরলে!"

"হাতের রুগী ছেড়েদিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ীতেই বা ব'সে থাকি কি ক'রে! এ জ্বর দু'একদিনের ভেতরেই সেরে যাবে।"

"আগে নিজের শরীর, তারপর তো পরের। নিজেরই যদি শরীর ভাল না থাকে, পরকে দেখবে কি ক'রে?"

সুরেশ কোন উত্তর করিল না। চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। সে তখন ভাবিতেছিল কিরণময়ীর জীবনী এবং ইন্দুর পত্রের কথা। ইন্দু যাহা লিখিয়াছে তাহাই তো ঠিক। অশ্রুর নিরুদ্দেশের পর সে তাহাকে অনেক খুঁজিয়াছে, কিন্তু সে অনুসন্ধানের ভিতর যথার্থই তো তেমন আন্তরিকতা ছিল না। কিরণময়ীর শেষ অনুরোধ এবং বিন্দুবাসিনীর আদেশ তাহাকে এ কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিল। যখনই সে নিজের অন্তরের ভিতর ফিরিয়া দেখিত, দেখিত যে স্থানটী অশ্রু আপনার করিয়া লইয়াছিল, সেখানে সে নাই; থাকিলেও অভিমানে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বসন্ত রোগের পর হইতেই অশ্রুর পরিবর্ত্তন এবং সেই সময় হইতেই তাহার হৃদয়ে অভিমানের অনধিকার প্রবেশ আরম্ভ হইয়াছিল এবং অশ্রুর তিরোহিতের পর সুরেশের দূরদৃষ্টির অভাব হেতু অভিমানই সেইটীকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতেই সে এতটা অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, বিবেকের উপদেশ, বিবেচনার অনুরোধ মোটেই গ্রাহ্য করে নাই। তাহারা হৃদয়ের মধ্যে প্রায়ই উদয় হইত, কিন্তু তাহাদের সরাইয়া সুরেশ অভিমানকেই বেশী প্রশ্রয় দিতে লাগিল।

কিরণময়ীর জীবনী এবং ইন্দুর পত্র তাহাকে অত্যন্তই বিচলিত করিয়া দিল এবং অভিমানের সিংহাসনটী টলমল করিয়া উঠিল। গতিক বুঝিয়া অভিমান ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ আসিয়া তাহার স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে লাগিল। যে তাহারই মঙ্গলের জন্য দেশত্যাগী হইয়াছে, পাছে সমাজে, লোকালয়ে, মুখ হেঁট হয়, উচ্চবংশ কলঙ্কিত হয় এই জন্য যে এতখানি আত্মদমন করিয়াছে, তাহার জন্য সুরেশ কি করিয়াছে? কিছুই তো করে নাই। উপরন্তু তাহারই উপর অভিমান করিয়া তাহাকে

ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

স্বার্থান্ধ সুরেশ এইটুকু ভাবিয়াই নিষ্কৃতি পাইল না। সে তো শুধু একজনকার উপর অবিচার করে নাই। সাবিত্রীর কি দোষ? কেন সে তাহাকে এক দিনের জন্য সুখী করে নাই? যদি ভালই না বাসিতে পারিবে, কেন সে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল? অভিমানে আবৃত থাকা সত্ত্বেও অশ্রুই যদি তাহার হৃদয়ের সবটুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছিল তাহা হইলে কেন সে সেখানে জোর করিয়া সাবিত্রীকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিল। সাবিত্রীর হৃদয়ের সবটুকু কাড়িয়া লইয়া প্রতিদানের ইচ্ছা থাকিলেও একটী কানা কড়িও দিতে পারিতেছে না কেন? কিছু একটু দিতে গেলেই পরের জিনিস্ দিতেছে বলিয়াই বা মনে হয় কেন? বিচারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ন্যায়ের দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে অশ্রু অপেক্ষা সাবিত্রীরই সুরেশের হৃদয় অধিকার করিবার দাবী বেশী। কিন্তু কেন সে তাহাকে তাহার নিজের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতেছে?

এতদিন সে নিজেও এসব বুঝিয়াছে কিন্তু ইন্দুই আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া ভাল করিয়া দেখাইয়া দিল। তাহারই পত্রের ঝাঁকুনীতে নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। অনুতাপের অগ্নি-শিখা আসিয়া পড়িয়াছে।

শুইয়া শুইয়া সুরেশ এই সবই ভাবিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ডাকিল, "সাবিত্রী"। সাবিত্রী তখনও মাথা টিপিয়া দিতেছিল, বলিল, "কেন?"

"অশ্রুর বিষয়ে সব কথা ইন্দু তোমায় ব'লে গ্যাছে না?" অশ্রুর কথা উঠিলেই সাবিত্রীর হৃদয়ের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত, মুখ শুকাইয়া যাইত। তাহারই জন্য যে তাহার স্বামীর মনে সুখ নাই, তাহার নিজের মনেও সুখ নাই, একটা অনাহূত ঈর্ষা, অচিন্তিত বিদ্বেষ ভাব অশ্রুর প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যে তাহার মনে উদয় হইত, সাবিত্রী বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিত। কিন্তু অশ্রুর সম্বন্ধেই সুরেশ বেশী কথা কহিত। তাহার কথা উঠিলেই সে বেশ থাকিত। কাজে কাজেই সাবিত্রী নিজের সমস্ত মনের ভাব গোপন রাখিয়া সময়ে অসময়ে নিজেই অশ্রুর কথা তুলিত এবং সুরেশের সহিত তাহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিত। যেটুকু সময় সুরেশ প্রফুল্ল থাকিত সেটুকুই তাহার পক্ষে ভাল। তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "হ্যাঁ, সেবারে এসে ঠাকুর্ঝী সব কথা আমায় ব'লে গ্যাচে।"

"তার মায়ের জীবনীটা পাঠিয়ে দিতে কি তুমিই ব'লেছিলে?" "হ্যাঁ।"

"সেটা প'ড়েচ ?"

"হ্যাঁ।"

"প'ড়ে কি বুঝলে ?"

"বুঝলুম যেমন ক'রে হোক্ দিদিকে খুঁজে বার করা তোমার উচিৎ।

"অশ্রুকে ?"

"হ্যাঁ"

"তাকে খুঁজে বার ক'ল্লে তোমার তো কোন লাভ নেই সাবিত্রী।"

"লাভ না থাকতে পারে, লোকসানও তো কিছু নেই।" প্রথমটা সুরেশ কিছুই বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "তাকে তুমি 'দিদি' ব'লে ডাক কেন সাবিত্রী ? তাকে তো তুমি চেন না। সাবিত্রী কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। সে যে সুরেশেরই মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিত। এ কথাই বা এখন কি করিয়া বলিবে! একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "ঠাকুরঝীর মুখে শুনেচি, তিনি নাকি বয়সে আমার চেয়ে বড়। তাই তাঁকে দিদি ব'লে ডাকি।" আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ বলিল, "সত্যি ব'লচ সাবিত্রী তাকে খুঁজে পেলে তোমার কোন লোকসান হবে না ?"

"লোকসান তো হবেই না, উপরন্তু লাভই হ'তে পারে। বিস্মিত হইয়া সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া সুরেশ বলিল, 'লাভ! তোমার কিসের লাভ হবে সাবিত্রী ?'

ইহার উত্তরে সাবিত্রী কিছুই বলিতে পারিল না। শুধু চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া গেল। সত্য কথা বলিতে গেলে অশ্রু ফিরিয়া আসিয়া যখন তাহার সম্পত্তি বুঝিয়া লইবে তখন সাবিত্রীর তো বলিবার কিছু থাকিবে না। ইহাতে তাহার লোকসানই হইবে। লাভ তো কিছুই হইবে না। তবু এখন সুরেশ তাহারই আছে। অশ্রু আসিলে সে তো একেবারে পর হইয়া যাইবে।

কিন্তু সাবিত্রী নিজের লাভ লোকসানের দিকে চাহিয়া ওকথা বলে নাই। সুরেশের লাভেই তাহার লাভ। সুরেশের সুখেই তাহার সুখ।

সাবিত্রীকে কাঁদিতে দেখিয়া সুরেশ বলিল, "কেঁদ না সাবিত্রী। চিরকালই কি এমনি করে কাঁদবে ? কি জানি, আমার জন্মে বোধহয় তোমার এমনি করেই চিরকাল কাঁদতে হবে। বিয়ে হবার পর থেকে একদিনের জন্যও তোমায় সুখী ক'ত্তে পারিনি, কখন পারব কিনা তাও জানি না। মাঝে মাঝে আপশোষ হয় সাবিত্রী, কেন তোমায় আমি বিয়ে ক'রেছিলুম।" সাবিত্রী

কিছুতেই আজ নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারিল না। যতই কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই অস্থির হইয়া উঠিল। সুরেশও যেন সে দিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিতে ছিল না। এতদিনকার জমাটবাঁধা মনের কথা আজ আর কোন বাধা না মানিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল, "তখনই আমার বোঝা উচিৎ ছিল। তোমায় আমি সুখে রাখতে পারবো না। যাকে ভোলবার জন্যে তোমায় বিয়ে ক'রে ছিলুম সাবিত্রী, তাকে ভোলা দূরের কথা, বিয়ের পর আরও ভাল ক'রে তাকে মনে প'ড়তে লাগ্‌লো। এখন বুঝতে পাচ্ছি তোমার ওপোর আমি কতটা অবিচার ক'রেছি, তোমার অধিকার থেকে কতখানি তোমায় বঞ্চিত করেছি।"

এবারেও সাবিত্রী কিছুই বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিল,—"তুমি আমায় যতখানি ভালবাস, আমায় সুখে রাখবার জন্যে, আমার মনে শান্তি দেবার জন্যে তুমি যতখানি চেষ্টা কর, আমি তার সিকির সিকিও করি না। আমি জানি সাবিত্রী, আমার ব্যবহারে তুমি কত কষ্ট পাও, কত দুঃখ চুপ ক'রে সহ্য কর। তোমার চেহারা দেখে তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারি। কিন্তু এর কোন উপায় কত্তে পারি না।"

এতক্ষণে সাবিত্রী অনেকটা নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল। বলিল,—"তার জন্যে তোমায় তো আমি কোন দিন কোন কথা বলি নি। আমার আবার দুঃখ কিসের? আমি তো বেশ সুখেই আছি। আমার জন্য অত ভেবে শরীর খারাপ কোরো না।"

"তুমি না ব'ল্লেও আমি সব বুঝ্‌তে পারি সাবিত্রী। ভাবনা যে আপনা থেকেই আসে। আমি কি জানি না তোমায় কত দূরে ফেলে রেখেছি, একদিনের জন্যেও তোমার সঙ্গে হেসে কথা কইনি, তোমায় দুটো ভাল কথা বলি নি। একদিনের জন্যেও তোমায় আদর যত্ন করি নি। কতবার নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করেচি, মনের সঙ্গে কতবার, ঝগড়া ক'রেচি, তুমিই যে আমার সব, এ কথা কতবার আমি ভাবতে চেষ্টা করেচি, কিন্তু- বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিয়া উঠিল,—"এতে যে মাথা ধরাটা আরও বেড়ে উঠবে। একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক না।"

"আর চুপ ক'রে কতদিন থাকবো সাবিত্রী! আর যে পারি না। চুপ ক'রে থেকে থেকে আমি অস্থির হ'য়ে উঠেছি।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া সুরেশ বলিয়া উঠিল,—"সাবিত্রী।"

"কি

"একটা কথা বলবো তার ঠিক উত্তর দেবে ?"

"কি ?"

"আমায় কখন ক্ষমা ক'ত্তে পারবে কি ? তোমার কাছে আমি অনেক অপরাধ ক'রেছি। সেগুলোকে ভুলে গিয়ে আমায় ক্ষমা কর্ত্তে পারবে ?"

সাবিত্রী চুপ করিয়া রহিল।

"বল, বল, চুপ ক'রে থেক না। আমায় ক্ষমা কর্ত্তে পারবে ? এত অবিচার, এত অত্যাচার, এত অপরাধের ক্ষমা কি তুমি ক'রবে সাবিত্রী ? তুমি আমায় ক্ষমা না ক'ল্লে, অশ্রু তো আমায় ক্ষমা কোরবে না। তা নইলে ভগবানের কাছ থেকে তো আমি ক্ষমা চাইতে পারবো না।"

সাবিত্রী আবার কাঁদিয়া ফেলিল। ক্ষমা! ক্ষমা সে কাহাকে করিবে ?

একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"তোমায় তো আমি একদিনের জন্যেও দোষ দিইনি। তুমি তো আমার কাছে কোন অপরাধই কর নি। বরং আমিই অনেক অপরাধ ক'রেচি। আমি তোমায় একদিনও সুখী ক'ত্তে পাল্লুম না। তোমার সুখের পথে কণ্টক হ'য়ে আমি তোমার কাছে এসেছিলুম। তুমিই আমায় ক্ষমা কোরো। তোমায় ক্ষমা করবার তো আমার কিছু নেই।"

"ওকথা বোলো না সাবিত্রী। ওতে আমায় আরও দোষী করা হয়। ভগবানের চোখে, মানুষের চোখে, বিবেকের চোখে আমি তোমার কাছে শত অপরাধে অপরাধী। সাবিত্রী, আমি যতবার তোমায় ভেবেচি, যতবার মনে ক'রেচি অশ্রুকে ভুলে যাব, যতবার তোমায় সুখী ক'ত্তে চেষ্টা করেচি, ততবারই সে আমার মনের মধ্যে এসে উদয় হয়েচে। অশ্রুই আমায় পাগল ক'রে তুলেচে সাবিত্রী। সেই আমায় তোমাকে ভুলিয়ে দিয়েচে। আমি কি বুঝতে পারি না এতে আমি তোমার কাছে কত দোষী, কত অপরাধী। এর আমি প্রতীকারের চেষ্টা করি কিন্তু পেরে উঠি না। অশ্রুর মত তোমায় ভালবাসতে পাল্লুম না। তাকে ভুলে গিয়ে তোমায় আপনার ক'রে নিতেও পাল্লুম না।"

কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী বলিল,—"আরও ভালো করে কেন দিদির খোঁজ কর না।" "কি হবে বেশী খোঁজ ক'রে সাবিত্রী। রতন যখন তার সঙ্গে আছে তার কোন ভাবনা নেই। একদিন না একদিন সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। বাড়ী ছেড়ে কখনই বেশীদিন কোথাও থাকবে না।"

"তা হ'লেও তোমার খোঁজ করা দরকার। যত শিগ্‌গীর তিনি ফিরে আসেন ততই ভাল।"

"না সাবিত্রী। তাতে আমারও কোন ভাল হবে না, তা'রও কোন ভাল হবে না। সে যেখানে আছে সেইখানেই থাক্। শুধু সুখে থাকলেই হ'লো।" "লাভ লোকসানের কথা হ'চ্চে না। দিদি ফিরে এলে আমি তাঁকে এখানে নিয়ে আসবো।"

বিস্মিত হইয়া সুরেশ বলিয়া উঠিল,—"তুমি! তাকে এখানে নিয়ে আসবে? আনতে পাববে সাবিত্রী?"

"কেন পাববো না। মুখের কথায় না আসেন পায়ে ধ'রে নিয়ে আসবো।"

"তাকে তুমি ভালবাসতে পারবে সাবিত্রী?"

"নিশ্চয়ই পার্ব্বো।"

আরও উত্তেজিত হইয়া সুরেশ বলিয়া উঠিল,—"তুমি তার পায়ে ধ'রতে যাবে কেন, সাবিত্রী? ভালই বা তাকে বাসবে কেন?"

"আমারই জন্যে তাঁকে ভালবাসবো, আমারই জন্যে তাঁর পায়ে ধোরবো।"

"তোমার জন্যে! সাবিত্রী, তার মায়ের জীবনী প'ড়ে তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জেনে, তুমি তাকে ভালবাসতে পারবে?"

"সেই জন্যেই তাঁর পায়ে ধোরবো, সেই জন্যেই তাঁকে ভালবাসবো।"

"ঠিক ব'লচো সাবিত্রী, পারবে?"

"পারতেই যে আমায় হবে।"

সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া সাবিত্রী দেখিল সুরেশের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে।

[ক্রমশঃ]

নারী-ধর্ম্ম।

(কবিভূষণ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন)

নারী একটী অচ্ছেদ্য বন্ধন-রজ্জু—শুধু রজ্জু নয়, রজ্জু ভ্রমে সর্প। ইহা আমার কথা নয়—মানব জাতির কথা—প্রত্যক্ষ শুভদৃষ্ট! পুরাণের কথা—মানব-সৃষ্টিতে ব্রহ্মা সৃষ্টির সাহায্য না পেয়ে—এক অঙ্গে পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু ও কন্যা শতরূপাকে সৃষ্টি করেন; এই মিথুন ধর্ম্মেই সৃষ্টির বিকাশ হয়, বন্ধন হয়, পালন হয়, রক্ষা হয়, আবার ধ্বংসও হয়। এই সকলের মধ্যে সুখ দুঃখ ওতপ্রোতভাবে সব আছে—আরও কত কি আছে। এই শতরূপা নাম সাফল্যে

বহুরূপা হ'য়ে মনুকে বন্ধন করেন, মনু হ'তেই মানবের উৎপত্তি ও বন্ধন—এ বন্ধনের যে রজ্জু তাহা অপ্রত্যক্ষ কিন্তু এত শক্ত—তা বল্‌বার নয়। তাহাই শতরূপা—বা—স্ত্রী—নারী—প্রকৃতি অথবা এককালে নারী-ধর্ম্ম।

রজ্জু—বন্ধন—কাঠিন্য যতই থাকুক, এই ধর্ম্মই নারী-ধর্ম্ম—প্রত্যক্ষ সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের সারভাগ। ইহার ভিত্তি এত গভীর, এত কঠিন,—এত মালমসলায় জমাট বাঁধা, কত যুগ গেল, কত ঝঞ্ঝা গেল, তবু এ অটুট থেকে, হিন্দুর আকাশব্যাপী ধ্বজা মাথায় ক'রে জগতের দর্শনীয়, স্পৃহনীয়, বরণীয়, আদরণীয়। তাই নারী বা নারী-ধর্ম্ম সৃষ্টিবিকাশের মুখ্য বা মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নারী সকলের,—কিন্তু সকলে নারীর হ'লেও যেন কেমন কেমন ভাবে ছাড়াছাড়া স্বার্থ সাধনে ভুলের পশরা মাথায় বেঁধে, যেন সকলে এই নারীকে ভুলে যায়। যার ধর্ম্মে সে উন্নত তা সে দেখেনা। কিন্তু নারী সকল সুখ ফেলে দিয়ে তাকে বুকে রাখে, হৃদয়ের নিভৃত নিবাসে পবিত্র আসন পেতে পুরুষকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে, ইহপরকালের সঙ্গী জ্ঞানে চির-দুঃখের পশরা মাথায় লয়,—বিষ খায়—আগুনে পড়ে, তবু ছাড়েনা, নিজের দিকে তাকায় না, কেবল পুরুষ, কেবল পুরুষ কেবল মাধুর্য্য ভাব। স্ত্রী স্বামীর—প্রকৃতি পুরুষের—ইহাই নিত্য সত্য ধর্ম্ম—ইহাই শ্রীবৃন্দাবনের গোপী ভাব—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের গোপীসম্মিলনে মাধুর্য্যরূপ মহারসে মহারাস।

এ নারী কোথায়? এ ধর্ম্ম কোন্ নারীতে? পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা কর—জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর পাবে—এ নারী—এ ধর্ম্ম হিন্দু জাতিতে, হিন্দু-জাতির সতী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী-রূপা পঞ্চপ্রতিমার আদর্শে সমস্ত হিন্দুনারীতে তাই অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী এই পঞ্চকন্যার স্মরণে সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়—ইহা সাধু বাক্য সত্য বাক্য! (১)

নারী সকল গুণের সার, সকল শক্তির সার, সকল ধর্ম্মের সার; নারী প্রকৃতিরূপা, পুরুষের সঙ্গিনী, প্রকৃতি ভিন্ন পুরুষের শক্তি নাই। আগুনে আগুন জ্বলে, শেষ আগুন প্রবল হলে পূর্ব্বের আগুন নিভে যায় তার আর প্রয়োজন হয় না, কিন্তু প্রকৃতি রূপা নারীতে নারীধর্ম্মে পুরুষ আবদ্ধ, পুরুষ শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু সে সেই নারীকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না, নারীও তাকে ছেড়ে নিস্তেজ রূপে থাক্‌তে পারে না, সেও ক্রমে

(১) এই অহল্যাদি পঞ্চকন্যার সত্যভাব 'পঞ্চকন্যা' নামে লেখকের দ্বারা শীঘ্র 'আলোচনাতে' প্রকাশিত হইবে।

উজ্জ্বল হয়, পুরুষকেও উজ্জ্বল করে ও রাখে।

হিন্দুনারীর উন্নত চরিত্র তন্ন তন্ন ক'রে আলোচনা কর, মানব চক্ষু ফেলে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ফেলে, দিব্য দৃষ্টিতে, দেব শিক্ষাতে মানব ধর্ম্মেতে হিন্দুর কর্ম্মেতে দেখ, ঠিক দেখ্‌বে হিন্দু-নারী প্রকৃত নারী, প্রকৃতি—দেবী, মহাদেবী; ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ন্যায়, শিক্ষা, কর্ত্তব্য, বিবেক ইত্যাদি মানবোচিত গুণ সমুচ্চয়কে মাথায় ক'রে সে সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত পুরুষের অনুগামিনী সহচারিণী হৃদয়বিলাসিনী আবার বিশ্ব—মাতৃ-রূপিণী সংসারে অবসাদে স্বাদদায়িনী। একাধারে এত গুণ এত আদর্শ এত স্নেহ যত্নের লালিত্য আর কোথাও নাই। যে স্বামীকে সে ধ'রে থাকে সে স্বামীতেও নাই থাকৃতে পারেও না।

সকল সমাজেই নারী আছে—স্ত্রীরূপে সে পুরুষকে আলিঙ্গন করে। সত্যের খাতিরে বল্‌তে হয়, এক হিন্দুনারী ভিন্ন সকলেই বিলাস-বাসনার দাসী—শয্যার সঙ্গিনী—স্বার্থের পরিপুষ্টি-কারিণী। সে স্বামীকে ধরিয়া থাকে আত্মসুখের নিমিত্ত, স্বামীর সুখের নিমিত্ত নয়; কিন্তু হিন্দু-নারী যা' করে সব স্বামীর সুখের নিমিত্ত. নিজের নয়। যখন মৃত স্বামীর সঙ্গে সে জীবিত অবস্থায় পুড়িতে পারে তখন এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা কি আছে? রামময়জীবিতা সীতা অশোকবনে একদিন সরমাকে ব'লেছিলেন "পাছে রাম-চন্দ্রের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের বাহু বিচ্ছিন্ন ভাব ও ঘটে, সেই জন্য আমি কণ্ঠে হার পরিনা। কিন্তু আজ সরিৎসাগর ভূধর মধ্যে থাকিয়া রামসীতার বিচ্ছিন্ন ভাব ঘটাইয়াছে।" এ ভাব কি অন্য জাতির নারীতে আছে বা থাকিতে পারে? স্বামীর নিন্দা শুনে দাক্ষায়িণী সতী দেহ ত্যাগ করেছিলেন, সাবিত্রী যমের সহিত যুদ্ধ ক'রে তাঁকে ঠকাইয়া মৃত স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। হিন্দুনারীর মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইহা আমি বলিনা, সমস্ত সমাজের নরনারীই ইহা স্বীকার করিয়া হিন্দু-নারীকে অগ্রে অর্ঘ্য দানে বরণ করিয়া থাকে।

এমন যে নারী, এমন যে নারীর ধর্ম্ম—কর্ম্ম —পতিভক্তি—পতিপ্রাণতা তা আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ সমাজে যেন বিবেকের আলোতে কেমন কেমন অন্য রঙে অনুরঞ্জিত হইয়া বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছে। এখন এমন নারীতে নারীর ধর্ম্মে পুরুষের মন দিয়া পূজা আসিতেছে না, যাইতেছে না—অর্ঘ্য বলির অভাব হইয়াছে। নারী হইতে অপত্য উৎপাদন যে ইহপরকালের মঙ্গলের নিদান তাহা যেন ভুলের ছায়ায় বিকৃত রঙ হইয়াছে। তাহাতে যে বিশ্বমাতৃকা ভাব আছে তাহাতে যে সুধা ক্ষরে সেই সুধায় সৃষ্টি স্থিতি

ধ্বংস হইয়া মঙ্গলের নিদান আনয়ন করে—সেই বিশ্বমাতৃকা ভাব যেন কথার কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। উহাতে যে নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারা হইতেছে—সংসারে আগুন ধরাণ হইতেছে—নিজেকে পোড়ান হইতেছে, তা কেউ ভাবিতেছে না—কেবল আত্মসুখ—স্বার্থ,—সেই সুখ স্বার্থের অভাব নারীতে দেখিলেই নির্য্যাতন! কথায় কথায় অপমান—হেয়জ্ঞান—সামান্য ভাবের আদান প্রদান।

তাই বর্ত্তমান মানুষের এত জ্বালা। পাশ্চাত্য আদর্শে নারীর চরিত্রকে—দর্পণের প্রতিবিম্বের সত্ত্বা স্থির করিয়া, হিন্দু হইয়া, হিন্দুর মর্য্যাদা ভুলিয়া, মনের মাঝে বিবিধ নারীর বিবিধ চরিত্র যে আঁকা রয়েছে, তার দিকে না তাকাইয়া, সব হারাইতে বসিয়াছে। শুধু বসিয়া নাই, হারাইতেছে। নিজের নাভিতে কস্তুরী থাকিলে মৃগ যেমন তার গন্ধে উদ্ভ্রান্ত হইয়া তল্লাতে ছুটাছুটি করে, আজ কাল পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন যুবক দল তেমনি নিজেদের নারী চরিত্রের যথাযথ বর্ণনা পরের কাছে করে ও নিজেরা তাহাদিগকে, তাহাদিগের ধর্ম্মকে, ভুলে গিয়ে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিনী ও নারীকে বিশ্বমাতা না ভাবিয়া অধঃপাতে যাইতেছে। তাই বলি একবার বিবেকের দৃষ্টিতে দেখ ভাই হিন্দু, তোমার নারীকে নারীধর্ম্মকে,—রাখ তাদের মান্—দেখাও তাহাদিগকে বিশ্বের মানব সকলকে,—বল, সপ্তস্বরায় গাও, 'হিন্দুর সতীধর্ম্ম নারীধর্ম্ম—তা'হলেই তুমি ধার্ম্মিক—কর্ম্মী। স্ত্রীকে স্ত্রী ভাবিও না—তোমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ন্যায়, সত্য, সব সে, তুমি ও তার, ঐরূপ সব। তোমরা পরস্পরে ইহপরকালের অক্ষয় অব্যয় বন্ধু, ইহ পরজন্মেরও সাথী! স্ত্রীতে তুমি আর কি চাও?

আত্ম-জ্ঞান।

(শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়)

আমি কে? তাইত—আমি কে! প্রশ্ন বড়ই জটিল। আমি সর্ব্বস্থানে, সকল অবস্থায়, সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান থাকিয়াও হারাইয়া গিয়াছি। কি অদ্ভুত! নতুবা আমি কে জানিতে বা বুঝিতে পারিতেছি না কেন? ইহারই নাম অজ্ঞান, মোহ বা মায়া।

এই অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত না হইলে 'আমিত্ব' জ্ঞান হয় না। এই আমিত্বের অনু-

সন্ধানে জ্ঞান বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রথম হইতে আজিও দিগ্বিদিক অনন্ত পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং কত দিন যে ঘুরিবে তাহাও জ্ঞানাতীত। কিন্তু কৈ ? এতদিনে ও কি আমিত্বের সন্ধান মিলিল ? মিলিলে নিশ্চয়ই জ্ঞানের তৃপ্তি হইত। আর ঘুরিবার ক্লেশ স্বীকার করিত না।

যাহাই হউক এতদিন ঘুরিয়া আমিত্বের কতটুকু সন্ধান হইল হিসাব করিয়া দেখা যাউক।

১। বিজ্ঞান শাস্ত্র পথে চলিতে চলিতে কতকগুলি শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের আভাস পাইয়া 'আমি' বিস্মিত, মুগ্ধ ও আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়াছি। উহাতে আমিত্বের সন্ধান পাইলাম কৈ ? উহারা যে 'আমারই' এ জ্ঞান 'আমার' নাই।

২। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শনাদি শাস্ত্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে 'সোঽহং', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি অবস্থায় আসিয়া 'আমি' শ্রুতিহারা, স্মৃতিহারা, দিশেহারা, আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি, তবু আমিত্বের সন্ধান মিলিল কই ? জ্ঞানহারা হইয়া 'সেই আমি' জানিলাম না। স্মৃতিহারা হইয়া 'সেই তুমি' ভুলিলাম। আমার অজ্ঞাতসারে 'আমিত্বের' পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। 'আমিত্ব' শূন্য হইয়া 'আমার' আমিত্ব লাভ হইল না।

৩। ধর্ম্মাদি শাস্ত্রপথে বিচরণ করিতে করিতে 'আমি' 'সচ্চিদানন্দ' অবস্থায় আসিয়া বিভোর, উন্মত্ত, আমি থাকিলেও প্রকৃতির অসহযোগে অর্থাৎ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া 'আমার' স্থান লাভ ঘটিল না। আমি আশ্রয়চ্যুত বা অবলম্বন শূন্য হইয়া আমিত্ব রাখিতে পারিলাম না। যাহাই হউক, আমিত্ব না রাখিতে পারিলেও যখন 'আমার' সন্ধান ঘটিল, তখন 'আমার' স্বরূপ এস্থলে একটু আলোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ইহার তাৎপর্য্য আমি সৎ অর্থাৎ চির বিদ্যমান্। আমি চিৎ বা চৈতন্য স্বরূপ, আমি আনন্দ বা আনন্দই আমার অনুভূতি, অর্থাৎ আনন্দময় অনুভূতিতেই আমার সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। এক্ষণে এই আনন্দময় অনুভূতি লাভ করিতে হইলে চৈতন্যের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, যাহা সৎ বা চির বিদ্যমান্।

চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বঘটে বিদ্যমান্ থাকিলেও চৈতন্যের জ্ঞান যখন 'আমার' নাই, তখন প্রথমতঃ উহাকে সীমাবদ্ধ বা ঘটস্থ করিয়াই উহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

দেহরূপ বিচিত্র ঘটে 'আমি' আছি জানি। কিন্তু কোথায় কি ভাবে আছি জানি না। কি করিতেছি জানিলেও 'আমিত্ব' জ্ঞানের অভাবে

'আমার' কার্য্য করা হইতেছে কি না তাহাও সম্যক্ জানি না।

আমি যখন চৈতন্য স্বরূপ এবং দেহের চৈতন্যই যখন প্রাণ বা জীবনী শক্তি, তখন প্রাণেই 'আমি' আছি। কিন্তু প্রাণ কি বস্তু না জানার দরুণ আমি কোথায় আছি জানি না। এক্ষণে প্রাণ কি বস্তু বুঝা যাউক। প্রাণ একটী অনুভূতি বিশেষ। ইহারই ঘাত প্রতিঘাতে বেগ উদ্ভূত হইয়া হৃদ্‌যন্ত্রকে স্পন্দিত করিতেছে, যদ্দ্বারা দেহ সজীব বা চৈতন্যময়।

অনুভূতি বলিতে মন বুঝায়। কিন্তু কি কারণে উহাতে ঘাত প্রতিঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা অনুভূতির বোধগম্য নহে। কিন্তু কিরূপে উহা প্রকাশিত হয়, মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিয়া বুঝা যাউক।

মন বলিতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুভূতি এই ত্রি-শক্তির সমবায় বুঝায়। অনুভূতিকে পৃথক শক্তি না ধরিলেও চলে, যেহেতু জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির যুগপৎ সংঘর্ষ হইতেই অনুভূতি উৎপন্ন বা প্রকাশিত হয়। কিন্তু জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি হইতে তজ্জাত অনুভূতি শক্তি ভিন্ন-গুণ-বিশিষ্ট হয় বলিয়া উহাকে পৃথক শক্তি ধরা হইয়াছে।

(বাস্তবিক পক্ষে শক্তি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে না। শক্তির ক্রিয়া-ভেদে উপাধি-ভেদ মাত্র)।

এই জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সংঘর্ষ 'আত্মশক্তির' দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

এক্ষণে এই জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সংঘর্ষ বা মিলন বা মিলন কিরূপে হয় বুঝিলেই 'আত্মশক্তি'র ক্রিয়া বুঝা যাইবে।

এই দুই বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ বা মিলন কিসে সম্ভব হয় বুঝিতে হইলে, উহাদের স্বরূপ বুঝা একান্তই প্রয়োজন।

১। জ্ঞান শক্তি :—

যে শক্তির দ্বারা 'আমাকে' জানা যায় তাহাকেই জ্ঞানশক্তি বলে। জ্ঞানশক্তির দ্বারা মাত্র আমিত্বের জ্ঞান হয় যে আমি আছি। কিন্তু কিরূপে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছি জানা যায় না। অর্থাৎ এই শক্তি দ্বারা 'আমার' অনুভূতি ও ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। ক্রিয়া শক্তি অভাবে 'আমি' অপ্রকাশ হইয়া পড়ি বলিয়াই এই শক্তি 'আমার' অপ্রকাশ শক্তি। এই অপ্রকাশ শক্তিবশে 'আমি' অপ্রকাশিত হইয়া জড়ভাবাপন্ন হই বা স্বরূপে স্থিত হই। সেই জন্য ইহা জড়শক্তি নামেও পরিচিত।

জ্ঞান শক্তি অপ্রকাশ হইলেও ইহার ক্রিয়া আছে, যদ্দ্বারা 'আমি' স্বরূপে স্থিত হই, এবং

আমার কার্য্য নিয়মিত হইয়া থাকে।

একটী টেবিলের উদাহরণ লইয়া এই শক্তির ক্রিয়া বুঝা যাউক। টেবিলের উপর বই রহিয়াছে। পুস্তক ধারণ-রূপ ক্ষমতা যে টেবিলের আছে তাহা বাহ্যতঃ প্রকাশ না পাইলেও (কারণ গতিতেই শক্তির প্রকাশ) জ্ঞানবলে উহার শক্তির কার্য্য অবগত হওয়া যায় যে টেবিল না থাকিলে পুস্তক পড়িয়া যাইত।

এই জ্ঞানশক্তিবশেই 'আমার' কর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া চিন্তারূপে কূটস্থ হয় এবং স্মৃতিরূপে "আমাতে" স্বরূপে অবস্থিত হয়। আত্মশক্তির এই ক্রিয়া তমোগুণের কার্য্য বলিয়া বিদিত। ইংরাজীতে ইহাকেই Negative power বলে। এই জ্ঞানশক্তির সহিত ক্রিয়াশক্তির সঙ্গম হইলেই অনুভূতি বা চৈতন্য উদ্বোধিত হইয়া সপ্রকাশ বা ক্রিয়াশীল হয়।

চকমকিতে অগ্নিক্রিয়া অপ্রকাশিত রহিয়াছে। অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি রাহিত্যে অগ্নি জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহার এই অপ্রকাশ শক্তির সহিত ঘর্ষণরূপ বেগ বা ক্রিয়াশক্তির সঙ্গম হইলেই অগ্নির চৈতন্য, স্ফুলিঙ্গরূপ অনুভূতি শক্তিবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়।

ইচ্ছাশক্তি—অনুভূতি বিশিষ্ট বেগশক্তি। ইহাই 'আমার' ক্রিয়াশক্তি নামে বিদিত। ইহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বলিয়া গতিশক্তিবিশিষ্ট গতিশক্তিবিশিষ্ট বলিয়াই ইহা সপ্রকাশ।

সপ্রকাশ হইবার নিমিত্তই অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তই আমি মুহুর্মুহু ইহাতে আসক্ত হইতেছি। আমার সত্ত্বায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তি বা স্মৃতির সহিত মিলিত হইতেছে।

এই সপ্রকাশ ও অপ্রকাশ শক্তির সংঘর্ষে অনুভূতি উৎপন্ন হইয়া আমাকে উদ্বোধিত, বা জাগরিত রাখিয়া কর্ম্ম করাইতেছে। এই ইচ্ছারই মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া অন্তর্যামীরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতি হইতে বিরাট ওঁকার অনুভূতি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আমি ব্রহ্ম (অহং) সৃষ্টি করিতেছি। ইহাই আমার সাকার পুরুষ রূপ, এবং গতিশক্তি বিশিষ্ট ইচ্ছাই আমার প্রকৃতি।

গতি (motion) যে প্রাকৃতিক শক্তি তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

উদাহরণ স্বরূপ সাগরাম্বরা পৃথিবী যদি প্রকৃতি হন, ঘূর্ণনরূপ ইহার গতিশক্তিও প্রাকৃতিক।

এই শক্তির দ্বারা আমি ক্রিয়াশীল হই বলিয়া ইহাকে 'আমার' রজগুণের কার্য্য বলিয়া থাকে। ইংরাজিতে ইহাই Positive Power নামে পরিচিত।

আমি কিরূপে 'আমার' সপ্রকাশ ক্রিয়াশক্তির সহিত অপ্রকাশ জ্ঞানশক্তির সংযোগ ঘটাইতেছি জানিলেই আমার কার্য্য ও 'আমাকে' জানা হইবে।

জ্ঞানশক্তি স্মৃতিতে পরিণত হইলে উহাতে কি আছে জানা যায়। জানা যায় 'আমার' কর্ম্ম সমূহ চিন্তারূপে জ্ঞানশক্তিবশে আজ্ঞাচক্রে বা ব্যোমতত্ত্বে নীত হইয়া 'আমাতে' স্থির হইতেছে। কিসের স্মৃতি থাকিতেছে? যাহা করিয়াছিলাম। কি করিয়াছিলাম? যাহা ইচ্ছা হইয়াছিল। সুতরাং 'আমার' সপ্রকাশ ইচ্ছাশক্তি অপ্রকাশ জ্ঞানশক্তিতে পরিণত হইয়া স্মৃতিপথে 'আমাতে' উপগত হইতেছে তাহা বুঝা যাইল।

স্মৃতির ইচ্ছা রাহিত্যে জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া লোপ পাইয়া অপ্রকাশ আমিত্বে স্থিত হইল। তথায় মাত্র আমি আছি আর কিছুই নাই। কিরূপে আছি? স্মৃতিরূপে কর্ম্মফল লইয়া। নতুবা কিসের স্মৃতি থাকিবে?

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আমার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই 'আমি' কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়াছি। এই স্মৃতি ও আসক্তির সংঘর্ষে আমি অনুভূতি বিশিষ্ট হইয়া বেগরূপ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হই বা সপ্রকাশ হই। সৃষ্টির নিমিত্তই আমার স্মৃতি কর্ম্মফলে আসক্ত হয়। কর্ম্ম করাই আমার স্বভাব। এবং অনুভূতিই আমার রূপ।

স্মৃতি যেমন জ্ঞানশক্তির পরিণাম আসক্তি তদ্রূপ ইচ্ছাশক্তির পরিণাম। উহারা উভয়ের সহজাত শক্তি নামে বিদিত এবং সমধর্ম্মাবলম্বী। (ইহাকেই ইংরাজীতে acceleration কহে।)

স্মৃতি ও আসক্তির সম্মিলন হওয়াই 'আমার' সত্বগুণের কার্য্য এবং ইহা দ্বারাই বা এইরূপেই আমি চিরকাল বিদ্যমান থাকি। ইহাই আমার সচ্চিদানন্দ রূপ।

মর্ম্মবাণী।

(অধ্যাপক শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ)

(১)

আছিল নিশ্চিহ্ন এক বিশাল প্রান্তর ভূমি
নিরুদ্বেল অব্ধিসম নাহি ছিল আমি তুমি।
ভূমি, জল, অগ্নি বায়ু, আকাশ বা গ্রহ তারা,
অথবা এহেন রাজ্যের কোন রীতি কোন ধারা।

(২)

কি যেন গো কোথা হ'তে কাহার ইচ্ছার বলে
বহিল প্রবল বাত্যা তরঙ্গ উঠিল কোলে
ধীরে ধীরে যথাপূর্ব্ব আবরিল চারিধার
ভাসিল সত্যের'পরে হেন বিশ্বচরাচর।

(৩)

রচিল অবিদ্যা তাহে বিমোহন রঙ্গভূমি
সাজিল কুহকে তার বিচিত্র এ ধরাখানি
বাঁধিল স্বার্থের যুদ্ধ আমিত্বের হুহুঙ্কার
মহত্ত্বের বিনিময়ে এল বিশ্বে হাহাকার।

(৪)

পাতিল যে সিংহাসন অহঙ্কার অভিমানে
সরলতা অস্তমিত কপটতা প্রলোভনে।
কোথা সত্য! কোথা পুণ্য! পবিত্রতা কোথা আর
সুবিপুল বসুন্ধরা মোহাচ্ছন্ন অনিবার॥

(৫)

হারায়েছে হিংসাদ্বেষে ভরিয়া গো উদারতা
জড়তা ঘেরেছে তাহে সঙ্গে ল'য়ে দরিদ্রতা
কোথা ত্যাগ! কোথা শান্তি! কোথা সে তপস্যাবল
কেনবা মালিন্য আসি আবরিল মর্ম্মস্থল॥

(৬)

কৃপাশীল আর্য্যঋষি! ওগো তুমি কোথা আজ
দেখ আসি একি হল তোমার ভারত মাঝ।
আমি ক্ষুদ্র বলি পার্শ্বে পড়ে আছে ভূমণ্ডলে
তৃপ্তিহীন হ'য়ে দেখ ভাসে তপ্ত অশ্রুজলে॥

(৭)

দাওগো ত্যাগের মন্ত্র স্বার্থহীন মহাপ্রাণ
বাজুক হৃদয়তন্ত্রী হ'ক পুনঃ সামগান।
ভাসুক সে সাম্য মৈত্রী তোমার আদর্শ হেরে
ভারতের শান্তি পুনঃ ভারতে আসুক ফিরে॥

(৮)

কোথা মা গো জ্যোতির্ম্ময়ি সুপ্তহৃদে প্রাণ দাও
বাজায়ে তোমারি বীণ শিহরে শিহরে রও।
কর মা গো দিব্যালোকে মহাব্যোম উদ্ভাসন
লভুক ভারত তায় ভারতের মহাধন॥

(৯)

এস নাদ অধিষ্ঠাত্রি! ওমা ধাত্রী বিজ্ঞানের
এস গো গায়ত্রী দেবী ওমা পূজ্য ত্রিলোকের।
সাধনার সিদ্ধি এস ওগো ঋদ্ধি তপস্যার
কর মা ভারতে আজি চির অস্ত তমিস্রার॥

(১০)

মর্ম্মস্পর্শি কে বলিল শুনরে দুর্ব্বল শিশু
কে বলিল হেন কথা ভারতের নাহি কিছু।
হের এ অমৃত সিন্ধু নিস্তরঙ্গ স্বতোজ্জ্বল
আমি আছি তাহে করি দীপ্ত চিত্ত শতদল।
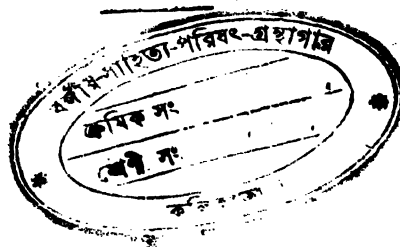
হিন্দুর বিবাহ

(সম্পাদক।)

বিশ্বসৃষ্টির আনুকূল্য বিধানার্থ স্ত্রীপুরুষ সম্মিলন বিধাতার নিয়ম। আবহমানকাল এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। জীব কখন একাকী থাকিতে পারে না—থাকিবার নিয়মও নাই। এই জন্য শাস্ত্র বিবাহ-বন্ধন বিধিবদ্ধ করিয়া সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন। সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন রহিয়াছে, এক প্রকারে না একপ্রকারে স্ত্রীপুরুষ সম্মিলন করিয়া তাহারা বিশ্বেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে।

অন্যান্য জীব হইতে মনুষ্য সমাজে ইহার প্রচলন কিছু ধর্ম্মসম্মত—কিছু ব্যবস্থানুমোদিত। আবার হিন্দুদের মধ্যে ইহার প্রচলন এত গভীর তত্ত্বানুমোদিত—বিধি বিধান সমন্বিত—যাহা অন্য কোন মনুষ্য জাতির মধ্যে নাই। দ্রব্য মাত্রেই যেমন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহন করে, হিন্দুও তেমনি গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন দ্বারা জন্ম হইতে ক্রমশঃ ধর্ম্মকর্ম্মে সংস্কৃত হইয়া যৌবনে বিবাহ দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে। হিন্দুর বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার, শুধু স্ত্রীপুরুষ সম্মিলন, বা কাম-কামনার বশবর্ত্তী হইয়া জীবোৎপত্তির কারণ নহে। হিন্দুকে হিন্দু করিবার জন্য, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের পর বিবাহ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। পুরুষ এই আশ্রমের ধর্ম্মবলে গরীয়ান রাজা, আর ধার্ম্মিকা রমণী তাহার রাণী—কর্ত্রী, পুরুষের সহচরী—ধর্ম্মপত্নী, অর্দ্ধাঙ্গিনী একের অভাবে অন্যের নাশ, একের মৃত্যুতে অন্যের মৃত্যু এই বিবাহ-বন্ধনের উদ্দেশ্য।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হিন্দুর জাতিগত—এই আশ্রম-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে হিন্দু উত্তর কালে নিষ্কাম ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া অনায়াসে নির্ব্বাণলাভে সমর্থ হয়, মুক্তির জন্য তাহাদের আর স্বতন্ত্র কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। নিষ্কামী হইতে হইলে এই আশ্রমধর্ম্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেই সহজে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচর্য্যে বিধিমত সংযম শিক্ষা করতঃ বিবাহ করিয়া গৃহী হইলে কিছুতেই পতনের সম্ভাবনা নাই। এই সংসারাশ্রমেই যত

কিছু কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনার পরিতৃপ্তি সাধিত হইয়া বানপ্রস্থে তাহার শিথিলতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়, এই শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় যে হৃদয়ভাণ্ড বিভাষিত হয়—সন্ন্যাসাশ্রমে তাহাতেই পৌর্ণমাসী বিকসিত হইয়া মানুষকে যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্মী বা জীবকে শিবত্ব দান করিয়া থাকে, নতুবা কেবল মাত্র বিবাহে বীতস্পৃহ হইয়া লেংটা সন্ন্যাসী রূপে ভবঘুরে হইয়া বেড়াইলে জীবনের সার্থকতা কোথায়! প্রাণে ভোগাশার প্রবল বহ্নি প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিয়া কেবল ব্যর্থ-জীবন-ভার বহন করিলে কি দেশের কাজ করিতে পারা যায়?

আজ কাল দেখা যায় অনেক বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক হিন্দুর পবিত্র ও প্রধান সংস্কার বিবাহের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া ইহার দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া দেহ মন এবং মনুষ্য জীবন পবিত্র করিতে চাহে না, তাহারা বলে—"বিবাহ করিলে কেবল কতকগুলা ছেলে-মেয়ে হইবে—রোগে শোকে কাতর করিয়া জীবনটাকে কষ্টকর করিয়া তুলিবে—তখন কেবল কষ্টভোগ ভিন্ন সুখের মুখ দেখিতে পাইব না, তার চেয়ে বিবাহ না করিয়া একাকী থাকিলে আর সে ভয়ের কোন কারণ নাই। যেখানেই থাকি—নিজে এক প্রকার সুখে সচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে পারিব। সময়ে দেশের কাজ করিতেও কোন বাধা হইবে না; বিয়ে করিলেই যত জঞ্জাল জালে জড়িত হইয়া পড়িতে হয়।" কেহ কেহ আবার বলে—"খুব বেশী টাকা রোজগার যদি কত্তে পারি—তবে খুব বয়সে বয়স্থা পত্নী গ্রহণ করিব।"

আমরা প্রথমতঃ তাঁহাদের এই যুক্তির পোষকতা করিতে পারি না। তাঁহারা হিন্দুর হৃদয় লইয়া হিন্দুভাবে শিক্ষিত হইয়া এ কথা বলেন না। বিজাতীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিজাতীয় ভাবে জ্ঞানবান্ হইয়া বিজাতীয় রীতি-নীতি অনুসারেই একথা বলিয়া থাকেন কিন্তু যথার্থ হিন্দুর ভাব তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুর বিবাহ কামজ মোহ নহে ইহা একটী প্রধান সংস্কার—গৃহী হইয়া জগতের কাজে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিবার একটী প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়। প্রথমতঃ তোমাদের আপত্তি—বিবাহ করিলে অনেক ছেলে পিলে হইবে, উপায় কম—খাওয়াইবে কেমন করিয়া—রোগে শোকে কেমন করিয়া চিকিৎসা করাইবে? কিন্তু ইহার মূলে যে সম্পূর্ণ দোষ তোমরা তাহা কি দেখ না, কেবল বিবাহের দোষ দাও, ইহাতে যে সম্পূর্ণ দোষ তোমার—তুমি সংযমহীন হইয়াছ, হিন্দুর নিয়মানুসারে সংসর্গ কর না, তাই অজস্র

স্বাস্থ্যহীন বিকৃত পুত্র হয়—নতুবা ঠিক নিয়মানুসারে সংযমী হইয়া পুত্রোৎপাদন করিলে—সে পুত্র নীরোগ, দীর্ঘায়ু হইবে এবং সংখ্যায়ও অল্প হইবে—তখন আর তোমার কষ্টের কোন কারণ থাকিবে না। তার পর দ্বিতীয় আপত্তি—বেশী টাকা না হইলে স্ত্রীকে সাজাইয়া গুছাইয়া অলঙ্কারাদি দানে বিবি সাজাইয়া রাখিব কিসে? এইখানে তোমার রুচির বিকৃতি পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হইতেছে—এখানে হিন্দুত্বের ধারণা একেবারে নাই, ইহা একেবারে বিজাতীয় ভাবে পূর্ণ।

হিন্দু-স্ত্রী সহধর্ম্মিণী কেবল বারবিলাসিনীর মত সালঙ্কারে বা পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কেবল তোমার নয়নের তৃপ্তি সাধনের জন্য তাহার জন্ম হয় নাই! হিন্দু-স্ত্রী সংসারের দেবী প্রতিমা, মা অন্নপূর্ণার অংশসম্ভূতা, লক্ষ্মী স্বরূপিণী, হাব-ভাব বিলাস-ব্যসনে ইঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে চাহেন না, তবে তুমি যদি তাহাদিগকে ঐরূপ হইতে শিক্ষা দাও, বা ঐরূপ না হইলে তৃপ্তিবোধ না কর তাহা হইলে পতি-অনুরাগিণী পতির অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য না করিবেন এমন কাজ কি আছে? কিন্তু ইহাতে তাহার ও তোমার ভবিষ্যৎ যে কুয়াশাচ্ছন্ন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। হিন্দু-স্ত্রী সহধর্ম্মিণী—ইঁহার সহিত পবিত্র সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জীবনের উন্নতি করাই তোমার উদ্দেশ্য, তাহা না করিয়া যদি বিপদগামী হও তাহা হইলে দোষ কার? হিন্দু-স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী তোমার যেমন অবস্থা সে সেইরূপ সুখ সচ্ছন্দ উপভোগ করিবে। তুমি অদৃষ্টক্রমে অট্টালিকাবাসী হও, সে তাহাতে সুখানুভব করিবে আর যদি কুঠির-বাসী হও তাহাতেও তাহার সুখের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। সীতা দময়ন্তী প্রভৃতি রাজরাণীও স্বামীর সহিত বনবাসিনী হইয়া অতুল সুখে কাল কাটাইয়াছিলেন। তুমি শিক্ষা দিতে পার না, বা বিদেশীয় ভাবে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত কর বলিয়াই তোমার এত কষ্ট, বেশী টাকা না হইলে বিবাহ করিতে পার না। হিন্দুস্ত্রী স্বামীর পরিচারিকা, তোমাকে সেবা করিয়া, না খাইয়া তোমায় খাওয়াইয়া পরাইয়া তোমার সন্তানাদি প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়া তোমার আলয় আশ্রয় দেখিয়া একদিনের দ্রব্য দুইদিন করিয়া স্বামীর সংসারে ধর্ম্মে সাহায্য করিতে পারিলেই হিন্দু-স্ত্রী আপনাকে ধন্যজ্ঞান করে। হিন্দু! এমন ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিতে তুমি ভীত হও?

আজকাল অনেক সভা সমিতি হইয়াছে,

এমন মঠও অনেক হইয়াছে, যথায় এই অপরিণত বয়স্ক যুবকদিগকে হিন্দুধর্ম্মের পরম হিতকর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনেক বিপরীত কথা শিক্ষা দেওয়া হয়, অনেক হিন্দুর আচার বিচার বিগর্হিত কার্য্য করিতে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে। সেই সকল উপদেষ্টা এই সকল যুবকগণকে বিবাহ করিবার উপদেশ প্রদান না করিয়া আজীবন কুমার ব্রত অবলম্বন করিতে আদেশ দেন। চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করা মন্দ নহে। কিন্তু তাহা কয়জনের পক্ষে সম্ভব, এত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া কয়জন দৃঢ়চিত্ত যুবক তাহা প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয়? অথচ একটা দায়ীত্ব হীন জীবন লইয়া চিরদিন উদ্দাম প্রকৃতির বশে ছুটাছুটী করিয়া এমন দুর্লভ মানবজীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া ফেলে। এই সকল যুবক বলিয়া থাকে বিবাহ করিয়া ছেলে পিলে হইলে সংসারে জড়িত হইয়া পড়িব, তাহা অপেক্ষা দেশের কাজে লাগিয়া থাকাই ভাল!

যাহারা ছেলে পিলে হইবার ভয়ে বিবাহ করিতে ভয় পায়, আত্মীয় স্বজন প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া যাহারা আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনে বিমুখ হয় তাহাদের দ্বারা দেশের কাজ যে কেমন করিয়া হইবে তাহাও বুঝিতে পারি না। সংসার আশ্রম কি দেশের কাজ ছাড়া! জগতে যে কোন কাজ কর সংসারাশ্রমের সাহায্য না পাইলে, গৃহীর কাছে হাত না পাতিলে যত বড়ই সাধারণ কার্য্য হউক তাহার সফলতা কোথায়! যেখানে যে কোন মহৎ কার্য্য হইয়াছে, যে কোন আশ্রম বা সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সংসারাশ্রমইত তাহার গোড়া! সংসার আশ্রম না থাকিলে কি অন্য আশ্রম থাকিতে পারে? সংসারই সকল আশ্রম ও সকল ব্রতের মূল। সংযমী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ব্রতী হইয়া সংসার করাই মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে ভুয়ো ভুয়ো আদেশ করিয়া গিয়াছে।

আগে ত্যাগ না আগে ভোগ। ত্যাগের জন্য সংযমী হইয়া ভোগ করিতে পারিলে ত্যাগ জোরে করিতে হয় না আপনি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন আর সে ত্যাগে পতনের সম্ভাবনা থাকে না। নতুবা ভোগের বাড়বানল হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে জ্বলিতে লাগিল, বাহিরে লোক দেখান ত্যাগ করিয়া সাধু সাজিলাম ইহাতে দেশের যে কি অনিষ্ট হয় তাহা কি আর বুঝাইয়া দিতে হইবে? অনেক দেবালয়ের সাধু সন্ন্যাসী ও মহান্তের প্রকৃতি দেখিয়া কি চৈতন্য হয় না? আর এই সকল দেবালয় বা মঠের অস্তিত্ব কোথায়? ধর্ম্মপ্রাণ সংসারী বিবাহিত জীবন গৃহীর

উপর নয় কি? তবে ভাই! পবিত্র সহধর্ম্মিণীর সহবাস সুখে বিমুখ কেন, আর তাহাদের গর্ভে পুত্র কন্যা হইবে বলিয়া ভয়ে এত জড়সড় হও কেন?

কর্ত্তা তুমি, কাজের ভার তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে, যেমন কাজ করিবে তেমনি ফল হইবে। আমাদের আর্য্য ঋষিগণের মত ধর্ম্মের পথে থাকিয়া যথার্থ সংযমী হইয়া আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, শিক্ষিত হইয়াছ নিজের শরীর ও মানসিক বৃত্তি অব্যাহত রাখ—ধর্ম্মকর্ম্মে মতিমান হও, দেখিবে এই বিবাহিত জীবন তোমাদের কত সুখকর হইবে, দেশের কাজ এই সংসার হইতে নির্ব্বাহ করিতে পরিবে?

হিন্দু সংসার কি সাধুর সংসার! এযে দয়া, ধর্ম্ম, দান, অতিথি ও আর্ত্তের সেবার উপরই প্রতিষ্ঠিত, এইখানে থাকিয়া, পুণ্যপূত পবিত্রতায় আধার সহধর্ম্মিনীর সাহায্যে ইহাকেই যে তুমি স্বর্গে পরিণত করিতে পার! কিন্তু সে চেষ্টা, সে সৎসাহস, সে প্রাণ সে মন কই? সমস্তই যে হারাইয়া ফেলিতেছ, তাই হিন্দু হইয়া হিন্দুর প্রধান সংস্কার বিবাহের দ্বারা সংস্কৃত হইতে ভয় পাও!

আমাদের আর্য্য ঋষিগণ কেহই পুত্র কলত্র ছাড়া ছিলেন না সহধর্ম্মিণীহীন জীবন বহন করিয়া কেহই উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই। হিন্দুর বিবাহ অতি পবিত্র—ইহাদের পরিণীতা ভার্য্যা সকল পবিত্রতার আধার দেবী, অন্যান্য জাতির মত হিন্দু বিবাহ কেবল কাম কামনা চরিতার্থের একটী আধার সংগ্রহ করা নহে। এ বিবাহ করিলে মানব দেহ সুসংস্কৃত হয় জীবন পবিত্র হয় বিবাহিত ধর্ম্মপত্নীর সহবাসে আজীবন সুখে কাটাইয়া অন্তে স্বর্গের পথ প্রশস্ত করিতে পারে।

জ্বরের কথা।

(শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস)

"জ্বর" কি? অনেকেরই ধারণা আছে যে, জ্বর একটা ব্যারাম। কিন্তু বাস্তবিক কথা জ্বর ব্যারাম নয়। জ্বর একটা লক্ষণ মাত্র। জ্বর তবে কিসের লক্ষণ? জ্বর দুইটী জিনিষের লক্ষণ—প্রথমতঃ, শরীরের মধ্যে কোনও বিজাতীয় বিষ প্রবেশের লক্ষণ। দৃষ্টান্ত যথা,—গাতে যদি কিছু ফুটিয়া গেল ও সে জায়গাটা পাকিল, ত অমনি জ্বর হইবে। পেটের মধ্যে

আমাশয় বা গর-হজম বা অপর কোনও উপদ্রব উপস্থিত হইলেই জ্বর হয়। বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া নিউমোনিয়া হইলেই জ্বর হয়। দ্বিতীয়তঃ—শরীরে প্রবিষ্ট বিষের প্রতিক্রিয়ার দরুণ যেমন জ্বর হয়, তেমনি মানসিক উদ্বেগ বা উত্তেজনার ফলেও জ্বর হইতে পারে। অত্যন্ত দুশ্চিন্তা, প্রবল ক্রোধ বা দুঃখ, ভয় প্রভৃতির ফলেও, জ্বর হইতে পারে।

আমাদের দেহ সুস্থ অবস্থায় সর্ব্বদাই একই উত্তাপ রক্ষা করিতেছে। অনেকের ধারণা যে, সে উত্তাপটি ৯৮.৪ ফারেন্‌হাইট্। দেশভেদে এই স্বাভাবিক উত্তাপের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা বিলাত অনেক উচ্চে অবস্থিত;—কাজেই বিলাতের উচ্চতা এবং তথাকার বায়ু চাপ বাঙ্গালাদেশের উচ্চতা ও বায়ু চাপের সঙ্গে সমান নহে। এইজন্য বিলাতের লোকদের স্বাভাবিক দৈহিক উত্তাপ ৯৮-৪ হইলেও এদেশের লোকদের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৬-৪ হইতে ৯৮ এই সংখ্যার মধ্যে। জ্বর হইলে, গা গরম হয়; অথচ, সুস্থদেহে, আমাদের সকলেরই দেহের উত্তাপ একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপের বেশীও হয় না, কম ও হয় না—৯৬.৪ হইতে ৯৮° এর মধ্যেই থাকে। তবে জ্বরের সময়ে এ অতিরিক্ত উত্তাপ আসে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে বলিব—এই নরদেহ আজব কারখানা। এখানে কত কি যে কাজ হয় কত কি যে সৃষ্ট হয়, তাহা ভাবিলেও অজ্ঞান হইতে হয়। শরীর খুব গরম বোধ হইলে, আমরা গা খুলিয়া দিই, এবং গায়ে অজস্র ঘাম হইতে থাকে—যেন দেহের সমস্ত জলের কলের মুখগুলিকে এক সঙ্গে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে! আবার শীত বোধ হইলে, আমরা খুব মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকি; অথবা যদি জামা না জোটে, তবে খুব হাত পা নাড়িয়া বা খানিকটা দৌড়িয়া দেহকে গরম করি—অর্থাৎ যেন মাংসপেশী গুলিকে খুব খাটাইয়া উত্তাপের সৃষ্টি করি। এই যে ঘাম দ্বারা দৈহিক উষ্ণতার হ্রাস ও মাংসপেশীকে খাটাইয়া উষ্ণতার সৃষ্টি—এ সবই এই দেহের কাজ। সমস্ত দেহের তাবৎ কাজই মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের মস্তিষ্কে তিনটি জায়গা আছে—একটির কাজ, যে যে দৈহিক প্রক্রিয়ায় উত্তাপাধিক্যের সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে খাটান; অপরটির কাজ হইতেছে, সেই সমস্ত উত্তাপকে বাহির করিবার চেষ্টা; তৃতীয়টার কাজ—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটান। এই দুইয়ের মধ্যে (উত্তাপ জমা ও খরচের মধ্যে) তৃতীয়াংশটি তাপ-সামঞ্জস্য ঘটাইতেছে। এই উত্তাপ-সামঞ্জস্যের ফলে, আমাদের দেহের উত্তাপ সদাসর্ব্বদাই একই থাকিয়া যাইতেছে। মস্তিষ্কস্থ

এই উত্তাপ-সামঞ্জস্য-বিধায়িনী কেন্দ্রের গোলযোগ উপস্থিত হইলেই, জ্বর হয়।

জ্বরে কি কি বিপদ হইতে পারে—জন সাধারণের সেগুলি বেশ করিয়া জানা থাকা উচিত। জ্বর হইলেই শরীরে উত্তাপ বাড়ে। অধিক উত্তাপের ফলে, দেহের সুকুমার সকল জিনিসই ধ্বংস বা ধ্বংসপ্রায় বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে:—কাজেই জ্বরের প্রথম কুফল—দেহ-ক্ষয় এবং দেহের সমস্ত যন্ত্রের বিকলতা প্রাপ্তি। জ্বর হইলেই মাথায়, যকৃতে (লিভারে), বুকে অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়। মাথায় রক্ত 'চড়ার' ফল—এলোমেলো বকুনি (বিকার); বুকে রক্ত জমা'র ফল, নিউমোনিয়া ইত্যাদি; লিভারে রক্ত জমার ফল—লিভার বড় হইয়া যাওয়া। এইগুলি জ্বরের দ্বিতীয় কুফল। জ্বরের তৃতীয় কুফল—দেহের কোনও কোনও যন্ত্রের কার্য্য-ভার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি' পাওয়া; অথবা কিয়ৎকালের জন্য একরকম বন্ধ থাকা। জ্বরে শরীরের ক্ষয় হয়; সেই দ্রুত ক্ষয়িত পদার্থগুলিকে দেহ হইতে বাহির করিতে যাইয়া, প্রস্রাবের যন্ত্র (Kidney) অনেক সময়ে বিকল হইয়া পড়ে। প্রস্রাবের যন্ত্র বিকল হইলে, প্রাণনাশের ভয় থাকে। জ্বরের চতুর্থ কুফল—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। প্লেগ,নিউমোনিয়া প্রভৃতি জ্বরে, হৃৎপিণ্ড সহজেই ভীষণভাবে জর্জ্জরিত হইয়াই প্রাণনাশ ঘটায়। একশো পাঁচের উপরে তাপ উঠিয়া বেশীক্ষণ থাকিলে হৃৎপিণ্ডের পক্ষে এই ভয়টি খুব বেশী। কচি-ছেলেদের ও দুর্ব্বল লোকেদের পক্ষে, পাঁচ ছয় ঘণ্টা স্থায়ী ১০৬° কি ১০৭° জ্বর প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে! আমি দীর্ঘস্থায়ী, প্রাণান্তক ১০৮ ডিগ্রি জ্বর পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। ম্যালেরিয়া বাত-জ্বর, প্লেগ প্রভৃতিতে অকস্মাৎ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রি জ্বর হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

জ্বরের "অপকারিতা" বলিলাম, জ্বরের "উপকারিতা" কিছু আছে কি? আছে বৈ কি। জ্বরই প্রকৃতির প্রধান চেষ্টা—দেহের মধ্যে আগন্তুক জীবাণুগুলিকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য। অধিকাংশস্থলেই, দেহের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করিয়াই জ্বরের উৎপত্তি ঘটায়। অধিকাংশ জ্বরই জীবাণুজ। জ্বরের জ্বালায় জীবাণুরাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের দেহ-নিঃসৃত বিষও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দেহকে বিষ মুক্ত করিবার জন্যই জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব জ্বর দেখিলেই, তাড়াতাড়ি, তাহাকে কমাইতে সকল সময়ে চেষ্টা করা উচিত নয়। কতক-গুলি জ্বর আবার "মেয়াদী"—অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট-

কাল স্থায়ী। ম্যালেরিয়া জ্বর সাধারণতঃ ৮।১০ ঘণ্টার বেশী থাকে না; নিউমোনিয়া জ্বর সাধারণতঃ ৫ম ৭ম, ৯ম, অথবা ১১শ দিবসে আপনিই মগ্ন হয়। টাইফয়েড জ্বর সাধারণতঃ ২১ দিনে ছাড়ে; ডেঙ্গু প্রভৃতি কতকগুলি জ্বর আছে তাহারা কেহ ৩য়, কেহ ৭ম, কেহ ১০ম দিনে ছাড়ে। চিকিৎসা কর আর না কর, ঐ সকল "মেয়াদী" জ্বর আপনার মেয়াদ লইবেই লইবে। জবরদস্তী করিয়া ছাড়াইতে যাইলে অনিষ্ট হয়। এই জন্য, সুচিকিৎসকগণ সকল সময়ে ঔষধ দিবার জন্য ব্যস্ত হন না। তাঁহারা খালি নজর করিয়া যান—প্রকৃতি দেবী কোন পথে যাইতেছেন। জ্বর আপনিই আপনার কারণ ধ্বংস করে—এই মূলমন্ত্র ধরিয়াই বর্ত্তমান সুচিকিৎসকেরা যা-তা করিয়া বসেন না।

এক্ষণে জ্বরে গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি? জ্বর হইলেই প্রথম কর্ত্তব্য—গোড়া হইতেই রোগীকে শয্যা গ্রহণ করান। জ্বর-রোগী যত গোড়া হইতে শয্যার আশ্রয় লইবে, ততই তাহার জ্বর অল্পকাল স্থায়ী হইবে, অবশ্য মেয়াদী জ্বরের কথা স্বতন্ত্র। গোড়া হইতেই কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া ভাবনা চিন্তাকে ত্যাগ করিয়া বিছানায় শুইয়া থাকিলে, জ্বরের প্রকোপ ও স্থায়িত্ব যেমন কম হইবার কথা, উপসর্গাদি তেমন না হইবার কথা। জ্বর গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইলে বা পরিশ্রম করিলে জ্বর ছাড়িতে চায় না। (ক্ষয়কাস রোগীর জ্বর সম্বন্ধে এই কথাটী খাটে)।

জ্বরে গৃহস্থের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—গোড়ায় পথ্য লঙ্ঘন দেওয়া। আমরা পুরাতন জ্বরের কথা বলিতেছি না—তরুণ জ্বরের কথাই বলিতেছি। জ্বরে শরীরের ক্ষয় হয় বলিয়া, যদি রোগীকে ভোগসর্ব্বস্ব ইংরাজের মতে তাড়াতাড়ি "পুষ্টিকর" খাদ্য দিতে যাই, তবে কুফল হইবে। কারণ, প্রথমতঃ, জ্বরের প্রকৃতিই এই যে, রোগীর ক্ষুধা থাকে না; দ্বিতীয়তঃ, জ্বরে পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়, এমন কি পরিপাক যন্ত্রের এত বৈকল্য ঘটে যে, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হয়, ক্ষুধা নষ্ট হয়, জিহ্বা ময়লায় ঢাকিয়া যায়, গা-বমি করে। সে রকম অবস্থায়, পাছে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এই অমূলক আশঙ্কায় তাহাকে কতকগুলা খাবার দেওয়া বড়ই ভুল। ডাক্তারেরা সে ভুল পদে পদে করেন। রোগীত দুর্ব্বল হইবেই—সে দৌর্ব্বল্য—জ্বরের বিষক্রিয়ার ফল—শরীর ক্ষয়ের ফল নয়। এমন অবস্থায়, তুমি পুষ্টিকর খাদ্য দিলেও খাইবে কে, বা হজম করিবে কে? লাভের মধ্যে, গরহজম হইয়া বমি, দৌর্ব্বল্য ও

জ্বর বাড়াইয়া দিবে। এ সম্বন্ধে আমাদের কবিরাজ মহাশয়ের পন্থা বড়ই সুখ্যাতির যোগ্য। জ্বরের অবস্থায়, রোগীরা আপনা আপনিই দুধ পান করিতে চাহেনা, অথচ ডাক্তারেরা চক্ষু বুজিয়া দুধ দিবার ব্যবস্থা করেন। একটু ভাবিয়া দেখিলে, বাহির হইতে দেখিলে দুধকে যত সহজপাচ্য, তরল ও লঘু পথ্য মনে করা যায়, দুধ ত তাহা নয়,—দুধ যে ডেলা-ডেলা ছানার সমষ্টি! যদি কোন চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করা যায়—"জ্বর হইয়াছে, রোগী ছানা খাইবে কি ?" তখনই তিনি শিহরিয়া উঠিয়া, তাহা নিষেধ করিবেন; কিন্তু দুধ পান করিতে বলিবার সময়ে, চিকিৎসকও ভাবেন না, যে, দুধ ছানার সমষ্টি। তরুণ এবং প্রবল জ্বরে দুধ বিষবৎ। আসল কথা এই যে, ডাক্তারেরা যে পাশ্চাত্য-গুরুর নিকট দুধ-পথ্যের গুণাগুণ শিক্ষা করেন, তাঁহারা প্রতি গ্রাসে মাংসপিণ্ড গলাধঃকরণ করেন, এবং তিন বেলায় তাঁহাদের ভোজন পাত্রের কাছে ভাগাড়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ জমায়েৎ হয়! কাজেই, সে জাতির পক্ষে, দুধ ও ভাত অতি লঘু পথ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ এইখানেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে, দেশী পথ্যাপথ্যকে আমরা অসার মনে করিয়া শ্লাঘা অনুভব করি। দেশী পথ্যাপথ্যের দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকায় লজ্জিত হই না এবং বরঞ্চ বিদ্যা মূর্খতা বশতঃ দেশী পথ্যকে উড়াইয়া দেওয়াই পরমার্থজ্ঞান করি। ইংরাজী কেতাবে যে যে পথ্যের কথা লেখা নাই, বা ইংরাজী কেতাবে যে যে ভাবে পথ্যাপথ্য ইংরাজ তাহার নিজ দেশকালপাত্র হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে, এ দেশীয় ডাক্তার মহাপ্রভুরা এদেশীয় হইলেও, সে সে গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারেন না। অন্ততঃ তাঁহাদের চিন্তাশক্তি এত পঙ্গু হইয়া যায়, বা মানব-প্রাণটাকে তাঁহারা এত তুচ্ছ সামগ্রী মনে করেন যে, বিনা চিন্তাতেই সকল জ্বরেই "দুধ সাগুর" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তরুণ ও প্রবল জ্বরে, দুধ না দেওয়াই উচিত। জল সাগু, জল বার্লি, টাট্‌কা আমানি, যব চিঁড়া বা খৈ-মণ্ড, পাণিফলের বা শঠির পালো, দৈএর ঘোল, জলের মিছরি ফুটান জল, ডাবের জল, গরম-দুধে নেবুর রস দিয়া প্রস্তুত করা "ছানার জল", "চা", শুধু পানীয় শীতল বা গরম জল, সোডা-লেমনেড প্রভৃতিই প্রবল ও তরুণ জ্বরে উৎকৃষ্ট পথ্য। প্রবৃদ্ধি হইলে, বাসী বিলাতি "ফুড" গুলিকে খুব পাতলা করিয়া তৈয়ারি করিয়াও দেওয়া যায়। যে রোগীর জ্বর তরুণ ও প্রবল নয়, দুধ পান করিলে যাহার পেট হুড় হুড় করে

—সেটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র বিধায়ে তাহাকেও পর্য্যুদস্ত বা জখম করা বোকামী। দেহের সে যন্ত্র জ্বরের জ্বালায় সহজেই জখম হইয়া আছে, এবং সে যন্ত্রটিরই উপরে শরীরের ক্ষয়িত পদার্থ নিষ্কাশনের প্রধান ভার, অতএব প্রস্রাবকারক ঔষধের দ্বারা "চাবুক মারিয়া" তাহার নিকট হইতে, তদবস্থায়, বেশী কাজ আদায় করার চেয়ে, রোগীকে প্রচুর পরিমাণে শীতল বা উষ্ণ জল, চা, ডাবের জল, বার্লি, মিছিরির জল, সোডা, লেমনেড, ডালিম, বেদানা, প্রভৃতি খাওয়াইয়া প্রস্রাবকে বাড়াইয়া, শরীরের ক্ষয়িত পদার্থকে পাতলা করিয়া বাহির করানর চেষ্টাই সমীচীন। ম্যালেরিয়ায় অথবা শীত করে এমন জ্বরে কম্পের সময়ে গরমজল পান করাইলে শীত ও কম্প কমিয়া যায়। রোগীর যদি শীত বা কম্প না থাকে, এবং গলার ব্যথা না থাকে, তবে যে রোগই হউক না কেন, দিনে রাত্রে শীত গ্রীষ্মে, সকল সময়েই জ্বর রোগীকে শীতল পানীয় দিতে পারা যায়। শীতকালে বা রাত্রে ঠাণ্ডা জল বা ডাবের জল পান করিলে, রোগীর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয় বলিয়া যে ধারণাটি আছে, তাহার মূলে সত্য নাই। শীতল পানীয়— পাইলে রোগীর তৃপ্তি হয় বলিয়া জ্বরে বারংবার বরফ খাইতে নাই। দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে সামান্য বরফ দেওয়া জল এক-আধবার দেওয়া যায়, কিন্তু শীতল পানীয় অপেক্ষা গরম জল বা চা পান করিলে ঘর্ম্মও বাড়ে এবং তৃষ্ণাও কমে। জ্বর রোগীকে একেবারে অনেকটা জল দিতে নাই। জ্বরে গা-বমি করিলে, এক-পেট কুসুম কুসুম গরম জল বা সোডাওয়াটার খাইলে বিবমিষা দূর হয় এবং সমস্ত পেট ধুইয়া "ঝাড়িয়া" বমি হওয়ায় রোগীও সুস্থ বোধ করে।

প্রস্রাব ও মল বাদ দিলে, ঘাম করান বাকী থাকে। ঘাম করাইলে রোগীর জ্বরও কমে, এবং সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অথচ অধিকাংশ জ্বর রোগেই রোগীর ঘর্ম্ম প্রায় হয় না, গাত্র-চর্ম্ম শুষ্ক ও রুক্ষ হয়। সাধারণের বোধ হয় জানা নাই যে, পৌষ মাসেও সুস্থ শরীরে সকলেরই ঘাম হয়—যদিও সে ঘাম আমরা দেখিতে পাই না। এইজন্য দৃশ্যতঃ ঘাম দেখা না যাইলেও, যে "অদৃশ্য ঘাম" হয়, তাহাকেও বাড়ান উচিত। গায়ের ঘামে বাতাস লাগিয়া সে ঘাম উপিয়া যাইলে, তবে শরীর ঠাণ্ডা হয়। অতএব ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে, সেই ঘামকে উপিয়া যাইবার অবসর দেওয়া চাই। ঘাম শুকাইতে যাইয়া যেন ঠাণ্ডা লাগান না হয়, সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

জ্বর রোগীর পক্ষে, এই নিয়মগুলি খাটাইয়া

চলিলে রোগীর যথেষ্ট উপকার হয়। প্রথমতঃ রোগীকে বহু জামা কাপড় জড়াইয়া ঘর দ্বার খুব বন্ধ করিয়া না রাখিয়া, এমন ভাবে জামা কাপড় পরাইয়া রাখা উচিত, যাহাতে তাহার "গায়ের গরম" গায়ে লাগিয়া না থাকে, গা ঠাণ্ডা হইবার অবসর পায়—যাহাতে অদৃশ্য ঘাম সহজে উপিয়া যাইবার অবসর পায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে, অনেকে জামার উপরে জামা জড়াইয়া রাখেন—ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা রোগীর গায়ের উত্তাপ "তাড়াইতে" চান—গায়ের উত্তাপকে গায়ে "জড়াইয়া" রাখার ঠিক উল্টাই করিতে চান। অথচ কথায় ও কাজে এমন উল্টা ভাব ঘরে ঘরে দেখা যায়। রোগীর গাত্রদাহ উপস্থিত, সে বেচারী একটুকু ঠাণ্ডা হাওয়া চায়—আর তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা ঘরদ্বার বন্ধ করিয়া, পাখার হাওয়াটুকু পর্য্যন্ত না দিয়া, রোগীকে ৪।৫দফা জামা কাপড়ে জড়াইয়া রাখেন—যাহাতে রোগীর গায়ের অদৃশ্য ও দৃশ্য ঘাম মৃদু মৃদু উপিয়া যাইতে পারে, সে ব্যবস্থা করাই উচিত। দ্বিতীয়তঃ আবশ্যক হইলে, শীতল জলের সাহায্যে রোগীর দেহের উত্তাপ কমান উচিত। যেখানে জ্বর ১০৫ হইতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, এমন অবস্থায় এবং ১০৬ বা তদূর্দ্ধে জ্বর উঠিলে "আইসপ্যাকিং" করা উচিত। ১০১ হইতে ১০৫ এর মধ্যে জ্বর থাকিলে, "স্পঞ্জ" করানই বিধেয়। এই দুইটী কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা পরে বলিতেছি। সাধারণের মধ্যে ধারণা আছে যে, স্পঞ্জ করান, শুধু জ্বর কমাইবার জন্য। কিন্তু জ্বর কমান ছাড়াও, উহার অপর একটী উদ্দেশ্য আছে; সেটি—রোগীর দেহের আরাম আনার জন্য! "শরীর গরম," "মাথা গরম" বিনিদ্র অবস্থা, প্রভৃতি উপসর্গের শান্তি বিধান করাও স্পঞ্জ করার উদ্দেশ্য।

"আইস প্যাকিং"—একখানি অয়েল ক্লথ পাতিয়া, তাহার উপরে রোগীকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া শোয়াইতে হইবে। ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া, ঘরে আলো জ্বালিয়া লইবে। মাথায় বরফের থলি বসাইয়া দিবে। আবশ্যক হইলে (অর্থাৎ রোগী দুর্ব্বল হইলে) পূর্ব্বেই কএকটা ব্রাণ্ডি সেবন করাইয়া লইবে। বরফ জলে একখানা প্রমাণ বিছানার চাদর নিংড়াইয়া গলা হইতে পা পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা রোগীকে জড়াইয়া দিবে—দেহের উঁচু-নীচু, খাঁজে খাঁজে চাদরখানিকে চাপিয়া বসাইয়া দিবে। ঐ চাদরের উপর একখানা মোটা কম্বল জড়াইয়া দিয়া, দশ পনর মিনিট অন্তর রোগীর জ্বর কত নামিল, তাহা পরীক্ষা করিবে। ১০২ কি ১০৩

ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর নামিলে, তাড়াতাড়ি ভিজা চাদর ও কম্বল খুলিয়া লইয়া, চার পাঁচজনে মিলিয়া শুক্‌না তোয়ালে দিয়া, বেশ করিয়া ধরিয়া সমস্ত গা মুছাইয়া শুকাইয়া দিবে। যদি তেমন জোরে হাওয়া বহিতে না থাকে, তবে আইস-প্যাকিং করিবার সময়ে আদৌ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না।

"স্পঞ্জ করা।"—এই জিনিষগুলি প্রথমেই হাতের কাছে আনিয়া রাখিবে।—থার্ম্মোমিটার, ২।৩ খানা তোয়ালে, গামছা বা নেকড়া; ২।৩ খানা ভিজা গামছা; এক প্রস্থ জামা কাপড়; লেপ কাঁথা; একঘটি গরম জল ও এক ঘটি ঠাণ্ডা জল; টয়লেট ভিনিগার; একটা আলো; বরফ পূর্ণ থলি; ব্রাণ্ডি ১ মাত্রা। সমস্ত যোগাড় হইয়া গেলে সে দিন বাহিরে হাওয়ার জোর থাকুক আর না থাকুক ঘরের জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিবে ও বাতি জ্বালিবে। রোগীর মাথায় বরফের থলি বসাইয়া দিবে এবং এক মাত্রা ব্রাণ্ডিও খাওয়াইয়া দিবে। শীঘ্র শীঘ্র তাহার সমস্ত জামা কাপড় ছাড়াইয়া লইয়া একজন একটা হাত, অপর জন অপর হাত কেহ একটা পা, অপর আর একজন অপর পা—এই রকমে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ভাগ করিয়া লইয়া, অল্প গরম জলে গামছা নিংড়াইয়া ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বারম্বার ঘষিবে—যতক্ষণ না সেগুলি কতক পরিমাণে ঠাণ্ডা হইয়া আসে। বুক, পিঠ, পাঁজর ও পেট অতি অল্প সময়ের জন্য ঘষা উচিত—রোগীর গায়ের উত্তাপ যদি ১০৪ হয় তবে প্রথমে ১০২ ডিগ্রী উত্তাপের জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিতে আরম্ভ করিতে হয় এবং বার বার ঐ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা করা জলে গামছাটিকে এমন ভাবে নিংড়াইতে হয়, যেন তাহা হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়ে না, অথচ রোগীর গা কিছু কিছু ভিজিয়া যায়। এই ভাবে ৫।৭।১০ মিনিট গা মোছার পরে, রোগীর জ্বর কত কমিল তাহা দেখা উচিত। জ্বর ২।৩।৪ ডিগ্রী কমিয়াছে বুঝিলে, সকলে মিলিয়া শুক্‌না তোয়ালে দিয়া তাড়াতাড়ি বেশ করিয়া ঘষিয়া গা শুকাইয়া, গরম করিয়া নিবে; এবং তৎক্ষণাৎ গলা পর্য্যন্ত র‍্যাপার প্রভৃতি দ্বারা ঢাকিয়া ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিবে।

জ্বর হইলেই সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া রোগীর গায়ে জামা জোড়ার বাহুল্য করা ভুল—বরং তাহার উল্টা করিয়াই সুফল পাওয়া যায়। যথাক্রমে যেমন শুধু জল, অডিকলোন মিশ্রিত জল, বরফ জল ও বরফ—শীতল হইতে শীতল-তর; তেমনি জ্বর রোগীকে অল্প হাওয়া খাইতে দেওয়া (অবশ্য আবশ্যকমত জামা জোড়া

পরাইয়া—বেশী বেশী পরাইয়া নয়) স্পঞ্জ করা, ও আইস প্যাকিং করা, সামান্য হইতে গুরুতর শীতলতা আনয়নের উপায়। এই সহজ কথা গুলি স্মরণ যোগ্য।

জ্বরে ষষ্ঠ কর্ত্তব্য—রোগীর দেহ পরিষ্কার রাখিবে। রীতিমত ধোয়ান, চুল আঁচড়ান নখ কাটা, চুল দাড়ি কাটা বা কামান, দাঁত মাজা, হাত-পা পরিষ্কার রাখা চাই। নাপিতের সাবান দিয়া হাত ধুইয়া, কামাইতে প্রত্যবায় নাই। প্রত্যহ শেষ ও কাপড়-চোপড় বদলান উচিত। আমাদের দেশে একটা প্রথা আছে যে, ব্যারামে ধোপার বাড়ী কাপড় দিতে নাই ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই। নাপিত ও ধোপা নানা রকম লোকের বাড়ী নিত্য যাতায়াত করে বলিয়া, ছোঁয়াচে কোনও রোগ হইলে, ঐ নিয়ম পালন করা উচিত। কিন্তু যদি নিজের রোগটি ছোঁয়াচে না হয়, যদি নাপিত বেশ পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরিয়া থাকে, যদি নিজ নিজ ক্ষুর, কাঁচি, সাবান, বুরুষ, নরুণ প্রভৃতি ব্যবহার করা যায় এবং যদি নাপিতকে বেশ করিয়া সাবান দিয়া হাত ধোয়াইয়া লওয়া হয়, তবে ক্ষৌর কর্ম্মে কোনও ন্যায্য বাধা থাকিতে পারে না। ঐ রকমে ছোঁয়াচে ব্যারাম না হইলে, ধোপার বাড়ী কাপড় দিতেও বাধা নাই। এই সংক্রান্ত দুইটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; প্রথমটি এই যে, একটি রোগী হইতে অপর বাড়ীতে ব্যারাম সংক্রামিত যাহাতে না হয়, তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং দ্বিতীয় কথাটি এই যে সুস্থ শরীরে, অনেক সময় ছোঁয়াচে ব্যারাম ঘটিলেও রোগ ধরে না বটে, কিন্তু "জ্বর গায়ে" যে কোনও অপর ব্যারাম সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। এই দুইটি মূল কথা মনে রাখিয়া বাহিরের জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়। স্বাস্থ্য, আষাঢ়, ১৩৩০।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

আর্ট বা সাহিত্য। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ, কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত পূর্ব্বে আমরা ইঁহার অনেক গভীর চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইঁহার চিন্তাশীলতা ও ভাবুকত্বরের পরিচয় পাইয়াছি। ক্ষিতীন্দ্র বাবু এ পুস্তক খানি আধুনিক সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রচার করিয়া যে সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজকাল আর্টের দোহাই দিয়া অনেকেই অবাধে সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। পুস্তক প্রকাশের কোন উদ্দেশ্য নাই তাহাতে সৎশিক্ষা ও সদাচারের

নাম গন্ধ নাই অথচ কুরুচিপূর্ণ কতকগুলি চরিত্রকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া মস্ত একখানি বড় বই করিয়া তিন চারি টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া প্রচার করিতেছেন। অপরিণত বয়স্ক যুবকগণ বাপের পয়সায় তাহা অবাধে ক্রয় করিতেছে। এই সকল পুস্তক যাহার কাছে ভাল করিয়া পড়িতেও লজ্জা বোধ করে! লেখকগণ সমাজের উপদেষ্টা, তাঁহাদের পুস্তকপাঠে কোথায় নরনারীর সৎশিক্ষা লাভ হইবে—চরিত্র-গঠন হইবে—তাহা না হইয়া কেবল চরিত্রহীন বিষয় সকল পাঠ করিয়া—অধঃপাতে যাইতেছে অথচ তাহা "আর্ট" পড়িতেই হইবে। আর্ট বা কৌশলের দ্বারা সমাজের এই অধঃপতনের দিনে ক্ষিতীন্দ্রবাবু এইরূপ গভীর গবেষণাপূর্ণ "আর্ট ও সাহিত্য" প্রচার করিয়া যে কত উপকার করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য দেশের অনেক গ্রন্থ হইতে "আর্টের" বহু উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন—"আর্ট" মানে কেবল কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস প্রচার করিয়া অর্থাগমের পথ সুগম করা নহে। আর্ট বা কৌশলের দ্বারা সমাজের উপকার সাধন করাই—লেখকগণের লেখনীধারণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। "আর্ট ও সাহিত্য" পুস্তকের মূল্য অতি অল্প ১৲ টাকা মাত্র এবং সুলেখক রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সন্ন্যাল বাহাদুরের ভূমিকা সম্বলিত। আমরা সকলকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আদি ব্রহ্মসমাজ যন্ত্রে ৫৫নং অপার চিৎপুর রোডে পাওয়া যায়।

পুরাণতত্ত্ব।—শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। কাশীধাম মহামণ্ডল মুদ্রাযন্ত্র হইতে মুদ্রিত, মূল্য ।৷৹ আনা। গ্রন্থকার একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত। হিন্দুর যাবতীয় পুরাণের কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে তিনি ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করিয়া আমাদের দেশের শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনেক অপণ্ডিতের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরম হিন্দু শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর মহোদয়ের উপহার সমালোচনা সংযুক্ত হইয়া পুস্তকখানি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে। আমরা পুরাণতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তুষানল। বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি.এ. প্রণীত একখানি উপন্যাস, এবং ১১৮নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড সালিখা হাওড়া যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীযুক্ত তারক দাস গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত মূল্য ১৷৹ টাকা। পুস্তকখানির ভাষা সুন্দর, ভাবও উন্নত এবং যথাযোগ্য; পড়িতে খুব আগ্রহ—চরিত্র চিত্রণ বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে; এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বা

মাতৃমন্দির।—একখানি নবপ্রকাশিত মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া ৩৩নং ইকনমিক জুয়েলারী ওয়াকর্স হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার দুই সংখ্যা মাত্র পাইয়াছি, স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে, দুই সংখ্যা পাঠে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে পরিচালন কার্য্য মন্দ হইতেছে না। অনেক সুলেখক এই মন্দির সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। আমরা নবীন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।
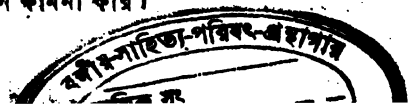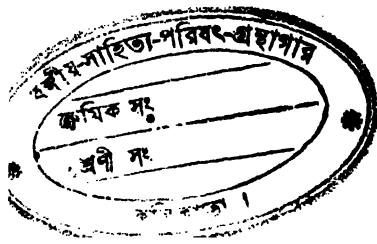
অবিশ্বাস।

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ।)

আমি ত দেখিনা কোন বিশ্বের ঈশ্বর।
শুধু কর্ম্ম, কর্ম্মফল, জড় চরাচর॥
আশা-উৎস হ'তে বিশ্ব উঠে বার বার।
ভাসে ডুবে আশা-স্রোতে সকল সংসার॥
কে করায়, কেবা করে, করে কার লাগি'
দর্শনের জটিলতা আমি নাহি মাগি॥

দেখি বহু বহুবার বহুর বিস্তার।
থাকে যদি এক, সেও সম না থাকার॥
আছে আশা, নাচে আশা, কিবা আছে আর।
সেত অন্ধকার দেশ, আশার ওপার॥
যে গেছে সে দেশে, সেত কভু ফিরে নাই।
যে যাবে, সে যাক্ সেথা মোর কাজ নাই॥

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।)

২৯।

ইন্দু যখন একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল, সংসারের কোন কাজকর্ম্মই আর করিতে পারিল না, তখন তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী এ আপদ-বালাই বিদায় করিয়া বাঁচিলেন। ইন্দুকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার কথা লইয়া বীরেনের সহিত তাহার মাতার অনেক বচসা হইয়া গিয়াছিল। বীরেনের ইচ্ছা ছিল আরও পূর্ব্বে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দ্যায়। এখানে তাহার তেমন সেবা শুশ্রূষাও হইতেছিল না এবং ডাক্তার বদ্যিও দ্যাখান হইতেছিল না।

কিন্তু ইন্দুও প্রথমটা বীরেনের প্রস্তাবে মত দ্যায় নাই। যে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার উঠিবার ক্ষমতা ছিল সে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংসারের কাজ

করিয়া দিয়াছে। যখন একান্তই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল এবং ডাক্তাররা শেষ জবাব দিয়া গেল তখন জননীকে দেখিবার জন্য তাহার মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু তত্রাচ বীরেনকে এ বিষয়ে একদিনও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলে নাই। শেষকালটা বীরেন তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া গেল। আসিবার সময়ে তাহার পায়ের ধুলা লইয়া বীরেন বলিয়াছিল,—"আবার ফিরে এসো বৌদি'। আমাদের ছেড়ে যেন বেশী দিন থেক না।" ইন্দু কোন উত্তর করিতে পারে নাই, শুধু কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়া আসে,—"আস্‌বো বইকি ঠাকুর পো, একটু ভাল হ'লেই ফিরে আসবো।" কিন্তু মৃত্যুর দূত আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছিল।

ইন্দুর অবস্থা দেখিয়া ব্রজবালা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন এবং সুরেশও চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারে নাই। ব্রজবালা ইন্দিরাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এক ছেলের সর্দ্দিকাশি হইয়াছিল বলিয়া আসিতে পারে নাই। আর এক মেয়ে অনেক দূরে থাকিত, সেও আসিতে পারে নাই। ব্রজবালার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া সুরেশ বলিয়াছিল,—"ভাবচেন কেন কাকীমা, আমরা তো আছি। ইন্দুর সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হবে না।"

একদিন সকালে ইন্দুর মাথার কাছে বসিয়া সুরেশ বলিল,—"আজ কেমন আছিস্ ইন্দু।" ইন্দু একটু ম্লান ভাবে হাসিয়া বলিল,—"ওকথা আর বারবার কেন জিগেস্ ক'চ্চ সুরেশদা। আমার চেয়ে তুমি তো ভাল ক'রেই আমার অবস্থাটা বুঝতে পাচ্চ।" সুরেশ কিছু না বলিয়া ইন্দুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দু বলিল,—"মনে পড়ে সুরেশদা, অনেক দিন আগে তোমায় একখানা চিঠিতে লিখেছিলুম যে, যেদিন আমি মহাসংগ্রাম থেকে জয়ী হ'তে পারবো সেই দিনই বুঝবো এখানে আর আমার কোন দরকার নেই এবং সেই দিনই হাসিমুখে আমার একমাত্র পাথেয় আত্মাটীকে নিয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে দাঁড়াব ? মনে আছে সুরেশদা ?"

"ওসব কথা থাক্ না ইন্দু।"

একটু হাসিয়া ইন্দু বলিল,-"সেই দিন আমার এসেচে সুরেশদা। আর আমার এখানে থাকবার কোন দরকার নেই। সব কাজই তো হ'য়ে গ্যাচে। তাই বোধ হয় ডাক প'ড়েচে।"

সুরেশ কোনই উত্তর করিল না। একটু ভাবিয়া ইন্দু আবার বলিল,—"কিন্তু সুরেশদা, এই ষোল বছর বয়সেই কি আমার সব সাধ আহ্লাদ মিটে গ্যাছে? তাতো যায়নি। যতই কেন আমি মৃত্যু কামনা করি না, এখন আমার ম'ত্তে ইচ্ছে ক'চ্চে না সুরেশদা। এখন তো আমার মরার বয়েস হয়নি।" ইন্দুর অজ্ঞাতে সুরেশ কোঁচার খুঁট দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। ইন্দু একই ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল,—"বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সাধ আহ্লাদ, মনের যা কিছু ইচ্ছে সব মরে গ্যাছে সুরেশদা। তাঁর মরবার পর একদিনের জন্ম হাসি কাকে বলে জানিনি, মনের স্ফূর্ত্তি কাকে বলে বুঝিনি। যে কাজের ভার তিনি স্বর্গ থেকে আমার ঘাড়ে দিয়েছিলেন, সেইটীকে শুধু সম্পূর্ণ করবার জন্যেই বুঝি আমি এতদিন বেঁচে ছিলুম। এখন সেটা সম্পূর্ণ হ'য়ে গ্যাছে, তাই বোধ হয় তিনি আমায় তাঁর কোলের কাছে ডেকে নিচ্ছেন।"

চক্ষুদ্বয়ের প্রান্ত দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। "সুরেশদা, শুধু তৈরী ক'ত্তেই বুঝি ভগবান্ আমায় পাঠিয়েছিলেন, ভোগ করবার জন্যে পাঠান নি। ম'ত্তে তো সবাইকে হ'বে সুরেশদা, কিন্তু এত কম বয়সে, এত সকাল সকাল, ম'ত্তে আমার বড্ড দুঃখ হ'চ্চে। তোমাদের আর দেখতে পাব না, আর তোমাদের সঙ্গে এমনি ক'রে কথা কইতে পাবো না, যতই আমার মনে হচ্চে ততই আমার প্রাণের ভেতর কেমন ক'রে উঠছে সুরেশদা। আমার তো এখন কোন সাধ আহ্লাদ মেটেনি, কোন আশা সম্পূর্ণ হয়নি। কোন কাজই তো ক'রে যেতে পাল্লুম না। সময় সময় মনে হয় সব কাজই হ'য়ে গ্যাছে, আবার মনে হয় এখন সবই বাকী, কিছুই হয়নি।"

"কেন অত কথা ভাবচিস্ ইন্দু। একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক না।"

"কিছু বোলো না সুরেশদা। যদি আর বেশীক্ষণ না বাঁচি! সব কথা তো তাহ'লে বলা হবে না। সুরেশদা', আমার যা কিছু সব তোমাদের দিয়ে যাচ্চি। আমি ম'রে গেলেও এমনি ক'রেই তোমাদের ভালবাসবো। আমায় তোমরা ভুলে যাবে না সুরেশদা'? মনে রাখবে? আমায় ভাববে? এমনি ক'রেই আমায় ভালবাসবে? শুধু তৃপ্তি, শুধু শান্তি, শুধু আত্মাটীকে নিয়েই আমি চ'লে যাচ্চি সুরেশদা, আর সবই তোমাদের দিয়ে যাচ্চি। তোমরা শুধু আমায় ভালবেসো, শুধু আমায় ভেবো। আর আমি তোমাদের কাছ থেকে

কিছু চাই না। এইটুকু জান্‌তে পাল্লে আমি আরও সুখে ম'ত্তে পারবো।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু আবার বলিয়া উঠিল, "আর একটা কথা সুরেশদা', অশ্রুকে খুঁজে বার কোরো। পারো তো তাকে সংসারী ক'ত্তে চেষ্টা কোরো। বিয়ের কথা আমি ব'লচি না সুরেশদা। বিয়ে তাকে কেউ কোরবে না আমি জানি। কোন কাজে তাকে ব্রতী ক'রে দিও। আর তুমি তার অভিভাবক হ'য়ে থেক—মনে কোরো সুরেশদা, ইন্দু তোমার মরেনি। সেই তোমার ইন্দু।"

অশ্রুর কথায় সুরেশ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, বলিল, "খুঁজবো বৈকী ইন্দু। তার মায়ের শেষ অনুরোধ তো আমি এখনও ভুলিনি। যতদিন বেঁচে থাকবো তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবো।"

"আর একটা কথা সুরেশদা, সাবিত্রীর ওপোর যথেষ্ট অবিচার ক'রেচ আর ক'রো না। সে বেচারা তোমায় ছাড়া আর কাউকে তো জানে না। তাকে অমন ক'রে দুঃখু দিয়ে কাঁদিয়ে তোমার কি সুখ হয় সুরেশদা'? সে বেচারাকে আর কষ্ট দিও না। যেমন ক'রে অশ্রুকে ভালবেসেচ তেমনি ক'রে ওকেও ভালবেস। তোমার মুখে হাসি দেখলে, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইলে, ও কত আমোদ পায়, কত ওর আনন্দ হয় তা জান সুরেশদা? কেন ওকে তা থেকে বঞ্চিত কচ্চ? ওর অধিকার থেকে ওকে সরিয়ে দিচ্চ কেন?"

"ওকে তো আমি কখন কোন কষ্ট দিইনি ইন্দু। যখন যা দরকার হয়েচে তাই এনে দিয়েচি, যা চেয়েচে তাই দিয়েচি।"

একটু যেন রাগিয়াই ইন্দু বলিল, "খাওয়া পরার কষ্ট আমি বলিনি সুরেশদা। ওতে আমাদের কিছুই এসে যায় না। কখন কি প্রাণ দিয়ে তাকে ভালবাসতে পেরেচ সুরেশদা? সত্যি ক'রে বলদিকি। তুমি হয়তো ব'লবে চেষ্টার কোন ত্রুটি করনি, কিন্তু পেরে ওঠোনি। তাতে তো ওর মন বুঝবে না। ও যে সম্পূর্ণ ভাবেই তোমাকে চায়। তাই যদি তুমি তাকে না দিতে পারবে, ভাল যদি তাকে না বাসতে পারবে তাহ'লে কেন তাকে বিয়ে ক'রেছিলে সুরেশদা? কেন তার সমস্ত জীবনটা নষ্ট ক'রে দিলে?"

সুরেশ কি একটা বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সাবিত্রী আসিতেই চুপ করিয়া গেল। একটু পরে বলিল "তুমি একটু ইন্দুর কাছে ব'স। আমি বীরেনকে ডেকে নিয়ে আসি।"

"থাক্ সুরেশদা। ঠাকুরপো কাল ব'লে

গ্যাছে শরীরটা তেমন ভাল নেই। এতদূর এসে অসুখ যদি আবার বেড়ে যায়। তোমার গিয়ে কাজ নেই।" সুরেশ কোন কথাই শুনিল না, চলিয়া গেল।

সাবিত্রী বলিল, "বেদানার রস ক'রে দেব, খাবে ঠাকুর্ঝী?"

"না ভাই, এখন থাক্। আমার কাছে এসে একটু ব'স্ সাবিত্রী। বুকের ভেতরটা বড্ড কেমন ক'চ্চে।"

ইন্দুর একটী হাত নিজের কোলের উপর রাখিয়া তাহার বুকের উপর হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সাবিত্রী বলিল, "ওষুধ খেয়েচ?"

"হ্যাঁ, সুরেশদা খাইয়ে দিয়েচেন।"

কিছুক্ষণ সাবিত্রীর দিকে নিস্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া ইন্দু বলিল, "তুই নাকি ব'লেচিস্ অশ্রু ফিরে এলে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসবি? পারবি সাবিত্রী।"

"তুমিই বলনা ঠাকুর্ঝি, পারা কি আমার উচিৎ না?"

"পাল্লেই ভালো।"

ইন্দু আর কিছু বলিল না। খানিক্ষণ পরে সাবিত্রীর হাতটী নিজের বুকের ওপোর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সুরেশদার ওপোর রাগ ক'রিস্নি, অভিমান ক'রিস্নি সাবিত্রী। তুই ছাড়া এখন আর তাঁকে দ্যাখবার কেউ নেই যেন মনে থাকে। তাঁর মনে এখন যে ঝড় উঠেচে, যে দ্বন্দ্ব চলেচে, খালি তুইই সেগুলোকে থামাতে পারবি সাবিত্রী, আর কেউ পারবে না। সুরেশদা' এখন সম্পূর্ণ তোরই ওপোর নির্ভর ক'চ্চেন।"

"শুধু এইটুকু বল ঠাকুর্ঝী যেন তাই পারি।"

"শুধু দিয়ে যাস্ সাবিত্রী, পাবার কিছু আশা করিস্নি। সবই তো দিয়েচিস্, আরও যদি কিছু থাকে তাও দিস্। দেখবি মনে কত শান্তি পাবি, কত তৃপ্তি পাবি। তখন আপনা থেকেই চোখের জল শুকিয়ে যাবে। আমরা কিছু নিতে আসিনি সাবিত্রী, শুধু দিতে এসেচি।"

সাবিত্রী আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল কখনই কাঁদিবে না, কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্বেও প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী বলিল, "তোমার দাদাকে ব'লো ঠাকুর্ঝি, আমার জন্যে যেন তিনি অত না ভাবেন, যেন নিজের দিকে একটু ফিরে দ্যাখেন। তুমি তো দেখচ ঠাকুর্ঝি, কি ছিলেন আর কি হ'য়ে গ্যাচেন। আমার জন্যে অত ভাবেন কেন? আমি তো কোনদিন কোন কথা বলিনি।"

"সবই দেখচি সাবিত্রী। তোর জন্যে যে বড্ড ভাবেন তাও দেখচি। কিন্তু ওর আর

কোন উপায় নেই। ভাবতে তাঁকে হবেই।"

এমন সময়ে অশ্রু আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ইন্দুর পায়ে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল "আমায় চিন্তে পারিস্ ইন্দু?"

ইন্দু প্রথমটা যেন কেমন হইয়া গেল। ঠিক বুঝিতে পারিল না স্বপ্নে অশ্রুকে দেখিতেছে না সত্য দেখিতেছে। অশ্রু আবার বলিল, "চিন্তে পারিস্ না ইন্দু?" ইন্দু নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "অশ্রু! তুই কবে এলি? এতদিন কোথায় ছিলি? আমার মরবার সময়ে বুঝি আমায় মনে প'ড়ল?

একটু গম্ভীর হইয়া অশ্রু বলিল "মনটা বড্ড কেমন করে উঠেছিল ব'লে তোদের দেখতে এলুম। আমায় ছেড়ে তুই কোথায় যাবি ইন্দু?"

"আমার ডাক প'ড়েছে অশ্রু, আমায় যেতেই হবে। আর যেন তুই কোথাও যাস্নি। সুরেশদা তোর কত খোঁজ ক'রেছেন, কত দেশ বিদেশে নিজে গ্যাছেন। আর তাঁকে ছেড়ে যাস্নি অশ্রু। আর সন্ন্যাসিনীর মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াস্ নি।"

এতক্ষন সাবিত্রীর কথা ইন্দুর কিছুই মনে ছিল না। অনেক দিনের পর অশ্রুর সহিত দ্যাখা হওয়ায় তাহারই সহিত কথা কহিতেছিল। সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই।

হঠাৎ সাবিত্রীর কথা মনে হওয়ায় "অশ্রুকে প্রণাম কর বৌদি" বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল— সে নাই, বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

মহাপুরুষের দিনলিপি।

(কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন—ভিষগ্ভূষণ)

(১)

সাধন-সিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি। তাঁহার কথাগুলি অনেকে বেদ-বাক্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকেন। "বেদ-বাণী" যাঁহার বিবেক-বাণী, সেই মহাপুরুষকে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব বেদ-বিভাগকর্ত্তা বেদব্যাসেরই অবতার বা অনুরূপ বলিয়া মনে করিবে অথবা শুক-শনকাদির পবিত্র আসনে বসাইয়া প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? তিনি মহাপুরুষ—তিনি সত্যের চির

উপাসক এবং সেই পরম সত্য শ্রীভগবানের একনিষ্ঠ সেবক—জগদম্বার প্রতি পূর্ণনির্ভরশীল।

সে অনেক দিনের কথা। তখন তিনি সন্ন্যাসী নহেন—সাধন-সিদ্ধ মহাপুরুষ নহেন। তখন তিনি অধ্যয়নশীল কিশোর-যুবক। কিন্তু সে নবীন বয়সেই তাঁহার কর্ণে সাগরের ডাক পঁহুছিয়াছে—শ্যামসুন্দরের অমিয়-মধুর বংশীরব "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশি" তাঁহার প্রাণ আকুল করিয়াছে—প্রেমের ঝড় বহিয়াছে!

যিনি যে বিষয়ে বড় হইবেন—যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন, বাল্যে বা কৈশোর-যৌবনেই তাহার শুভ সূচনা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এ মহাপুরুষের ও কৈশোর-যৌবনের সন্ধি স্থলে বিদ্যালয়ে বিদ্যা অধ্যয়ন কালেই ধর্ম্মানুসন্ধিৎসার বিশেষ পরিচয় পওয়া গিয়াছিল। তিনি বিদ্যালয়ে জ্ঞান-চর্চ্চার সহিত ধর্ম্মানুশীলন—সাধু-সজ্জন সহ সম্মেলন এবং মহাপুরুষদের পুণ্য পবিত্রতাময় জীবনী আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে বড় ভালবাসিতেন এবং সে অনুসন্ধান-আলোচনার ফল তিনি তাঁহার দিনলিপিতে যথারীতি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।

তিনি এখন সন্ন্যাসী। তাঁহার সে সব পরিত্যক্ত দিনলিপি এখন বাজে কাগজের ন্যায় আমাদের মত পাঁচ জন বাজে লোকের হস্তগত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমার জনৈক স্নেহভাজন বালক তাহার একখণ্ড কুড়াইয়া পাওয়ায় উহা আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়। আমি শুষ্ক কাষ্ঠ; সোণা হওয়ার আশা এবার আর আমার নাই। তাই উহা জনসমাজে ছড়াইয়া দিতেছি। আশা, এ 'পরশ পাতর' স্পর্শে যদি একটি পাষাণ-কঠিনপ্রাণ লৌহমূর্ত্তি মানব ও সোণার মানুষে পরিণত হইতে পারে।

(পাগল)।

"সে ছিল পাগল। তাকে একদিন কত বোঝালাম যে, যখন তুমি একটা পেট নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফেরো, তখন তোমাকে কিছু না কিছু কাজ কর্ত্তে হবেই। রোজ রোজ কে খেতে দেবে? তখন সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে একবার আমার মুখের পানে চাইতো এবং শেষে একবার উর্দ্ধদিকে তাকাত। এইভাবে কয়েক মাস তাকে দেখেছি, একবেলাও নাকি সে অনাহারে থাকে নাই। তবে মাঝে মাঝে অজস্র গালি খেতে হতো। তখনকার দিনে আমার বই পড়ার একটা রোক ছিল। বাছা বাছা বইগুলি পড়তে সুরু কল্লাম। একদিন খুব বর্ষা হচ্ছে, ওব্যাটা

দেখি ভিজিতে ভিজিতে বারান্দায় আমার কাছে দাঁড়াল, বুঝেছিলাম যে, আজ আর কোথাও খাবার জোটে নাই। মুখে কিন্তু কিছু বলে না, একটু একটু হাসে। যেন আমার পড়া ও সমস্তই বুঝে নিচ্ছে। একটা জায়গা পড়ছি। "মানুষ জন্ম কি? উহা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর পক্ষে মুক্তির আস্বাদন—ক্ষুদ্র সরিৎ অতিক্রম করিয়া মহাসমুদ্রে পতন—দৈহিক সুখের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক আনন্দে পৌঁছিবার শক্তি লাভ, উহা প্রণব উচ্চারণের অধিকার প্রাপ্তির শুভকাল, অনন্ত বিমানের ন্যায় ব্রহ্মানন্দের অপরিমেয় ক্ষেত্র মানুষেরও সম্মুখে পড়িয়া আছে। যে ক্ষুদ্র সুখ লইয়া রহিল—সে তাহার দাবী দাওয়া ছাড়িয়া দিল।" বৃষ্টি একটু থেমেছে, লোকটা এদিন না খেয়েই চলে গেল। আমিও একটু ঘুমিয়ে ছিলুম, সেদিন ওকে খাওয়াবার হুঁস্ ছিল না। শেষটা একটু দুঃখ হয়েছিল। পরদিন দেখি ভোরবেলা এসে হাজির। চোক্ দু'টা লাল যেন করমচা! জ্রুটা ফুলে উঠেছে এবং ঈষৎ রক্তাভ। ভাবলুম, বোধহয় ব্যাটার চোখ উঠেছে, ও কিন্তু এসে আমার ঘরের দেওয়ালের ছবিগুলো দেখতে লাগল। যে ছবিখানাতে ধরপাকে তুলবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন এ ভাবটা আঁকা ছিল ও সেখানার কাছে থমকিয়া দাঁড়ালো এবং নজর করে দেখতে লাগলো। শুনেছি পাড়ার কারু সঙ্গে ও কথা কইতো না এবং তারা যে কেবল তারে পাগল বলত তা নয়, বোবাও বলত। আমি কিন্তু বোবা বলতে পারতুম না। পাঁচ সাত দিন অন্তর অন্তর আমার কাছে খেতে চাইত—বলতো 'আজ নিরামিষ ইচ্ছা হয়েছে, তাই এখানে।' ওযে আমার সাথে দুই একটা কথা চালায়, এ কাউকে জান্‌তে দিই নি। কিছুক্ষণ পরে একটু জল হাতে করে এসে ছবিখানা তুললো, বগলে করে নিয়ে গেল। আমার অনুমতি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কল্লো না। ভাবলুম, আস্পর্দ্ধা পেয়েছে। আবার পড়াশুনায় মেতে রইলুম, ওর কথা ভাববার আর অবসর পাই নি।

গভীর রাত, ঘুম ভেঙ্গে গেছে, উঠে বসেছি। ভিতর এখনও তো শান্ত হয়নি, দেব-দানবের যুদ্ধ অবিরত চলেছে। অন্তরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে মনে হলো। ভাবলুম ঠাণ্ডায় একটু বেইরে পড়ি; বোধহয় সুস্থ হ'তে পারবো। রাস্তায় বেইরেছি, দেখি ঐ অত রাত্রে পাগলা রাস্তায় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে! আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরেছে, বলছে—"শোন—শোন—শোন, ঐ যে সেদিন তুমি বইতে পড়ছিলে আমি আড়াল

থেকে শুনেছিলুম—যে পাঞ্চজন্য শঙ্খের রব শুনতে পাওয়া যায়—তা একেবারে ঠিক। আমি আজ দু'দিন যাবৎ শুনতে পাচ্ছি। সে রব শুনতে হ'লে আনমনা হতে হয় না এবং ঘুমুতে পারে না।" এই বলে আমাকে ছেড়ে রাত্রির অন্ধকারে আবার লুকিয়ে গেল। আমি বেশী কিছু ভাবতে সময় পাইনি, তবে সমস্ত শরীরটা যেন হালকা বোধ হচ্ছে।

দুই তিন দিন যাবৎ শরীরটা একটু সুস্থবোধ করছি, তাই কাজকর্ম্ম বেশ চল্‌ছে। আমাদের দুধওয়ালা এসে খবর দিলে যে ঐ হাটখোলার কাছে পাগলা বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। শুনলুম কলেরা হয়েছে। খোঁজ করে জানলুম, এক মুসলমানের বাড়ীতে আগের রাত্রে খুব মাংস, পোলাও খেয়েছে এবং পাঁচছয় দিনে কিছু খেয়েছিল না। যখন কাছে গেলুম, একটু হুঁস হয়েছে, আমার পানে তাকিয়ে বল্লে, "পিঞ্জরাবদ্ধ, পক্ষীর পক্ষের আমিষ নিরামিষের স্বাদ নিয়ে কি হবে?—যদি সে আস্বাদ—ভগবৎপ্রেমামৃতের স্বাদ নিতে না পায়। আস্বাদ পেয়েছিনু দাদা", এই বলে একেবারে চুপ কল্লো।

আমি একবার বুকে হাত দিলুম, দেখি ছবিখানাকে চেপে রেখেছিল, টেনে বের করে নিয়ে এলুম।

(ভণ্ড)

"এই সহরেই ছিল তার বাস। আগে এক মুসলমান জমিদারের এষ্টেটে মোক্তারী করতো, শেষে ছেড়ে দিয়েছিল। লোকে জানত ভণ্ড। পোষাকটা ছিল আধপাগলা গোছের। কিন্তু যখন মোক্তারী চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান করে বেড়াতো, তখন তাঁহার যে কোন ভয় ভাবনা ছিল, দেখলে তা মনেই হতো না। সে জাতিতে বোধ হয় কায়স্থ হবে। একটা গানের দুটো পদ কণ্ঠস্থ করে গর্দ্দভ-বিনিন্দিত স্বরে শেষ রাত্রে পাড়াটাকে জাগিয়ে তুলতো। লাইন দুটো আজও বেশ মনে আছে ঃ—

"মেরা গিরিধারী গোপাল দোশরা নো কই ;
সাধু সঙ্গে বইঠি বইঠি লোকলাজ খই।"

বাস্তবিক সে লোক-লজ্জা একেবারে চুলোয় দিয়েছিল। চাকরী ছেড়ে দিল পরে ছেলেমেয়ে যখন অনাহারে কষ্ট পেতে লাগলো, তখন আমরা তাঁকে ধরে একদিন যা ইচ্ছা তাই বলে গালি দিলাম। সে ভ্রুক্ষেপও কল্লে না!

সেই সেবার তখন আমরা স্কুলে পড়ি। বোর্ডিংএর উড়িয়া পাচকের দেহে বসন্তের চিহ্ন ফুটে বেরুল। সহরময় তোলপাড়! কি করা যায়?—একে কোথায় রাখা যায়? আশপাশের

গ্রাম্য ছেলেরা যে যার পালিয়ে গেল। বড় একটা হৈ চৈ বেধে গেল আর কি। সেই সময় দেখা গেল এই ভণ্ডের বীরত্ব! আজ আর ভণ্ড বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না। আজ দেবতা জ্ঞানে তাঁকে প্রণাম দিচ্ছি। একা ঘাড়ে বসন্তের রোগী কাশীপুরের রাস্তায় নিয়ে গেল, কাহারও বিশেষ সাহায্য পেল না—চাইলে না। দু' একটি মুসলমানের সাহায্যে মাঠে একখানা ঘর তৈরী হলো। চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই সমস্ত শরীরে ঘা হ'য়ে গেল। একয়দিন তাঁর খাওয়া দাওয়ার দিকে ঝোঁক ছিল না। রোগীর পাশে বসে গুটী ভেঙ্গে দিতেন, পথ্য খাওয়াতেন এবং ওকে অভয় দিতেন। জেলার বিধাতা রাষ্ট্র করে দিলেন, ঢাকের বাদ্যে যে "কাশীপুরের রাস্তায় কেউ যেতে পার্‌বে না।" যুবকবৃন্দ যাদের ভিতরটা একটু নাড়াচাড়া দিয়েছিল, তারাও আইনের ভয়ে সঙ্কুচিত হলো।

এক পক্ষের অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায় পাচক ঠাকুর এরোগ হতে মুক্ত হলো বটে, কিন্তু পুনরায় কলেরায় মারা পড়লো।" "রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?—মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?"

তখন ঐ যে ভণ্ডের পোষাকের নীচে দেবত্ব ঢাকা ছিল সহরের হৃদয়বান্ ব্যক্তিরা টের পেলেন। একদিন এক রাত্রিতে শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তি আমাকে ডেকে পাঠালেন, বল্লেন,—"শোন এই মোক্তার বাবুর একটু পরিচয়।" সেখানে মোক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন,—"হঠাৎ একরাত্রে এই শ্মশানে আমার গুরুদেবের সহিত দেখা। গুরু বল্লেন—"দেখ, মিথ্যা কথা বল্‌বিনে এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করবি, তাহলেই তোর হবে" এই বলে চলে গেলেন। পর দিন আদালতে চল্লাম, সে দিনই আমার এক মিথ্যা মামলা। আমি সাক্ষ্য না দিলে মামলা ফাঁস হয়ে যায়। জমিদার একটু অপ্রস্তুত হইবেন। কি করি, সাক্ষীর বক্সে চড়িয়া হলপ পড়িতে গেলাম, আশ্চর্য্য হলাম, হলপের কাগজ খানায় আগের রাত্রির গুরুদেবের কথা কয়টা সাজান রয়েছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম না। হৃদয়ে বল পেলাম কে যেন কতখানি শক্তি হৃদয়ে ঢুকিয়ে দিল। পূর্ব্বে অনেক মাতলামি করেছি বটে, সে সব নেশার ঝোঁক ও যেন সেদিন চলে গেল; আমি রেহাই পেলাম। আর চাকুরীতে যাইনি।"

মহাপুরুষের ডায়েরিতে এরূপ অনেকগুলি সত্যঘটনামূলক ক্ষুদ্র গল্প আছে; আলোচনার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকট ভাল লাগিলে, ক্রমশঃ সে সবগুলি কাহিনীই তাঁহাদিগকে উপহার দিতে যত্ন করিব।

রায় বাহাদুর।

(১)

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুটিয়াল সাহেব তাহাদের পুরাতন কুটির ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করিবার মানসে ত্রিবেণীতে আসিয়াছেন। ঘাটে তাঁহার বজরা বাঁধা আছে।

কুটির ভগ্ন অট্টালিকা এখন পূর্ব্বের সৌষ্ঠব বিসর্জ্জন দিয়া গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসের সমাধিরূপে বিরাজ করিতেছে। বহুকাল পরে কুটির কর্ত্তৃপক্ষরা ত্রিবেণীতে পুনর্ব্বার কুটি স্থাপন করিবার জন্য এই সাহেবকে তাঁহাদের পুরাণ কুটির স্থাননির্দ্দেশ করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। সাহেব কুটি দেখিতে আসিয়া আপনার ব্যাধপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে দু'দশটা পাখী শিকার করিয়া বনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, সঙ্গে একজন শিকার-বালক মৃত পাখীগুলি লইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে জনৈক গ্রামবাসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, তুমি কি একটা বাদুড় মারিয়াছ?" সাহেব কিছু বুঝিতে না পারায় বিরক্তভাবে শিকার-বালকের দিকে চাহিলেন। শিকার-বালক লোকটির কথা বুঝিতে পারিয়া জানাইল, "হাঁ"। সাহেব লোকটার প্রতি সরোষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিলেন। আগন্তুক নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে করজোড়ে বলিল, "দোহাই সাহেব! বাদুড়টি আমাদের ফিরে দাও!"

সাহেব তাহার গতিক দেখিয়া দাঁড়াইলেন, একবার শিকার-বালকের দিকে চাহিলেন। সে হিন্দি ভাষায় সাহেবকে বুঝাইয়া দিল যে, উহারা বাদুড়টি চায়। সাহেব হিন্দি বুঝিতেন, এবং একটু একটু বাংলাও বলিতেন। তিনি বলিলেন, "কেন টুমি বাহাদুর চাহিতেছ?" লোকটি সেই ভাব নিবেদন করিল, "সে অনেক কথা। পূর্ব্বে ঐ বাদুড় আপনাদের অনেক উপকার করিয়াছে। শুনিতে চান্ তো বলি।"

এই আজগুবি কথা শুনিয়া সাহেব কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গ্রাম্য ফুলটাকে লইয়া একটু রঙ্গ করিবার নিমিত্ত ইঙ্গিতে জানাইলেন, বজরায় চল, সব শুনিব। কুটিয়াল সাহেবের আদেশ অমান্য করিতে সাহসী না হইয়া ও বাদুড়

পাইবার আশায় লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

(২)

মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া সাহেব একটা আরাম কেদারায় অঙ্গ হেলাইয়া চুরাট ফুকিতেছেন, গ্রাম্য লোকটি একটা মোড়ার উপর বসিয়া বাদুড়ের উপখ্যান বলিতেছে :—

ঘনশ্যাম রায় একজন ধনবান্ ব্যক্তি। এই স্থানেই তাঁহার বাস ছিল। তিনি প্রচুর অর্থের মালিক ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সদ্ব্যয় বড় বিশেষ কিছু ছিল না। হঠাৎ একদিন আপনাদের এক কুটিয়াল সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাহেব লম্বা সেলাম ঠুকিয়া ও গায়ে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে এমনি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন যে, রায় মহাশয় সাহেবকে কুটি করিবার জন্য অনেকটা জমি ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে ছাগল, গরু প্রভৃতি পশুহাড় সংগৃহিত হইয়া সেই কুটিতে পেষাই হইতে লাগিল। একে তো হিন্দু পল্লীতে গোহাড় পেষাই পাপ-জনক, তাহার উপর কুটির লোকের অত্যাচারে গ্রাম উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। কুটি উঠাইয়া দিবার জন্য সকলেই রায় মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কতকটা অনিচ্ছায়, কতকটা সাহসের অভাবে তাহাতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং গ্রামের লোক অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। সকলে পরামর্শ করিয়া কুটি লুট করাইতে মনন করিল।

তখনকার লোকে কুটির সাহেবদের বাঘের মত ভয় করিত। প্রকাশ্যতঃ তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে সাহস করিল না। তাই ডাকাতের সাহায্যে কুটির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইল। গ্রামের লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত দস্যুদলপতি শঙ্কর তাহার সমস্ত দল বল লইয়া হঠাৎ একদিন রাত্রিতে সিংহ বিক্রমে কুটির উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহাদের মশাল মালার উজ্জ্বল আলোকে ও ভীষণ চীৎকার ধ্বনিতে কুটির সমস্ত লোক জাগিয়া উঠিল; কিন্তু, এরূপ আশাতীত বিপদপাতের জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না বলিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় প্রাণ ভয়ে যথেচ্ছ দিকে পলায়ন করিল। বিনা বাধায় শঙ্কর কুটি লুট করিয়া, তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। যে সমস্ত পলাতক তাহাদের সম্মুখে পড়িয়াছিল তাহাদের সকলেরই মৃতদেহ পরদিন গঙ্গার জলে ভাসিতে দেখা গিয়াছিল।

এরূপ বিপদপাতে সাহেব বুদ্ধি করিয়া সর্ব্ব প্রথমেই পলাইলেন। এক দৌড়ে ঘনশ্যাম রায়ের বাটী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কুটির

বিপদ জানাইলেন। ঘনশ্যাম দস্যু শঙ্করের প্রতাপ জানিতেন। কাজেই তিনি বলিলেন, অর্থ সাহায্য করা ছাড়া এ ব্যপারে তাঁহার আর কোন ক্ষমতা নাই। রায় মহাশয় গোলমাল না করিয়া সাহেবকে চোরা কুটারির ভিতর লুকাইয়া রাখিলেন। ডাকাতের দল চলিয়া গেল। সাহেব বাহির হইয়া কুটিতে আসিয়া দেখেন, কুটিতে কেহ নাই, কেবল গোটাকতক কুটির মজুরের মৃতদেহ রক্তস্রোতের উপর ভাসিতেছে; আর কুটি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রকাণ্ড চিতার ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। সাহেবের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল; কিন্তু সে রক্তচক্ষুর রোষদীপ্তি নিরীহ পল্লীবাসীকে দগ্ধ করে, বলবানের পদলেহন করে মাত্র।

কুটির যে সকল লোক ডাকাতের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, পরদিন তাহারা কুটিতে উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিবামাত্র সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। সে নিমক-হারাম বেয়াদবগুলা কুটি রক্ষা না করিয়া পলায়ন করিয়াছিল কেন? এই অপরাধে বেচারারা রক্তমুখের সুমিষ্ট স্নেহ-সম্ভাষণ এবং ইরাজি বুটের কোমল ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে পুনরায় কুটির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; নচেৎ তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। সাহেব উপরওয়ালা কর্ত্তাদের নিকট রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, কুটির মজুরদের সহিত যোগাযোগ করিয়া ডাকাতে কুটি লুট করিয়াছে, কুটিতে অগ্নি লাগাইয়া পলাইয়াছে।

কুটির সর্ব্বস্ব দস্যুলুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হইল। এখন ঘনশ্যামবাবুর সাহায্য ব্যতীত কুটি উঠিয়া যায়। সাহেব যাইয়া রায় মহাশয়ের দ্বারস্থ হইলেন। সাহেব রায় মহাশয়কে ভাল রকম বুঝিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অর্থ শুষিবার আদায়ের মন্ত্র জানিতেন,—এখন তাহা বিধিমতে প্রয়োগ করিলেন। লম্বা লম্বা সেলাম, ভূয়সী প্রশংসাবাদ এবং সাহেবের স্বভাবাতীত নম্র ব্যবহারে রায় মহাশয় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ কর্জ্জ দিলেন। কুটি আবার চলিতে লাগিল। তবে, যতদূর জানা গিয়াছে, রায় বংশের কেহই আর সে অর্থ ফিরিয়া পায় নাই।

ঘনশ্যাম রায়ের অর্থে কুটি পুনঃ স্থাপিত হইল। সাহেব রায় মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে বড় বড় ভেট পাঠাইতে লাগিলেন। রায়মহাশয়ও আপনাকে সম্মানের উচ্চতর শীর্ষে স্থাপন করিতে লাগিলেন; যেহেতু খাস বিলাতী গৌরাঙ্গ তাঁহার সম্মান করিতেছেন! এদিকে গ্রামের মধ্যে এক গুজোব উঠিল, কুটির লোক মাঠ

হইতে গ্রামবাসীদের গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি ধরিয়া লইয়া যায় এবং মারিয়া তাহাদের হাড় পেষাই করে, মাংস আহারের কার্য্যে লাগে। শুধু কথায় নহে, সত্যসত্যই তাহারা দেখিল যে, যে সমস্ত পশু চরিতে যায়, প্রায়ই তাহাদের সকলগুলি ফিরিয়া আসে না। ধর্ম্ম যায়—গ্রামের লোক একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। এবার তাহাদের আক্রোশ কেবল সাহেবের উপর নহে, ঘনশ্যামের উপরেই বেশী। উনিই তো এই আপদ ঘটাইয়াছেন। গ্রামের সকলেই এবার পরামর্শ করিল যে, আগে ঘরের শত্রু রায়-কুম্ভীরকে বিনাশ করিতে হইবে, নচেৎ কুটি উঠান যাইবে না। কিন্তু, গুপ্তভাবে এ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। দস্যু শঙ্কর অগ্রসর হইয়া বলিল,—"ভয় কি দাদাঠাকুর! সে ভার আমার ওপর।"

(৩)

তখন রাত্রি বারটা বাজিয়াছে কি বাজিয়া গেছে। অমাবস্যার ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার গ্রামখানির মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে;—কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। গাছপালা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন একটা দৈব দুর্ব্বিপাকের আশঙ্কা করিতেছে, মনে হয়, প্রকৃতি যেন ইচ্ছা করিয়াই সেদিন এই মহানিস্তব্ধতা ধারণ করিয়াছিল। পশ্চিম দিক হইতে একখানি প্রকাণ্ড কাল মেঘ রজনীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া ধীরে ধীরে নক্ষত্রগুলিকে গ্রাস করিতেছিল। কুটিও নিস্তব্ধ কেবল গঙ্গার উচ্ছল শব্দ প্রকৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাণ্ডব ঝটিকা শোঁ শোঁ শব্দে এক লহমায় গ্রামটিকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। ত্রিবেণীর জল নৃত্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে অদূরে গঙ্গার জলে একটী ছোট আলো দেখা গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল আরোহী ভিতর হইতে বলিতেছেন,—"মাঝি, এখানেই ভিড়াও—এইখানেই ভিড়াও, আমি এখানেই নামিয়া যাই। এইখান হইতে হাঁটিয়া বাটী যাইব।" তাহাই হইল। মাঝি নৌকা বাঁধিল। একজন শ্যামবর্ণের স্থূলকায় ব্যক্তি ক্যামবিসের ব্যাগ হাতে করিয়া নৌকা হইতে বাহির হইয়া আসিল। টলিতে টলিতে, পড়িতে পড়িতে, গড়াইতে গড়াইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাপড় সামলাইতে সামলাইতে কোন রকমে তীর বহিয়া ভদ্রলোক উঠিয়া আসিলেন; ইনিই আমাদের ঘনশ্যাম রায়। কিছুদিন হইল, তিনি কোন কুটুম্বের বাটী গিয়াছিলেন,- এই দিন বাটী ফিরিতেছিলেন।

এইখান হইতে গ্রামে প্রবেশ করিবার পথে একটা ঘন বন আছে। রায় মহাশয় সেই বনের নিকট আসিবামাত্র একটা লোক তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকারে তাহাকে চেনা গেল না। রায় মহাশয় ভয় পাইলেন, কারণ তাহার সঙ্গে টাকা ছিল; আর এই দুর্য্যোগময়ী রাত্রিতে জঙ্গলের কাছে থাকাও যুক্তি সঙ্গত নহে। তিনি দ্রুত চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে রায় মহাশয় 'বাপ্‌রে' বলিয়া পড়িয়া গেলেন। মস্তক হইতে তীব্রবেগে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"সাহেব!!" গভীর রজনীর উন্মত্ত দুর্য্যোগ উত্তর করিল—শোঁ—শোঁ—শোঁ। তাঁহার দ্বিতীয় কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে আর এক ঘা লাঠি তাঁহার কপালের উপর পড়িল। ফোয়ারার ন্যায় শোণিত-নিস্রাব হইতে লাগিল। ঘনশ্যামের নাতি দীর্ঘ স্থুল শরীরটা ছেদিত ছাগের ন্যায় অব্যক্ত যন্ত্রণায় একবার ছট্‌ফট্‌ করিয়া স্থির ধীর হইয়া গেল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কড়্‌কড়্‌ শব্দে একটা ক্রুদ্ধ বজ্র কুটিকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়া গেল।

সেই রাত্রিতে পুনর্ব্বার কুটিতে ডাকাত পড়ে। কিন্তু দস্যুরা সাহেবকে ধরিতে পারে নাই।

পরদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। হেটরা প্রত্যুষে হাটে যাইতে যাইতে বনের নিকট রায় কর্ত্তার মৃতদেহ দেখিয়া সত্বর রায়েদের বাটীতে সংবাদ দিল। এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব শোক সংবাদে বাটীস্থ সকলেই শোক সাগরে নিমগ্ন হইল। হঠাৎ শান্ত রায়েদের বাটীতে ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া প্রতিবেশীগণ ছুটিয়া আসিল। সকলে তাহাদের সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্র পুত্রবধূ সকল আসিয়া পিতার উপরত ক্রিয়া সমাপন করিল। সেই দিন হইতে ঘনশ্যাম রায়ের সহিত কুটিও ত্রিবেণী হইতে চিরবিদায় লইল, এবং রায় পরিবারও শ্রীহীন হইতে লাগিল।

(৪)

সে সকল দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন সে বর্দ্ধিষ্ণু রায় বংশের একজনও উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান নাই। সে বিশাল অট্টালিকার বৃক্ষ সমাকুল ভগ্ন স্তূপ কেবল একটা উপকথা জাগাইয়া রাখিয়াছে। কুটির অবস্থাও তদ্রূপ। এক্ষণে ঐ গহন অরণ্যই ঐ দুইটি পুরাকীর্ত্তির স্মৃতি-সমাধিকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছে। পেচক, চামচিকা, আশুলা প্রভৃতি এখন উক্ত রায়েদের বাটীতে নির্ভয়ে বাস করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে একটী অর্দ্ধভগ্ন ঘরের কোণে এই বাদুড়টি

বহু কাল হইতে বাস করিয়া আসিতে ছিল।

ঘনশ্যামরায়ের এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় —আমার পিতামহ,—একদিন স্বপ্ন দেখেন, যেন বৃদ্ধ ঘনশ্যাম তাঁহাকে বলিতেছেন ;—

"আমি কখনও কোন ব্রাহ্মণ, দুঃখীকে একপয়সা দান করি নাই ; কোন সদ্ব্যয়েরও আয়োজন জীবনে করি নাই ; পরন্তু বহুপ্রকার অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দিয়াছি। সাহেবদের হস্তে প্রচুর অর্থ ঢালিয়া দিয়া গোরক্তে ও গোহাড় চুর্ণে দেশকে কলুষিত করিয়াছি। মিথ্যা সম্মানের মোহে জ্ঞান হারা হইয়া কাহারও কথায় কর্ণপাত করি নাই। আজ তাহার সাজা ভোগ করিতেছি। ভগবান্ আমাকে নির্ব্বংশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, আমায় বাদুড় করিয়া চিরান্ধকারে রাখিয়া দিয়াছেন। তখন আত্মাভিমানে কাহারও মুখের দিকে তাকাই নাই, তাই আজ থেকে আমায় জন্মশোধ মুখনীচু করিয়াই থাকিতে হইবে। আজ তোমার কাছে একটী ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তোমাকেই তখন বড় ভাল বাস্‌তাম—তাই তোমায় জানালেম ! আমি বাদুড় আকারে আমারই বাটীর একটী ভগ্ন কক্ষে বাস করিতেছি ;—সেইটাই আমার শয়ন কক্ষ ছিল। যদি তুমি কৃপাকরে সে ঘরে প্রত্যহ রাত্রিতে একটী প্রদীপ জালিয়া দিয়া-আইস তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। আর আমি যতদিন থাকিব তোমাদের সংসারে কোন অমঙ্গল থাকিবে না।"

সেই দিন হইতে আমরা পুরুষানুক্রমে উক্ত ঘরে প্রত্যহ রাত্রিতে প্রদীপ দিয়া আসিতেছি। লোকে উহাকে রায় বাদুড়ের ঘর বলিয়া থাকে। কেহ কেহ কোন মানত করিয়া অমাবস্যার রাত্রিতে ঐ ঘরে প্রদীপ দিয়া আসে। এতদিন পরে আপনার হাতে সেই রায় বাদুড়ের মৃত্যু হ'ল।—দোহাই সাহেব ! বাদুড়টি ফিরে দাও !!"

সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, "দুঃখের বিষয়, আমি আপনাদের রায় বাহাদুরকে ভোজন করিয়া ফেলিয়াছি।"

লোকটি শুনিয়া হতভম্ব হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বিষন্ন অন্তরে একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। চিরকাল তাহার কর্ণে সেই এক কথা ঝঙ্কার দিয়া বাজিতে লাগিল।

রায়-বাহাদুর !

সমাপ্ত।

চন্দ্রমা।

(Shelley হইতে)

(শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।)

শ্রান্ত মলিন আনন ল'য়ে
উঠ্‌ছ তুমি আকাশ পথে,
মর্ত্ত্যপানে চেয়েই চেয়ে
ক্লান্ত নাকি আলোক দিতে ?
সঙ্গে তোমার নাইক' সাথী,
তারার দলে একেলা তুমি,
প্রীতিভরা লুব্ধ আঁখি
বরিতে চায় তোমায় চুমি।
তাদের দিকে চাওনা ফিরে,
তবু কেন তোমায় ঘিরে,
চিত্র কত বরণ ধ'রে,
মহাকাশ ভরা করুণা,
দেখাতে চায় পরাণ চিরে
জীবনেরি কত মহিমা !

তব মূর্ত্তি হেরি নিত্য নব,
ঐ নয়নের ক্ষীণ চাহনি,
কোথা' তোমার প্রেম প্রতিমা,
কেইবা তব হৃদবাসিনী ?
জগতের রহস্য অপার,
স্বর্গের তুমি আঁধার-হরা,
তুমি যেহে বিজন তারার
প্রেমপিপাসা, পুলক ভরা !
গভীর তব মৌন মহিমা,
কিবা প্রশান্ত ঐ হাসিখানি !
সে যে উষালোক সম অসীমা,
কে গো তব অন্তর ব্যাপিনী ?

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

[শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়।]

ওঁকার বলিতে আমরা কি বুঝি ? আমরা বুঝি ইহা একটী বেদমন্ত্র, উহাই মন্ত্রের বীজ-স্বরূপ এবং একমাত্র প্রণব মন্ত্রদ্বারা আমরা ঈশ্বরকে আবাহন করিতে পারি।

সুতরাং ওঁকারের স্বরূপ বুঝিতে হইলে মন্ত্র কাহাকে বলে প্রথমেই জানা আবশ্যক। যদ্দ্বারা মনের ত্রাণ হয় বা অনুভূতির বিকাশ হয় তাহাই মন্ত্র। এই মন্ত্রবলেই চৈতন্যের বিলাস সাধিত হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দময় সেই জ্ঞানাতীত চৈতন্যপুরুষ এই ওঁকারেই আবির্ভূত বা প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

এই ওঁকারেই চৈতন্যের অভিব্যক্তি। কিন্তু কিরূপে সেই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম চৈতন্যময় পুরুষ এই ওঁকারে প্রকাশিত হন তাহা দেখা যাউক। তাহা হইলেই ওঁকারের স্বরূপ বুঝা হইবে।

আমরা জানি যে অন্তর্যামীরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতি বা চৈতন্য আসক্তি সহযোগে বেগবিশিষ্ট হইয়াও প্রকাশিত হইতে পারেন না। কারণ বেগ অনুভূতির উপলব্ধির বিষয় হইলেও জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। সুতরাং বাহ্যতঃ প্রকাশ তাহার কিরূপে সম্ভব হইবে?

এক্ষণে জানিবার বিষয় সেই বেগবিশিষ্ট অনুভূতি কিরূপে রহিতেছেন। অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে, উহা প্রকাশের নিমিত্ত বিক্ষুব্ধ মুহুর্মুহু কম্পিত ও ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিতেছে। সেই চাঞ্চল্যের ফলে তথা হইতে এক অপূর্ব্ব নাদ উত্থিত হইতেছে। ঐ নাদেই চৈতন্যের অভিব্যক্তি এবং উহাই ওঁকার।

দুই একটী উদাহরণ লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

১। একটী মর্ম্মন্তুদ ঘটনা দেখিতেছি। উহার ক্রিয়া আমার অজ্ঞাতসারে আমার অন্তরে একটী ঘা দিল। সেই আঘাতে হৃদয় স্পন্দিত হইল। উহার বেগ বিচ্ছুরিত হইয়া অস্থির করিল। আমি আবেগভরে বলিয়া উঠিলাম "ওঃ! কি কষ্ট!" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, আমার আবেগ "ওঃ" রূপ বিষাদ-সূচক অব্যয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

এইরূপে প্রত্যেক বিস্ময়সূচক হর্ষমূলক প্রভৃতি অব্যয় শব্দ (Interjection) বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা হৃদয়াবেগের প্রকাশ ব্যতীত কিছুই নহে। ইহা হইতে বুঝা যায়, নাদ বা ধ্বনি রূপেই বেগবান্ অনুভূতি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। আমরা সকলেই জানি যে বাষ্পীয়-শকটে শকট চালনা করিবার নিমিত্ত যখন বাষ্পকে বেগবিশিষ্ট করিতে হয়, তখন যন্ত্র হইতে এক বিকট 'গোঁ গোঁ' ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রাকৃতিক জগতে ও যেখানে যেখানে বেগশক্তির পরিচয় পাইয়াছি সেখানে শব্দও শ্রুত হইয়াছে। (Theory of Sound বিশেষ ভাবে আলোচ্য) ইহা হইতে বুঝা যায়

বেগবান্ অনুভূতি প্রথমে নাদরূপে ব্যক্ত হয়। ঐ নাদ প্রথমে গোঁ গোঁ, সোঁ সোঁ ওঁ ওঁ প্রভৃতি রূপেই শ্রুত হইয়া থাকে।

উহাই ওঁকারের স্বরূপ, তাই ওঁকার শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত। অনুভূতি প্রথমে নাদরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় বলিয়াই ওঁকার দৃশ্যমান্ জগতের বীজ-স্বরূপ। এই জন্যই উহা বীজ মন্ত্র বলিয়া আখ্যাত।

এক্ষণে বুঝা যাইল যে, সূক্ষ্ম অনুভূতি বা চৈতন্য স্থূল অনুভূতি রূপে অন্তরিন্দ্রিয়ের বা মনের গ্রাহ্য হইয়া ওঁকার রূপ নাদরূপে শ্রুতি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় হইয়া বাহ্যিক প্রকাশিত হইলেন। ওঁ যে সকল প্রকার শব্দের আদি তাহা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। আবার পরিণামেও বুঝা যায় যে সকল প্রকার শব্দ ও ওঁকারে লীন হইতেছে। একটী হাটের উদাহরণ লইয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, হাটের কোলাহলশব্দ সমীরণে প্রতিহত হইয়া ওঁকার রূপে দিগন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে। মধ্যস্থ শব্দরাশি সেই এক ওঁকারেরই বিকার মাত্র।

ভাব বা অনুভূতি প্রকাশের নিমিত্ত ভাষা। ভাষা শব্দরাশি ব্যতীত কিছুই নহে। শব্দরাশি ওঁকারেরই রূপান্তর মাত্র। তাহা হইলে ওঁকারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ব্যক্ত অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইবে।

শব্দবিজ্ঞানে বা ভাষাবিজ্ঞানে ওঁ শব্দটী তিন ভাগে বিশ্লেষিত হইয়া থাকে। অ+উ+ম্। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদেও চৈতন্যের অবস্থাত্রয় সূচিত হইয়া থাকে। এই অবস্থাত্রয় চৈতন্যের সত্ত্ব রজঃ ও তমঃগুণের ক্রিয়া ব্যতীত কিছুই নহে। অনুভূতি, সপ্রকাশ ও অপ্রকাশ শক্তি দ্বারাই গুণত্রয় সূচিত হইয়া থাকে। সুতরাং অ, উ, ম্, দ্বারা চৈতন্যের তিন গুণের ক্রিয়া সূচিত হইয়া থাকে। অ, উ, ম্, দ্বারা কোন্ কোন্ গুণ সূচিত হয় জানিলেই উহাদিগের স্বরূপ জানা যায়। উহাদিগের স্বরূপ জানিলেই, ওঁকার বিষয়ক জ্ঞান আরও বিকশিত হইবে এবং বুঝা যাইবে ওঁকাররূপ ব্যক্ত চৈতন্য গুণত্রয়ে বিভাজিত হইয়া কিরূপে অবস্থিত হয়।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলেই আমাদিগের প্রথমেই জানা আবশ্যক জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি চৈতন্যের কোন কোন গুণের ক্রিয়া। যাহাই হউক উহা আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে।

আমরা জানিয়াছি ওঁকার শব্দের আদি। তাই শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া 'উঁয়া উঁয়া' করিয়া কাঁদে। তাই সকল জাতির সকল ভাষায় ওঁ পূর্ণ অথবা বিকৃত মাত্রায় বিদ্যমান্। তাই হর্ষ,

বিষয়াদি সূচক অধ্যয়েও পূর্ণ অথবা বিকৃত ভাবে বর্ত্তমান। তাই আমিত্বের স্থূল অনুভূতি "আমি' 'আম্', হাম্, 'আই', 'অহং' প্রভৃতি শব্দ ওঁকার ধ্বনির বিকৃত অথবা পূর্ণমাত্রায় উচ্চারিত। তাই প্রাণাপানাদি বায়ুর বেগ বাহ্যিক ওঁকার বা ইহার বিকৃত মাত্রায় প্রকাশিত হয়। তাই প্রাকৃতিক বায়ু তাড়িৎবেগে বিক্ষোভিত হইয়া ওঁকার গর্জ্জন করিয়া থাকে। তাই প্রতিধ্বনি প্রাকৃতিক বায়ুকে স্পন্দিত করিয়া ওঁকার রূপে শব্দিত হইয়া থাকে।

যেখানেই চৈতন্য অনুভূত সেই খানেই অনুভূতি ওঁকার রূপে ব্যক্ত। এই ওঁকাররূপ অনুভূতির অভিব্যক্তি দ্বারাই চৈতন্য জ্ঞানাতীত হইয়াও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়াছে। আমার পরিচিত ব্যক্তিকে না দেখিয়াও তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে অমুক বলিয়া জানিতে পারি। এই কর্ম্মজগৎ বা ব্রহ্ম ব্যাপিয়া অনুভূতি বেগবান্, তাই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ওঁকার ধ্বনিত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় আমার অনুভূত বলিয়া আমার চৈতন্য আমি রূপ ওঁকারের সত্তায় সত্তাবান্।

এক্ষণে ওঁকাররূপ নাদের এবংবিধ (ও) ব্যাকৃতির বিষয় আলোচিত হইতেছে।

ওঁকারেই যখন বেগবান্ অনুভূতির প্রকাশ, তখন উহার স্থিতি কোথায় জানা যাইলে স্বপ্রকাশ চৈতন্যের স্থিতির বিষয় জানিতে পারিব।

আমরা জানি চৈতন্য অনুভূতিরূপেই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী, অতএব উহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অনুভূতি বেগ ফলতঃ গতিশক্তি বিশিষ্ট হইয়া স্পর্শে গ্রাহ্য হয়। ঐ স্পর্শ প্রাকৃতিক বায়ুর গ্রাহ্য। ইহা হইতে বুঝা যায় প্রাকৃতিক বায়ু স্পর্শমাত্রাত্মক হইয়া স্পর্শেন্দ্রিয়ের সংযোগে বেগবান্ অনুভূতি, ইচ্ছা বা তাড়িৎশক্তির সহিত মিলিয়া প্রাণময় হয় এবং নিশ্বাসই উহার অভিব্যক্তি। ত্বক্‌রূপ বিচিত্র যন্ত্র স্পর্শমাত্রা বিশিষ্ট, তাই উহাকে স্পর্শেন্দ্রিয় কহে।

এই স্পর্শমাত্রায় অনুভূতির বেগ ঘাত-প্রতিঘাত রূপে প্রকাশিত হয়। Electric shock স্পর্শমাত্রাত্মক ঘাতরূপে বিদিত। প্রাকৃতিক বায়ু একটী জড়শক্তিবিশেষ। উহার শক্তি গতি—তাই ঘাতপ্রতিঘাত রূপ স্পর্শ মাত্রা উহার গ্রাহ্য হয়।

এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে গাত্রে শীতলতা বা উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে বলিয়া আমরা বায়ুর অস্তিত্ব জানিতে পারি ইহা নহে, কারণ—শৈত্য বা উষ্ণতা বায়ুর গুণ নহে। স্পর্শ উহার গুণ। ধাক্কাই উহার অনুভূতি।

অনুভূতির এই স্পর্শমাত্রায় অভিব্যক্তি হওনই তাড়িৎশক্তি নামে বিদিত।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে প্রাণবায়ু বলিতে একটী হৃৎপিণ্ডের আঘাত বুঝায়। আঘাত বেগবান্ অনুভূতি বলিয়া ওঁকাররূপ নাদবিশিষ্ট। ঐ আঘাতের গতি অনুসরণ করিলেই উহার গন্তব্য স্থান ও উহার স্থিতি কোথায় জানা যাইবে। অনুসরণ করিয়া জানা যায়, যতদূর চৈতন্য সপ্রকাশ ও ক্রিয়াশীল ততদূর অর্থাৎ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত চলিয়াছে এবং ব্রহ্মেই উহার স্থিতি।

এই প্রাণবায়ুর স্পন্দন শ্বাসবায়ুর গতি দ্বারা নিরূপিত হয় উহা আমরা জানি। উহা কতদূর ব্যাপী এবং গতি কি ভাবে হইতেছে এবং উহার স্থিতি কোথায় জানিলেই আমরা প্রাণবায়ুর অবস্থা বুঝিতে পারিব। কারণ অনুভূতির বেগ ঘাতশক্তি রূপে প্রকাশিত হইয়া স্থির থাকিতে পারে না। গতিশীল হইয়া ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং অনুভূতির গতির বিষয় জানিলেই উহার ক্রিয়া জানা যাইবে। ঐ অনুভূতি যে চৈতন্যের ঘাত বা স্পন্দন তাহা এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গতি শক্তি উপলব্ধির বিষয় হইলেও তাহার সাহায্যে রেখারূপ চিহ্ন দ্বারা বুঝান হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রাণ ক্রিয়ার আলোচনার ফলে জানা যাইল, উহা একটী ঘাত বা স্পন্দন মাত্র এবং গতি শক্তি উহার গ্রাহ্য। তাই গতিশক্তি বিশিষ্ট বিশ্ববায়ু স্পর্শমাত্রায় গৃহীত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস রূপে বেগবান্। ঐ বেগবশেই প্রাণ গতিশীল ও ক্রিয়াশীল। উহার গতি বিদিত হইলেই, প্রাণের গতি বিদিত হইবে।

শ্বাসবায়ুর ক্রিয়ায় অবগত হওয়া যায় যে, বিশ্ববায়ু নাসারন্ধ্র পথে প্রবিষ্ট হইয়া শ্বাসরূপে আজ্ঞাচক্র বা ব্যোমতত্ত্ব হইতে আসিতেছে এবং ফুস্ফুসে স্থির হওতঃ উহাকে বেগবান্ করিয়া হৃৎপিণ্ডে ঘাত দিতেছে। ফলে সেই ঘাত যন্ত্র হইতে যন্ত্রান্তরে নীত হইয়া মূলাধারে প্রতিহত হইতেছে। এই প্রতিহত বেগ নাভি বা তেজস্তত্ত্ব হইতে প্রত্যাগত হইয়া ফুস্ফুসকে বেগরহিত করিতেছে। ফলে শ্বাস, প্রশ্বাস রূপে কণ্ঠপথে নাসারন্ধ্র দিয়া পার্থিব বায়ুকে প্রতিহত করিতেছে। ঐ প্রতিঘাতের ফলে প্রাকৃতিক বায়ু স্পন্দিত হইয়া স্পর্শমাত্রাত্মক চৈতন্যরূপে স্পর্শেন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রাণময় হইয়া পুনরায় নিশ্বাসে রূপান্তরি তহইতেছে। প্রশ্বাস কিরূপে প্রকৃতির সহযোগে নিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়, কিংবা শ্বাস প্রশ্বাস অভিন্ন কিনা উপস্থিত ইহা আলোচ্য নহে।

আমরা জানি স্মৃতি আসক্তি সংযোগে,

অনুভূতিরূপে প্রকাশিত হয় এবং অনুভূতি স্পন্দিত হইয়া গতিশীল বা ক্রিয়াশীল হয়। গতিশক্তিবিশিষ্ট বায়ুই উহার অভিব্যক্তি। তাই শ্বাসবায়ু গতিশীল জীবের চৈতন্যমধ্যে পরিগণিত। কারণ প্রাণবায়ুর গতি শ্বাসের গতি অনুসারেই হইয়া থাকে।

অনুভূতি ক্রিয়াশক্তি দ্বারা রূপান্তরিত হইলেও উহার চৈতন্য অপরিবর্ত্তিত ভাবেই থাকে।

স্মৃতি আসক্তি সংযোগে অনুভূতিবিশিষ্ট হইয়া গতিশীল ও অনন্তপথে ছুটিয়াছে। কুণ্ডলীত বেগে চলিতে চলিতে নানা স্তরে অনুভূতির রূপান্তর ঘটিলেও উহার চৈতন্য স্থির আছে। প্রতি স্তরে স্মৃতি একই ভাবে আসক্তিতে সঙ্গত হয়। শক্তিদ্বয়ের বেগের তারতম্য ঘটিয়া অনুভূতির চৈতন্যে বিকৃতি ঘটিলে উহার চৈতন্য কখনই আসক্তিতে সঙ্গত হইতে পারিত না। এবং অনুভূতি ক্রিয়াশক্তিহীন হইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইত। প্রাণবায়ুর গতি দেহ-ক্ষেত্রে এইরূপেই অনুভূত হয়। শ্বাসবায়ুর গতি প্রাকৃতিক বায়ু মধ্যে ঠিক এই ভাবেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডে সমীরণ এই ভাবেই গতিশীল অনুমিত হয়। গতিশক্তির বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

ওঁকাররূপী সপ্রকাশ অনুভূতি এইরূপ কুণ্ডলীত বেগে সত্ত্ব, রজঃ. তমঃগুণভেদে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়া অনন্তপথে ছুটিয়াছে। উহার গতি পথ ত্রিভঙ্গিম ওঁকারের আকৃতির অনুরূপ বলিয়া ওঁ এইরূপ চিহ্নের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ অনুভূতির বেগে যে নাদ উত্থিত হয়, তাহা ওঁএর অনুরূপ। তাই ওঁ শব্দ ব্রহ্ম।

ওঁ ব্রহ্ম ও চৈতন্যের প্রথম বিকাশ বলিয়া ব্রহ্মের স্তোত্রাদিতে ও চৈতন্যের প্রার্থনাদিতে ওঁ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বধর্ম্মানুমোদিত ও সকল জাতিই করিয়া থাকে। মুসলমান ও খৃষ্টানগণ আমীন, আমেন প্রভৃতি শব্দে প্রার্থনা শেষ করেন, তাহা অনেকেই জানেন। ঐ শব্দগুলি ওঁকারের অপভ্রংশ শব্দ বলিয়া সুধীগণ স্থির করেন।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

স্ত্রী-পুরুষ।
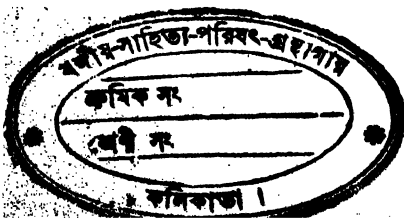
(কবিভূষণ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন বিদ্যাবিনোদ)

সংসারের মূল স্ত্রী পুরুষ,—বন্ধন স্ত্রীপুরুষ—সুখ সৌভাগ্য প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি সবই যেন স্ত্রীপুরুষের মধ্যগত। মা বাপ ভাই বোন ইত্যাদি থাকলেও, সকলের সহিত ভক্তি-স্নেহের আদান প্রদান চল্‌লেও, সৃষ্টির আদি ধর্‌লেও, স্ত্রী পুরুষই যেন সংসারের বীজ, অঙ্কুর,—বৃক্ষ, ফুল,—ফল;—সেই ফল হইতে আবার বীজ, আবার সেইরূপ গতিতে ক্রম বর্দ্ধমান—ক্রম বহমান। মা বাপ পরস্পর স্ত্রীপুরুষ, ভাই বল বোন বল,—আর যাকেই ধর– সকলেই স্ত্রীপুরুষ রূপে,—একটি সংসারের তরুব্রতভী রূপে, ফুল ফল দানে নিযুক্ত। ইহা জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের মায়াবন্ধনের ফল, নতুবা কে কোথা—কোথাকার কে—এমন কার্য্য—এমন বন্ধন—এমন হৃদ্গত ভালবাসা—মানুষ তো জ্ঞানবিবেকসম্পন্ন, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত এ দাম্পত্য লীলার জয় গানে চির নিযুক্ত।

ঐ তো গেল সৃষ্টির কৌশল, বন্ধন,—এতে ঐশতত্ত্বের সূক্ষ্মত্ব স্থূলত্ব যাই থাকুক, আব্রহ্মস্তম্ভ সকলকেই এর সুখ দুঃখ, দৈন্য দারিদ্র্য,—মিলন বিচ্ছেদ, আশীর্ব্বাদ অভিশাপ মাথা পেতে নিতে হয়—ঘাড় পেতে সইতে হয়—বুক পেতে শিরীষ কুসুম ও বাজের পতন ভোগ করতেই হয়—এতে 'না' নাই, কেবল 'হাঁ'; কি যে সৃষ্টির নিয়ম,—কি যে বন্ধন,—কি যে সুখ শান্তির লিপ্সা—কি যে অদম্য রিপুশক্তি এতে 'না' নাই কেবল হাঁ। কেন না এ'তে আত্মশক্তি নাই, আত্মশক্তি যে শক্তির অধীন, সেই কালশক্তির মহাশক্তি যে ঐশশক্তি,—যার গতি অপ্রতিহত—বিশ্বজয়ী বীরও যার কাছে নিম্নশির, চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি ইন্দ্র যম যার শক্তিতে কার্য্যকরী শক্তিলাভে শক্তিমান, এ সেই শক্তি, তাই সংসারের বন্ধন এত শক্ত, অচ্ছেদ্য!

সূক্ষ্মতত্ত্বে এই শক্তিতে স্ত্রী পুরুষ বাঁধা,—এতেই তারা সংসারী—এতেই তাদের পুত্র কন্যা ধন দৌলৎ—যা' আছে সব—যা' হবে সব! আজন্ম মৃত্যু তারা এর অধীন; এর ছায়ায় তারা শান্ত আবার এর খরতাপে তারা তপ্ত। এর যে শক্তি—ইন্দ্রজাল—বিদ্যুৎস্ফুরণ—অলৌকিক অস্বাভাবিক। এ ছাড়া এর বন্ধন ইহপরকালের দ্যোতক, সরল বিশ্বাসে তাদের ফল ভোগ পুনর্জ্জন্মবাদ!—ইহাতেই ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইহাতেই

জ্ঞানকর্ণধার।

আবার সংসার সম্বন্ধে এই স্ত্রীপুরুষ সমাজ-শাস্ত্রের অলঙ্কার —একটি বৃন্তে দুইটি ফুলের মত তারা চির বর্ত্তমান। একের তাপে অপরটি শুষ্ক—একটি তুলিতে দুইটিই হাতে জড়্‌য়ে উঠে। তাদের গায়ে যা কিছু জন্মে, যাদের সহিত তাদের নিকটতম সম্বন্ধ, সব তাদের হা'তে ছেড়ে যায়, কিন্তু তারা দু'টি অন্তরঙ্গ—কেউ কাকে ছাড়ে না—ছাড়তে পারেও না—একাত্ম!

যদি দু'টির সম্বন্ধ এরূপ, তবে সমাজের দেশের আচার ব্যবহারে কেন যে পৃথক দেখায়, পৃথক ভাবায়, পৃথক রাখায়, তা কে বলিবে। অবশ্যই এ স্থূল দৃষ্টির অন্তর্গত, তবু বলি, কেন এ পৃথকত্ব? সকল সমাজে সকল দেশে, সকল কালে না হ'লেও সমাজ দেশ ও কাল বিশেষে এ পৃথকত্বের ছায়া যে তাপ দেয়,—বালুকাকণা যে কৃশানুরূপ ধরে তা বলবার নয়,—কেবল সইবার।

স্ত্রীপুরুষে ভগবান যা পার্থক্য দেখান, তা অভ্রান্ত,—মঙ্গলের প্রসূ। তা ছাড়া, মানবের, মানব গড়া সমাজের দুই চোকে বিভিন্নরূপে দুইটিকে দেখা, অভিন্নতার অপলাপ করা—প্রাণে আঘাত দেয় না কি? স্ত্রীপুরুষের রক্ত এক—মেদ মাংস অস্থি সব এক—সুখ দুঃখ এক,—আশা আকাঙ্ক্ষা এক—ক্ষুধাতৃষ্ণা এক—তন্দ্রা নিদ্রা এক, প্রেম ভালবাসা এক,—পৃথক ত কিছু নাই, তবে কেন পুরুষের যে সুবিধা, স্ত্রীর সে সুবিধা নাই? স্ত্রী অবলা—এই অপরাধে কোন্ অর্থে অবলা? শক্তিশূন্যতা অর্থে না বাক্যশূন্যতা অর্থে,—শক্তি ও বাক্য দুইটির কোনটিতে ত স্ত্রী কম নয়। মহাশক্তি বিশ্বপ্রসবিনী আবার বিশ্ববিনাশিনী। একবার অতীত দৃশ্যের দিকে তাকাও, দেখ স্ত্রীর শক্তি দেখ স্ত্রী বাক্য কেমন! সাবিত্রী বাগস্ত্রে যেমন যমকে জয় ক'রে মৃত স্বামীকে বাঁচয়েছে, বল দেখি, কোন্ পুরুষ সেরূপ স্ত্রীকে বাঁচাতে পেরেছে? পতিনিন্দা শুনে সতীর তনুত্যাগ—কিন্তু কোন্ স্বামী স্ত্রীর নিন্দায় দেহত্যাগে নিযুক্ত? কোন্ পুরুষ স্ত্রীর সহিত অনুমৃত? তবে কেন পুরুষের সুবিধা স্ত্রীতে পায় না? আর কেনই বা পাবে না?

কতকগুলা কার্য্য আছে, যাহা সমাজের তন্ত্র। তাতে পুরুষ যেন স্পর্শমণি—তার শক্তিই শক্তি—তার কার্য্যই কার্য্য,—তার যেন পাপ পুণ্য নাই, ব্যভিচার দোষ নাই—ভুল ভ্রান্তি নাই; আর স্ত্রী যথার্থ স্পর্শমণি হয়ে, যথার্থ শক্তিমতী হ'য়ে, যথার্থ জনয়িত্রী পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী হ'য়ে, সকলে বঞ্চিত। তার একটি কথা কইবার যো নাই,—

সে যেন কিছুই জানে না। যে উভয় ভারতী বিদুষীর শিরোমণি হ'য়ে, একদিন শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচার প্রতিদ্বন্দিতার আসন গ্রহণ ক'রেছিলেন, যে অত্রিপত্নী অনসূয়া একদিন পাতিব্রত্যে মরুভূমিতে গঙ্গাস্রোত এনেছিলেন—যে অরুন্ধতী আজও সপ্তর্ষি-মণ্ডলান্তর্গত স্বামী বশিষ্ঠের পার্শ্বে ব'সে পতি-প্রাণতার দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন—যাক্ পূর্ব্বের কথা, —বর্ত্তমানে তাকাও, কত স্ত্রী কত কার্য্য—পুরুষে যা পারে না, সে শক্তি ধ'রে, বরেণ্য ও বরদরূপে শোভা পাচ্চে—তবু স্ত্রী অবলা—দুর্ব্বলা? দাম্পত্য জীবনে যাকে লোকে সুখের আদান প্রদান ভাবে, রিপুচরিতার্থের সহযোগিতা ভাবে, তা'ত পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবমণ্ডলীর সৃষ্টি প্রকরণের প্রবৃত্তি-ঐশিশক্তি, তাতে পরস্পর ন্যূনাধিক্য ভাব ত কিছুই দেখা যায় না। সুতরাং সে সকল ক্রিয়া ল'য়ে ভালমন্দ বিচার করা চলে না। ভালমন্দর বিচার গুণে, শক্তিতে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, যদি তা হয়, তবে অন্ধচক্ষে স্থলবিশেষে স্ত্রী হেয় কেন? পুরুষ শ্রদ্ধেয় বা গননীয় কেন? এ দৃষ্টি বা দৃশ্যের মধ্যে কি পাপ পুণ্য নাই?

এ সকল বিষয় ল'য়ে অল্পবুদ্ধি আমাদের বাক্‌বিতণ্ডা বা তর্ক মীমাংসা আসে না, তবে কি প্রাকৃতিক কি ব্যবহারিক জ্ঞান বুদ্ধিতে যা আসে, তাতে যা দেখা শুনা যায়,—হাতে কলমে যা ধরা পড়ে—তাই দেখে বা শুনে যতটা সিদ্ধান্তে উঠা যায় তাতে একবৃন্তে যুগল পুষ্পের এক সৃষ্ট গুণে একটি কাল একটি লাল দেখে প্রাণ কাঁদে না কি?

কবি গাইয়াছেন 'নারী বিশ্বজননীর ছবি';* যদি তাই হয়—যে নারী, সেইত স্ত্রী—তবে স্ত্রীতে কোন্ শক্তি নাই? তবে তাকে তার সহধর্ম্মী সমকর্ম্মী—একযাত্রী পুরুষের বা স্বামীর সহিত এক রাখা হয় না কেন; ইহার মধ্যে সমাজের যে গুপ্ত-তত্ত্ব আছে, গূঢ় রহস্য আছে তা জানিনা, কে বলে দিবে,—রহস্যভেদে কে জ্বালা নিভাবে? উত্তর—কেউ নয়। তবে বিশ্বজননীর ছবি নারী—স্ত্রী! থাক তুমি তোমার শক্তিতে শক্তিমতী হ'য়ে, থাকুক লোকের চোকে মনে—তোমার একপ্রাণ স্বামীর সহিত তোমার পার্থক্য,—করুক স্বামীও তোমার তোমাকে সে প্রার্থক্যের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি। তুমি যখন বিশ্বমাতা, সহনশক্তি তোমার অপরিমেয়, তখন সও তুমি, —কর আপনার কাজ—সাধনায় সিদ্ধ হও—জ্ঞান ও কর্ম্মে উৎকর্ষ লাভ কর—যে যা বলে

* নবীনচন্দ্র সেন—কুরুক্ষেত্র।—'আমরা বিশ্বজননীর ছবি' (সুভদ্রা দ্রৌপদি সংবাদ)।

বলুক, তোমার শক্তি অক্ষুণ্ণ। কেননা, তুমি যে মহাশক্তির অংশভূতা, মহাকার্য্যে দীক্ষিতা! প্রকৃতিরূপিণী সৃষ্টির নিয়ন্ত্রী হ'য়ে তুমি যে নির্জ্জীবপুরুষকে চৈতন্য দাও—আবার তোমাতে নাই কি?

লোকে পাগল বল্‌লে লোক পাগল হয় না,—কার্য্যই তার পাগলত্ব প্রকাশ করে। পুরুষের সহিত একধারে এত পার্থক্যের বোঝা মাথায় নিয়ে তুমি যে স্বধর্ম্মে দাঁড়ায়ে আছ—ইহাই তোমার স্ত্রীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ—শ্রেষ্ঠশক্তির সারত্ব বিকাশ! স্বামী তোমার শিবরূপ—একদিন তুমি পিতার মুখে স্বামীনিন্দা—শিবনিন্দা শুনে, স্বামীনিন্দুকের—শিবনিন্দুকের অঙ্গজ তনু ধারণে গ্লানি মনে ক'রে ঘৃণায় তনুত্যাগ কর্‌তে পেরেছিলে, তখন নিজে তুমি সেই স্বামীর কার্য্যে-বাক্যে, যত দোষই থাকুক না, তাকে ত তুমি অন্যায় বল্‌বে না, বল্‌তে পার্‌বেও না। আবার লোকে বা সমাজে যদি তাকে স্বামীকে পুরুষকে স্পর্শমণি বলে,—তোমাকে সে আধিপত্য সে শক্তি না দেয় তাতে ত তুমি কোন কথা কইবে না, বরং স্বামীর পৌরুষ সৌজন্য দেখে, আনন্দে নেচে উঠ্‌বে—একেই ত বলে স্ত্রী-ধর্ম্ম,—নারী-ধর্ম্ম,—সহধর্ম্মিণীর জ্ঞান ও কর্ম্ম! ধন্য মাতৃরূপা তুমি,—তোমার স্তন্যপানে আমরা সজীব,—শক্তিমান্, তবু তোমাকে শক্তিমতী—শক্তিশ্বরী বলিনা,—এই পাপ তাপ আমাদের,—তাই আমরা নির্জ্জীব। আবার যখন স্ত্রীরূপে তুমি আমোদের সহিত সঙ্গত হও, তখনও তোমার শক্তিতে আমরা প্রত্যক্ষ শক্তি পাই, তবু বলিনা তুমি শক্তিসম্পন্না,—তাই আমাদের অধোগতি! থাক মহাশক্তি আমাদিগকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে আশ্রয় ক'রে। যে পথেই হ'ক আমরা তোমাকে ধরে, তোমার শক্তিকে লয়ে, সংসারে থেকে সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের কার্য্য করি আর বলি :—

স্ত্রী আমাদের—পুরুষ মোরা—আমরা স্ত্রীর
আপন হই।
স্ত্রীরূপেতে মহাশক্তি,—মহাশক্তি লয়ে রই॥

সার ও অসার

(শ্রীকালিদাস রায়।)

এক কণা সার কথা সুকৌশলী ধানুষ্কের
অব্যর্থ সন্ধান ;
অসার বাক্যের পুঞ্জ—অপটু হস্তের মত
লক্ষ্যহীন বাণ।

এক কণা সার কথা মৃগমদবিন্দুসম
ছড়ায় সুযশ ;
অসার বাক্যের স্তূপ ভঙ্গুর শৈলের মত
রঙিন অলস।

চতুর্দ্দশ সাহিত্য সম্মিলন।

কাঁটালপাড়া।

(শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী, কাঁটালপাড়া চতুষ্পাঠী)

এবৎসরে সাহিত্য সম্মিলন লইয়া যাহা হইয়া গেল, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখার যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি উন্মোচনের দিনে সাহিত্য পরিষদের বিশেষ মাসিক অধিবেশনে চতুর্দ্দশ সাহিত্য সম্মিলন বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনেই আহূত হয়। তদনুসারে বিজ্ঞাপন পত্র মুদ্রিত হইয়া আইসে।

হঠাৎ একদিন সকলে শুনিল সাহিত্য সম্মিলন বঙ্কিমভবনে না হইয়া নৈহাটীতে হইতেছে। তখন কাঁটালপাড়াবাসীরা অন্তরে মহা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। (পূর্ব্বেও অবশ্য নানা-রূপ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন) তখন তাঁহারা কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমভবনে সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিবেন স্থির করিলেন।

কাঁটালপাড়াবাসীরা সভা হইতে চলিয়া আসিবার পর দিনই ভার্দ্দা হাটে নৈহাটীর কয়জনে যেমন নৈহাটীতেই সম্মিলন করা সাব্যস্ত করিলেন, অমনই সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমান মহারাজ মূল সভাপতি ও অন্যান্য শাখা সভাপতি স্থির করিয়া ফেলিলেন। বিষয়টি এমন গোপন রাখা হইল, টেলিগ্রামের সম্মতি-উত্তর আসিবার পূর্ব্বে কেহ জানিল না শুনিল না।

কাঁটালপাড়াবাসীরা ভট্টপল্লীর নারায়ণপুর মাদরাল প্রভৃতি গ্রামের সহিত এক যোগে

কাঁটালপাড়ার বঙ্কিমভবনে সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিলেন। নাটোর মহারাজ মূল সভাপতি (অবশ্য পরে মহারাজের ইচ্ছায় শ্রীযুক্ত বিপিন-চন্দ্র পাল) নির্ব্বাচিত হইলেন। দর্শন-শাখায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, সাহিত্য-শাখায় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাস শাখায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রভৃতি সভাপতির নির্ব্বাচন হইয়া গেল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (পরে শ্রীযুত আচার্য্য পঞ্চানন মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন)।

হীরেন্দ্র বাবু, যতীন্দ্র বাবু প্রভৃতি পরিষদের পাণ্ডারা দুইটি সম্মিলনের বিরোধ মিটাইবার জন্য নাটোর মহারাজ এবং রমাপ্রসাদ চন্দ বাবুকে মধ্যস্থ মানিলেন। নাটোর মহারাজ, হীরেন্দ্র বাবু,যতীন্দ্র বাবু, রমাপ্রসাদ বাবু, অমূল্য বিদ্যাভূষন, হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, খগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই বঙ্কিম ভবনে সমাগত হইলেন। সকলে এবং মধ্যস্থেরাও সাব্যস্ত করিয়া গেলেন চতুর্দ্দশ সাহিত্যসম্মিলন বঙ্কিমভবনেই হইবে।

ভাবিলাম বিরোধ মিটিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও দৌহিত্রেরা থাকিয়া কলিকাতাতেও উহাই স্থির হইল। পরদিন রাত্রিবেলা কাঁটাল-পাড়াবাসীদের কয়জন প্রতিনিধিরা শুনিয়া আসিলেন—সম্মিলন নৈহাটীতেই হইবে। বঙ্কিমভবনে হইবে না। হায়, মধ্যস্থেরা, হায়, হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা! আপনাদের বিচার সিদ্ধান্ত কোথায় রহিল ?

কাঁটালপাড়ার সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোগ সমারোহে সম্পন্ন হইতেছিল—এমন সময়ে পরিষদ হইতে এক পত্র আসিল—চতুর্দ্দশ আখ্যাটি কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমভবনের সম্মিলন পাইবে না। পাইবে—নৈহাটীর সম্মিলনটি।

ইহাই সুবিচার! বঙ্কিমচন্দ্রভ্রাতুষ্পুত্র বিপিন-চন্দ্র শেষে অভ্যর্থনা সমিতির প্রতিশ্রুত সভাপতি পদ পরিত্যাগ করিলেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া সম্মিলনের গৌরব বর্দ্ধিতই করিলেন।

পরিষদের এই পক্ষপাতিতায় (কয়েক জন পাণ্ডার) কাঁটালপাড়া ভাটপাড়ার অনেকেই ক্ষুব্ধ হইলেন। স্থির হইল, সম্মিলনটির নাম বঙ্কিম সম্মিলন দেওয়া হউক। পরে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির বিচারে চতুর্দ্দশ সম্মিলন বলিয়া ঘোষিত হয়, হইবে।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে (একজন ভোট দেন নাই) ইহাই চতুর্দ্দশ সম্মিলন নামে ঘোষিত হইল।

পরিষদের পত্র খানি যে অবৈধ—ইহা রবিবারে সাধারণ সভায় স্বীকৃত হইয়া গেল। মহারাজ (নাটোর) আসিয়া বলিলেন -"ইহাই যখন চতুর্দ্দশ সম্মিলন—তখন ইহা চতুর্দ্দশ সম্মিলন—এরূপ ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি?"

সম্মিলনের প্রাণ পাঁচকড়ি বাবু আসিতেই পারেন নাই,—সাহিত্যশাখায় সভাপতি হন—নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, প্রবাসীর চারুবাবুকে সভাপতির পদ লইবার জন্য ক্ষীরোদ বাবু অনুরোধ করিলেন। চারু বাবু বলিলেন—আপনার মত বিজ্ঞ দেশ-বিশ্রুত নাট্যকার থাকিতে শিষ্যস্থানীয় আমার (সাহিত্যশাখার) সভাপতি পদ গ্রহণ সাজে না।

শ্রীযুক্ত আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অসুস্থ শরীরেই সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়া অভিভাষণ পাঠ এবং বক্তৃতা করিলেন। বৃদ্ধ পূজকের আত্মনিবেদনে সকলেই তৃপ্ত হন। সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের তিন ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা একটি শুনিবার জিনিষ ছিল। কি ভাষা কি ভাব কি বা উন্মাদনা। শ্রোতৃবৃন্দ নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থির।

মহামোহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের আধ্যাত্মিক বক্তৃতাটিও বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। এই দুই জনের বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

ইতিহাস সভাপতি রমাপ্রসাদ বাবুর অভিভাষণটি বঙ্গভাষায় একটি মূল্যবান্ সম্পত্তি। সেটি একখানি গ্রন্থ। মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থাকারে সত্বর প্রকাশিত হইবে। কাশীর হরিহর শাস্ত্রী। শ্রীজীবভায়া নিখিল বাবু (ঐতিহাসিক) রমেশ বাবু, কুমুদ চৌধুরী (ব্যারিষ্টার) শিবকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। মেটামিটির প্রস্তাব চলিতেছিল বলিয়া কাঁটালপাড়ার সম্মিলনের কর্ত্তারা ঠিকমত সাহিত্যিকদের পত্রাদি দিতে পারেন নাই। বিদেশে সকলকেও জানাইতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহারা বড়ই দুঃখিত।

দুইটি গ্রামে দুইটি সম্মিলন হইয়া গেল, ইহা গৌরবের, কি দুঃখের; সাধারণে তাহা বিচার করুন। সম্মিলনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করা সম্ভব হইল না, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট—আমি ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

শুক্রনীতিসার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব লিখিত)

যাঁহারা সামন্তাদি পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও যথোপযুক্ত বেতনাদি দ্বারা মহারাজাদি কর্ত্তৃক পালিত হয়েন ; তাঁহারা 'হীনসামান্ত" সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। যিনি এক শত গ্রামের অধিপতি তিনি 'সামন্ত' এবং নৃপ কর্ত্তৃক যিনি শত গ্রাম শাসনে নিযুক্ত, তিনি 'অনুসামন্ত' বলিয়া কথিত হয়েন॥ ১৮৯—৯১॥ যিনি দশ গ্রামের অধিপতি তাঁহার নাম 'নায়ক' এবং যিনি দশ সহস্র গ্রামের শাসক ও রাজস্বগ্রাহী, তিনি 'দিক্‌পাল ও স্বরাট' বলিয়া সংপূজিত হয়েন॥ ১৯২॥

যাহা এক ক্রোশ পরিমিত জনপদ, সহস্র রৌপ্য মুদ্রা যাহার রাজস্ব, তাহাকে গ্রাম কহে। ঐরূপ গ্রামের অর্দ্ধেককে 'পল্লি' বলিয়া জানিবে এবং ঐরূপ পল্লির অর্দ্ধেক 'কুম্ভ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১৯৩॥ পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমিত ভূভাগকে প্রজাপতি ক্রোশ নামে সংজ্ঞিত করিয়াছেন এবং মনু চারি সহস্র হস্ত পরিমিত ভূভাগকে ক্রোশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন॥১৯৪॥ সার্দ্ধদ্বিকোটি (আড়াই কোটি) হস্তের দ্বারা ব্রহ্মার এক ক্রোশ ভূমির পরিমাণ হয় এবং সেইরূপ পাঁচ শত ক্রোশের দ্বারা ব্রহ্মার এক নিবর্ত্তন নামে পরিমাণ হয়॥ ১৯৫॥ মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্য পর্ব্বের যে পরিমাণ তাহাকে "অঙ্গুল" কহে। অষ্টসংখ্যক যবোদরে (যবের মধ্য ভাগের পরিমাণে) এক দৈর্ঘ্য এবং পঞ্চ যবোদরে এক স্থৌল্য হয় ১৯৬ সেইরূপ চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলে প্রজাপতির মতে এক হস্ত হয়। এইরূপ হস্ত ভূমির পরিমাণ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ইহা হইতে অন্য পরিমাণের হস্ত অধম বলিয়া অভিহিত হয়॥ ১৯৭॥ চারি হস্ত পরিমাণকে 'দণ্ড' কহে এবং পঞ্চ হস্ত পরিমাণকে 'লঘু' বলিয়া জানিবে। সেই দণ্ড অথবা লঘুর 'অঙ্গুল' পঞ্চ যবে হইয়া থাকে ইহা মনুর অথবা মনুষ্যদিগের মতাবলম্বী॥ ১৯৮॥ সাত শত আটষট্টি ৭৬৮ যবে প্রজাপতির একদণ্ড এবং ছয় শত যবে মনুর অথবা মানবের এক দণ্ড হইয়া থাকে॥ ১৯৯॥ দৈর্ঘ্য পরিমাণে ত্রিশ শত অঙ্গুলপরিমিত এবং স্থৌল্য পরিমাণে ত্রিপঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চদশ সহস্রযবপরিমিত পঁচিশ দণ্ডে

'নিবর্ত্তন' হয়। ২০০॥ এক শত পঁচিশ সংখ্যক হস্তে অথবা উনিশ হাজার দুই শত যবোদরে মনুপ্রোক্ত 'নিবর্ত্তন' (পরিমাণ বিশেষ) হয় ॥২০১॥

চব্বিশ শত অঙ্গুলে অথবা একশত হস্তে প্রাজাপত্য নিবর্ত্তন হয় ॥২০২॥ মনু এবং প্রজাপতির সম্বন্ধী নিবর্ত্তন কথিত হইল। ছয়শত পঁচিশ দণ্ডে (পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ বিশেষে) উভয়েরই মতাবলম্বী পঁচিশ নিবর্ত্তন হয় ॥২০৩॥ পঞ্চসপ্ততি (৭৫) সহস্র অঙ্গুলে মনুর মতাবলম্বী 'পরিবর্ত্তন' নামক পরিমাণ হয়। এবং ষষ্ঠি সহস্র অঙ্গুলে প্রজাপতির মতে এক 'পরিবর্ত্তন' হয় ॥২০৪॥ একত্রিশ শত পঁচিশ হস্তে মনুর এক 'পরিবর্ত্তন' এবং পঁচিশ শত হস্তে প্রজাপতির এক 'পরিবর্ত্তন' হয়। এক পাদ হীন চারিলক্ষ যবে মনুর এক পরিবর্ত্তন এবং চারিলক্ষ অশিতি সহস্র যবে প্রজাপতির এক পরিবর্ত্তন হয় ॥২০৫-৬॥ সেই মনুর অষ্টশত দণ্ড এবং চারি সহস্র হস্ত অর্থাৎ চারি সহস্র হস্ত অধিক অষ্ট শত দণ্ড পরিমাণে দ্বাত্রিংশৎ নিবর্ত্তন হয় ॥২০৭॥ পরিবর্ত্তন নামক পূর্ব্বকথিত পরিমাণ বিশেষে পঁচিশ দণ্ডে এক ভুজ এবং অযুত হস্তে সেই ভুজের ক্ষেত্র হয় ॥২০৮॥ ভূমির 'পরিবর্ত্তন' (পরিমাণ বিশেষ) কষ্টজনক। এ বিষয়ে চারি ভুজে অর্থাৎ এক শত দণ্ডে 'সম' নামক পরিমাণ হয়। রাজা পূর্ব্বকথিত প্রাজাপত্য পরিমাণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে মনুর পরিমাণ দ্বারা ভূমির নির্ণয় করিবেন অন্য প্রণালী অনুসারে ভূনির্ণয় করিবেন না। যে রাজা লোভ বশতঃ ভূভাগ নির্ণয় করিয়া প্রজাগণকে পীড়া দান করেন, তিনি সপুত্র রাজ্য ভ্রষ্ট হয়েন। অর্থাৎ রাজা রাজত্ব বিস্তার কালে প্রজাপতি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে কার্য্য করিবেন এবং বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইলে অথবা কোনও কারণ বশতঃ ভূমির পরিচ্ছেদ করা একান্ত আবশ্যক হইলে মনুর মতে কার্য্য করিবেন ॥২০৮।৯॥

রাজা দুই অঙ্গুলি পরিমিত ভূমিও কাহাকেও দিবেন না। অথবা গ্রহীতা যতদিন বাঁচিবে, ততদিনের নিমিত্ত তাহার বৃত্তিরূপে স্বত্ব ত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ সামান্য মাত্রও ভূমি কাহাকেও দিবেন না; যদি দিতে হয় তাহা হইলে তাহাও গ্রহীতার জীবনস্বত্ব রূপে ॥২১০॥ গুণবান্ রাজা দেবালয় স্থাপন জন্য সর্ব্বদাই ভূমি দান করিবেন। গৃহী দেখিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার উদ্যান অথবা গৃহনির্ম্মাণ জন্য দান করিবেন। এস্থলের দানও জীবনস্বত্ব। নতুবা পূর্ব্ববচনের সহিত বিরোধ ঘটে ॥২১১॥

রাজধানীকরণ কথিত হইতেছে—যেস্থলে বহুপ্রকার বৃক্ষলতা বর্ত্তমান আছে, এবং সর্ব্বদা

পশুপক্ষিগণ যেস্থলে বিচরণ করে, যেস্থান জল ও ধান্যাদি শস্যে পরিপূর্ণ এবং তৃণ কাষ্ঠাদি যেখানে সুপ্রাপ্য, যে দেশ সমুদ্র পর্য্যন্ত নৌকা দ্বারা সুন্দর রূপে গমনাগমন করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, যে দেশের নিকটে পর্ব্বত বিদ্যমান এবং যে স্থল মনোহর সমতল ভূভাগ সেই স্থলকে রাজধানী রূপে পরিকল্পিত করিবে ॥২১৩।১৯॥ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার অথবা মণ্ডলাকার কিংবা চতুষ্কোণ প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে গ্রাম ও পল্লী আদির দ্বারা সুশোভিত,মধ্যে মধ্যে সভা সমিতি বিরাজিত রাজধানী হইবে। নগরীর মধ্যে কূপ বাপী ও তড়াগাদি জলাশয় প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিবে। চারিদিকে চারিটী দ্বার, প্রশস্ত রাজপথ সকল এবং উপবনশ্রেণী নগরীর শোভা বর্দ্ধন করিবে। প্রচুর পরিমাণে দেবালয়, মঠ, চতুষ্পাঠী আদি বিদ্যালয় এবং পান্থশালা বিদ্যমান থাকিবে। এবম্ভূত রাজধানীতে রাজা সৈন্যাদি দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সপরিবারে বাস করিবেন। ২১৫—১৭॥ সেই রাজধানীর মধ্যে সভাগৃহ বিচারালয়, গোশালা, অশ্বশালা, হস্তিশালা ও মনোরম বাপী কূপাদি জলাশয় সমন্বিত রাজগৃহ হইবে। রাজগৃহের চারিদিক সমভুজ অর্থাৎ সমান, দক্ষিণ দিক উচ্চ, উত্তরদিক নীচ, গৃহ হইতে গৃহপ্রাঙ্গণ দীর্ঘ (কারণ—চতুঃশাল গৃহ বহুভুজ পরিমাণ শালা ব্যতীত প্রায়ই অশুভ-দায়ক হয়) রাজগৃহের পরিমাণ অযুগ্মভুজ (৫।৭ ইত্যাদি) অস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত এবং মন্ত্রণা গৃহ সমন্বিত রাজভবন হইবে॥২১৮—২০॥ সেই রাজগৃহে সুশোভিত তিনটী কক্ষ ও চারিটী দ্বার, প্রতি দ্বারে শস্ত্রাস্ত্রধারী চারিজন, পাঁচজন অথবা ছয়জন পরিবর্ত্তক (দৌবারিক) পর্য্যায়ক্রমে স্থিত প্রহরী, অভ্যন্তরে বিবিধ প্রকার গৃহ পট-মণ্ডপ এবং হর্ম্ম্যশ্রেণী বিদ্যমান থাকিবে ॥২২১-২২ রাজান্তঃপুরের পূর্ব্বদিকে বস্ত্রাদিমার্জ্জন গৃহ, স্নান গৃহ, যজ্ঞাগার, ভোজনাগার এবং পাকশালা হইবে ॥২২৩॥ দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ শয়নাগার, ক্রীড়ামণ্ডপ, পানাগার (মদ্যাদি পানার্থ গৃহ), রোদনাগার, ধান্যাগার, গোধূমাদি, শস্ত্রাগার, বাদ্য-যন্ত্রাগার,দাসদাসীদিগের গৃহ এবং মলমূত্র ত্যাগের গৃহ কল্পনা করিবে। পশ্চিমদিকে গো, উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তি আদি পশু সকলের রক্ষণার্থ গৃহ কল্পনা করিবে ॥২২৪-২৫॥

(ক্রমশঃ)
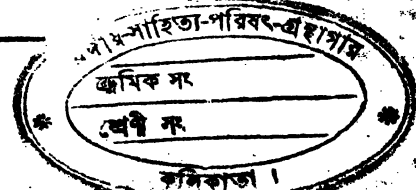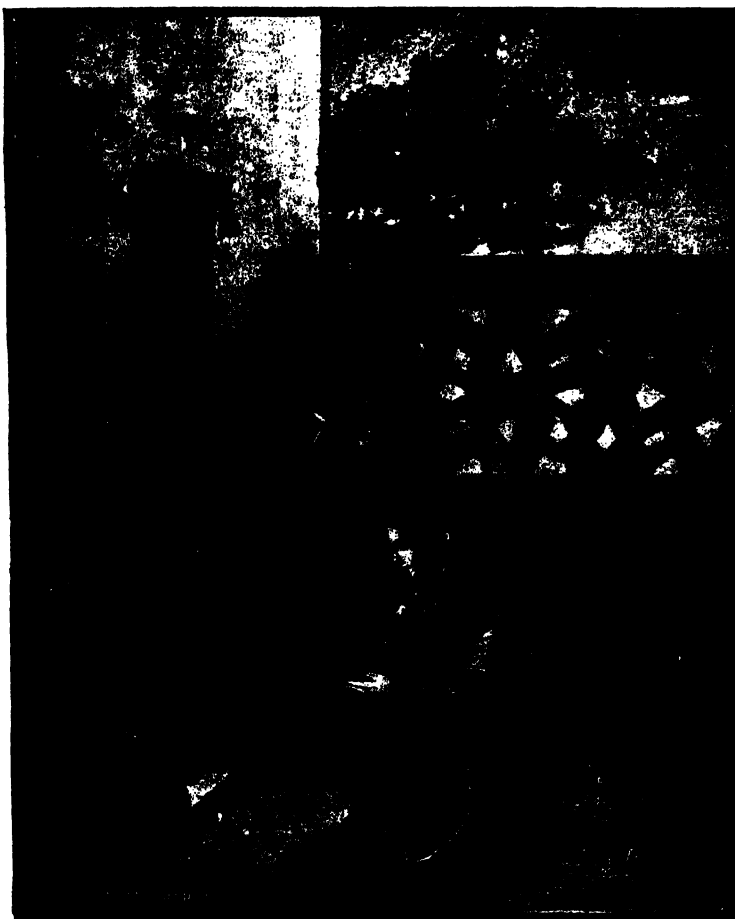
কালবরণ বাবুর সৌজন্যে।

কর্ম্মযোগ প্রেস, হাওড়া।

পূজার আহ্বান।

(শ্রীকালিদাস রায়)

মা এসেছে আজি ওগো পরবাসী
তোমাদেরে গৃহে ডাকি,
বাঁশরীতে বাজে বারোঁয়া রাগিণী
গৃহদ্বারে থাকি থাকি।
কতদিন হ'তে পথপানে চাওয়া
নাহি জননীর খাওয়া পরা নাওয়া,
দূরদিগন্তে প্রতি তরী পানে
চেয়ে আছে কত আঁখি।

শিউলি কুসুমে আঙিনা ভরেছে
আলিপনা আধ ঢাকা,
অলি পাখীকুলে আবাহন সভা
রচেছে দাড়িম শাখা।
কদলীকুঞ্জ কাঁধিভারে নত
আঙিনায় ফল সঞ্চিত কত
সব আয়োজন হইয়াছে শেষ
তোমরাই শুধু বাকী।

পূজার আনন্দ।

(গল্প)

(শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস)

শারদীয়া মহাষষ্ঠী!—আনন্দময়ীর আগমনে আজ নিরানন্দময় বাংলার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে আনন্দের নির্ম্মল উৎস ছুটিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে এক অভিনব আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে;—বিশেষতঃ বালক-বালিকারা নূতন কাপড় জামা জুতা পাইবার আনন্দে একবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পর, গোপাল তাহার মাতাকে বলিল "মা! কাল ত পূজা,—আমার নূতন কাপড় এনে দিলে না?"

মাতা বলিলেন—"বাবা! যে দুর্দ্দিন প'ড়েছে, আহার জুটা'তে পারছি না—নূতন কাপড় কোথা পা'ব?"

গোপাল বলিল—"তা' হ'বে না মা! ও বাড়ীর রমেশ, নরেশ, পারিজাত সবাই নূতন কাপড় পেয়েছে—আমায় দিতেই হ'বে।"

মাতা—"কি দিয়ে এনে দিব বাছা? আমার হাতে যে একটী পয়সাও নাই।"

গোপাল অভিমান স্বরে বলিল—"কাল সবাই নূতন কাপড় প'রে পূজা দেখ্‌তে যাবে—আর বুঝি শুধু আমি ছেঁড়া কাপড় প'রে যাব?"

ছেলের কথাগুলি দুঃখিনী জননীর স্নেহ কোমল হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিঁধিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু বিন্দু ঝরিতে লাগিল।

হায়, গত বৎসর পূজার সময় গোপালের কত সুন্দর সুন্দর কাপড়-কোর্ত্তা, জামা-জুতা হইয়াছিল। হে ভগবান! এবার কি আর গোপাল একখানি নূতন কাপড়ও পাইবে না? দুঃখিনী জননী আঁচলে চোখ মুছিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

গোপালের জননী বড় দুঃখিনী। আজ ৮।৯ মাস হইল, তাহার স্বামী নিদারুণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের অশেষ কষ্ট ভোগের পর, পরলোকে গমন করেন। তাঁহার রুগ্ন অবস্থায় চিকিৎসায় ও পথ্যাদিতে ঘটি-বাটী যাহা কিছু তৈজসপত্র ছিল, তাহা সমস্তই মহাজনের ঘরে বাঁধা পড়িয়াছে।—স্বামী দিন মজুরে রোজ যাহা আনিত—খাইয়া ফেলিত।—স্বামীর মৃত্যুর পর, দুঃখিনী মন্দার-সৌরভটুকুর মত এই বালক গোপালকে বুকে লইয়া স্বামীশোক ভুলিলেন। কিন্তু চলিবার কোন উপায় রহিল না।—খাইবার লোক দুইজন—রোজগার মোটেই নাই—কিরূপে চলিবে?—দুঃখিনী এ-বাড়ীতে ধান ভানিত, ও-বাড়ীতে কাঁথা সেলাই করিয়া অতিকষ্টে দু'মুঠা অন্নের সংস্থান করিতেছিল। এতদিন যা' হোক নিজে অর্দ্ধাশনে, অনশনে কোনরূপে গোপালকে একবেলা খাওয়াইয়া ছিন্ন কাপড় পরাইয়া কাটাইয়াছে। কিন্তু কাল যে পূজা,—ছেলেকে কাপড় দিতে হইবে। পূর্ব্বে ১ খানি কাপড় বার আনায় পাওয়া যাইত, কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধের দরুণ, আজ কাপড়ের বাজার আগুন। আজ একখানি কাপড় কিনিতে অন্ততঃ ১৷৷০ টাকার দরকার। দুঃখিনী এ টাকা পাইবে কোথায়? তাহার হাতে ত একপয়সাও নাই। তাই বড় দুঃখে আজ তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।—হায়, আজ যদি তাহার স্বামী জীবিত থাকিত, তাহা হইলে কি তার স্নেহের গোপাল একখানি কাপড় পায় না?—এইরূপ ভাবিতে

ভাবিতে বহুক্ষণ অতীত হইল।

সহসা বাহিরে কে ডাকিল—"গোপাল!" দুঃখিনী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল,—১৬।১৭ বৎসরের একটী সুন্দর যুবক বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। যুবকের বগলে এক বস্তা নূতন কাপড়! দুঃখিনীর বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল; এ-যে জমিদারের ছেলে—শরৎ! দুঃখিনী বলিল—"এত রাত্রে একা কেন বাবা?"

কোমল স্বরে শরৎ বলিল—"পূজার সময় সবাই নূতন কাপড় প'রবে, গোপাল শুধু এম্‌নি থা'কবে? তাই ওকে নূতন কাপড় দিতে এসেছি,—এই নিন্‌!"

দুঃখিনী জমিদার পুত্রের অনেক গুপ্ত দানের কথা শুনিয়াছিল। সে হাত বাড়াইয়া কাপড় গ্রহণ করিল।

শরৎ চলিয়া গেল; দুঃখিনী ভগবানের সমীপে যুবকের মঙ্গল প্রার্থনা করিল! অনন্তর কেরাসিনের মিটি মিটি প্রদীপটী নিভাইয়া সে "হরি নারায়ণ" বলিয়া হৃষ্ট চিত্তে শয়ন করিল।

(২)

শরৎ, গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। তাহার পিতার জমিদারীর আয়, বার্ষিক ২০০০০৲ টাকা। জমিদার বাবু অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি; তিনি অযথা বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় না করিয়া, যাহাতে দেশের ও দশের উপকার হয়, সেইজন্য উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় তিনি কখনই করিতেন না। তাই আধুনিক জমিদারগণের ন্যায় তিনি ঋণ-ভারাক্রান্ত নহেন।

জমিদারের ছেলে হইয়াও শরতের মনে বিন্দুমাত্র গরিমার লেশ ছিল না। শরৎ সদ্‌গুণের আধার,—একদিকে লেখাপড়ায় যেমন তাহার পরম উৎসাহ, অন্যদিকে তেমনি দেশের ও দশের কাজে তাহার অসীম আগ্রহ! সব চেয়ে বেশী আনন্দ পায় সে আর্ত্তের সেবায়, রোগীর সুশ্রূষায় ও দরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে। তাহাকে দেখিতে যেমন সুন্দর, তাহার হৃদয়ও তেমনি কোমল আর্ত্তের আর্ত্তনাদে তাহার কোমল হৃদয় গলিয়া যাইত

তাহার ইচ্ছা যতদূর সম্ভব গ্রামবাসীর দুঃখকষ্ট দূর করিবে, গ্রামের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে, হাসপাতাল স্থাপন করিবে। আর অবসর সময়ে ঈশ্বরোপাসনা করিবে।

জমিদারের আদরের পুত্র বলিয়া শরৎ পিতার নিকট হইতে মাসিক ৫০৲ টাকা পকেট খরচ পাইত। তাহার এই টাকা গুলির অধিকাংশই গ্রামবাসী দরিদ্রদিগের জন্য ব্যয়

হইয়া যাইত। যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা জননীর কাছে জমা রাখিত। ইহা ছাড়া শরতের আর একটা গুণ এই যে,—সে গুপ্ত দানের বড় পক্ষপাতী—সংসারে নাম কেনা তাহার উদ্দেশ্য নহে। তাই সন্ধ্যার পরে সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত; কাহারও কোনও অভাব দেখিতে পাইলে, সে গুপ্ত দানের দ্বারা তাহার অভাব মোচন করিয়া দিত।

সম্মুখে পূজা—শরতের মন বড়ই প্রফুল্ল! তাহার বহুদিনের একটী সাধ পূর্ণ হইতে চলিল। প্রায় ছয়মাস যাবৎ সে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছে—এবার পূজার সময় দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে বস্ত্রদান করিবে। তাই অনেক দিন ধরিয়া সে তাহার পকেট-খরচের টাকা সমস্তই সঞ্চয় করিতেছিল। সে-টাকা এখন প্রায় তিনশত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিল। শরৎ মহকুমা হইতে ভাল ভাল কাপড়-কোর্ত্তা কিনিয়া আনিল। শরৎ ইচ্ছা করিলে বাটীর সম্মুখে "দান-ভাণ্ডার" খুলিয়া বস্ত্র প্রদান করিতে পারিত এবং সংবাদ-পত্র ওয়ালাদের নিকট হইতে "বাহোবাও" পাইত; কিন্তু নামকেনা তাহার উদ্দেশ্য নহে। তাই সে নিস্তব্ধ ষষ্ঠীরাত্রে একাকী এক বস্তা কাপড় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তারপর দরিদ্র গ্রামবাসীদের কুটীর-দ্বারে গিয়া যে ভাবে বস্ত্র বিতরণ করিতে লাগিল, পাঠক-পাঠিকা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

হায়! কবে সেদিন আসিবে—যেদিন শরতের স্থায় ধার্ম্মিক কর্ম্মি যুবকগণ বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে?

(৩)

আজ মহামায়ার মর্ত্তে আগমন—মহাসপ্তমী পূজা! সম্বৎসর পরে, এই দুঃখতাপপূর্ণ বঙ্গে আনন্দময়ী মা আসিয়াছেন;—তাই আজ দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত বঙ্গবাসীর শুষ্ক অধরে পূজার মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জমিদার-বাটী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত। সম্মুখে পূজার বৃহৎ প্রতিমা! প্রভাত হইতে না হইতেই নহবতের সুমধুর সুর সমস্ত গ্রামটিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। দলে দলে নর নারী নূতন বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া জমিদার বাড়ীতে প্রতিমা দেখিতে যাইতে লাগিল—শরৎ সমাগত জনবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক, পরিতুষ্ট সহকারে ভোজন করাইতে লাগিল! সহসা শরৎ দেখিল,—একটী মলিন বেশধারী শীর্ণ বালক, তাহার ছিন্ন বস্ত্রাগ্রে খাদ্য-সামগ্রী বাঁধিতেছে। শরৎ এ-দৃশ্য দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইল। শরৎ বালককে সম্বোধন করিয়া কোমল

স্বরে বলিল—"বালক! তুমি এ-সকল না খেয়ে বাঁধিতেছ কেন?"

বালক ভয়ে ভয়ে বলিল—"বাবু! বাড়ীতে আমার মা ও একটী ছোট বোন্ আছে—তারা আজ দু'দিন ধ'রে উপবাসী আছে। তাই মনে ক'রেছি,—এসব আমি এখানে একা না খেয়ে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তিনজনে মিলে ভাগ ক'রে খাব! বাবু! আমায় ক্ষমা করুন!"

বালকের কথাগুলি শুনিয়া পর দুঃখ-কাতর শরতের দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। অনন্তর চক্ষুজল মুছিয়া বলিল—"বালক! তুমি ঐ খাদ্য সামগ্রী খাইয়া ফেল, তোমার মা ও ভগ্নীর জন্ত আমি আরও খাদ্য দিতেছি।"

বালকের আহার শেষ হইলে, শরৎ নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী ও কয়েকটী টাকা আনিয়া বালকের হাতে দিল। বালক কৃতজ্ঞতায় অশ্রুজল ফেলিতে লাগিল।

শরৎ বলিল—"তোমার ও তোমার মা-বোনের নূতন কাপড় আছে?"

বালক বলিল—"না বাবু!—খেতে পাইনে, কি দিয়ে কাপড় আনব?"

শরৎ—"তোমাদের বাড়ী কোন্ গ্রামে?"

বালক—"রাজপুর,—এখান থেকে ৭ মাইল দূরে।—আপনাদের বাড়ীতে পূজার সময় সবাই খেতে পায়,—তাই শুনে এসেছিলাম বাবু!"

শরৎ—"বেশ-তুমি আর একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের নূতন কাপড় দিতেছি!"

শরৎ গৃহে গিয়া দেখিল,—মাত্র দুইখানি নূতন কাপড় আছে;—তাহারও একখানি ছোট! শরৎ মনে ভাবিল—বালকের মা-বোনের জন্ত না হয় এই কাপড় দুইখানি দিলে চলিবে। কিন্তু ঐ শতছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত বালককে কি দিবে? নূতন কাপড়-ত আর একখানিও নাই। শরতের বড় দুঃখ হইল। এখন কি করিবে? অবশেষে সে এক বুদ্ধি স্থির করিয়া, নূতন কাপড় দুইখানি ও একখানি পুরাতন কাপড় লইয়া বালকের সম্মুখে আসিয়া বলিল—

"বালক! এই নূতন কাপড় দুইখানির একখানি তোমার মাকে, আর একখানি তোমার ভগ্নীকে দিও। আর তুমি আমার পরণের এই নূতন কাপড়-কোর্ত্তা লইয়া যাও।"—এই বলিয়া শরৎ স্বীয় পরিহিত কাপড়-কোর্ত্তা ত্যাগ পূর্ব্বক পুরাতন কাপড়খানি পরিধান করিল।

বালক ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—"বাবু! আমি এ কাপড়-কোর্ত্তা নিতে পার্ব্ব না;—আমায় ক্ষমা করুন।"

সহাস্যে শরৎ বলিল—"ভয় কি? আমি

নিজে ইচ্ছা ক'রে তোমায় দিচ্ছি!—এস তোমায় পরা'য়ে দি'।"

শরৎ সহাস্যে বালককে কাপড়-কোর্ত্তা পরাইয়া দিল।—সহসা পশ্চাৎ হইতে কে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া স্নেহ-সজল-কণ্ঠে বলিলেন,—"বাবা শরৎ! ধন্য তুই! ধন্য তোর হৃদয়!! তোর মত পুত্র লাভে আজ আমিও ধন্য!!!"

শরৎ সাষ্টাঙ্গে পিতার পদপ্রান্তে প্রণত হইল।

আহা কি করুণ-পূত মধুর দৃশ্য! আজ শরতের মত সুখী কে?—শরৎ বুঝিয়াছে—**প্রকৃত সুখ ভোগে নহে—প্রকৃত সুখ ত্যাগে—প্রকৃত সুখ দানে—** আর এ-দানেই দানের **সার্থকতা**!

সন্ধ্যা-আরতির সময় একদল বালক-বালিকা নূতন বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া জমিদার বাড়ীতে সন্ধ্যা আরতি দেখিতে আসিল। তাহাদের সকলের মুখই আনন্দে উৎফুল্ল! সকলেই নৃত্যসহ সমস্বরে গাহিতে লাগিল—

"করুণারূপিনী মাগো দীন-জনপালিনী।
দীন সন্তানে দয়া কর মাগো কল্যাণী।
নাহি ভক্তি-ধন পূজা উপচার,
কি দিয়ে পূজিব চরণ তোমার,
শুধু অশ্রুজল আছে গো সম্বল
তাই লহ আজি,—কল্যাণদায়িনী ভবানী॥"

শরৎ অদূরে দাঁড়াইয়া—আনন্দোৎফুল্ল বালকদলের সুধা-কণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত লহরী শ্রবণ করিতেছিল। সেই সুমধুর সঙ্গীতে তাহার হৃদয়ে এক অনুভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইতেছিল।—আহা! এই দীনহীন বালকগণের আজ কি আনন্দ!—ইহাদের চেয়ে আরও বেশী আনন্দ আজ শরতের!—শরৎ আজ আনন্দে মাতোয়ারা—আহ্লাদে গদ্‌গদ! আনন্দময়ীর আগমনে নিরানন্দময় বালক-বালিকার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া আজ শরৎ যে আনন্দ অনুভব করিতেছে; এমন নির্ম্মল আনন্দ সে জীবনে আর কখনও উপভোগ করে নাই। আজ তাহার "পরমানন্দ" লাভ হইয়াছে।—পরার্থে স্বার্থ বিস্মৃতি—পরের তৃপ্তিতে পরিতৃপ্তিই "পরমানন্দ" লাভ। ধন্য শরৎ! কবে তোমার ন্যায় সহৃদয় দয়াল যুবক বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে?

সোনার বাংলা।

[শেখ মোহাম্মাদ ইদ্‌রিস আলী]

সকল দেশের রাণী ইহা সোনার বাংলা সবাই বলে,
তবে তাহার পুত্র কেন বক্ষ ভাসায় চক্ষু জলে ?
ধনে-ধান্যে—পুষ্পে ভরা ইহাই যদি দেশের সেরা,
তবে কেন ভিক্ষু-অধম নির্লজ্য এর সন্তানেরা ?
সুযশ যাহার নিত্য বাজে বিশ্ব বীণার হর্ষ তারে ;
সে দেশবাসী কাঙাল কেন, এ কথাটা সুধাই কারে ?

*　　*　　*　　*

নয়ক' ঝুটো খাঁটী কথা সোনা ফলে বাংলার মাঠে,
ছড়িয়ে আছে রতন-মানিক আজও তার হাটে ঘাটে।
অন্ধ যে তার নন্দনেরা বদ্ধ হয়ে গোলামখানায়,
দেখ্‌ছে না তার কোনটা কোথায়, মুগ্ধ হয়ে মোহ মায়ায়।
চক্ষু যাদের ছিল খোলা দুঃখ তাদের গেছে ঘুচে ?
আজও তারা ভরছে গোলা নিচ্ছে রতন কুড়িয়ে মুছে।

*　　*　　*　　*

সত্য কথা নইলে কেন, আজও সারা জগদ্বাসী ;
দেশে দু'দিন উপোস গেলে হেথায় দাঁড়ায় ছুটে আসি'।
কোথাও যাহার দিন চলে না, নাইক যাহার কোন পুঁজি ;
বাংলা তাহার 'রক্ষা কবজ' পায় সে রতন হেথায় খুঁজি' ;
উপায়হীনের উপায় এদেশ, জগন্নরের পান্থশালা ;
এর দুয়ারে এলেই ঘুচে, দুঃস্থ-দীনের সকল জ্বালা।

আজও বঙ্গ বিশ্বরাণী, বক্ষে তাহার স্বর্ণ কমল ;
মুগ্ধ জগত লুব্ধ হয়ে খুঁজছে ও তার মধু অমল।
পেটের দায়ে অনাহারে মরে না'ক হেথায় কেহ,
লক্ষ্মীছাড়া সেও যে হেথা করছে খাড়া সোনার গেহ।
বাংলা ছিল রত্তন খনি আজও বাংলা আছে তাহা ;
চিন্‌লনা তার পুত্র তাকে ইহাই কেবল দুঃখ যাহা।

* * * *

আজও বঙ্গ শস্য শ্যামা পুষ্পাঞ্চলা জগত রাণী,
নাহিক দুঃখ দৈন্যগ্রস্তা ফুল্ল তাহার আনন খানি।
নিত্য নিশায় বাঁশির রবে আজও তাহার কানন কুঞ্জে,
বাস বিলায়ে বাতাস গায়ে ফুট্‌ছে কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে,
চাঁদের স্নিগ্ধ কনক করে পুলক পূর্ণ বক্ষ তাহার,
ফুর্ত্তিনাশা কুজ্‌ঝটিকায় আজও তাহা হয়নি আঁধার।

* * * *

সূর্য্য যেমন উজল কিরণ ছড়িয়ে দিত পুরাকালে,
আজও তেমনি রাঙিয়ে রাখে বাংলাকে তার রশ্মিজালে।
আকাশ তাহার তেমনি সুনীল, তেমনি অনিল-স্নিগ্ধ-মধুর,
ফলের জলের তেমনি সুস্বাদ আজও আছে তেমনি প্রচুর।
বাংলার নদ নদীর ঘাটে আজও বিকায় সোনা মাণিক,
দুঃখ কেবল দেখ্‌তে সে সব পায়না মোদের দেশী বণিক।

* * * *

জাগনা ওরে বঙ্গবাসী নস্ত তোরা অধম কানা,
দেখ্‌না বারেক চোকটা মেলে কোথায় গলদ দিচ্ছে হানা।
তোদের ঘরের রতন কনা বুদ্ধিবলে উপায় ক'রে,
কড়ার কাঙাল আমির হয়ে বেড়াচ্ছে দেখ দম্ভ ভরে।
কেন রে তোরা থাকবি দুঃখী কিসের অভাব কিসের ক্লেশ,
সকল গলদ সরিয়ে দেরে, পরিস না আর জীর্ণ বেশ

*　　*　　*　　*

ভয় কি তোদের শঙ্কা কিবা, উঠরে শুধু উঠরে জেগে,
কেবল তোদের দেখলে সজাগ সকল বালাই যাবে ভেগে।
সুখের আলো জ্বলবে তখন, বরবে তোদের ভাগ্য দেবী,
কনক কিরণ ছড়িয়ে ধীরে তোদের সুযশ গাইবে রবি।
সোণার বাংলা সোনার হবে সকল বিষাদ যাবে দূরে,
গন্ধ ভরা' মন্দ কুসুম ফুটবে তোদের হৃদয় পুরে।

অর্চ্চনা।

(শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়)

দীন হতে দীন করিয়াছ মোরে
　　দাও নাই কোন শকতি—
হীন হতে হীন করিয়াছ মোরে
　　দাও নাই প্রাণে ভকতি—
তাই ঘুরে মরি হয়ে পথহারা
নাহি জানি কোথা বহে প্রেমধারা
নাহি জানি প্রভু কোন সুধা-পানে
　　বন্ধন লবে মুকতি,

(তুমি) দীন হতে দীন করিয়াছ মোরে
　　দাও নাই কোন শকতি!
তবু ও গন্ধমোদিত এ প্রাতে
　　মনে পড়ে কোন স্বর্গ,
নিঃস্ব যদিও করিয়াছ মোরে
বাসনা তবু যে জাগে অন্তরে
শুভ্র সেফালি চয়ন করিয়া
　　রচি যাবে বসি অর্ঘ্য।

দেউলের তব দুয়ারের পাশে
দাঁড়ায়ে অযুত ভক্ত,
আমি যে দাঁড়ায়ে আছি একধারে
মন্ত্র না জানি পূজা করিবারে
নয়নের জল ঝরে পড়ে শুধু
ফুল-দল করে সিক্ত!

পূজার মন্ত্র নাহি জানি আমি
নাহি আছে হৃদে কল্পনা,
সাধ তবু প্রভু আছে অন্তরে
ভক্ত যে ফুল নিবেদন করে
কুড়ায়ে রচিব অর্ঘ্য তাহাতে
সাধিব তোমার অর্চ্চনা।

ত্রিবেণী

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩০।

আবার আসিবে বলিয়া অশ্রু সেদিন ইন্দুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিল কিন্তু আর আসে নাই। ইন্দুর মুখ হইতে সমস্ত শুনিয়া সুরেশ উপর্য্যুপরি দুই দিন অশ্রুর বাটী গিয়াছিল। কিন্তু দুই দিনই বৎসরাধিক পূর্ব্বের ন্যায় বাটীতে তালা বন্ধই দেখিয়া আসিয়াছিল। সুরেশের নিকট এ ঘটনাটী স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল। যথার্থই যদি অশ্রু ফিরিয়া আসিবে তাহা হইলে কেন সে তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই চলিয়া গেল! তবে কি ইন্দুর নিকট হইতে সাবিত্রীর পরিচয় পাইয়া সে চলিয়া গিয়াছে! যে অশ্রুর জন্য সে আজ একবৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাহার জন্য সাবিত্রীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই, যাহার চিন্তাই তাহাকে সমস্ত কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিয়াছিল, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি গ্রাহ্য না করিয়া যাহার প্রতীক্ষায় সে এতদিন বসিয়া আছে সেই কিনা তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দ্যাখা না দিয়া চলিয়া গেল। আবার অভিমান আসিয়া উদয় হইল। এবার সে সাবিত্রীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

এদিকে সাবিত্রীরও অনুতাপের সীমা পরিসীমা ছিল না। তাহার এত মনের জোর, এত প্রতিজ্ঞা সব কোথায় গেল। অশ্রুকে

দেখিয়া এমন করিয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া চলিয়া আসাটা তাহার একেবারেই ভাল হয় নাই। একটা অজ্ঞাত বেদনাই তাহাকে সেখানে বসিতে দ্যায় নাই, অবাধ্য ঈর্ষাই তাহাকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছিল এবং চোখের জলই তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

যখন শুনিল অশ্রু আবার চলিয়া গিয়াছে, এবং সুরেশ যখন বলিল, "ধ'রে রাখতে পাল্লে না, ছেড়ে দিলে!" তখন সাবিত্রীর মনে হইয়াছিল আত্মহত্যা করিয়া মরিয়া যায় কিংবা নিজেই যেখান হইতে পারে তাহাকে আবার লইয়া আসে। এত কাছে পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য সাবিত্রী নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করিল এবং ভবিষ্যতে আর কখন এরূপ ভুল করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

ইন্দুকে একদিন বলিল "আমার জন্যেই কি দিদি চ'লে গেলেন ঠাকুর্ঝী ?"

"আমিও কিছু বুঝতে পাল্লুম না সাবিত্রী। সে ঝড়ের মত এসে ঝড়ের মত চ'লে গেল। কেনই বা এল, কেনই বা গেল কিছুই বুঝতে পাল্লুম না "

"বোধ হয় আমার পরিচয় পেয়েই তিনি চ'লে গ্যাচেন। কেন তুমি তাঁকে আমার কথা বলতে গেলে ঠাকুর্ঝী।"

"বোধ হয় সেইজন্যেই চলে গ্যাচে।"

"তুমি তাঁকে থাকতে ব'ল্লে না কেন ?"

"আমার বলবার দরকার হয় নি সাবিত্রী। সে নিজেই ব'ল্লে আর যা'বে না, অন্ততঃ যে কটাদিন আমি বেঁচে থাকবো আমার কাছেই থাকবে। হঠাৎ কেন চ'লে গেলো কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।"

কিছুক্ষণ পরে ইন্দু বলিল, "আজকের দিনটা বোধহয় আমার কাটবে না বৌদি'। বয়েসে আমার চেয়ে ছোট হ'লেও সম্পর্কে আমার চেয়ে তুমি ঢের বড়। তোমার পায়ের ধুলো একটু দাও। মাথায় নিয়ে যাই। অশ্রুর এ ব্যবহারে সুরেশদা আরও যেন কেমন হ'য়ে গ্যাচেন। তাঁকে দেখ বৌদি। আর আমার বলবার কিছু নেই। অশ্রু যদি ফিরে আসে তার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নিও। তোমাদের দুজনকার মধ্যে একজনকে ছাড়তেই হবে বৌদি, নইলে সুরেশদাকে কেউই পাবে না। মাঝখান থেকে তিনিই মারা যাবেন।"

যতই রাত্রি হইতে লাগিল ইন্দুর অবস্থা ততই খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল।

ব্রজবালা ছাতে তুলসী তলার কাছে কেবল মাথা ঠুকিতেছিলেন এবং চীৎকার করিয়া

কাঁদিতেছিলেন, বলিতেছিলেন, "ওরে ইন্দু একদিনের জন্যেও তোকে যে আমি ভাল কথা বলিনিরে" ইত্যাদি। সাবিত্রী তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচ্ছন্ন সান্ত্বনা ব্রজবালার মন হইতে চলিয়া যাইতেছিল তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, মায়ের প্রাণে তিনি ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিলেন। ইন্দুর বিবাহিত জীবন যতই কেন কষ্টের হউক না, যতই কেন তিনি তাহাকে কটু কথা বলুন না, মারধোর করুন না ইন্দুই যে তাঁহার সান্ত্বনা ইহা তিনি একদিনের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। সেই সান্ত্বনা আজ চলিয়া যাইতেছে, দুঃখের অন্ধকার রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, সুখের প্রত্যুষের প্রারম্ভেই, বিধবার সান্ত্বনা সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইতেছে, কোন সান্ত্বনাই আজ তাঁহাকে সান্ত্বনা ফিরাইয়া দিতে পারিতেছিল না।

সুরেশ ধীরেনের হাত ধরিয়া ইন্দুর ঘরের সামনে বারাণ্ডায় পায়চারী করিতেছিল। বীরেন ইন্দুর কাছে ঘরে বসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে ইন্দু ধীরে ধীরে বলিল "আমার একটা কথা রাখবে?" ইন্দুর একটী হাত ধরিয়া বীরেন বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "কি?"

"বল, রাখবে। আমার শেষ অনুরোধ, পায়ে পড়ি রেখ।"

"নিশ্চয়ই রাখবো ইন্দু। তুমি যা ব'লবে তাই শুনবো।"

"আসবার সময় মা ব'লেছিলেন আমি ম'রে গেলে আবার তোমার বিয়ে দেবেন। তোমার পায়ে পড়ি মার কথা শুনো, বিয়ে ক'রো। তা না হ'লে তিনি বড় দুঃখিত হবেন।"

ইন্দুকে জড়াইয়া ধরিয়া বীরেন বলিয়া উঠিল "না, না, তা আমি ক'ত্তে পারবো না।' এমন ক'রে আমায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে যেও না ইন্দু! তোমায় আমি এখন ভুলতে পারবো না। বিয়ে আমি কখন কোরবো না।"

কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে, তাহার সমস্ত পাংশবর্ণ মুখ একটু যেন আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। ক্ষীণ হাত দুটী বাড়াইয়া তাহার পদধূলি লইয়া বলিল, "আমার অনুরোধ, বিয়ে ক'রো। আমার জন্য কেন তুমি কষ্ট পাবে! বল বিয়ে ক'রবে, মার কথা রাখবে।"

একই ভাবে বীরেণ বলিল, "তোমার গা ছুঁয়ে শপথ কচ্চি ইন্দু, তা আমি পারবো না। ও কথা ব'লে আর আমার মনে কষ্ট দিও

না ইন্দু।"

ইন্দু আর কিছুই বলিল না। মনে মনে বলিল, "এমনি ক'রেই চিরকাল ভালবেস, কখন যেন ভুলে যেও না।" খানিক্ষণ পরে প্রকাশ্যে বলিল, "মাকে দেখো, ঠাকুরপোকে দেখো, সে ছেলেমানুষ, তাকে যেন কখন কষ্ট দিও না, আদর যত্ন কোরো "

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দু আর কোন কথাবার্ত্তা কহে নাই। ভোরের দিকে ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া দেখিল সকলেই ঘরের ভিতর রহিয়াছে, কেবল ব্রজবালা নাই। বাহিরে তাঁহার ক্রন্দনের স্বর শুনিয়া বলিল. "সুরেশদা, মা অত কাঁদচেন কেন? তোমরা কাঁদচ কেন সুরেশদা? মাকে ডেকে নিয়ে এস. তোমরা সব আমার কাছে ব'সো। সাবিত্রী কৈ? আমার মনের ভেতর বড্ড কেমন কচ্চে সুরেশদা।" পায়ের নিকট ধীরেনকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"ঠাকুরপো।" দুই চক্ষু ইন্দুর জলে ভরিয়া গেল। পাদু'টী জড়াইয়া ধরিয়া ধীরেন কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল মাত্র বলিল,—"বৌদি।" জড়িত স্বরে ক্ষীণ কণ্ঠে ইন্দু বলিল,—"কেঁদ না ভাই। আবার তো আমি ফিরে আস্‌বো।" ক্রমশঃ

সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়)

সভা সমিতির নাম শুনিলে আজকাল হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইদানীং নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে সর্ব্বদা আহূত হইয়া নানাপ্রকার বার্ত্তা প্রচার উপলক্ষে দেশের হৃদয়ের স্পন্দন কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। দেশের যে এখন ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই আর কাহারও উপলব্ধি করিতে বাকী নাই। এই বোধেই আমাদিগকে প্রকৃত পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত করিবে। দেশবাসীর মনে আজ যে ব্যাকুলতা আসিয়াছে, তাহাতেই শেষ সাফল্য আসিবে বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাই চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হই না। আজ এই সভায় মহিলারা আসিয়াছেন। দেশের সমস্ত শক্তির প্রচেষ্টার সঙ্গে ইঁহারা কায়মনে যোগদান না করিলে এদেশ জাগ্রত হইবার আশা করা বৃথা।

আমি সাধারণতঃ খদ্দর সম্বন্ধেই বলিয়া

থাকি, কিন্তু বারোয়ারী উপলক্ষে মিলিত হইয়া কোন জটিল প্রশ্নের উত্থাপন করিতে চাহি না। বারোয়ারী বলিতে আমরা সাধারণতঃ "দোকান-দারী কাণ্ড" বুঝি। জানি না, এ স্থানে কয়জন দোকানদার উপস্থিত আছেন। বারোরকম লোক রং-তামাসা করিবার জন্য যে সামাজিক প্রয়োজনে মিলিত হয়, তাহাকেই বলে— বারোয়ারী, কিন্তু আজ বাঙ্গালা দেশে মুখরোচক আলোচনার বিষয় কোথায়? যে স্থানেই যাই, দেখি যুবক ও ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত, কাজেই আমাকে অপ্রিয় সত্য প্রচার করিতে হয়। এই যুবকগণ সমাজের আশা ও ভরসা স্থল, কাযেই আজও আমাদের সামাজিক কতকগুলি দৌর্ব্বল্যের কথা বলিব।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমি প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন হিন্দু সমাজের ঘোর বিপ্লবের সময়। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় যুবকবৃন্দ অনুপ্রাণিত। তাহাদের উৎসাহে সমাজ-দেহে এক বিরাট চেতনার অনুভূতি সঞ্চার হইয়াছে। তাহার পর আবার অবসাদের যুগ আসিয়াছিল। এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া সমাজে নানা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি, এখন হিন্দু-সমাজে সকল অনাচারই সহিয়া গিয়াছে। তাই বলিয়া যথেষ্ট উদারতা যে আসিয়াছে, এমন মনে করিবার কোন কারণই নাই। বাহ্যিক ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের সমাজের উদারতা বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, 'সমাজের' 'মনের' বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আমাদের অনেক ব্যাধি, শতাব্দীর পর শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অনাচারের নাগপাশে সমাজ-দেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে, রাজা রামমোহনের সময় হইতে এক শতাব্দীর প্রচেষ্টায়ও বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যৌবনে শিক্ষার্থীরূপে ছয় বৎসর একাদি-ক্রমে এবং পরে আর তিন বারে দর্শকভাবে দুই বৎসর বিলাতে বাস করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা আমাদের অন্তরের দৈন্য ও দুর্দ্দশার প্রকৃত মূর্ত্তি বুঝিতে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। আজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলিব।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা জাতীয় ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই হিন্দু কলেজে অধ্যাপক ডিরোজিওর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত একটী যুবকসঙ্ঘ সৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারাই

সর্ব্বপ্রথম আমাদের ব্যাধিক্লিষ্ট সমাজদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, ডিরোজিওর উন্মাদিনী শিক্ষার প্রভাবে এই নবীন সংস্কারকদল প্রতীচীর সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া লইতেন, আর যাহা কিছু প্রাচ্য এবং ভারতীয় আদর্শ, তাহাকেই আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে অন্তরায় বলিয়া ধরিয়া লইতেন। ইঁহাদের অন্তঃকরণে যে যথেষ্ট পরিমাণ স্বদেশ হিতৈষণা জাগ্রত হয় নাই, এরূপ ভাবিবার কোন হেতু নাই। ইঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শে জাতীয় মুক্তি সাধিত হইবে বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিতেন। জাতীয় হীনতায় এবং অবনতিতে মনে সংস্কারের ইচ্ছা বলবতী হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে, কিন্তু এই সংস্কারের ইচ্ছা কিছু উৎকট আকার ধারণ করিয়াছিল, আঘাত করিবার ইচ্ছা এতই বলবতী হইয়া ছিল যে, ইঁহারা প্রকাশ্যে গোমাংস ভোজন করিয়া হাড় প্রতিবেশীর গৃহে নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। স্বর্গীয় মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও তাঁহার সহাধ্যায়ীগণ পর্য্যন্ত এক সময়ে প্রকাশ্যে মদ্যপান করা অতি বড় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি সেকালের হিন্দুকলেজের ছাত্রবৃন্দ, বিলাতী সভ্যতাই জাতিকে মোক্ষে লইয়া যাইবে এ বিশ্বাস করিতেন। তাহার পর মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি যখন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন এবং হাইকোর্টে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখনই এই 'সাহেবীয়ানার' স্রোত পূর্ণ মাত্রায় প্রবাহিত হইল, বিদেশী হালে বাস করা, বিদেশী চালে পোষাক পরা ও কথা বলাই এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া উঠিল। হোটেলে গৌরাঙ্গদের সঙ্গে বাস করা এবং সযত্নে বাঙ্গালীত্বের সমস্ত চিহ্ন সঙ্গোপনে দূর করিবার প্রয়োজনই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল, কিন্তু আজ মনকে জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে, সেই ধারা কি রুদ্ধ হইয়াছে? এখনও কি বালীগঞ্জ অঞ্চলে ইহাই বীজমন্ত্র বা article of faith নহে? এই জাতীয়তার উদ্বোধনের দিনেও আঠার আনা সাহেবীর ইচ্ছা কোন কোন অঞ্চলে বর্ত্তমান!

ইহার ফলে, একটী প্রতিঘাত তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির 'আর্য্যামীর' পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়, একদিকে যেমন উৎকট 'সাহেবিয়ানা'ই জাতিকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় বলিয়া এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করিতেছিলেন, তেমনই এই আর্য্যামীর আস্ফালন আরম্ভ করিলেন আর একদল। সেই সময়

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর General Assembly Hallএ একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন—'আর্য্যামী ও সাহেবিয়ানা'। কবিবর রবীন্দ্রনাথ তখন লিখিয়াছিলেন—

"মোক্ষ মুলর বলেছে 'আর্য্য,'
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য্য,
মোরা বড় বলে করেছি ধার্য্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।"

জাতীয় আন্দোলনের পর হইতে এই উৎকট 'সাহেবিয়ানাকে' আমরা বড় আর প্রকাশ্যে আমল দিই না। কিন্তু ইহা ওতঃপ্রোত ভাবে যেন আমাদের নব্য সমাজের অস্থি মজ্জায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী ঘটনার কথাই বলিব। আজকাল চা প্রায় সকলেই পান করেন—যদিও এই চা'ই আমাদের দেশের অজীর্ণতা এবং দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি আধুনিক ব্যধিগুলির অন্যতম কারণ। এই চা'র সঙ্গে বিস্কুট খাওয়াও আজকাল ফ্যাশান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটিন বিলাতী হান্টলী পামারের বিস্কুটের মূল্য ৩৲।৩৷৹ টাকা দিতে হয়। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি বলিতে পারি, এই বিস্কুট আমাদের দেশের মুড়ি অপেক্ষা কোনমতে খাদ্যরূপে উৎকৃষ্ট নহে, একথা অনেকে জানেনও; কিন্তু মুড়ির নামে কে না নাসিকা কুঞ্চিত করেন? এই যে মনোভাব, ইহার মধ্যে কি 'সাহেবিয়ানা' খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? ভদ্রলোক-অতিথিকে বিস্কুটের পরিবর্ত্তে মুড়ি দিয়া অভ্যর্থনা করিবার সাহস নাই কেন? এই বিস্কুটের জন্য যে প্রতি টিনে অন্যূন ৩৲ টাকা বেশী খরচ করিতে হইতেছে, তবু করি কেন? আমরা কি বিলাতকে এতই ভালবাসি যে, প্রতি টিন বিস্কুট কিনিবার উপলক্ষে ৩৲ টাকা মণি-অর্ডার করিয়া সাহায্য করিতে ব্যস্ত হই? এই তথা কথিত 'সাহিবি' সভ্যতার বাহিরের পরিচায়ক নয় কি? অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে ইহা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ চৌরঙ্গীতে থাকিতে হইবে অর্থাৎ আমি যাহা নহি, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে হইবে, যাঁহারা বিলাত হইতে ডাক্তার ব্যারিষ্টার হইয়া আইসেন, তাঁহাদিগকে প্রথমেই মোটর কিনিতে হইবে, বাহিরের নানাপ্রকার জাঁকজমকের দ্বারা লোক ভুলাইতে হইবে। সমাজের চক্ষুতে ধূলি দিয়া ধাঁধাঁ লাগাইতে হইবে যে, আমার পসার বেজায়। এই মিথ্যা অনুষ্ঠানের উপর দাঁড় করান আমাদের 'সাহেবিয়ানার' প্রভাব সমাজ-দেহে সর্ব্বত্র বিসর্পিত হইয়াছে। গৃহলক্ষ্মী-দিগকে আরও একটা সহজ উদাহরণ দিব।

বিবাহ উপলক্ষে পাকা দেখার খাওয়া আজকাল একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। মহারাজকেও পরাস্ত করিয়া অকালের ফল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ভোজের আয়োজন দরিদ্র কেরাণী পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। অকালের আম কি খাইতে বেশী সুস্বাদু? অত্যধিক মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিবার মত বিত্তশালীও সকলে নহে। তবুও ইহা কোন্ উদ্দেশ্যে করা হয়? নিমন্ত্রিত দশজনের দৃষ্টিতে নিজের কদর বাড়াইবার এবং নিজেকে ধনী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছাই কি ইহার মূলে দেখিতে পাই না? এইরূপ মিথ্যাচার আজ সমাজের সর্ব্বত্র।

পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে আজকাল যে বিলাসিতা ঢুকিয়াছে, অবশ্য ব্রাহ্মণ-সমাজ মূলতঃ তাহার পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজ কোন অংশে কম যান না; পরন্তু অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু-সমাজই অগ্রণী। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি প্রচেষ্টাই কি এই বিলাসিতার একমাত্র কারণ? দশজনের মধ্যে বস্ত্র এবং অলঙ্কারের বহু মূল্যতা দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কোন ইচ্ছা কি ইহাতে অবর্ত্তমান থাকে? মুখে জাতীয়তার আদর্শ আওড়াইলে কি হইবে? ভারতের চিরন্তণ আদর্শ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে থাকে কোথায়? দরিদ্র-দেশকে এই সমস্ত বিলাসিতার অনাচার দ্বারা আমরা আরও দরিদ্র করিয়া তুলিতেছি এবং সর্ব্বনাশের পথে লইয়া চলিয়াছি.—আমাদের ব্যবহারে তাহা যে বুঝিয়াছি, তাহার প্রমাণ কোথায়?

বিলাতের অনুকরণ স্পৃহা আমাদের অস্থি মজ্জাগত, প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে সিডনী স্মিথ বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে "Poverty is regarded as infamous". আমরাও সেই আদর্শ মনে মনে বরণ করিয়াছি, তাই ইংরাজের দেখাদেখি সহজে ধনী হইবার আশায় যৌথ কারবারের পত্তন করিতেছি। পত্রান্তরে—সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড নামক যে উৎকৃষ্ট নক্সা বাহির হইয়াছিল, অনেকেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। প্রথম প্রথম লক্ষ টাকা মূলধন করিয়া এই সমস্ত কোম্পানী জাহির করা হইত, এখন ক্রমেই মাত্রা বাড়াইয়া ২০।২৫ লক্ষে এবং এক কোটিতে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজের কাজ করিবার পদ্ধতির অনুকরণ জন্য যে যত্ন ও অধ্যবসায় আছে, তাহা আমাদের নাই, কিন্তু বাহিরের আড়ম্বর, চটক ও জাঁকজমক এবং ধরণধারণ নকল করিয়াই আমরা সফল হইবার আশা করি। ইংরাজের ব্যবসায়ে সততা আমরা অনুকরণ করি না।

অনেকে নিজেদের ব্যবসায়ে কু-কীর্ত্তি দুই একটা ইংরাজ কোম্পানীর আচরিত জুয়াচুরীর দোহাই দিয়া ক্ষালন করিতে চাহেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান কদাচিৎ দুই একটা ইংরাজ কোম্পানীই এরূপ করিয়া থাকে। অধিকাংশই সততার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অংশীদারদের স্বার্থ-রক্ষা করিয়া থাকে। আর যদি বা ইংরাজ কোম্পানীগুলি অসাধু হইত, ইংরাজ পাপাচরণ করে বলিয়া কি আমাদেরও তাহা করিলে পুণ্য হইবে? ইংলণ্ডে দারিদ্র্য দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাই বলিয়া, আমরা কি বুঝিব যে, জীবনে যতকিছু কুকার্য্যই করি না কেন, যদি প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে পারি এবং অনেকে আমার অনুগ্রহ ভিখারী হয়, তবে আমার সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে? যদি কোন সাধু এবং সদ্‌ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্য না হইতে পারেন, তবে কি তাঁহার দারিদ্র্য দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইবে? আমাদের দেশে এই বিকৃত পাশ্চাত্য আদর্শ আসিয়াছে। কারণ এদেশে দারিদ্র্য কোন দিন লজ্জার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত না। নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের পত্নী অলঙ্কারের অভাবে বাম মণিবন্ধে লাল সূতা বাঁধিয়া রাখিতেন; কিন্তু জানিতেন, সে সূতা যেদিন খুলিতে হইবে, নবদ্বীপ সেদিন অন্ধকার হইবে। কুচরিত্র, হীন ব্যক্তি আজ যদি লাটের সভায় সভাসদ্ হয়েন, তবে কি আমরা তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া নানা প্রকার চাটু-বাক্যে তাঁহার তোষামোদ করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হই? দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতিই আমাদের যত কিছু সামাজিক শাসন। শুধু তাহার দারিদ্রের অপরাধেই যত প্রকার সামাজিক উৎপীড়ন আমরা করিয়া থাকি। যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাহার বালিকা বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দেয় এবং যদি তাহার যথেষ্ট অর্থবল না থাকে, তবে তাহার অপরাধ; আর ধনীর এইরূপ আচরণে কোন বিশেষ সামাজিক গোল হয় না। তিনি তাঁহার অর্থের প্রভাবে হেলায় বৈতরণী পার হইয়া যায়েন।

আর একটী সামাজিক কুপ্রথার কথা বলিব, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনাও হইয়াছে। পণ প্রথায় আমাদের দেশের যে কিরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। বড় বড় বক্তৃতা, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর ইত্যাদি সব কাজই আমরা যথানিয়মে পালন করিয়াছি। কিন্তু নিজের পুত্রের বিবাহে অন্তঃপুরের দোহাই দিয়া যুগপৎ প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং অর্থলোভের সমন্বয় করিয়া থাকি। শত শত স্নেহলতার মৃত্যুতে কলঙ্কিত এই বঙ্গদেশে আজিও এই

প্রথার উপশম হইল না! তাই কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রাগ্রস্ত এই জাতি কোনদিন জাগিবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। এই পণ প্রথার সহিত অপর একটী প্রথার উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। সম্প্রতি বিবাহে লৌকিকতা প্রদান করাও একটা ব্যাধিতে দাঁড়াইয়াছে। ইহা আমরা আমাদের গুরু ইংরাজের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। ইংরাজের বড় বড় বিবাহের পরদিন কাগজে লাটসভার সদস্য বণিক, সিবিলিয়ান্ প্রভৃতির প্রদত্ত উপহারের তালিকা প্রকাশিত হয়, এবং আমাদের দেশীয় একদল ও ঐরূপ কাগজে নিজের উপহারের বিজ্ঞাপন দেখিবার চরম সুখটুকু লাভ করিবার জন্য বহুমূল্য উপহার অকাতরে অর্থ ঢালিয়া ক্রয় করিয়া থাকেন। আজকাল কোন কোন অঞ্চলের fashionable wedding এ উপহার তালিকা বাহির হইয়া থাকে। ইহা আবার দেশীয় পরিচালিত (Native) কাগজে হইলে চলিবে না; খাস চৌরঙ্গীস্থ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইলে তবে নেটিব-জীবন ধন্য হইবে। আর আমাদের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণী ধনীদের অনুকরণ করিয়া এই লৌকিকতাকে উৎপীড়নের একটী যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে। তবে সুখের বিষয়, কায়স্থ সমাজে সারদা চরণ মিত্র প্রভৃতি কতিপয় অগ্রণীর চেষ্টায় এই কুপ্রথার প্রচলন কিছু কমিয়াছে। বিবাহে পণ প্রথা নিবারণ করিতে অনেক বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সুফল কিছু হয় নাই, হইবেও না, যতদিন কন্যাদিগকে আমরা সযত্নে শিক্ষা দিয়া আত্ম-মর্য্যাদাবোধে প্রবুদ্ধ না করিতেছি। সম্প্রতি দেখিয়া আসিলাম, বোম্বাই আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কলেজে কলেজে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একত্র বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। আমরাত হিন্দুত্বের বড়াই করিয়া থাকি। সে দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে কি দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা অনেকেই জানেন; মছলি খায় শুনিলে তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন। অথচ তথায় স্ত্রী স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান্। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাদ্রাজী লিখিয়াছিলেন, সমাজ সংস্কারে বাঙ্গালা অগ্রণী। যে দেশ রাম মোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির জন্ম দিয়াছে, তাহা সমাজ সংস্কারের দেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু এখন বাঙ্গালায় সমাজ সংস্কার কোথায়? আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তার হইতেছে সত্য, বিলাতী সভ্যতা আমরা অনেকেই গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সমাজ সংস্কারের পথে দিন দিনই আমরা পশ্চাতে যাইতেছি। অথচ বাহিরের দিকে

দেখিলে আমাদের সংস্কারের অবশিষ্ট অতি অল্পই আছে। এখন আহারবিহারের কোন বাধাই আমরা মানিনা। কেশব বাবুর সময়, এক পূর্ব্ববঙ্গবাসী কলিকাতায় আসিয়া বলিয়াছিল, "কেশব সেন, উইলসেন (Wilson's Hotel) এবং ইষ্টিসেন (station) এই তিন সেনে মিলিয়া বাঙ্গালা দেশের জাতি নষ্ট করিতেছে।" এখন কেল্‌নারের হোটেলে খাইতে আমাদের আর কোন বাধা নেই। কিন্তু সামাজিক নিমন্ত্রণে পংক্তি ভোজন করিলেই যেন জাতি নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে সমাজের এক অঙ্গকে ক্রমাগত অপাংক্তেয় অস্পৃশ্য করিয়া আমরা হীনবল হইয়া পড়িতেছি। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে মাদ্রাজে ২লক্ষ টিয়ার মুসলমান বা খৃষ্টান্ হইয়া যাইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ সামাজিক উৎপীড়ন। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থে শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিষ্ঠায় কে বড়, কে ছোট, তাহা বিচার করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু মাদ্রাজে অব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার অসহনীয়। বাঙ্গালায় যদি দানবীর তারক পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, সারদাচরণ মিত্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি কায়স্থ সমাজের সুধীবৃন্দকে সামাজিক অত্যাচারে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে কি মর্ম্মান্তিক হইত, শুধু তাহাই কল্পনা করুন। এই টিয়ার সম্প্রদায় সমাজের সামান্য অধিকারটুকু লাভ করিতে অক্ষম হইয়াই আজ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তি আছেন। বাঙ্গালায় নবশাক প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতি আমরা অবিচার করিয়া থাকি। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালায় দৃষ্টি দোষে ভোজন নষ্ট হয় না। কিংবা এক পুকুরে স্নানাদিতেও কোন সামাজিক বাধা নাই। মাদ্রাজে নিম্নশ্রেণীর প্রতি কিরূপ নির্য্যাতন করা হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন, পারিয়াদের প্রতি অত্যাচার যে কতবড় জাতীয় কলঙ্ক তাহা এই জাতীয়তার জাগরণের দিনে আর বেশী করিয়া কি বলিব?

আর্য্যসমাজ সম্প্রতি রাজপুতানার ৬ হাজার মুসলমানকে হিন্দু ধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে সমস্ত মুসলমান সমাজে কি আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে! ধনি-দারিদ্র-নির্ব্বিশেষে সামাজিক সমন্বয়ের এতবড় আদর্শ এক ইস্‌লাম ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন ধর্ম্মে নাই। তাই নির্য্যাতীত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ইস্‌লামের আশ্রয়ে মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার আশায় যাইতেছে। আমাদেরই বাঙ্গালা দেশে ফরিদপুর অঞ্চলে নমঃশূদ্রদের প্রতি সামাজিক নির্য্যাতনের

ফলে গ্রামের পর গ্রাম হয় খৃষ্টান নয় মুসলমান হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আমাদের সমাজে কোনরূপ বিক্ষোভ উঠিয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

বাঙ্গালার হিন্দুজাতি ধ্বংসোন্মুখ; আর মুসলমানগণ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ, মুসলমানদের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা আছে। হিন্দু তাহার পৈতৃক ভিটা আগলাইয়া বাপ পিতামহের নাম বজায় রাখিতে ব্যস্ত হইয়া যখন ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন মুসলমান যুবকরা পদ্মার অজানা চরে যাইয়া আবাদ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে ব্যস্ত; কেহ ষ্টীমারে খালাসী, সারেঙ্গ হইয়া স্বতন্ত্র জীবিকা অর্জ্জন করিয়া বাপ পিতামহের দুই বিঘা জমিতে ভাইদের সঙ্গে ভাগ বসাইতেছে না। যেভাবে বাঙ্গালার হিন্দুজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ২৫ বৎসর পরে হিন্দু মুসলমান সমস্যার মীমাংসা আপনিই হইয়া যাইবে। প্রকৃতিকে এড়াইয়া ফাঁকি দিয়ে বাঁচা অসম্ভব। You can not cheat nature of her dues. প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ লইবেই লইবে। শুধু আধ্যাত্মিকতার বড়াই করিয়া জগতে বাঁচিয়া থাকা যায় না। সামাজিক দুর্নীতি সকল কূট তর্কে দূর হয় না। হিন্দুদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেই জগতে আমাদের স্থান হইবে না। আমরা যদি অচিরে সমস্ত সামাজিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান না করি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ যে ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, তাহা না বলিলেও বুঝা যাইতেছে।

আজকাল যেমন কালাজ্বর ও হুকওয়ার্ম নূতন ব্যাধি দেশে দেখা দিয়াছে, তেমনই সমাজে আর একটা বড় ব্যাধি আসিয়াছে—জুয়া। জুয়া খেলা যে আকারে সমাজে চলিত, তাহাতে মানুষের কত বিপদ হইতে পারে, মহাভারতে অক্ষক্রীড়ায় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির দুর্গতিতে তাহা দেখান হইয়াছে। আর আজ, রাতারাতি বড়মানুষ হইবার চেষ্টায় সহরে ঘরে ঘরে জুয়া খেলা! তুলার খেলায় অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আবার ঘোড়দৌড়ের নেশা নাকি অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ!

যদি কাহারও মনে কোন ব্যথা দিয়া থাকি, তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। অপ্রিয় আলোচনা বন্ধ রাখিলে রোগ সারিবে না। এই অধঃপতিত জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মন বিষাদে আক্রান্ত হয়। জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত একাসনে বসিবার স্থান পাইতে হইলে সমাজ দেহের

ক্ষতগুলির উপর অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। ইহাতে যে বেদনা বোধ হইবে, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া সহ্য করিতে হইবে।

আজ আমাদের হৃদয়ের অবসাদ দূর হইয়া এই জাতি নব বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠুক এবং অন্তরে জাতীয় জীবন-দেবতার আহ্বান ভেরী শুনিয়া আমরা জাতি গঠনের কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োজিত করি। বসুমতী।

মাতৃ-আবাহন।

(শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য)

অয়ি সুখময়ি শরৎ! কে তোমাকে সৃজন করিল? তোমার ললাটে বালার্ক-সিন্দুর-বিন্দু কে শোভিত করিয়া দিল? তুমি সর্ব্বদা মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছ, সদাই আনন্দে বিভোর। এই অনন্ত প্রেম মিশ্রিত হাস্য কেই বা শিক্ষা দিল? জগৎ মোহিত করিয়া, বিপিনে কাহার চরণারবিন্দ বন্দনা করিবার নিমিত্ত এই সুমোহন গীত গাহিয়া সকলের প্রাণে এক অপূর্ব্ব প্রেমের উৎস প্রবাহিত করিতেছ? বল,—কাহার নিমিত্ত এরূপ লালায়িত? কাহাকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে আজ নব বেশে সজ্জিত? কাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, কমল-নয়ন খুলিয়া অনন্ত মাধুর্য্য পান করিতে উদ্যত? কাহার জন্য নির্ম্মল প্রেম-অশ্রু নির্ঝরিত হইতেছে? জগৎ কি মোহিনী মন্ত্রে তোমার দর্শনমাত্র নবজীবন লাভ করিল? ধন্য তোমার কুহকিনী শক্তি! যে তোমাকে এইরূপ সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিল, একবার তাহার অনন্ত মাধুর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য কান্তি দেখাও! বুঝিয়াছি,—আর বলিতে হইবে না, কেন আজ রূপসী প্রকৃতির মোহিনী বেশে সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়া কুসুম-অর্ঘ্য হস্তে অপেক্ষা করিতেছ? বুঝিয়াছি,—আনন্দময়ী জননীর আগমনের জন্য এত আয়োজন।

এস মা, প্রোজ্জ্বলপীতকাঞ্চন জ্যোতির্ম্ময়ী! নির্ম্মল অনন্ত গগনে একবার দেখা দাও। তোমার আলোকপ্লাবনে স্নিগ্ধ উষাকে প্লাবিত কর। এস মা, ত্বরায় আগমন কর। বিশ্বমানব অন্তরে বরাভয় ঢালিয়া দাও। পবনদেবকে অন্ধ করিয়া সুবিমল অঙ্গের মধুর মদির গন্ধে সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত কর। কোটী কোটী কুসুমহাস্যে কাননকুঞ্জভবনে আগমন কর। সৃষ্টির গলদেশে

বর্ণে বর্ণে রজতে স্বর্ণে মাল্য শোভিত করিয়া দাও! জগৎবাসীর হৃদয়ানন্দবর্দ্ধিনি! সত্বর আগমন কর মা! একবার নিযুতছন্দে সঙ্গীতের সঞ্জীবনী মন্ত্রে সকলের নিদ্রা ভগ্ন করিয়া দাও। এই শস্য-শ্যামল উৎসবপুরে, এই শুভ্র-শেফালী-মণ্ডিত ধরাপ্রাঙ্গণে পদ দান করিয়া, মিলনানন্দ প্রেমগান গাহিতে গাহিতে দৈন্য, বিপদ ও শঙ্কা চিরতরে হরণ কর মা! বর্ষা-নিরদ-নির্ঝর-বারি-ধৌত-বদন লইয়া একবার দেখা দাও। এস "কর্ম্মমুখরমন্দির মাঝে মর্ম্মের চিরভাষা"! এস সুখসম্পদময়ি! সংসার তোমার জন্য আকুল হইয়া কাঁদিতেছে! তোমার সস্নেহ চুম্বন দান করিতে বোধনবাদ্য শঙ্খস্বননে আগমন কর। এস মা! তোমার কুন্তলরাজিতে তারাপুঞ্জের আঁখিভরা করুণা নয়ন ভরিয়া দেখিব। 'সুন্দর-শিবমঙ্গলমধুর রসে' চিরতরুণা জননী! "উদ্দাম চলচপল চিত্তে উত্তাল সাগরের বান"! মানবের ঘরে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধাময় জীবনের তান ধর। চন্দ্রসূর্য্যের বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে অম্বরোপরে মত্ত হইয়া, ফেনিলোচ্ছ্বল সিন্ধুর শিরে ঊর্ম্মির মালা গাঁথিয়া, জ্যোৎস্নামগ্নানন্দিতা নিশিথিনীর সুখ স্বপ্নের মধুদ্বার উদ্ঘাটন কর; শতবার শান্তশোভার সম্পদছবি বন্দনা লও।

আমাদের সস্নেহ আহ্বান জননী বুঝি শুনিতে পাইয়াছেন! মা আসিতেছেন, হে জগৎ, দেখিবে এস। মায়ামুগ্ধ জীবের কি এই ভয়ঙ্করী মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিবার শক্তি নাই। কে এমন ভক্ত আছ, কে এমন মাতৃবৎসল সন্তান আছ, কে এমন সাধক আছ, কে এমন জিতেন্দ্রিয় পুণ্যবান্ আছ,—একবার গৃহের বাহির হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া জননীর 'মায়ামোহধ্বংসকারী', অপরূপ রূপ দেখিয়া জীবন ধন্য কর। এস! এস—মাতার প্রিয় সন্তানগণ, আমাদের মা আসিতেছেন—দেখিবে এস। সেই অনন্ত লাবণ্যচ্ছটা দেখিবে এস। এমন রূপ ও কান্তি কখনও দর্শন কর নাই,—এমন ভীষণত্বের সহিত সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ কখনও দৃষ্টিগোচর কর নাই। এমন 'দুষ্ট-ইন্দ্রিয় প্রমথনকারী' ভয়ঙ্করী রূপমাধুরী কখনও উপভোগ কর নাই। এস—মায়ের বীর, সাহসী, শুচি পুত্রগণ—এস, নয়ন ভরিয়া মায়ের কালভয়বারণ মধুর ভীষণ রূপ দেখিয়া লই। আমাদের প্রাণ, মন বিভোর হইয়া যাইবে। আমাদের হৃদয় অনন্ত বিহায়সের ন্যায় উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। আমাদের মানব জন্ম সার্থক হইবে। মায়ের সৌন্দর্য্যময়ী রূপমাধুরী একবার মনোযোগ সহকারে দেখি এস! 'ভয়ঙ্করী

অন্তরালে মায়ের করুণাময়ী মূর্ত্তি বিরাজ-

মানা।' মায়ের উলঙ্গ কৃপাণের দিকে একবার দেখ দেখি,—এস একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই—অসির পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রেমের অনন্তধারা প্রবাহিতা,—সম্মুখ দিয়া প্রচণ্ড দানবের রুধির-ধারা বিনির্গত হইতেছে। এস! এস! আমরা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া দেখি—বিশ্বময়ী ধরা-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণা হইতেছেন।

আজ পরমাপ্রকৃতি দিব্যলোকে গমন করিবেন। আজ লঘুগুরু মিলিয়া সমান হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রেমে আজ সকলেই বিভোর, সকলেই এক অদ্বিতীয়া পরমাপ্রকৃতি জননীর সন্তান। আজ যেন সকলেই এক সংসারভুক্ত। এযে বড় স্পৃহনীয় মিলন, এযে একপ্রাণতার পূর্ণ-চিত্র! আমরা মহাপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি ভগবতীকে বিশ্বজননী বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, তখন আমরা দেখিতে পাইব,—আমাদের মাতার জগৎসংসার আমাদেরই, জগতের সকল নরনারী আমাদেরই ভ্রাতা, ভগিনী। জননীর অমরবাঞ্ছিত স্নেহ-সুধা পান করিয়া আমরা সফল-জন্ম হইব। আমরা ইহ-সংসারে হিংসা, দ্বেষ ভুলিয়া সকলকে সমান বিবেচনা করিব। আত্মপর বিস্মৃত হইয়া সকলেই এক অনন্ত মাতৃপ্রেম-ডোরে আবদ্ধ হইব, এবং প্রেমময়ীর অনন্ত ছবি শান্ত-হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়া তাঁহার সারূপ্য লাভ করিতে পারিব। তখন ভগবৎপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইব; তখন মনের মলা ধুইয়া যাইবে, হৃদয়ে শান্তিধারা বহিতে থাকিবে। মন কলুষ ও সন্তাপ হারাইবে।

দেবী-পূজার উদ্দেশ্য সুমহৎ। দেবীর প্রতিমা একতার পূর্ণচিত্র। দুর্গা দেবগণের শক্তি-সম্ভূত মূর্ত্তি নারীতে পরিণতা মহাশক্তি-রূপিণী বিশ্ব-জননী দশভূজা। একতা প্রাপ্ত হইলেই মহাশক্তির সঞ্চার হয়। শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইলে লক্ষ্মী ও সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া সুধাদানে পরিতৃপ্ত করেন। একদিকে সিদ্ধি ও অপরপার্শ্বে রক্ষার নিমিত্ত দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়। দেবী স্বয়ং সর্ব্বশক্তির আধার—আবার স্বগণে সেই মহাশক্তির পৃথক্ বিকাশ হইয়াছে। লক্ষ্মীতে সৌভাগ্য-শক্তির সঞ্চার, সরস্বতীতে বাক্-শক্তির, কার্ত্তিকেয়ে পরাক্রম-শক্তির এবং গণেশে বিঘ্নহরণ শক্তির বিকাশ পাইয়াছে।

এই মহাপূজার নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতা আছে। আমাদের হৃদয়-কন্দরে প্রতিনিয়ত দুর্গোৎসব সংসাধিত হইতেছে। আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে অমঙ্গলের সহিত মঙ্গলের সংগ্রাম, দানবরূপী কুমতির সহিত দেবরূপী সুমতির

সংঘর্ষ সর্ব্বদাই সাধিত হইতেছে। বিশ্বপিতা জগদীশ্বরের শক্তিপ্রভাবেই মঙ্গল, অমঙ্গলকে দমন করিয়া থাকে, সুপ্রবৃত্তির ও সুনীতি কুপ্রবৃত্তি ও কুনীতির উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করে। দেবীপূজার এই সনাতন তথ্যই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা যে দিন মায়ের পূজার দ্বারা বলীয়ান্ হইয়া এই মহাসত্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিব—যেদিন অমঙ্গল ও কুনীতি বা কুমতি রূপ দানবগণকে জয় ও বিনাশ করিয়া জগতে মঙ্গল ও সুনীতি বা সুমতির একাধিপত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইব,—যেদিন বাহ্য-আলিঙ্গন, অভিবাদন, প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ হইতে অন্তরে অন্তরে আলিঙ্গনাদি করিতে পারিব; যেদিন দশমীর দিবস সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে প্রকৃত সিদ্ধি করতলগত করিতে পারিব, সেই দিনই মাকে যথার্থ সম্মান করিতে শিখিব, সেই দিনই আমাদের মহিষার্দ্দিনী জগদম্বার পূজা সার্থক হইবে। আমরা ধন্য হইব। মায়ের করুণা কটাক্ষে অভিনব প্রাণ প্রাপ্ত হইব।

এস মা—দশভূজে। আশার স্নিগ্ধ অঞ্জনে আমাদের চক্ষু মাজিয়া দাও। তোমার বরাভয়-দায়ী কর স্পর্শে মোহ কাটিয়া যাক্; অন্তরের অন্তস্তলে সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত হোক্। আমরা যেন একপ্রাণে একতানে বিশ্ব কাঁপাইয়া উদাত্ত কণ্ঠে গাহিতে পারি,—

"তুমিই মনের তৃপ্তি, তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ হারা হই;
করুণা কটাক্ষে তব পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তি রসে মগ্ন হ'য়ে রই।
যে কদিন আছে প্রাণ, করিব তোমার ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙা চরণতলে॥"

এই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাক। কিসের দুঃখ? বিশ্ব প্রকৃতি জননী যাহাদের সহায়, তাহাদের কিসের ভয়?

সকলেই জননীর সারূপ্য হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। সকলেই একতামন্ত্রে দীক্ষিত হও। আবার ভারতের গগন পট নবীন উষার আলোকচ্ছটায় তরুণ রবির স্বর্ণ কিরণ জালে উদ্ভাসিত হইবে। সকল দৈন্য, দুঃখ কাটিয়া যাইবে। মায়ের অনুগৃহীত কৃতী সন্তান হইয়া আবার ধরণী বক্ষে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে। আমরা গাই,—

"জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি গো, নমি নমি।
জয় জয় পরমা নির্বৃতি গো, নমি নমি।
গ্রন্থিচ্ছেদন খরসংঘাতকারিণী,
স্ফূর্ত্তি, মুক্তি, বিস্মৃতি গো, নমি নমি।
নমি নমি তোমারে, অয়ি জননি।"

পাগলের কথা।

(শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

শারদীয় কাদম্বিনীকুল! উন্মুক্ত আকাশ-মার্গে দলে দলে চলিয়াছ;—চলিয়াছ বটে, কিন্তু এ যাত্রার যেন কোন গন্তব্যস্থল নাই,—যেন কাহার আগমনোপলক্ষে পথ বিধৌত করিবার মানসে বারিঝারা লইয়া মঙ্গলধারা ঢালিতে ঢালিতে চলিয়াছ। কতদূর যাইতে হইবে, আর কোন দিকেই বা যাইতে হইবে, তা বুঝি জান না? তাই তোমাদের নিয়ন্তা কালের আদেশে পরিচালিতা হইয়া তাহারই পাছু পাছু চলিয়াছ? এই যাত্রাই কি শেষ যাত্রা? অথবা স্মরণাতীত কাল হইতে এই মহাযাত্রার প্রারম্ভাবধি কেবল চলিয়াছ—আর চলিয়াছে! অবসন্ন—শ্রান্ত—দেহ খানি টানিয়া টানিয়া কালের ইঙ্গিতে আরও কতকাল এই ভাবে চলিবে তা' বুঝি তোমরাও জান না, আমরাও জানি না? জানিবার প্রয়োজনও দেখি না। তোমরা ঐ অগাধ বায়ু সমুদ্রে ভাসিয়া যাও;—যাইতে যাইতে তোমাদের উদার হৃদয়ের পূর্ণ-ভাণ্ডার হইতে দুই চারি কোঁটা পীযুষ ধারা ঢালিয়া দিয়া যাও—যাহার আশায় আমরা চাতকের মত ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া আছি—আমরা কৃতকৃতার্থ হই! আর যদি পার, তবে, অয়ি, অপার্থিব—স্নেহ ভালবাসাময়ী—ব্যোমচারিণী—পরীর দল, এই নিতান্ত অভাগা পাগলটাকে সঙ্গে লইয়া যাও! ঐ চরণে নূপুর হইয়া রহিব,—যাত্রাকণ্টক হইব না। আবার যদি কখনও এদেশাভিমুখে ফিরিতে আদিষ্টা হও, তখন আমি আপনিই তোমাদের ঐচরণাশ্রয় পরিহার করিয়া অস্তাচলের শিখরদেশে অবস্থান করিব; পরে আলোর রাজাসহ চিতারোহণ করিয়া নিদারুণ অন্ধকারে নিরাশব্যথা-অনুভূতির হাত হইতে এড়াইব।

ভাল,—আমি তো বলিলাম অনেক, তুমি যেমন চলিতেছিলে তেমনি চলিলে, শুনিলে কৈ? তপ্তবুকে শীতল অমিয় ঢালিয়া দিয়া লুপ্তপ্রায় আশারাশিকে—কাণায় কাণায় উথলিয়া তুলিলে। এবার জীর্ণ বাঁধ ভঙ্গ করিয়া পাগল-ধারা বুঝি বা ধায়! যা ছিল—তাও বা ভাসিয়া যায়! যায় যাক্। কোনটা চিরস্থায়ী? যাহারা পূর্ব্বে ছিল, তাহারা গিয়াছে; যাহারা এখন আছে, তাহারাও যাইবে; আবার যাহারা আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহারাও সম-

সূত্রে যাইতে বাধ্য; এ আসা যাওয়ার অন্ত নাই—নিবার নাই। তাই বলিতেছিলাম, যাহা হারাইয়া যায় তাহা চাহি না,—কেবল চাই যাইতে। আমি অনেক দিন হইল আসিয়াছি যাইব কবে বলিতে পার কি? যদি না পার, তবে যাঁহার আগমনের উদ্যোগ আয়োজন করিতে আসিয়াছ, অথবা, যাঁহার অগ্রদূত তোমরা, তাঁহার সহিত একটু পরিচয় করিয়া দিয়া যাও। কেবল বিদ্যুদ্দৃষ্টিতে নয়ন ধাঁধিয়া, বজ্রনির্ঘোষে পাঁজর কখানা ভাঙ্গিয়া দিয়া গেলে চলিবে না। তবে আয় মা শারদলক্ষ্মী, বাঙ্লার ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া আয়! বাঙালী আজ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মনুষ্যত্ব হারাইয়া মানবপশু নামে একপ্রকার জীবে পরিণত হইয়াছে, দেখিয়া যা! ইহার জাতীয়তা নাই, একতা নাই, দেশ থাকিয়াও নাই। এরা নিজের ঘরে বিদেশী, নিজের দেশে প্রবাসী। সারাদিনরাত্রির মধ্যে কেবল অন্ধকারে ইহাদের দাসত্ব-মলিন-মুখখানি লুকাইবার জন্যই বুঝি এরা সংসার পাতিয়াছিল! এ কঠোর বিধান এদের ভাগ্যে কেন মা?

ইহারা মানুষ হইয়া মনুষ্যত্ব হারা হইয়াছে, আর জন্ম দিতেছে, কতকগুলা অকর্ম্মণ্য ননীর পুতুল। ইহারা আহার, বিহার, প্রভৃতি বিষয়ে পশুর মতই প্রবৃত্তির দাস। এই সকল প্রবৃত্তি মানুষেরও সহজ, পশুরও সহজ। যেমনি প্রবৃত্তি কোন কিছু চাহিল, অমনি তৎসংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়াদির স্ফুরণ হইল; অবস্থা অনুকূল হইলে পশুরা কাণ্ডজ্ঞান রহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া বসিল। পরন্তু, মানুষের বিবেক—মানুষের হিতাহিত বিবেচনা শক্তি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কোন কিছু করিতে দেয় না। এইখানেই মানুষে পশুতে প্রভেদ। এখন দেখা গেল, মানুষের মধ্যে পশুত্বও আছে। এই মনুষ্যত্ব, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, মানুষ তাহা হারাইলেই পশুনামধেয়। আর শিক্ষাই মানুষের মনুষ্যত্ব আনিয়া দেয়। আমি শিক্ষা বলিতে ইহাই বুঝি যে, দেশ কাল পাত্রানুযায়ী ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনযাত্রার উপযোগী যে কর্ম্মকুশলতা লাভ তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এইরূপ শিক্ষাদান মানব সমাজে সুফলপ্রদ হইয়া থাকে।

মানুষ মনুষ্যত্বের অঙ্কুর লইয়াই জন্মায়। "তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও উন্নতি কামনা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম।" তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা; জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি কামনা স্বতঃই বলবতী হইয়া উঠে। এখন, জ্ঞানলাভ শিক্ষা সাপেক্ষ, শিক্ষা আবার অনুশীলন বা প্রযত্নের উপর কতকটা নির্ভর করে। ফলতঃ

"জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরাপেক্ষী।" এই সূত্রের মূলে হৃষ্টপুষ্ট শরীর ও মন চাই। হৃষ্টপুষ্ট শরীর মন লাভ করিতে হইলে আশৈশব সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য দরকার। এই সর্ব্বমূলাধার শিক্ষা আজকাল আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই আমাদের দেহ, মন ও মেধা একেবারে ক্ষীণ হইতে হইতে শেষ লোপ পাইয়া যায়। এ অবস্থায় জ্ঞানী ও কর্ম্মী হওয়া দূরে থাকুক আমাদের বুদ্ধিটাও তাদৃশ মার্জ্জিত হইবার সুযোগ সুবিধা পায় না। অকর্ম্মণ্য তকৃতকে—ঝকঝকে—ঘসামাজা—সুখী সখী দেহখানির উপর গজভুক্ত কপিত্থবৎ একটা ঘাড় কামান মাথা লইয়া, সওদাগরী নোকর হওয়া ছাড়া পেশা, আর মাগোয়ারী ভেড়ুয়া হওয়া ছাড়া নেশা, বাবু তারাদের আর কি হবে। সাহেবেরা ঘাড় কামায়, কারণ, নেকটাই, কলার, টুপি পরে; আর আমরা হাতকড়ীওয়ালা-চাপকান-পাঞ্জাবী পরিয়া কেন যে ঘাড় কামাই, সে প্রশ্নের উত্তর অনেক নিশীথ চিন্তার পর অদ্য আমি স্থির করিয়াছি। ঈশ্বর জগতের মঙ্গল করুন, আমি তাঁহাকে বন্দনা করিয়া, তাঁহারই আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ সেই জটীল সমস্যা জগতের সমক্ষে সরল করিতেছি।

দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, শরীরের মধ্যে পরিষ্কার জলবায়ু ও আলোক প্রবেশ করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ গ্লানি বিদূরিত হয়; সুতরাং মগজেও ঐ নিয়ম খাটিবে না কেন? বিশেষতঃ, আজ কয়পুরুষ ধরিয়া (ঠিক হিসাব করিয়া দেখি নাই) দেশের সারাংশের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াই আসিতেছে, তাহার ফলে মগজটা যেন ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া সঙ্কুচিত হইতে বসিয়াছে; অতএব বুদ্ধির গোড়ায় জলবায়ু সেচন করা নিতান্ত আবশ্যক। একেবারে মুণ্ডিত মস্তকও হওয়া যায় না, তাহাতে চাকুরী তো টিকিবেই না, আবার শুভকার্য্যকালে লোকে নাকি মুণ্ডিতমস্তক দর্শন করে না। এ সকল কারণে বুদ্ধির পশ্চাদ্ভাগটা চাঁচিয়া ফেলাই যুক্তি সঙ্গত। আর কেশের ঐ ক্ষতিটা, সম্মুখের চুল দুই চারি হাত লম্বা রাখিলেই, পূরণ হইবে। Equilibrium রক্ষিত হইবে। তোফা!! স্ত্রীবুদ্ধিপরিচালিত মস্তকে কে বলে বুদ্ধি নাই?

শঙ্করী! অনুমতি কর তো তোমার ছাওয়াল দুইটার মাথা ক্লিপ দিয়া ছাঁটিয়া দি। দেখিবে, কৈলাসে ফিরিয়াই উহারা ঐ জঙ্গলী শিলাপিণ্ডটাকে একটা রীতিমত সিনেমাপেলেস করে ফেলবে। আর সেই পেলেসের বাঁধা রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেকদিন সাহায্যাভিনয় খোলা

হবে। তখন হে দশভুজে! আর তোমায় আশ্বিন মাসের দেবীপক্ষের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না। শিব নিজেই তোমাকে টিকিট বিক্রয় করিবার জন্য সর্ব্বদাই বাঙলার মাঠে ঘাটে বেড়াতে পাঠিয়ে দেবেন।

মানুষ মাত্রেই উন্নতি লাভে একান্ত ইচ্ছুক। শুধু ইচ্ছুক হইলেই তো বাসনা পূর্ণ হইবে না। তজ্জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। প্রকৃত শিক্ষা না পাইলে যথাযথ কর্ম্ম করিব কিরূপে? যদি বল, পুরুষের শিক্ষা তো যথেষ্ট হইতেছে, তত্রাপি এ জাতির উন্নতি কোথায়? ইহার উত্তরে বলি, মূলে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না হওয়ায় সমস্ত শিক্ষা তাসের ঘরের মত কার্য্যকরী হইতেছে না, অথবা, শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে সিদ্ধ হইতেছে না। এ শিক্ষার দ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি না ঘটিয়া রজো ও তমোগুণেরই প্রাবল্য ঘটিতেছে। তাহাতে মানুষের বিলাসাদি ধ্বংসকরী বৃত্তি প্রবলতর হইয়া, কর্ম্মে অপারগ্ করিয়া ধ্বংশের মুখেই ফেলিয়া দিতেছে। আর যে শিক্ষা হইতেছে, তাহা কেবল পুরুষের; প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা আদৌ হইতেছে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল পুরুষ লইয়াই সংসার নহে,—একটা জাতি গঠিত হয় না। বরং পুরুষ অপেক্ষা রমণীর প্রাধান্য সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

স্ত্রী-পুরুষ লইয়া সংসার,—সংসারের সমষ্টি লইয়া সমাজ,—আর সমাজের সমবায়ে জাতি গঠিত হয়। যেদিক দিয়াই দেখা যায়, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই প্রকৃত শিক্ষালাভের উপর শান্তি ও শৃঙ্খলা নির্ভর করিতেছে। তবে উভয়ের শিক্ষা একভাবের নহে। "শিক্ষা যখন জীবন যাত্রার সম্বল, তখন যাহাকে যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহার শিক্ষা তদুপযোগী হওয়া আবশ্যক।" প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক শিক্ষা পুরুষের জন্য, রমণীর জন্য নহে। জননী গৃহিণী হইবার উপযুক্ত যে শিক্ষা তাহাই রমণীর শিক্ষা। এই শিক্ষার দ্বারাই সংসার, সমাজ, জাতি, সকলের মঙ্গল সাধিত হয়। এ শিক্ষা দেশীয় স্ত্রী-শিক্ষা হওয়া চাই। পাশ্চাত্যভাবের বিবিয়ানা শিক্ষা হইলে চলিবে না।

মহামতি নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, একটা জাতি গঠিত করিতে হইলে মা চাই। কেন? জাতীয় উন্নতিকল্পে তিনটি জিনিষ মুখ্যতঃ প্রয়োজন :—মানুষ, অর্থ এবং উপকরণ। মানুষ হইতে অর্থ হয়,—আর অর্থ হইতে উপকরণ জন্মে। অতএব মানুষ সকলের মূল। এ মানুষ তৈয়ারী করে মা। শিশু মাতৃস্তন্যে পুষ্ট এবং মাতৃভাব ও শিক্ষায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শৈশবে মায়ের নিকট হইতে সন্তান আপনা

আপনি শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষাই ভবিষ্যৎ মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্র গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। এখন, মা যদি কুশিক্ষা লাভকরে (প্রকৃত শিক্ষার অভাব কুশিক্ষা আপনি আসিয়া জোটে) তবে সে সন্তানকে সুশিক্ষা দিবে কোথা হইতে। আশৈশব কুশিক্ষা প্রাপ্ত সন্তান সন্ততি ভবিষ্যতে আমার মত অকাল কুষ্মাণ্ড না হইবে কেন? এখন বলদেখি ভাই কার শিক্ষার প্রয়োজন বেশী?

পূর্ব্বেকার ক্ষত্রিয় জননীর কথা ভাবিয়া দেখ। তাঁহারা বীর্য্যবতী, সুরুচিসম্পন্না এবং তীক্ষবুদ্ধিশালিনী রমণী ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের সন্তানকুল দেশের শাসন দণ্ডপরিচালনের উপযুক্ত হইত। সত্যযুগের স্ত্রীলোকগণ দেশীয় স্ত্রী-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ও মাতৃত্বগুণশালিনী হইয়াছিলেন। সেই রমণীকুল—বাঙ্‌লার গৃহলক্ষ্মী—ভারতের গৌরব—জগতের বরণীয়া—নারীত্বের পূর্ণবিকাশ—মাতৃত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ—এদেশের রমণীকুল,—সকল হারাইয়াও যাদের মাথায় করিয়া আমরা সারা বিশ্বের সম্মুখে স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইতে পারিতাম, সেই রমণীরত্ন সুশিক্ষার অভাবে কেমন ধীরে ধীরে উন্মার্গগামিনী হইতেছে তাহাই একবার দেখিয়া যাও শিবাজী!

অশিক্ষিতা কুসংস্কারাপন্না স্ত্রীলোকের যতই কেন সদ্‌গুণ থাকনা, সে সমস্তই ঊষর ভূমিতে বীজ পতনের মত বৃথা হয়। স্ত্রীলোক সংসারে তথা সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপিণী। বিশেষ, কেরাণী বাবুদের অর্দ্ধাঙ্গিণী বৈ গতি নাই। গোঠে যাওয়া আর ঘরে আসা ছাড়া অন্যান্য সাংসারিক কোন কর্ম্মই অনেক অনেক নন্দদুলালদের কর্ত্তৃক হয় না। শরীর বয় না। তবে কএকটি কর্ম্ম তাঁহারা দাঁতমুখ খিঁচাইয়া গরম চা'য়ের পেয়ালায় চুমুক মারিতে মারিতে করিতে বাধ্য হয়েন;—বাজার করা, অ'ড্ডা দেওয়া, ইত্যাদি। এ সব কাজতো আর গিন্নীর দ্বারা হইবার যো নাই। এমন কি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ভারটাও দুলাল দাদাদের গুরু ভার মনে হয়। চাকুরী করিয়া আসিয়া আবার কি ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করা যায়? তাঁহারা যেন একমাত্র চাকুরী আর বংশবৃদ্ধির দায়িত্বটুকুই ভগবানের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, বংশধরের প্রকৃত লালন পালনের দায়িত্ব বুঝি অন্য কর্ত্তার উপর ন্যস্ত আছে। (ছেলেমেয়েদেরও কি পত্তনি দেওয়া চলে?) কোনরকমে দিন মজুরীটা সারিতে পারিলেই তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট বেকসুর হইলেন মনে করেন। আর কোনদিক তাঁহাদের ভাবিবার

বা দেখিবার নাই। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি সুশিক্ষিতা হয় তাহা হইলে শিশুসন্তানদের লেখা পড়ার কিছু সুবিধা হইতে পারে।

তাহার পর আর এক কথা। পুরুষের উপর রমণীর আধিপত্য চিরকালই আছে। তবে আধুনিক আমরা কোন দিকেই হালে পানি না পাইয়া যেন মরিয়া হইয়াই স্ত্রীকে সকল বিষয়ে আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিয়া নিজেরা তাহাদের অঞ্চলের নিধি হইয়া বসিয়া আছি। আহার বিহার, আত্মীয়-স্বজন, লোক লৌকিকতা, এমন কি সামাজিক ও রাজনৈতিক এ সকল ব্যাপারেও Her majestyর পরামর্শ ব্যতিরেকে একপাও চলি না। অনেকে আবার এতই সুবোধ স্ত্রৈণবালক যে, যমের বাড়ীর ডাক আসিলেও যাইবে কিনা, স্ত্রীর অনুমতি যাচিঞা করেন! হায় মূর্খ! যখন আমাদের এই দশা, তখন সেকালের কথা নাই বলিলাম, একালে স্ত্রী এবং মায়ের জাতকে সুশিক্ষার দ্বারা সুরুচি-সম্পন্না করা একান্ত প্রয়োজন তাহা ভূরি ভূরি সোনার সংসার এবং বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বিপর্য্যয় ও ছার খার হইতে দেখিয়াও কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না? সংসারের সুখ, সংসারের শান্তি, সংসারের সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি যে সম্পূর্ণ ভাবে স্ত্রীজাতির উপর নির্ভর করিতেছে, ইহা তো আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। দুর্ব্বহ তিক্ত কেরাণী জীবনে যে শান্তিচ্ছায়াটুকু এখনও দাবদগ্ধ প্রাণ জুড়াইবার আশ্রয়স্থল, তাহা আমরা হেলায় হারাইতে বসিয়াছি। দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার অভাবে রমণীকুল যে সৌম্যোজ্জ্বল মধুর মাতৃত্ব ও সতীত্ব বিবর্জ্জিতা হইয়া স্বার্থ-পরায়ণা,—হিতাহিত বিবেক বিরহিতা, কুসংস্কা-রাপন্না, জঘন্যজীবে পরিণত হইতে চলিয়াছে—তাহা অল্প পর্য্যালোচনা দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া যায়। 'মরাগরু ঘাস খায় না' ভাবিয়া আমরা প্রেত-পুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি করিতে চাহি না, দৈনিক বারব্রত পূজা হোমাদি উন্মাদ মস্তিষ্কের অভিব্যক্তি বলিয়া উপহাস করি, কিন্তু যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ মায়েদের চেষ্টায় ঐ সকল হিন্দুসংসারে ঘটিতেছিল, তাঁহাদের কন্যারা দেশীয় স্ত্রী-শিক্ষা না পাইয়া ঐ সকল পরিত্যাজ্য বিবেচনা করিতেছে। যে সকল সংস্কারাদি নিতান্ত না করিলে নয় তাহার সম্পূর্ণ ভার ঠিকা মজুর পুরোহিতের উপর দিয়া আত্মার তৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত থাকে। যাহাদের আশ্রয় করিয়া এতদিন ছিলেন, তাঁহারাই ধর্ম্মত্যাগিণী হইলে, ধর্ম্ম শুধু জাতিভেদের পর্ণকুটিরের ভগ্নাবশেষে মাথা গুঁজিয়া কয়দিন টিকিবেন?

আর কত বলিব। দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার

অভাবে, সমাজদেহে যে কি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিষাক্ত ব্যাধি প্রবেশ করিতেছে তাহা বলিতে যাইলে ক্ষোভে দুঃখে মুখে বাক্যস্ফুরণ হয় না, হস্তে লেখনী অসাড় হইয়া যায়। তবু আর একটী মারাত্মক ব্যাধির কথা বলিব। না বলিলে বুঝি আমার প্রধান কর্ত্তব্যের ক্রটি থাকিয়া যাইবে।

রমণীর পত্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ। ইহার উদ্দেশ্য ও ফল অবশ্যই মহৎ। এই উচ্চতম ব্রত—বৈধব্য পালন কেবল এতদ্দেশীয় নারীর একটী বিশিষ্টতা। জগতের অপর সমস্ত নারীতে এমন ভালবাসার আদর্শ অতীব বিরল। এক্ষণে, ক্রমশঃ, বৈধব্যটা আচার ও কার্য্যগত না হইয়া কেবল বাহ্যিক দুই একটা লক্ষণগত হইয়া পড়িতেছে। পত্যন্তর গ্রহণ মাত্র না করিয়া বিধবাগণ অনেক স্থলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে। ইহা কি প্রকৃত সুশিক্ষার হীনতার কুফল নহে?

বহুকালের অভ্যাস মানুষ মুখের কথায় একদিনে ছাড়িতে পারে না। বিশেষ, যে অভ্যাস পরিত্যাগ করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম কার্য্য—অথচ সেইটাই সব চেয়ে প্রিয়। যে রমণী সধবা অবস্থায় কেবল কাম ও বিলাসিতার পূজা করিতে শিখিয়াছে এবং তাহার আপাত-রম্য মধুর আস্বাদে মসগুল হইয়া আছে;—যে সংযম কখনও করে নাই,—সংযম কাহাকে বলে জানে না,—সংযমী ব্রহ্মচারীর আদর্শ কখনও দেখে না,—সে বিধবা হইয়া একেবারে একলম্ফে উচ্চে উঠিয়া এ পঙ্কিল সমাজের সব প্রলোভন এড়াইয়া বিভৎস শুঁয়াপোকা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নয়নাভিরাম প্রজাপতি হওয়ার মত ধাঁ করিয়া দেবী হইয়া পড়িবে এরূপ দুরাশা আমার মত পাগলও করিতে পারে কিনা সন্দেহ। এরূপ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে যে কতখানি সংযম—কতখানি শিক্ষা প্রয়োজন তাহা আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তা মহাত্মাগণ বার বার চীৎকার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। *সে সব কচ্‌কচি শুনিব কেন?* বরং বারাঙ্গনার দুটো টপ্পা, অথবা সমুদ্রের উপর cyclone, কিংবা তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ বাঙ্গালী থিয়েটার শুনিব।

এই প্রকার গুপ্ত ব্যাভিচার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের অন্তঃসার শূন্য করিতেছে। এমন কি, সধবা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও এ ভীষণ ব্যাধি ক্রমশঃ সংক্রামিত হইতেছে। সুশিক্ষার অভাবে ধর্ম্মভাবের হ্রাস ইহার একটা কারণ; আর একটা কারণ, পুরুষ জাতির নারীত্ব প্রাপ্তি। পুরুষ যেমন রমণীতে ষোল আনা রমণীসুলভ গুণরাশির সমাবেশ

দেখিতে পছন্দ করে, নারীগণও তেমনি পুরুষের মধ্যে পুরুষোচিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ দেখিতে চায়, অথচ, এমনি মজা, তাহারা পুরুষকে মেনীমুখো করিয়া নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে বড়ই কৌতুক অনুভব করে। ইহাও কুশিক্ষা বা কুসংস্কারের ফল। স্ত্রৈন পুরুষের উপর নারীর আস্থা ও ভক্তি স্বভাবতঃই অল্প হইয়া থাকে। এমন কি, অনেক স্থলে দেখা যায়, স্ত্রীগণ ঐরূপ পুরুষকে অপদার্থ জ্ঞানে ঘৃণা করে। সংযম ও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই অকাল বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যু প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। ইহার ফলে কত "সাজান বাগান" অকালে শুকাইয়া যাইতেছে, ইহা তো আমরা চোখের উপরে দেখিতেছি, ঠেকিতেছি, তবুও শিখিতেছি না, ইহা কি কম আক্ষেপের কথা!

"যাহারা গুপ্তভাবে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজের চোখে ধূলি দিয়া গোপনে তাহাদের পাপ কার্য্য করিতে থাকে—সমাজের ভিতর থাকিয়া যাহারা এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতে থাকে—তাহাদের দ্বারা সমাজের যে কত অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাহাদের কামপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে পড়িয়া কত যুবক যুবতীর যে সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহা ছাড়া এই শ্রেণীর বারাঙ্গনার দ্বারা, জগতের যাহা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই, সেই মহাপাপ ভ্রূণহত্যা যত অধিক হয় এত কাহারও দ্বারা হয় না।

"সমাজ ও সংসারের ভিতর থাকিয়া যাহারা এই বৃত্তি অবলম্বন করে তাহাদের দ্বারা না হইতে পারে এমন কোন গুরুতর মন্দ কার্য্য জগতে নাই। তাহাদের সম্বন্ধ জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়—তাহারা এমন কি তাহাদের নিকট আত্মীয়ের সহিতও তাহাদের এই কুৎসিৎ পাপ বাসনা চরিতার্থ করিতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না। ইহাদের জ্বালায় কত সোনার সংসার যে ছারখার হইয়া গিয়াছে ও প্রতিদিন যাইতেছে তাহা স্থির করা যায় না। ইহাদের জানিবার চিনিবার কোন উপায় নাই, ইহারা ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া সর্ব্বদাই সমাজ ও সংসারে মহাপাপের অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। ইহারা সংসারে থাকিয়া চির-পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের মূলেও কুঠারাঘাত করে। ইহারা স্বামীর নিকট সতী, সন্তানের নিকট রাক্ষসী মা, আর উপপতির নিকট দাসী সাজিয়া থাকে।"

দেশবাসী,—একবার চাহিয়া দেখ, তোমাদের স্বর্গীয়-শান্তিপূর্ণ-পবিত্র মন্দিরের অভ্যন্তরের পচা দুর্গন্ধ কেমন ধীরে ধীরে ধূপধূনার সৌরভকে

চাপা দিতেছে। আর কতকাল চক্ষু মুদিয়া সকল সহ্য করিবে? বহুকাল সঞ্চিত আবর্জ্জনা-রাশি মন্দির হইতে বহিষ্কৃত কর। প্রকৃত শিক্ষা—যাহাতে মানুষ মানুষ হবে—দেবতা হবে—সদ্‌গুণের বৃদ্ধি হবে—ধর্ম্মভাব প্রবল হবে—এমন শিক্ষা বিস্তার করিয়া উন্নতির কণ্টক উচ্ছেদ কর।

শিক্ষাই অমার্জ্জিত মনকে মার্জ্জিত করে, অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া জীবন যাত্রার সুপথ দেখাইয়া দেয়; শিক্ষাই বুদ্ধির উন্মেষ করিয়া দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করে; শিক্ষাই অসম্ভবকে সম্ভব করে। ওরূপ শিক্ষা আমাদের নাই—আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যার নাই। আমাদের এদেশ যে মাতৃশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই "না জাগিল আজ ভারত-ললনা এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।" সেই মাতৃশক্তিকে প্রবুদ্ধা করিতে হইলে মা-জননীদের সৎশিক্ষার দ্বারা ভূষিতা করিতে হইবে। তাঁহাদের সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া—ধর্ম্ম-ভাবে অন্তর পরিপূরিত করিয়া মানব পদবাচ্য সন্তানের জননী করিতে হইবে। ভাই, আমরা তো গোল্লায় গিয়াছি, আমাদের উদ্ধার সুদূর পরাহত; পরন্তু আমাদের সন্তান সন্ততি—আমাদের বংশধর—আমাদের আশাভরসাস্থল পুত্রকন্যাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদের সুশিক্ষা বিধানে যত্নবান্ হও! নচেৎ তাহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা আরও হৃদয় বিদারক হইয়া দাঁড়াইবে, নিশ্চয় জানিও।

কৰ্ম্মযোগ প্রেস—হাওড়া।] [কালবরণ বাবুর সৌজন্যে।
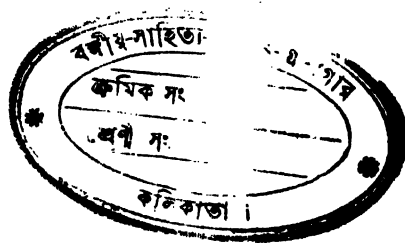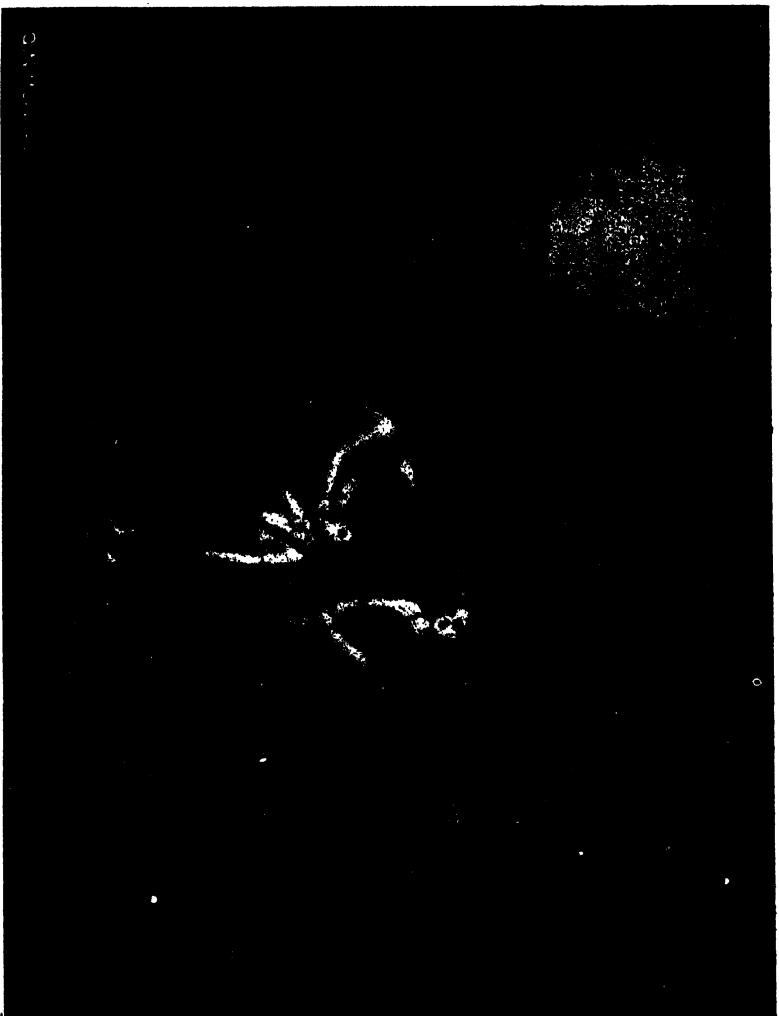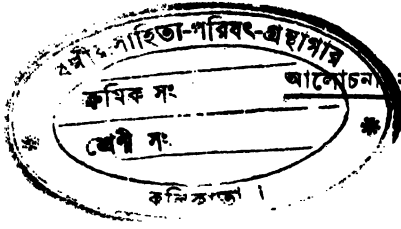
আলোচনা, সপ্তবিংশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৩০ সাল।

কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা।

(শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায় এম্-এ।

(চারুশীলা)

ভাগীরথী-তীর,

ভাগীরথীর প্রতি।

মহাব্যস্ত তুমি মাতা পতিদরশনে
যাইতেছ খরতরবেগে যথা পতি
শুনিবে কি তুমি কাণে দুখিনী-কাহিনী ?
কিন্তু সতীদুখে সতী হয়েন কাতরা
দাঁড়াও মুহূর্ত্ত তরে যেও তার পর।
কুলীনের বংশে জন্ম হইল আমার
বাল্যে পিতৃমাতৃ হীনা অদৃষ্টের দোষে
মাতুল পুত্রের গৃহে কষ্টে দিন যায়
ভ্রাতার তাড়না ভ্রাতৃবধূর গঞ্জনা
১০। সহিলাম কত শৈশবেতে নাহি সীমা।
লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডের বিধান
আছিল আমার প্রতি! যদি কোনদিন
হইত তাচ্ছিল্য মম কোন কার্য্যে তাঁর
নিজ হস্তে বেত্রাঘাত করিতেন ভ্রাতা
অনাহারে রাখিতেন দিবস রজনী।

এইরূপে কিছুকাল হইল অতীত
যৌবন সীমায় করিলাম পদার্পণ
মনে হলো শীঘ্র দূর হবে কষ্ট মোর
পতিগৃহে পতিসুখে হইব সুখিনী।
২০। কিন্তু কোন চেষ্টা নাহি মাতুল পুত্রের
সমর্পিতে মোরে পরিগৃহীতার করে
বরঞ্চ অধিকতর কষ্টকর কায
হইতে লাগিল মোর স্কন্ধে সমর্পণ।
দিবানিশি পরিশ্রমে ক্ষীণতর তনু
শরতের নদী মত ক্ষীণ অঙ্গ শোভা
মলিন বসন পরিধানে রুক্ষ কেশ
স্বভাব সৌন্দর্য্য কিন্তু না হইল লোপ।
একদিন রাত্রিকালে মহাসমারোহে
হইল বিবাহ প্রতিবেশীর কন্যার
৩০। কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁরা আমাদেরি ঘর।

বহুব্যয়ে বহুদূর হতে বর লয়ে
এসেছেন তাঁরা কন্যা বিবাহের তরে
মহৎ কুলীন বর, বাস পূর্ব্ব দেশে।
গিয়াছিনু আমি ভ্রাতৃবধুর সহিত
দেখিতে বিবাহ। অকস্মাৎ শুনিলাম
হইবে বিবাহ মোর উক্ত বর সনে
আরো দুইজন কন্যা করিবেন দান
তাঁহারে, তাঁহার সম পাত্র পাওয়া দায়।
এক রাত্রে চারি কন্যা হলো সম্প্রদান
৪০। সন্ত্রান্ত কুলীন বরে, মহোল্লাস তায়
কুলীন সমাজ মাঝে গ্রামের ভিতর।
অল্প ব্যয়ে মম বিভা হলো সম্পাদন
কিন্তু পতিমুখ নাহি দেখি তার পর
বহুকাল। অবশেষে বহুব্যয় করি
আনালেন জামাতারে সপত্নীর পিতা।
কিন্তু মম ভ্রাতা ব্যয়ে বড়ই কাতর
নাহি করিলেন তাঁরে গৃহে নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞ উপবীত কাটি ভ্রাতার আলয়ে
করেছিনু দুই দশ টাকা উপার্জ্জন
৫০। সমস্তই ভ্রাতৃবধূ লয়ে ছিল কাড়ি
যাহা কিছু ছিল তাহা করিনু অর্পণ
মাতুল পুত্রের করে আনিতে পতিরে।
আইলেন পতি গৃহে কৃপাদান করি।
তারপর অন্তর্দ্ধান হইলেন তিনি
কত যুগ যুগান্তর তরে নাহি জানি।
অবশেষে একদিন প্রদোষ সময়
আইলেন বিনা নিমন্ত্রণে মোর গৃহে
বলিলেন মোরে লয়ে যাইবেন দেশে।
এক ভার্য্যা তাঁর গৃহে রহিবে সতত।
৬০। কত চাটুবাক্য বলি তুষিলেন মোরে
সকল জায়ার মধ্যে রূপবতী আমি
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতীর সমান
ধর্ম্ম আচরণে বেদমাতা উমা সম।
অমৃত ক্ষরণ হলো শ্রবণে আমার
একে পতিকণ্ঠ তায় বহুদিন পরে
শ্রুত। ভাবিলাম কত ভাগ্যবতী আমি
ফেলিয়া অপর জায়া মোর প্রতি রত
পতি মম; করিবেন ঘর মোরে লয়ে।
পরদিন প্রাতঃকালে ভ্রাতৃগৃহ ছাড়ি
৭০। অগ্রসর হইলাম পতিগৃহ প্রতি।
তারপর এই দশা কি বলিব মাতঃ
বলিতে বিদরে বুক শুষ্ককণ্ঠ তালু
রাখিয়াছে করি বন্দী উদ্যান মাঝারে
বলি দিবে বলি পাপ লম্পটের কাছে
ধন আশে মান ধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন।
কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করি নাহি জানি
দুরাচার নীচ বৃত্তি পতি হস্ত হতে
আশা মাত্র তুমি মাতা সর্ব্বতাপহরা

লও অঙ্কে মাতৃহীনা দীনা বালিকারে।
৮০। জগতের মাতা তুমি আমারও প্রসূতি।
শুনিয়াছি ছিল মাতা দেখিনাই চখে
তুমিই আমার মাতা অন্য মাতা নাই
দাও স্থান শ্রীচরণে দুখিনী কন্যায়।
প্রহরী চৌদিকে ঘেরি রাখিয়াছে মোরে
অতিকষ্টে আসিয়াছি কূলেতে তোমার
কুলরক্ষা মানরক্ষা কর মা জাহ্নবি
৮১। তনয়া-সতীত্ব রক্ষা কর মহাদেবি।

[ইহা বলিয়া দুখিনী কুলীন কন্যা গঙ্গাজলে ঝাঁপদিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ও নীচবৃত্তি পতিহস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন]

দুখ।

("গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত।)

দাও—দাও কুসুমাঞ্জলি মায়ের চরণে। আমার হৃদয়পদ্ম দলরাজি দিয়ে যে শ্রীপাদপদ্ম আলিঙ্গনবদ্ধ করে রেখেছে, প্রাণ রেণুর রসমঞ্জরী সেই পাদপদ্মে দাও—দাও বৎস কুসুমাঞ্জলি।

সমগ্র পাদপদ্ম দেখার সৌভাগ্য এখনও হয় নি! নাই হউক, ওই যে হৃৎপুণ্ডরীকের অন্তরে দহরাকাশ,—ওই যে অন্তরাকাশ,—ওই যে প্রাণাকাশ,—ওই যে চেতনাকাশ—প্রাণরেণু মাখান ওই পাদাঙ্গুষ্ঠ! ওই সেই অঙ্গুষ্ঠ বৎস,—সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন—সর্ব্বশ্রুতিপ্রসিদ্ধ সেই "অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষঃ জ্যোতিরিবাধূমক ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্যঃ স উ শ্বঃ। এতদ্বৈতৎ"। সেই ধূমহীন জ্যোতির মত অঙ্গুষ্ঠবৎ দৃশ্যমান ভূতভব্যের ঈশান সনাতন আত্মা ওই সেই মা বৎস; ওই অঙ্গুষ্ঠ অবলম্বন কর,—ওরে ওই খানে দে তোর অঞ্জলিভরা কুসুমের স্তবক,—সম্প্রতিষ্ঠ করে রাখ তোর নয়ন, সে তার মহিমমণ্ডিত তনু প্রকাশ করবে যে তোর মা আত্মা। ওই অঙ্গুষ্ঠ!

ওই রক্তকমলের মাঝে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ কোটিচন্দ্র-সুশীতল ওই অঙ্গুষ্ঠ, ওই আমার হৃৎ-পদ্মে অধিষ্ঠিত আলতাপরা পরমাত্ম পদপ্রান্ত,—ওই তোর হৃদয়ে বৎস আলতা পরা সত্যামূর্ত্ত পদপ্রান্ত,—ওই বিশ্বের হৃদয়ে সম্প্রতিষ্ঠিত অলক্ত-রঞ্জিত বরাভয়প্রদ পদপ্রান্ত,—ওই মৃতসঞ্জীবনী সুধার মধুচক্র ;—প্রাণ দিয়ে মায়ের ওই অঙ্গুষ্ঠ-মূর্ত্তির বরণ কর সর্ব্বাগ্রে! দে ওই খানে তোর জীবনকুসুমের মহা অর্ঘ্য!

ওরে ও অঙ্গুলিমাত্র নয় রে কুমার, ওরে অমৃতস্তনী মায়ের অমৃতপায়ী কুমার—ও অঙ্গুলি মাত্র নয়। তোর সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্র রন্ধ্রের আকারে ও মধুময় অঙ্গুলির আকার রচিত; তোর হৃদয়পদ্মিদি দিয়ে গড়া ও অঙ্গুলি,—ওতে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী অন্তরীক্ষ আকাশ দ্যুঃ ভূঃ—যাহা কিছু আছে—যাহা কিছু নেই সমস্ত ওই-খানে সমাহিত বৎস! সর্ব্বতঃপাণিপাদ, সর্ব্বতঃ নয়ন, সর্ব্বতঃ আনন মায়ের আমার ওই অঙ্গুলি মূর্ত্তি,—ওই আলতা মাখান অঙ্গুলিটি তুই স্মরণ কর—ধারণ কর—বরণ কর—জীবন মরণ পণ ক'রে তুই তোর বিবেক-বিবিক্ত ওষ্ঠাধর লগ্ন করে দে;—তুই বিশ্বের অমৃত লাভ করবি—তুই মায়ের চরণ পাবি—অঙ্ক পাবি—বক্ষ পাবি—মুখ পাবি—নয়ন পাবি—চুম্বন পাবি—দৃষ্টি পাবি,—তুই সব পাবি! তুই প্রাণ পাবি রে মৃতকল্প কুমার প্রাণ পাবি! ঢেলে দে তোর শুভ্র শেফালীর অঞ্জলি! প্রাণ পাবি, চরণপদ্মের মধু পান ক'রে তুই প্রাণ পাবি। তুই শারীর বিজ্ঞানে শুনিস্ না রে তোর দেহের মলিন রক্ত ওই হৃৎপিণ্ডে ঘুরে গিয়ে বিশুদ্ধ হ'য়ে আবার দেহের ধমনীতে ধমনীতে ফিরে আসে? তুই যখন সারা দিবা বিষয়-চিন্তায় বিষয়কর্ম্মে ক্লান্ত হ'য়ে ঝরা-ফুলের মত শুকিয়ে উঠিস, মূর্চ্ছা যাস—ঘুমিয়ে পড়িস, তখন ওই খানে গিয়েই এক বিরামময় ক্রোড়ের সংস্পর্শে আবার ক্লান্তিশূন্য নবীন জীবনের নবীন প্রভাত ফিরে পাস,—কেমন ক'রে জানিস? ওই মাতৃপদপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয় ব'লে তোর কাল রক্ত অরুণ-রাঙ্গা হ'য়ে ওঠে! ওই গুপ্ত মন্দিরে নিয়ে গিয়ে তোর ক্লান্তিতে ঢ'লে পড়া সন্তার অধরে মা চুম্ দেয়। বক্ষে ধরে তপ্ত চুম্বন! অজ্ঞান মূঢ় শিশু! সোহাগের সে চুম্বনে তোর ক্লান্তি ক্লেদ বিধৌত হ'য়ে যায়। ঘুমের ঘোরে এ মধুদান, তুই মাকে না বরণ কর'লে কেমন ক'রে জানবি! সে মধু চুম্বন মাকে ঘুরিয়ে দে বৎস—তবে তুই চুমের প্রস্রবণ মাকে আমার দেখতে পাবি. দে ওই অঙ্গুষ্ঠে ওষ্ঠাধর সংলগ্ন ক'রে তোর আবেগভরা পুলককম্পিত চুম্বন—মাতৃপূজার মহা অর্ঘ্য।

তুই জ্বলেছিস—অসুর-পীড়নে গৃহচ্যুত হয়েছিস্? ব্রহ্মপুর ওই দেহে তোর অসুর অগ্নি-সংযোগ করেছে? ত্রিতাপে তুই জর্জ্জরিত? গৃহহীন পথভ্রান্ত পথিকের মত জন্ম হ'তে জন্মান্তর ত্রাহি ত্রাহি ক'রে ছুটে চলেছিস? অতিথি হও বৎস ঋষির আশ্রমে। বড় দুর্দ্দিন, বড় অকাল তোমার! অকালে মায়ের বোধন কর! কর্ত্তৃত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়েছিলে, তাই অধ্যবসায়রূপ মহিষাসুর তোমাকে উৎক্ষিপ্ত করেছে; তোমার

হৃৎপিণ্ড অসুর হ'য়ে উঠেছে—ধক্ ধক্ করে তোমায় দেশ দেশান্তরে বিতাড়িত করেছে, কিন্তু তোমায় চালিত করে এনেছে মায়েরই দুয়ারে বৎস! ওই ত মায়ের মধ্য বলি। এইবার দেখবে মায়ের মধুপান। উপবেশন কর—দেখ ওই মাতৃ পদাঙ্গুষ্ঠ সে অসুরের স্কন্ধে! "অঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি"—দেখ বৎস দেখ! প্রতি বিষয় বোধের দ্বারা যে প্রাণের উদ্বেলন তোমার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, সেই প্রাণের স্ফুরণ অবলম্বন করে তোমার হৃদয়ের ওই অন্তর আকাশ—ওই মাতৃ-চরণাঙ্গুষ্ঠ লক্ষ্য কর—বিষয়-কুসুম যেখানে ফুটছে দেখ! ওই মাতৃমন্দিরের পুষ্পাঙ্গন! বৎস, ওরই মাঝে ওই দেখ উহাদের আশ্রয় ওই আকাশ; ওই প্রাণরেণুবিস্রাবী মাতৃচরণাঙ্গুষ্ঠ! জ্ঞানের আধার, প্রাণের আধার, শত হৃদয় বৃত্তির আশ্রয়। অঙ্গুষ্ঠের চুম্বন গ্রহণ কর, আচুম্বিত হও, আকৃষ্ট হও, ওই অঙ্গুষ্ঠ মূর্ত্তিতে—হৃদয়ে! মধু পান কর। দেখ মায়ের মধুপান। মধুপান দেখতে না পেলে অসুরদলন দেখতে পাবে না।

শ্রুতি কথিত মধু—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ, মেঘ, আকাশ, ধর্ম্ম, সত্য, মনুষ্য, আত্মা। ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু•••। ইমা আপঃ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু আসাম্ অপাম্ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু•••। অয়ং অগ্নিঃ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু অস্যাগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু•••। অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু অস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু•••। অয়ম্ আদিত্যঃ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাং মধু অস্য আদিত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু•••। এইরূপ "ইমা দিশঃ" "অয়ং চন্দ্রঃ" "ইয়ং বিদ্যুৎ" "অয়ং স্তনয়িত্নুঃ" "অয়ম্ আকাশঃ" "অয়ং ধর্ম্মঃ" "ইদম্ সত্যম্" "ইদম্ মানুষম্" অয়মাত্মা" এই সমস্ত ভূত সকলের মধু আর ভূত সকল এই সমস্তের মধু। আর যিনি ওই সমস্তে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং তোমার শরীরেতে, বাক্যে, প্রাণে, চক্ষে, শ্রোত্রে, মনে, তেজে, শব্দে, হৃদয়াকাশে, ধর্ম্মে সত্যে, মনুষ্যভাবে, আত্মায় তেজোময় অমৃত পুরুষ, ইনিই সেই অমৃতরূপিণী মধুময়ী। এই সমস্ত পরস্পর পরস্পরের মধু পরস্পরে পরস্পরকে পান করে, গ্রহণ করে, বোধ করে, মধু পানে মত্ত হয়—বিভোর হয়। মধু-পান-মত্তা মায়ের অধিষ্ঠানই ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যময় মধু পান লীলা বিসর্পিত করে,—মধুর আদান প্রদান সঞ্জীবিত করে। মায়ের এ ভূরাদি লোকপুঞ্জপ্রকাশ—শুধু মধু পান, প্রাণের চুম্বনের আদান প্রদান মত্ত হবার জন্য;—সে মধুপান—আত্মদান। কিন্তু সে মধুপানে রত হয়ে ভূতসঙ্ঘ, জীবসঙ্ঘ, দেবসঙ্ঘ,

আত্মদান ভুলে অধিকারে—অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, আমিত্বের অযথা প্রসারে যত্নবান হয়, দান ভুলে শুধু গ্রহণে রত হয়; তখন সেথা ওঠে ত্রাহি ত্রাহি রব। এই সবই হয় হৃদয়ে; আর তখনই মাকে মধু পান করাতে হয়;—আত্মদান করে তাঁর অমৃতস্রাবী বক্ষে আশ্রয় নিতে হয়। আর সে দানও সম্পন্ন হয় তার চরণপ্রান্তে ওই অঙ্গুষ্ঠে ওই হৃদয়ে—মায়ের চরণাঙ্গুলে।

হৃদয়—হৃদি অয়তে গচ্ছতি ইতি হৃদয়ঃ—হৃদয়ে যিনি গমন করেন বা থাকেন তাঁর নাম হৃদয়। অথবা হৃ আহরণ করেন দ-দান করেন, য-গমন করেন, সমস্ত বিষয় ও বিষয়ের আদান প্রদান যাঁর দ্বারায় সম্পন্ন হয় আর যিনি বিসর্পিত হয়েন সমস্তে, সেই বোধস্বরূপা বোধশক্তিময়ীই হৃদয়। কে বলে রে সংসার মোহময়? মিথ্যা মরিচীকার মরুপ্রান্তর? কে বলেরে এ বিশ্ব একটা ছলনা—ভ্রান্তি রাক্ষসীর রুদ্র পেষণ? শুধু সত্যবৎ প্রতীয়মান মিথ্যা? মাতা পিতার আকুল স্নেহ, স্ত্রীর অহৈতুকী আত্মদান, পুত্রের পূত ভক্তি, বন্ধুর স্বার্থশূন্য প্রেম,—এসব রাক্ষসের রক্তোল্লাস, অজ্ঞানের বিকট চর্ব্বণ—দাহ তৃষা মোহের ঘূর্ণাবর্ত্ত—এ কথা কে শিখালে? এ সত্যবৎ প্রতীয়মান মিথ্যা নহে—মিথ্যাবৎ প্রতীয়মান সত্য। এ সর্ব্বপ্রেমাস্পদ আত্মার আত্মরতিময় প্রীতির উল্লাস, শুধু আত্মজ্ঞানশূন্য আত্মসত্তার বোধশূন্য বালকের অদূরদর্শী নয়নে বীভৎসরূপে প্রতিফলিত হয়। জন্মের পর জন্ম ধরে, অজ্ঞের শক্তার আত্মানন্দ, কাঁচ খণ্ডে সূর্য্য রশ্মির মত বিশ্লেষিত হয়ে স্নেহ, প্রেম, করুণা, ভক্তি আদি আকারে অনুভূত হয়ে অন্তর্যামিনীর অস্তিত্ববোধ ফুটিয়ে তুলছে—তোমাকে বাহিরের স্ত্রী পুত্রে আত্মদান করিয়ে যে মমতাময় আত্মোল্লাসময় অন্তরের প্রবাহ উদ্বোধিত করে তুলছে—এ শুধু তোমায় দেখিয়ে দিতে আত্মার আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী মমত্ব, আত্মত্ব। বার বার জন্ম মৃত্যুর লাঞ্ছনা শুধু তোমায় দেখিয়ে দিতে, মায়ের বেদনময় সত্তা,—শুধু সত্তা মাত্র নয়, শুধু জড় আলোকবৎ প্রকাশশক্তি নয়—প্রেমের আস্পদ, মমতার আস্পদ, প্রাণের আস্পদ সে মা। শুধু দেখিয়ে দিতে স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, সর্ব্বস্ব এ সব অনুভূতি—বোধ বিলাস! আর এ সব তোমার অন্তরে—তোমার অন্তরাত্মায়—মায়ে—ওই যার অঙ্গুষ্ঠ মাত্র তোমার বরণযোগ্য প্রত্যক্ষ; তুমি সেই তোমার অন্তর্যামী আত্মাকেই স্ত্রী ব'লে পুত্র ব'লে ভ্রাতা ব'লে সখা ব'লে বিশ্ব ব'লে আলিঙ্গন করছ। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মাকেই আত্মদান ক'রে আসছ—মাকেই দেখে আসছ, ভালবেসে আসছ, মাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও

কখনও তুমি জান না পাও না। সংসার রচনা শুধু মাকেই স্বরূপে জানবার জন্য, বুকভরে পাবার জন্য, আত্মলাভের জন্য এই জন্ম-মরণ লাঞ্ছিত আত্মোৎসর্গ সাধনা জন্মের পর জন্ম ক'রে আসছ। যে আজ দুর্ল্লভা দুর্গা সেই সুলভা সুখস্বরূপা হ'য়ে তোমায় ভূমা বোধে তুলে দিচ্ছে, আর এই আত্মরতি সাধন শ্রমক্লান্ত সাধকের কাণের কাছে এসে প্রাচীনের বেশে অর্ব্বাচীনের প্রলাপ "বিষময় মিথ্যাময় পণ্ডশ্রম এ সংসার!" এ জীবন্ত একান্ত সজীব সচেতন দেবতামণ্ডলী পৃথিবী বায়ু অগ্নি আকাশ আদিত্য অনন্ত চিৎ-শক্তি বিলাস। এ দেখেও যদি আত্মার শক্তিময়ী মূর্ত্তির ধারণা করতে না পার, সংসার মধুময় না দেখ, তবে ধিক্ তোমার আত্মজ্ঞানে, ধিক্ তোমার বিচারবিভ্রমে, বিবেকে।

ওঠ ক্লান্তবীর বলীয়ান তুমি মায়ের কুমার। ওই চরণাঙ্গুলিতে প্রবেশ কর, আত্মসমর্পণ কর, মেধার সাহায্যে নয়—প্রাণের সাহায্যে। তোমার বিষয়ানুভূতি তোমার আত্মীয়তা প্রভৃতি বোধের অনুভূতি তোমার নিজ অস্তিত্বের অনুভূতি তোমার ক্লান্তি ক্লেশ সমস্ত অনুভূতির সাহায্যে দেখ মাত্র সম্বিৎ ভিন্ন অন্য কিছুর ওখানে প্রতীতি হয় না!

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" দেখ, চেতনারূপিণী মা ভিন্ন অন্য কেহ নাই কিছু নাই। এই জ্ঞানে ওই ভূমিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আত্মশক্তিমূর্ত্তির অন্বেষী হও ওইখানে যা বল্‌বে তাই পাবে, যা আকাঙ্ক্ষা কর্‌বে তাই আবির্ভূত হবে। বল "দুর্গায়ৈ বিদ্মহে" দুর্গানামে চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগ কর; ও আত্মসম্প্রদান—ভূমি, ওখানে আত্মসম্প্রদান স্বতঃ সংঘটিত হয়, সেই জন্য সম্প্রদানে চতুর্থী প্রয়োগ ক'রে "দুর্গায়ৈ" বল্‌তে ঋষি আদেশ করেছেন। বল "দুর্গায়ৈ বিদ্মহে" তোমার যিনি আত্মা, আমার যিনি আত্মা বিশ্বের যিনি আত্মা, যিনি সর্ব্বান্তর সাক্ষাৎ আত্মা তিনি স্বীয় মহিমময়ী দুর্গামূর্ত্তি প্রকাশ করবেন। তবেই মহিমময় সম্বিৎ বিগ্রহময় সম্বিৎ সম্বোধে কৃতকৃতার্থ হবে।

ওরে ওই অঙ্গুষ্ঠ ক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌তে না পার্‌লে হবে না। মায়ের ও অঙ্গুলিদর্শন না কর্‌লে চলবে না। ওই চরণাঙ্গুলির চেতনপরশ পেলে মন্ত্রচৈতন্য হয়, মন্ত্রচৈতন্য হয় ব'লেই চিন্ময়ীর আবির্ভাব ঘটে। ওইখানে ভিন্ন 'সোঽহম্' চিন্তা বোধের আকার গ্রহণ করে না, চিন্তা চিন্তামাত্রই থাকে, আত্মার অমরত্ব আসে না, ভূতশুদ্ধি হয় না, অচেতন ভূত স্কন্ধে থাকেই থাকে। শত অভিষেকে পূর্ণাভিষেকে পুরশ্চরণেও মন্ত্রচৈতন্য হয় না যদি সত্যপ্রতিষ্ঠা সত্যানুভূতি

না হয়। মন্ত্রগুরু দেবতার একীকরণ, মন্ত্রচৈতন্যের যা প্রকৃত তাৎপর্য্য তা সম্ভব হয় না সত্য প্রতিষ্ঠার সাহায্য না নিয়ে। আর মন্ত্রচৈতন্য না হ'লে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। "মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ। শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে", মন্ত্রার্থ না জানলে আর সে অর্থে অনুভূতিময় না হ'লে মন্ত্রচৈতন্য হয় না এ ত পূর্ব্বে অনেকবার বলেছি। আর যোনিমুদ্রা সম্যক্ অবগত না হ'লে তোর সকল প্রতিষ্ঠাই ব্যর্থ হবে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি তাদের যোনি বা চিন্ময়ীতে—চেতনতে ফেরাবার নাম যোনিমুদ্রা। সে কি শুধু চোক কাণ টিপে ললাট জ্যোতি দেখলে হয়রে! তা হয় না তাতে জ্যোতি ফোটে, আকাশ ফোটে, কিন্তু প্রাণের বিকাশ খেলে না। ও যোনিমুদ্রা নয়। জ্ঞান ভিন্ন, অনুভূতি ভিন্ন, প্রাণের বেদন ভিন্ন, মায়ের ও হৃদয়মন্দির না, না ওই চরণাঙ্গুলি দেখতে পাবে না। তোর মন্ত্রচৈতন্যও হবে না প্রাণপ্রতিষ্ঠাও হবে না। সত্যানুভূতিই অসুরদলনীকে আবাহন করার একমাত্র উপায়। শোন, ব্রহ্মযোনি জ্ঞানাধারে বা চেতনায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ফিরিয়ে ধরার নামই প্রকৃত যোনিমুদ্রা। যদি এমন হতে পারিস—ওরে যদি তোর এমন জ্ঞানমূর্ত্তি গুরুর কৃপালাভ হয়ে থাকে যে তোর চক্ষু ওই রক্তমাখা আঙ্গুলটিতে ভ্রমরের মত বসে থাকবে—তোর শ্রবণ উৎকর্ণ হয়ে বাঙ্ময়ীর অভয় বাণীর জন্য অপেক্ষা করবে, তোর জিহ্বা সে চরণামৃত পানে অথবা চুম্বনাস্বাদনে রসাল হবার জন্য তৃষাময় হবে, তোর নাসিকা স্নেহপুলকে তার ললাট আঘ্রাণ করবে, তোর সমগ্র দেহব্যাপী স্পর্শেন্দ্রিয় পরশাবেগে কণ্টকিত হতে থাকবে, তবেই জানবি তোর যোনিমুদ্রা করা হয়েছে। যে প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন তাতে প্রাণ চক্ষু, শ্রোত্র, মন, সংন্যস্ত করাই যোনিমুদ্রা।

আর এ সব হবে শুধু ওই অনুভূতির পরশমণি ও চরণাঙ্গুলিতে। ঘুমঘোরে তুমি স্বপ্ন দর্শন করছ এক অপূর্ব্ব গন্ধপূর্ণ অপূর্ব্ব আলোকময় গৃহে এক অপূর্ব্বা স্নেহময়ী জননী তোমার অঙ্গে তার কোমল করপল্লব বুলিয়ে দিতে দিতে তোমায় নানা সুস্বাদু আহার্য্য দিয়ে আহারে অনুরোধ করছে,—সে পুণ্যগন্ধে তোমার নাসা পূর্ণ, আলোকে ও মাতৃরূপে তুমি মুগ্ধ, করপল্লব পরশে তোমার শরীর কণ্টকিত, তার স্নেহময় অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠস্বরে তুমি বিভোর, আহার্য্যের স্বাদে তুমি পুলকিত। এ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, কোথা ছিল বৎস? ছিল ওই অন্তরে—চিদাকাশে, ওই দহরে—ওই চরণপ্রান্তে।

ঘটনাক্রমে তুমি সেখানে গিয়ে সেই সকল ভোগ পেয়েছিলে। যদি তুমি এমন শক্তি পাও যে নিদ্রাদি ঘটনার সাহায্য না নিয়ে তুমি ইচ্ছামত ওই ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পার, তবেই তুমি সত্য সত্যই সর্ব্বগন্ধময়ী, সর্ব্বরূপময়ী, সর্ব্বরসময়ী, সর্ব্বস্পর্শময়ী, সর্ব্বশব্দময়ী, সর্ব্বপ্রাণময়ী মায়ের ক্রোড়ে গিয়েছ বলেই বুঝতে সক্ষম হবে। ওই তত্ত্ব ক্ষেত্রে ওই তত্ত্বমালাবিভূষণা মা—অনুভূতির-প্রস্রবণ শ্রীপাদাঙ্গুলি।

আর—আর যদি তুমি বাহ্যপূজায় ব্রতী হও, বৎস যদি প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বাহ্য-সেবাসঙ্গযুক্ত প্রাণ তোমার তাকে বাহ্যসেবায় তৃপ্তি দিতে চায়, কিম্বা মহোচ্চশ্রেণীর ঋষির মত আপনাকে দ্বিধা করতে ইচ্ছুক হও, আপনার বহু হবার শক্তি বিকাশ করতে সঙ্কল্প কর, তবে ঐখানে প্রাণের লক্ষ্য কর—আত্মপ্রাণসত্তাকে আবির্ভূত কর। বলেছি ঐখানে সব আছে। ব্রাহ্ম্য অনুশাসনে সমস্ত ঐখানে প্রকট হয়—শুধু আবাহন অপেক্ষা! সে সজীব আত্মবিভূতি আবির্ভূতা হ'লে তোমার ইচ্ছামত প্রতিমায় অধিষ্ঠিতা হবেন দীপ হতে দীপান্তরের প্রজ্বলনের মত।

বিষয় ভোগের সময় আত্মীয়তাময় ব্যবহার প্রকাশের সময় অনুভূতি যেখানে ফোটে, প্রাণের যে স্পন্দন হয়, সেত নিত্য অনুভব কর; সেই অনুভূতি ধরে ওই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ মাকে দেখ, মায়ের পদপ্রান্ত দর্শন কর; এ কঠিন ব্যাপার নয় বৎস—শুধু মনোযোগ সহকারে যদি উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করে থাক, তবে অবশ্যই পারবে। আর পরাণে যদি আত্ম অস্তিত্বে সত্যানুভূতি ফুটিয়ে তুলে থাক। অনুভূতিই জীবের বন্ধনের কারণ অনুভূতিই জীবের মুক্তির কারণ। অনুভূতির তারতম্য এ জগৎ বৈচিত্র্য; তুমি মাকে সত্য অনুভব কর। মাতৃত্ব লাভ করবে। তোমায় যদি সন্নিহিত বৃক্ষে একটা ব্রহ্মদৈত্যের অস্তিত্বের কথা বলি, সেখানে গেলে তোমার সত্য সত্যই ভীতির উদয় হয়, কিন্তু ব্রহ্মময়ী মা রয়েছে সহস্র প্রকার বুঝিয়ে দিলেওত মাতৃ-সান্নিধ্যের অনুভূতি তোমার কৈ ফোটে না? এ পার্থক্য হয় শুধু সত্যতার তারতম্যে। ভূতে প্রাণ নাশ করতে পারে এ আশঙ্কা প্রাণে বদ্ধমূল সত্যবৎ বিদ্যমান। কিন্তু মা আছে, এ ধারণার সত্যতা তোমার নাই। তাই এ পার্থক্য।

তাই বলি কুমার, তোমার হৃদয়-কন্দরে তোমার যে বিকাশ ওই তোমার দুর্গা—ওইখানে সে চিন্ময়ী মাকে দর্শন কর। কিন্তু শুধু মাকে জ্ঞান মাত্র ব'লে বুঝলে হবে না, তাতে মাত্র

দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবে, অমৃতত্ব লাভ করতে পারবে না;—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা, বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে" তার বিদ্যামূর্ত্তি মহিমময়ী ঈশ্বরীমূর্ত্তি হৈমবতী উমা মূর্ত্তি দেখ্‌তে হবে। আত্ম-মহিমা বোধ না হ'লে আত্মবোধ সম্যক্ হয় না—এ কথা যেন ভুল না। শুধু বুদ্ধিতে প্রতিফলিত চেতন সত্তাটুকু সঞ্চয় ক'রে "সম্বিৎ" "সম্বিৎ" করলে চলবে না। আবাহন কর সে চেতনায় তার শক্তি বিলাস প্রাণ বিলাস। শক্তিপ্রচুর আত্মা দর্শন কর। মাকে দেখ।

তবে স্থির জেনে রেখ কুমার, পূজা-তত্ত্বই অধিকার কর, আর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই কর, যৌগিক প্রথায় যাও—আর জ্ঞান বিচার সিদ্ধি মুমুক্ষু হও—তাকে পাওয়া নির্ভর করে শুধু তারই উপর। সে যাকে বরণ করে সেই তাকে পায়—অন্যে বহু অন্যে নয়।

তাই হে সর্ব্বান্তর্যামিনী প্রত্যক্ চিন্ময়ীর পাদাঙ্গুলি ওই "অঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি" লক্ষ্য করে, বেদনের পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে তার মুখ চেয়ে অপেক্ষা কর। যদি বিশুষ্ক মুখে সরল সত্য আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন ফুটে উঠে—যদি তোমার আহ্বানে সত্যের কাতরতা দেদীপ্যমান হয়—তবেই জানবে তোমার মঙ্গলপ্রভাত সমাগত। জ্ঞানের কৌতুহল মাকে আনে না বৎস—প্রাণের কাতরতা তাকে মর্ত্ত্যে নামিয়ে আনে দেখেছি।

তাই এত কথা না ব'লে, এস শুধু বলি মা—শুধু শুনি মা—শুধু দেখি মা—শুধু স্পর্শ করি মা, শুধু বোধ করি, অনুভব করি মা—মা—মা! ওরে শক্তিময়ীর শক্তিমান পুত্র, লেখনীতে শুধু লেখ মা—মা—মা—মা।

দুর্গা অধস্তাৎ—দুর্গা উপরিষ্টাৎ—দুর্গা পশ্চাৎ—দুর্গা পুরস্তাৎ—দুর্গা দক্ষিণতঃ—দুর্গা উত্তরতঃ—দুর্গৈবেদং সর্ব্বম্॥

মাতৃভাবের মজার সাধক!!

(শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ।)

শুনি, সদাই নাকি, মায়ের ভাবে থাকিস্ বিভোর!
শুধু, তোর সৃষ্টিছাড়া, জগজ্জোড়া জগদম্বা তোর।
মাতৃভাবে হ'লে সিদ্ধি,
স্ত্রীতে কেন ভেদবুদ্ধি,
সিদ্ধি হ'লে ভেদবুদ্ধি কখন কি রয়?

এক মাসের সে শিশু-ছেলে, সাধক যে জন হয়।
যাকে দেখে সেই যে তার মা, বধূ, কেহই নয়।
শিশু কি রে মাকে ভুলে, সুরত-রত হয়?
শিশুর কিরে ছেলে পিলে, বছুর বছুর হয়?
মাতৃ ভাবের মজার সাধক! করলে বিশ্ব জয়!!

ত্রিবেণী।

(শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩১)

বিন্দুবাসিনী এবং সুরেশ গিরিডি হইতে কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অশ্রু রতনকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসে। শুধু এইটুকু ভরসা লইয়াই সে গৃহত্যাগী হইয়াছিল যে, এত বড় পৃথিবীতে তাহাদের দুজনের মত কোথাও না কোথাও একটু স্থান হইবেই।

পাণ্ডু ঘাটে ষ্টীমার হইতে নামিয়া রতন বলিল, "রেলে ক'রেই কামাখ্যা যাবে দিদিমণি? দেখচ তো ব্রহ্মপুত্রের অবস্থা। এরকম স্রোতের মুখে উজান যাওয়া ছোট একখানা ডিঙ্গী ক'রে বড় ভাল বোধ হ'চ্চে না, দিদিমণি!"

অশ্রু বলিল, "স্রোতের বিপক্ষেই এখন আমায় যেতে হবে, রতনদা'। এতে ভয় ক'ল্লে চ'লবে না। আমি ঐ ছোট ডিঙ্গীখানা ক'রেই যাব।"

রতন আর কিছু না বলিয়া ডিঙ্গীর উপর চুপ করিয়া বসিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার ভয় হইতেছিল এইবার ডিঙ্গীখানি বোধ হয় ডুবিয়া যাইবে। শ্রাবণ মাসের ভরা নদ। দুই পার্শ্বে পর্ব্বত থাকার দরুণ সেখানকার স্রোতের গতি অত্যন্ত দ্রুত। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ছোট ডিঙ্গীখানিকে বার বার দোলাইয়া দিয়া যাইতেছিল। দুই হাতে প্রাণপণে ডিঙ্গীর মধ্যস্থিত কাঠগুলিকে ধরিয়া রতন বার বার বলিতেছিল, "কাজটা ভাল ক'ল্লে না দিদিমণি। লোকেরা সব মানা ক'ল্লে, তাদের কথা শুনলে না। এখন ভালয় ভালয় ঘাটে পৌঁছুতে পাল্লে হয়।"

ডিঙ্গীখানির এককোণে বসিয়া অশ্রু একদৃষ্টে স্রোতের উদ্দাম গতির দিকে চাহিয়াছিল। মাঝে মাঝে উভয় পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতমালার প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছিল, যৌবনের অদম্য স্রোতকে সংযত করিবার জন্যই বুঝি ভগবান এখানটা এত পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন দিকেই যাইবার কোন উপায় না থাকায় আপনার মনেই হুঙ্কার করিতে করিতে স্রোতের গতি নিজের পথে সোজা দিকেই চলিয়া যাইতেছিল।

বর্ষাকালে নদনদী যখন নিজের বাসনা দমন

করিতে না পারিয়া উভয় পার্শ্বস্থিত ভূমি সমূহ প্লাবিত করিয়া দেয় তখন তাহারাও একবার ভাবে না যে এমন দিন আসিবে যখন তাহাদের যৌবনের এ অদম্য বাসনা আর থাকিবে না, আবার তাহাদের নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং ভূমি সমূহও এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিয়া দেখে না যে তাহাদের এমন দিন আসিবে যখন শুধু শুকনো মুখেই থাকিতে হইবে। যৌবনের মোহ কাটিয়া গেলে শুধু ময়লা, শুধু কাদা, শুধু আবর্জ্জনা রাশি লইয়াই ক্ষীণ দেহে নদনদীকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে। এবং ভূমি সমূহও এতদিন যাহাদের বুকের উপর তুলিয়া লইয়া চক্ষু বুজিয়া প্রেম সুধা পান করিতেছিল হঠাৎ একদিন চক্ষু মেলিয়া যখন চাহিবে, যখন তাহাদেরও যৌবনের নেশা কাটিয়া যাইবে, তখন দেখিবে তাহাদেরই অজ্ঞাতে তাহাদের বুকের ধন চলিয়া গিয়াছে, রাখিয়া গিয়াছে শুধু স্মৃতি।

মানুষের সহিত প্রকৃতির এত নিকট সম্বন্ধ, এত সাদৃশ্য, এইটুকুই শুধু অশ্রু ভাবিতেছিল এবং নিজের জীবনের সহিত কতক কতক স্থানে মিলাইয়া লইতেছিল।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া ডিঙ্গীখানিকে বেশ একটু বেচাল করিয়া দিল। ছইটা ধরিয়া না ফেলিলে অশ্রু হয়তো পড়িয়া যাইত। রতন বলিয়া উঠিল, "কি যে অন্যমনস্ক হ'য়ে ব'সে আছ দিদিমণি! একটু কথাবার্ত্তা কওনা।" একটু হাসিয়া অশ্রু বলিল, "তুমি বুড়ো মানুষ রতনদা' তাই তোমার এত ভয়! আমি প'ড়বো না। ওকি! তুমি আমার কাছে আসচ কেন?"

"তোমায় ধ'রে থাকবো দিদিমণি। ডুবি তো আমরা দুজনেই ডুব্‌বো। দেখচ, ওদিকে কিরকম মেঘ করেছে। বল্লুম তখন, এপথে এসে কাজ নেই।"

কতকগুলি কালো মেঘ দক্ষিণ দিক হইতে উঠিয়া সমস্ত আকাশটাকে ক্রমশঃ আবৃত করিয়া দিতেছিল। সেইদিকে একবার চাহিয়া অশ্রু বলিল, "সেই বেশ হবে রতনদা'। দু'জনে এক সঙ্গে ডুব্‌বো। পৃথিবীতে তোমার জন্যে কাঁদবারও কেউ নেই, আমার জন্যে কাঁদবারও কেউ নেই।"

আর একটু পরেই প্রবল বেগে ঝড় জল আরম্ভ হইল। মাঝিরাও মনে মনে প্রমাদ গণিল। অশ্রুকে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া রতন কাঁপিতে কাঁপিতে কেবলমাত্র ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

তাহাকে একটু অন্যমনস্ক করিবার জন্য অশ্রু

বলিল. "কামাখ্যা দেবী দর্শন ক'রে আমরা কোথায় যাব রতনদা ?"

"সে কথা পরে হবে। এখন শুধু ভগবানকে ডাক। ভগবান, ভগবান, ভগবান।"

"তুমি তো আমায় একদিন ব'লেছিলে রতনদা' যে, বাবাকে আর মাকে নিয়ে তুমি এরকম অনেক বিপদেই পড়েছিলে। তবে আজ এ সামান্য বিপদে এত ভয় পাচ্ছ কেন ?"

"সামান্য নয় দিদিমণি, সামান্য নয়। ভগবান, ভগবান।"

"ভগবানকে অত ডাকবারই বা কি দরকার রতনদা' ? আমাদের এ বিপদ কি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না !"

রতন কি একটা বলিতে যাইতেছিল এমন সময়ে কড় কড় শব্দ করিয়া একটা বজ্রপাৎ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল।

অশ্রুও আর কিছু বলিল না। এত ঝড় জলের মধ্যেও সে শুধু নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিল। এ ঝড় জলও প্রকৃতির যৌবনের একটা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ ঝড় জল মানুষের ন্যায় প্রকৃতিরও যৌবনেই প্রবলবেগে আসিয়া থাকে। অন্য সময়ে এতটা হয় না। অশ্রু ভাবিল কেহ কেহ এই প্রবৃত্তির তাড়নায় দুইকূল ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যায়, আবার কেহ কেহ উভয় পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতরাজির ন্যায় প্রবৃত্তির উদ্দাম গতিকে সংযত করিয়া রাখিয়া যায়। নিজের সহিত মিলাইয়া অশ্রু শুধু এইটুকু ভাবিল যে তাহাকেও তাহার উদ্দাম বাসনা এবং যৌবনের প্রবৃত্তি গুলিকে বিবেক এবং মনুষ্যত্ব রূপ পর্ব্বতের দ্বারা সংযত করিয়া রাখিতে হইবে, যতই কেন প্রবল বেগে ঝড় জল হউক না, হৃদয় আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন থাকুক না।

মাঝীরা হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে ডিঙ্গী লাগাইয়া যখন রতনকে ডাকিয়া দিল রতন যেন তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহার দেহে যেন প্রাণ আসিল। তাড়াতাড়ী নামিয়া অশ্রুর হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়া লইল। তখন বেশ জল পড়িতেছিল এবং বাতাসও বহিতেছিল।

খানিকটা দূর পাহাড়ের উপর উঠিয়া রতন বলিল, "এখন অনেক দূর উঠতে হবে দিদিমণি। তারপর মন্দির পাব। এই ঝড় জল মাথায় ক'রে কি ক'রে উঠবে" ?

"এই ঝড় জল মাথায় ক'রেই তো এখন আমার সারা জীবনটা উঠতে হবে. রতনদা। ওপর দিকে তাকিয়ে ভয় পেলে তো চ'লবে না।"

রতন আর কিছু না বলিয়া অশ্রুর হাত ধরিয়া

ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া রতন বলিল, "ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেলে মন্দিরে গেলে হ'ত না দিদিমণি।"

"না রতনদা' আগে দেবী দর্শন না করে আমি কোথাও যাব না।"

রতনের কোন কথাই না শুনিয়া অশ্রু ভিজা কাপড়েই মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। চৌকাঠ পার হইয়া খানিকটা দূর গিয়াই হঠাৎ কি মনে হওয়াতে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, কি যেন একটা তাহাকে পেছন দিক হইতে টানিয়া ধরিল। আর বেশী দূর অগ্রসর না হইয়া তাড়াতাড়ী চৌকাঠের বাহিরে চলিয়া আসিল। রতন বলিল, "ও কি দিদিমণি! বাইরে চলে গেলে যে!"

"এইখান থেকেই দেবীর উদ্দেশ্যে নমস্কার ক'রবো রতনদা'। ভেতরে যাবার অধিকার তো আমার নেই।"

সেইখানেই অশ্রু দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। কত যাত্রী তখন সেখান দিয়া যাওয়া আসা করিতেছিল। তাহাদের পায়ের জল কাদায় সেখানটা কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছিল। সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া অশ্রু সেইখানেই চৌকাঠে মাথা ঠ্যাকাইয়া প্রণাম করিল।

অদূরে গৈরিক-বসন পরিহিতা একটী বৃদ্ধা রমণী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি অশ্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন। "সবাই ভেতরে গিয়ে দেবী দর্শন ক'রে আসচে। তুমি কেন গেলে না মা? লোকের পায়ের-ধূলোর ওপোর এইখানেই কেন প্রণাম ক'রলে?"

চোখের জল আসিয়া অশ্রুর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল; কিছুই বলিতে পারিল না।

"তোমার সঙ্গে কে আছে মা?" রতন বলিল,—"আমি শুধু আছি মা আর কেউ নেই!"

"কোথায় এসে তোমরা উঠেছ? এর পর কোথায় যাবে?"

"এখন কোথাও আশ্রয় নিইনি মা। এরপর কোথায় যাব, তাও জানি না!"

অশ্রু তখনও চোখের জল ফেলিতেছিল।

এলোকেশী বলিলেন,—"কেঁদ না মা! আমার সঙ্গে এস। যে ক'দিন এখানে তোমরা থাকবে আমার কুটীরেই থেকো।"

অশ্রু একটু ইতস্ততঃ করিল। রতনের দিকে চাহিতেই রতন বলিল,—"একটা আশ্রয়ও তো চাই দিদিমণি।"

এলোকেশীর দিকে চাহিয়া অশ্রু বলিল,—"আমি এখানেই মন্দিরের এক পাশে প'ড়ে থাকবো!"

"তা কি হয় মা" বলিয়া তিনি অশ্রুর হাত ধরিয়া নিজের আশ্রমের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

৩২

কিরণময়ীর জীবনী শুনিয়া একদিন তিনি বলিলেন,—"এরই জন্যে সেদিন তুমি মায়ের কাছে যেতে পারনি মা? আমার সঙ্গে আসবার জন্যে এত কুণ্ঠিতবোধ করছিলে?"

অশ্রু অধোবদনে বসিয়া রহিল। কোনই উত্তর করিতে পারিল না।

"মায়ের কাছে তো সবাই সমান মা। তাঁর কাছে খারাপ ভালো ব'লে কিছুই নেই। আন্তরিকতা নিয়ে যে তাঁর কাছে যাবে তাকেই তিনি কোলে তুলে নেবেন।"

অশ্রু এবারেও কিছু বলিতে পারিল না। নিস্তব্ধভাবে শুধু পর্ব্বতমালার প্রতি চাহিয়া রহিল। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু পর্ব্বতের তরঙ্গ—পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, যেন মনে হইতেছে দূরে আরও দূরে আকাশের সহিত সমস্ত পর্ব্বত মিশিয়া গিয়াছে।

"তোমাকে দেখেই সেদিন আমি বুঝতে পেরেছিলুম মা যে, একটা মনের বেদনা নিয়েই তুমি মায়ের কাছে এসেচ। মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে এইখানেই থাক মা। মনে শান্তি পাবে, জীবনে একটা তৃপ্তি পাবে।"

যদি শুধু কিরণময়ীর জীবনীই অশ্রুর বেদনার কারণ হইত তাহা হইলে সে হয়তো এলোকেশীর এ প্রস্তাবে এখনই মত দিতে পারিত। কিন্তু ছয় মাস কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে থাকিবার পরই কলিকাতা যাইবার জন্য অশ্রুর প্রাণ ছটফট করিয়া উঠিল। যখন সে সুরেশকে ভাবিত, যখন ভাবিত সে চলিয়া আসার পর সুরেশ নিশ্চয়ই তাহার বাটী আসিয়াছিল, নিশ্চয়ই অভিমান করিয়া, দুঃখ করিয়া, রাগ করিয়া, ম্রিয়মান হইয়া শূন্যমনে বাটী ফিরিয়া গিয়াছে, তখনই তাহাকে দেখিবার জন্য, তাহার নিকট হইতে এ অজ্ঞাতবাসের জন্য ক্ষমা চাহিয়া আসিবার জন্য, তাহার মুখের কথা দুই দণ্ড শুনিবার জন্য অশ্রুর সমস্ত বাসনা একত্র হইয়া তাহাকে যেন কলিকাতার দিকে ঠেলিয়া দিত।

আবার পরক্ষণেই কি যেন একটা প্রবল ঝড়ের মত আসিয়া তাহার ঈপ্সিত বাসনাগুলিকে উড়াইয়া লইয়া যাইত। ক্ষণিক আশার ক্ষীণ উজ্জ্বল আলোক এক নিমেষে নিভিয়া গিয়া সমস্ত হৃদয় আকাশ অন্ধকারময় হইয়া যাইত।

একদিন শীতকালে ভুবনেশ্বরী পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে বসিয়া অশ্রু আপনার অদৃষ্টের কথাই

ভাবিতেছিলেন। এক বৎসর তো অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কয়েক দিবসের মধ্যে সে তো নূতন পথে তেমন কিছুই অগ্রসর হইতে পারে নাই। পুরাণ পথ হইতেও তো বেশী দূর হটিয়া আসিতে পারে নাই। সম্মুখে শুধু নীলিমা চুম্বিত পর্ব্বতরাজি দেখিয়া অশ্রু ভাবিতেছিল তাহারও পথের সম্মুখে এইরূপই পর্ব্বত, এইরূপই বাধা। যে পথ সে একদিন সোজাই দেখিয়াছিল সেই পথেরই সম্মুখে এত বিঘ্ন দেখিয়া অশ্রু একটু ভীত হইয়া উঠিল এবং পেছন ফিরিয়া দেখিল যে পথ হইতে সে কিছু দূরে হটিয়া আসিয়াছে সেই পথই সোজা এবং বোধহয় সেই পথেই তাহাকে আবার ফিরিতে হইবে।

কিরণময়ীর করুণ জীবনী তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অগ্র পশ্চাৎ উভয় পথই চাহিয়া দেখিল, দেখিল যে সে এখন এমন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে যেখান হইতে সে না পারিবে এক পদ অগ্রসর হইতে না পারিবে পিছু হটিতে। সম্মুখে কুয়াসা এবং মেঘে ঢাকা। ব্রহ্মপুত্রের দিকে চাহিয়া ভাবিল তাহারও হৃদয় বুঝি চিরকালই এইরূপ মেঘ এবং কুজ্ঝটিকায় আবৃত থাকিবে এবং এই আবরণের ভিতর দিয়া নদের স্রোতের মত তাহার জীবন-স্রোতও ছোট একখানি মোচার খোলার ন্যায় ভাসিয়া যাইবে—কখন ডুবিবেও না, কখন দৃঢ় হইয়া আপনার পথে চলিবেও না; শুধু ভাসিয়া ভাসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।

হঠাৎ একদিন কি মনে হওয়াতে রতনকে বলিল, "সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে শুধু একখানা বাড়ী আর কিছু টাকা নগদ বাবাকে দেওয়া হয়েছিল, না রতন দা? বাবা মা যখন গ্রাম ছেড়ে চ'লে আসেন তুমিও তাঁদের সঙ্গে চ'লে এসেছিলে না?"

রতন বলিল, "আমি যে বাবুকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ ক'রেছিলুম, দিদিমণি। তাঁকে কি আমি একলা ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারি! আজ হঠাৎ একথা কেন জিগেস্ ক'চ্চ দিদিমণি? তুমি তো অনেকবার এসব আমার কাছথেকে শুনেচ।"

"বাবা মৃত্যুর সময়ে তাঁর বাপের কাছথেকে ক্ষমা পেয়ে গিছলেন না?"

"বড় কর্ত্তা আমার বাবুকে বড্ড ভালবাসতেন দিদিমণি। তাঁর ইচ্ছে ছিল মায়ের সঙ্গে বাবুর বিয়ে দিয়ে তাঁদের ঘরে তুলে ন্যান কিন্তু গ্রামের লোকের জ্বালায় পেরে উঠেন নি। সেই দুঃখেই তো তিনি মারা গেলেন দিদিমণি।"

"মার বাপের বাড়ীর লোকরা কি ব'লেছিল?

তিনি তো তাঁর বাপ মায়ের কাছ থেকে ক্ষমা পেয়ে যেতে পারেননি। তাঁকে ক্ষমা ক'রে যাওয়ার ক্ষমতা পর্য্যন্ত গ্রামের লোকেরা তাঁর বাপ মাকে দ্যায়নি—না রতন দা? গ্রামের জমিদার ব'লেই বুঝি বাবার বেলায় এ ক্ষমতাটুকু তাঁর বাপকে দেওয়া হ'য়েছিল?"

"তবুও তো বড় কর্ত্তা তাদের কথা ঠেলতে পারেন নি দিদিমণি। তাদের এক রকম লুকিয়েই বাড়ীখানা আর টাকা কটা দিয়ে গিয়েছিলেন।"

"তাদেরই ভয়ে আমাকেও আজ পালিয়ে আসতে হয়েচে। কিন্তু রতনদা, আমিও তো মানুষ। মানুষের ভয়ে আমি এরকম ক'রে লুকিয়েই বা থাকবো কেন?"

একটা দ্বন্দ, একটা তর্ক, যুক্তি আজ কয়েক দিন হইতেই অশ্রুকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল? ইচ্ছার অনুকূল যুক্তি সকলেরই আছে। সেই ক্তির দ্বারাই অশ্রু আজ কয়েকদিন হইতে বিবেককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু প্রতিবারে বিবেক অশ্রুর হৃদয়ে ঘা দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, সে শুধু অনুকূল যুক্তির দ্বারা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই করিতেছে না।

রতন কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই এলোকেশী সেখানে আসিয়া পড়িলেন। তিনি তাহাদের অলক্ষ্যে সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, "সত্যি কথাই তো মা, লুকিয়েই বা থাকবে কেন? মানুষকেই বা ভয় ক'রে চলবে কেন? আমরা তো সবাই সমান মা। একই যায়গা থেকে আমরা সবাই জীবন-যাত্রা আরম্ভ করি, আবার একই যায়গায় এসে মিলিত হই। যত কিছু ব্যবধান, বিবাদ, বিচ্ছেদ, সবই এই যাত্রার পর ফিরে আসা পর্য্যন্ত। এরই মধ্যে মানুষের সমাজ, মানুষের শাস্ত্র, নিয়ম সব। তুমি তো ফের্‌বার পথে যাত্রা করেচ মা তবে এ সব চিন্তা তোমার কেন? আমি ঢের দেখেচি, ঢের শুনেচি। আমিও তোমারই বয়সে ফেরবার যাত্রা করেছিলুম। আমার পথ বোধ হয় ফুরিয়ে এসেচে। তোমারও একদিন আমারই মত ফুরিয়ে আস্‌বে মা। তখন দেখ্‌বে সবই ভুয়ো, সবই শূন্য, সবই ফাঁকা।"

এলোকেশীকে দেখিলেই অশ্রুর হৃদয়ে, আপনা হইতেই বল আসিত, বিনা চেষ্টাতেই তাঁহার পায়ের তলায় মস্তক অবনত হইয়া আসিত। তিনিও অশ্রুর অন্তরের কথা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয় তিনি তাহাকে কন্যার মত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন, কন্যার মত স্নেহ করিতে পারিয়াছিলেন। কোথায় যে একটু মিল আছে, একটু

সহানুভূতির কারণ আছে যাহার জন্য উভয়েই উভয়ের সহিত এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, অশ্রু কিংবা এলোকেশী কাহারও ইহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। যেন একই নিয়মের একই চক্রনেমীর আবর্ত্তে পড়িয়া উভয়েই ঘুরিতেছে ; উভয়েরই দুঃখের কারণ, হাহাকারের কারণ নিরাশার কারণ বুঝি এক। শুধু এইটুকুই তফাৎ যে, একজন অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে এবং আর একজন সবে ফিরিবার পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে।

এলোকেশীর কথার উত্তরে অশ্রু বলিল, "ফেরবার পথেও যে অনেক বাধা মা।"

"ওসব মনের ভ্রম। শুধু ভ্রান্তি, শুধু মায়াই আমাদের মরীচিকার দিকে ঠেলে ছায় মা। যে পথে চ'লতে আরম্ভ ক'রেচ শুধু সামনে দিকে চেয়েই চ'লতে হবে, পেছন ফিরলে হবে না, দাঁড়ালে চ'লবে না।" "পা যে আপনা থেকেই থেমে আসে মা। কে যেন জোর ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে ছায়। এত দিন যাদের সঙ্গে সমান ভাবে এতটা পথ চ'লে এসেচি এত শিগ্গীর তাদের যে ভুলতে পাচ্চি না মা।"

"তাদের কেন ভুলবে মা? ভুলতে হবে নিজেকে, দমন কত্তে হবে নিজের বাসনাকে, নিবিয়ে দিতে হবে আশার প্রদীপকে। যাদের এতদিন শুধু স্বার্থের দিক দিয়ে ভালবেসে এসেচ, মধ্যে যাদের বদ্ধ রেখেচ, তাদের আরও ভাল ক'রে ভালবাসতে হবে, স্বার্থপরতাটাকে সরিয়ে দিয়ে সীমার রেখা মুছে দিতে হবে। দুটো চোখের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান আছে সেটুকুকে তুলে দিয়ে এক ক'রে দিতে হবে। আর একটা কথা মা—শুধু 'আমার' ব'লে যেন কিছু মনের মধ্যে না থাকে ; তার আগে একটা 'সবাই' যোগ ক'ত্তে হবে।"

অশ্রু তখন ভাবিতেছিল ইন্দুর কথা। সেও একখানা পত্রে ঠিক এইসব কথাই অশ্রুকে লিখিয়াছিল—ভালবাসাটাকে পাঁচিলের ভিতর আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, ইহাকে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতে হইবে।

এলোকেশী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন তোমার পথে এসে দাঁড়িয়েচে মা, শুধু কর্ম্মস্রোতই সেইগুলিকে সরিয়ে দিতে পারবে, কর্ত্তব্যের কঠিন দণ্ডই সেগুলিকে আর পথের কাছে আসতে দেবে না, ত্যাগই সেগুলোকে ভুলে যেতে শিখিয়ে দেবে। এ রাস্তায় চল্‌তে গেলে চোখের জল ফেল্লে চ'লবে না। সে শুধু রাস্তাটাকে কর্দ্দমাক্তই ক'রে দেবে। স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিলে চ'লবে না। পথটাকে সে আরও জটিল, আরও অন্ধকার ক'রে দেবে,

অতীতকে সামনে এনে সামনের পথকে আড়াল ক'রে দেবে।"

অশ্রুর হৃদয়-তন্ত্রীর সুর সেদিন কেমন যেন বেসুরো বাজিতেছিল, কতকগুলি মেঘ যেন তাহার হৃদয়াকাশে চলা ফেরা করিতেছিল, বাতাস যেন কেমন এলোমেলো বহিতেছিল। এই রূপ বেতালা হৃদয়ের অবস্থাতে এলোকেশীর কোন কথাই তাহার অন্তরে যাইতেছিল না। কি যেন একটা সেগুলিকে কর্ণের ভিতর হইতেই তাড়াইয়া দিতেছিল।

কিন্তু এলোকেশীর হৃদয়-ক্ষেত্র বিদ্ধ করিয়া যে উৎস সেদিন বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, সেও যেন আর থামিতে চাহিতেছিল না, "কর্ম্মের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে, দেখতে পাবে মা, ফেরবার পথটা তোমার কত সোজা হ'য়ে যাবে, কত সরল হ'য়ে যাবে। যারা তোমায় তাড়িয়ে দিয়েচে, যারা তোমায় ঘৃণা করে, তাদেরই, তখন দেখবে মা, তুমি কত ভালবাসতে পারবে, কত আপনার ক'রে নিতে পারবে। যে সমাজ তোমায় ত্যাগ ক'রেচে, যে শাস্ত্র তোমায় তোমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রেচে, তখন তুমি তাদের ঢের ওপরে চ'লে যাবে। কোন শৃঙ্খলই তখন তোমায় টেনে আনতে পারবে না, কোন মায়াই জালে জড়াতে পারবে না।"

এলোকেশীর মুখের দিকে চাহিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের মত অশ্রু শুধু শুনিয়া যাইতে লাগিল।

যে ঘূর্ণীর মধ্যে কয়েকদিন হইতে একটা অজ্ঞান শক্তি অশ্রুকে আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইতে শত চেষ্টা করিয়াও সে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। এলোকেশীর কত অনুরোধ, কত উপদেশ, কোনই কার্য্যে লাগিল না, ঘূর্ণীর মধ্য হইতে অশ্রুকে টানিয়া তুলিতে পারিল না।

তাহারই আবর্ত্তে পড়িয়া এলোকেশীকে না বলিয়াই অশ্রু একদিন রতনের সহিত কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুধু একা আসিল না; অতীতের যা কিছু তাহার প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। আশার আলোক, বাসনার উত্তেজনা, কামনার উদ্দীপনা—সকলই আবার অশ্রুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

রতন যখন শা নগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ইন্দু সেখানে নাই, পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছে, অশ্রু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে যেন এই রকমই একটা কিছু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছিল। কোথায় যাইবার দরুণ, কাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তাহার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছিল। কিন্তু অবাধ্য বিবেককে

সে কোন যুক্তি তর্ক দ্বারা যেন প্রাণের কথাটী বুঝাইতে পারিতেছিল না। কিন্তু কঠিন ব্যারাম লইয়া ইন্দু পিত্রালয়ে আসিয়াছে এইটুকুই যখন তাহার যুক্তির অনুকূল হইয়া তাহারই পক্ষ লইয়া দাঁড়াইল তখন প্রথমটা বিবেক কিছুই বলিতে পারিল না। এই স্বর্ণ সুযোগটী অবহেলা না করিয়া অশ্রু ইন্দুর বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল।

* * * *

অশ্রু যদি জানিত ইন্দুর মৃত্যুশয্যার উপর তাহারও মৃত্যুশয্যা বিছান ছিল, চিতাকাষ্ঠের শত অগ্নিশিখা তাহাকে ভস্ম করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহা হইলে সে কখনই এলোকেশীকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া আসিত না।

নিজের অবস্থাটী সম্যকভাবে অশ্রু বুঝিতে পারিল তখন যখন সে টলিতে টলিতে বাটী ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

আবার তল্পি তল্পা গুটাইবার আদেশ পাইয়া রতন বলিল, "এবার কোথায় যাবে দিদিমণি ?"

"যেদিকে তুই চক্ষু যাবে রতনদা'।"

(ক্রমশঃ)

চতুর্ব্বেণী সঙ্গম। *

(শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য)

(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ)

[ভূমিকা—বিগত ১৬ই আষাঢ় অপরাহ্নে শিবপুর ইনিষ্টিটিউটের উদ্যোগে হাওড়া টাউন হলে এক সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণস্বরূপ উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করেন। যথা সময়ে বসুমতী পত্রিকায় এই সভার বিবরণ ও প্রবন্ধের সারাংশ প্রকাশিত হয়। তদ্দৃষ্টে এই প্রতিবাদ।]

এ বৎসর চারিদিকেই সাহিত্য সম্মেলনের বড়ই ধুম পড়িয়া গিয়াছে। হাওড়ায় সাহিত্য সম্মেলনের আগেই নৈহাটি ও কাঁটাল পাড়ায় দুইটি বিরুদ্ধ দলের সাহিত্য সম্মেলন হইয়াছিল। 'শিশির' সম্পাদক মহাশয়েরই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি যে ইহাকে সাহিত্য সম্মেলন না বলিয়া "সাহিত্যের নরমেধ যজ্ঞ" বলাই ভাল;

* (প্রবন্ধের মতামত সম্বন্ধে লেখকই দায়ী)।

কারণ এ সম্মেলনগুলিতে যে সভাপতি বরণের পরিবর্ত্তে সভাপতি বলিদানই হইয়াছিল তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই—"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ" এ শ্রুতি-বাক্য এখানে প্রতিপালিত হইয়াছে। 'সাহিত্যের' 'স' যাঁহাদের উদরে নাই তাঁহাদের ধরিয়া বাঁধিয়া বলির পশুকে যূপকাষ্ঠে বাঁধিবার মত এই সাহিত্য যজ্ঞাগারে আনয়ন করায় প্রাণভয়ে যে সকরুণ চীৎকার তাঁহারা করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গবাসী মাত্রেরই কিছুদিন মনে থাকিবে সন্দেহ নাই। তবে ইহাতে তাঁহাদের কোনও অপরাধ নাই—তাই সাধারণের করুণা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। অক্ষম যদি নিজেকে অক্ষম বলিয়া স্বীকার করে, তবে ত সব ল্যাঠাই চুকিয়া গেল, কিন্তু সে যদি উল্টে তাল ঠুকিয়া নিজেকে সক্ষম বলিয়া লোকের কাছে প্রতিপন্ন করাইতে চায় তবে 'অর্দ্ধচন্দ্র' ব্যতীত তাহার ভাগ্যে আর কি জুটিবে? হাওড়ায় এইরূপ একটি ব্যাপারই ঘটিয়াছে। এ সম্মেলনটির কি নাম দিব তাহা প্রথমে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। জনৈক প্রবীন সাহিত্যিক (?) ইহাকে "সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে যেরূপ ভাবে আত্মবিকথনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে বাদ দেওয়া বড়ই নেড়া নেড়া দেখায়। তাই সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা ইহার নাম দিয়াছি **"সাহিত্যের চতুর্ব্বেণী সঙ্গম।"**

আত্মবিকথনা আজকাল একশ্রেণীর লেখকের বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে এটা স্বাভাবিক। চক্‌চকে মলাট ও সোণার জলে একটা উন্মাদনীশক্তিবিশিষ্ট নাম লেখা এবং বীভৎস 'আর্টের' দোহাই দেওয়া দুর্নীতিপূর্ণ নভেলগুলির যখন হুড় হুড় করিয়া প্রতিদিন দুইবার সংস্করণ বাহির হইতে থাকে—সহজে প্রতারিত কোমল মস্তিষ্ক যুবক ও দুর্নীতিপ্রিয় লম্পটগণ যখন 'বাহবা' ও হাততালির জোরে উক্ত নভেল লেখকগণকে সপ্তম স্বর্গে পৌঁছিয়া দিবার Contract করিয়া লন—তখন যে লেখকগণের হৃদয় গর্ব্বে আপনা হইতেই কূপমণ্ডুকের (বা ফুটবলের ব্ল্যাডারের) ন্যায় অত্যধিক স্ফীত হইয়া থাকে, এ বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে,—আর ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ দোষও দেওয়া চলে না। যাক্, এ সব কথা একটু পরে বলিলেও চলিবে।

দেশের দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে হাসিব কি কাঁদিব তাহা স্থির করিয়া উঠা যায় না। শরৎ-

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখন দেশের "প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক"—"বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী"—তিনি এই 'চতুর্ব্বেণী সঙ্গমের' সাহিত্য শাখার সভাপতি। বাংলার কি দড়ি কলসী জুটে না? ইহা অপেক্ষা বাংলা সাহিত্য লোপ পাওয়া শতবার উচিত ছিল। তারপর আবার শরৎবাবুর অভিভাষণ—বাংলা সাহিত্য-জগতে একেবারে French Revolution! সাহিত্যের ত খাইয়া দাইয়া কাজ নাই? খালি Revolution, হুলস্থুল ব্যাপার, ভূমিকম্প, Civil War প্রভৃতি লাগিয়াই আছে। প্রাণ ওষ্ঠাগত!

শরৎ বাবুর অভিভাষণের প্রথম Sentence টিতেই আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। বলা হইয়াছে 'রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি'। কবিবরকে খুব সম্মান দেখান হইল বটে, কিন্তু শরৎ বাবু নিজেই নিজের বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি এটা Glaring Falsehood কি না? কি হিসাবে তিনি সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি? যদি Nobel Prize পাইলেই সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি হওয়া যাইত, তবে Rudyard Kiplingও ত সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি! পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে শুধু বক্তৃতা দিয়া হাততালি পাইলেই যদি সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি হওয়া যাইত তবে ত বিবেকানন্দও সমস্ত বিশ্বের কবি—রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও শতগুণে বরণীয়; কারণ, তিনি Nobel Prize পান নাই, Poet Laureateএর Recommendation, পৃষ্ঠবল প্রভৃতি কিছুই তাঁহার ছিল না—এক বস্ত্র সম্বল করিয়া তিনি পাশ্চাত্যভূখণ্ডে যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রের পক্ষে লাভ করা সাধ্যাতীত হইত (যদি না এতগুলি জিনিষ তাঁহার আয়ত্ত হইত।) তারপর যদি এরূপ কথা বলা হয় যে, রবীন্দ্রের কবিতায় অনেক abstruse দার্শনিক তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—জীবন মরণের ও বিশ্বের সমস্ত প্রহেলিকা তিনি ছিন্ন করিয়া আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন তাহা হইলে বলিব এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তাঁহার কবিতায় যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস মাত্র—Philosophy তাহাতে কিছু নাই, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেন। তাঁহার কবিতায় অপূর্ব্ব শব্দ-বিন্যাস—বিভিন্ন ছন্দের ঘটা—Felicity of Expression—Use of the Inevitable Word—নৃত্যশীলা তরুণীর হৃদয়-স্পন্দনের ন্যায় অপূর্ব্ব স্পন্দন—প্রবহমানা তটিনীর ন্যায় অবাধ গতি প্রভৃতি আদর্শ Lyric Poetএর সকল লক্ষণই থাকিতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিশ্বের

বরণীয় কবি বলিতে সাহস করি না। শরৎবাবুর কাছে বিশ্বের Limit কতটুকু তাহা জানিতে চাই। যদি তিনি নিজে, যতীন্দ্রমোহন বাক্‌চী, রায়বাহাদুর জলধর সেন, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণকে লইয়াই "তাঁহার বিশ্ব" সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। রবীন্দ্রনাথ যে মহাকবি—তাঁহার মত Lyric Poet খুব কমই যে জন্মিয়াছে তাহাতে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আমাদের (শরৎবাবুর অপেক্ষা) নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহার রচিত কবিতাগুলি অমূল্য—বাংলাভাষার নবজীবন এই কবিতাগুলি প্রদান করিয়াছে—বাংলা সাহিত্যের ধারা বদ্‌লাইয়া নূতন আলোক সম্পাতে তাহারা বাংলা সাহিত্যকে হাস্যোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, এ কথা যে অস্বীকার করিবে সে অতি পাষণ্ড; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে "সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি" বলিতে পারি না। তবে রবীন্দ্রনাথের সভাপতি নির্ব্বাচনে আমাদের কোনই ক্ষোভ থাকিতে পারে না। কারণ, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর সাহিত্যিক ও কবি আর কেহ নাই।

তাহার পর শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দরিদ্র নিরন্ন সাহিত্যিকদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া ধনবান্ সাহিত্যিকগণের অত্যধিক উচ্ছ্বাস ও উদ্যমকে যে ভাবে Condemn করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাঁহার এরূপ উদ্যম বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

তিনি তার পর বলিয়াছেন যে যাঁহারা সাহিত্যরচনার কাজটাকে বাহুল্য (ক্ষমতাতীত?) বলিয়া মনে করেন তাঁহারাই সমালোচক সাজেন। কথাটা নিহাত মিথ্যা নয়। Landorএর 'A critic is a cutdown poet'—এ বচনটি আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রায় জানেন। এ কথা লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটির বোধ হয় আবশ্যক নাই। এখন কথা হইতেছে এই সমালোচকদিগের মতামত সম্বন্ধে। সমালোচকদিগের প্রথম বক্তব্য (অবশ্য শরৎ বাবুর মতে) এই যে, "বাংলা ভাষার মত ভাষা বিশ্বসাহিত্যে আর কোন জাতিরই নাই—পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এরূপ উন্নতি, এ কেবল বাংলা-সাহিত্যের পক্ষেই সম্ভব।" শরৎ বাবু এই প্রথম বক্তব্যটির সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছুই বলেন নাই;—কারণ, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তিনি সমালোচকগণের দ্বিতীয় বক্তব্যটির প্রতি বিশেষ আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন।

শরৎ বাবুর মতে সমালোচকদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে "আবর্জ্জনায় বঙ্গ সাহিত্য বোঝাই হইয়া উঠিল, আর বুঝি ইহা বাঁচে না; বঙ্কিম নাই, সুতরাং মুগুর মারিবে কে? রাশি রাশি দুর্নীতিপূর্ণ নাটক নভেল ও কবিতা বাহির হইতেছে—ইহার প্রতিই পাঠকগণের আগ্রহ অত্যধিক—প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি ভাল ভাল বই পাঠকগণের উৎসাহের অভাবে বাহির হইতেছে না।" কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার মত। বাস্তবিক আজকাল বাংলা লাইব্রেরি বলিলেই খানকয়েক বাংলা নভেলের সমষ্টি বুঝায়—'বাংলা বই' মানে বুঝায় নভেল। বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদিগের বাংলার প্রতি তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্ না কেন উত্তর পাওয়া যাইবে—'বাংলা আবার পড়িবে কি?' এইত বাংলা ভাষার অবস্থা! এখন বাংলাভাষায় একখানা ইতিহাস লিখিত হইলে এক বৎসরে ১০০ কপি বিক্রয় হয় না, কিন্তু একখানা নূতন নভেল বাহির হউক দেখি, তিন দিনে এক সংস্করণ শেষ হইয়া যাইবে। এই ত দেশের লোকের Mentality! তবে বাংলা ভাষার উন্নতি কি করিয়া হইবে? ইহার একটা প্রতিকার অত্যাবশ্যক। কিন্তু করিবে কে? বঙ্কিম নাই—ইন্দ্রনাথ নাই—সমাজপতি নাই, আছেন শুধু শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রমোহন ও শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনে কে? এ সাহিত্যশাসন তাঁহাদের পক্ষে একরূপ সাধ্যাতীত। শরৎবাবু ইহার উত্তরে গাহিয়াছেন যে "বিশ্বসাহিত্যে অন্যান্য যে সব ভাষা স্থান পাইয়াছে তাহাদের নাটক নভেলের তুলনায় কয়খানিই বা নাটক নভেল বাংলা ভাষায় আছে যে সমালোচকগণ নাটক নভেলের বহুল প্রচারে আশঙ্কিত হইতেছেন।" তাঁহার মতে 'নাটক নভেলে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া গেল' এ অতি হেয় মিথ্যা কথা! আর যে নাটক নভেলকে সমালোচকগণ আবর্জ্জনা বলিয়া থাকেন তাহাই সাহিত্যের বনিয়াদ্। 'মেঘদূত বা গীতাঞ্জলি' ঝাঁকে ঝাঁকে সৃষ্ট হয় না, আবর্জ্জনা আছে বলিয়াই ইহারা জন্মলাভ করিয়াছে" নতুবা এতদিন অক্কালাভ করিত। সুতরাং **নাটক নভেল বাংলা ভাষায় যতই প্রচারিত হয় বাংলা ভাষার ততই উন্নতি** (লেখকদিগেরও ততই পকেট ভারি)।

বিশ্বসাহিত্যে অন্যান্য যে সব ভাষা স্থান পাইয়াছে তাহাতে বিস্তর নাটক নভেল আছে—বাংলা নাটক নভেল অপেক্ষা অনেক নাটক নভেল আছে এ কথা সত্য; কিন্তু বাংলাভাষার

শুধু নাটক নভেলই তাহাদের একমাত্র সম্বল নহে। অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকও আছে। নাটক নভেলমাত্রই যে খারাপ একথা আমি বলিতেছি না। কারণ, Shakespeare, Scott, Dickens, Hardy, Goethe, Tolstoy, Ibsen, Victor Hugo, Materlinck, Turgeniv প্রভৃতির নাটক নভেলের মত জিনিষ ফেল্‌না নহে। যেদিন বাংলায় এই Standardএর নাটক নভেল প্রচারিত হইতে থাকিবে সেদিন অবশ্য নাটক নভেলকে দোষ দেওয়া চলিবে না। বঙ্কিম বা গিরীশের মত নভেল নাটক বাহির হইলে বিশেষ দোষের কিছুই থাকে না, তবে 'চরিত্রহীন' বা 'শ্রীকান্তের' মত পুস্তক বাহির হইলে যে দোষ দেবার কারণ আছে তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তারপর বিদেশী ভাষার সমালোচকগণের কাছে ভাল নাটক নভেলের আদর যেমন, "Grubstreet Productions" বা 'Kieff Poet' দের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণাও ততোধিক। তাহা ছাড়া Goethe, Schiller, Carlyle, Emerson, Ruskin, Irving, Macaulay প্রভৃতি মনীষিগণের সাহিত্যরচনাও Shakespeare প্রভৃতির নাটক নভেলের অপেক্ষা কিছু কম আদর পায় না। (কিন্তু আমাদের দেশে বঙ্কিমের "বিবিধ প্রবন্ধ" "কৃষ্ণচরিত্র" বা কালীপ্রসন্নের "নিশীথচিন্তা" বা চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সাহিত্যগ্রন্থ কয়জন পড়েন?) আর বাংলায় এরূপ বই আছেই বা কয়খানি? যা আছে সেত আঙ্গুলের পাবেই গোনা যায়। সাধে কি Macaulay বলিয়াছেন "A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India aud Arabia" (অবশ্য একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও ফলতঃ অনেকটা সত্য বটে)। সর্ব্ববিষয়ে বিদেশী সাহিত্যের সমকক্ষ হইলেই তবে তাহার সহিত তুলনা করা সাজে। অন্যথা জোনাকীর চাঁদ হইবার আশার ন্যায়, পিপীলিকার পক্ষী হইবার আশার ন্যায়, কেবল পচা নাটক নভেল প্রসব করার জোরেই বিদেশী সাহিত্যের সমকক্ষ হইবার আশাও ধ্বংসেই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

(আগামী বারে সমাপ্য)
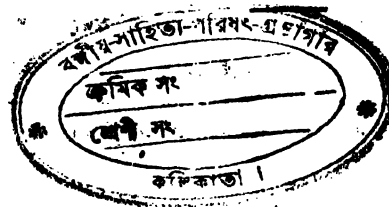
সাথী-হারা। *

(শ্রীব্যোমকেশ অধিকারী)

বাদ্‌লা দিনের পাগ্‌লা হাওয়া
জমাট মেঘের সাথে।
দিলের ব্যথা প্রাণের মাঝে
গুমরে শুধুই ওঠে।
জমাট মেঘের সাথে।
কাতর চোখে ঝরে বারি
শিথিল ওরে প্রাণের ডুরি
বিভোল বাদল রাতে।
জমাট মেঘের সাথে।
সজল দুটি কাহার আঁখি,
জাগ্‌ছে হৃদে থাকি থাকি,
অসীম মেঘের পথে।
বিভোল বাদল রাতে।

দূর সুদূরের অসীম রেখা,
কোথা সেপথ যায়না দেখা,
পারিস্ কি খুঁজে যেতে
জমাট মেঘের রাতে।

অধীর প্রাণ আজ সাথী-হারা,
খুঁজ্‌ব তারেই পাগল পারা,
বাদল হাওয়া মাথে
আকুল আঁখির সাথে।

সংস্কার।

(শ্রীকালবরণ ঘোষ)

হরনাথ সবে মাত্র বাড়ীতে পা দিয়াছেন, ক্ষান্তমণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার স্বরে মুখ-খানা বিকৃত করিয়া বলিল, "যার বে দেবার ক্ষমতা নেই সে মেয়ের বাপ হয় কেন ?"

কর্ম্মক্লান্ত-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এই অপ্রীতিকর কথা শুনিয়া হরনাথের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। জ্বলিয়া উঠিলে উপায় কি ? অপ্রিয় হইলেও কথাটাত সত্য। কোন উত্তর না দিয়া নীরবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাপড় ছাড়িয়া রোয়াকে আসিয়া বসিল। বেদনা-পীড়িত হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া হরনাথকে একটু

* খ্যাটরা পারিজাত সমাজের "সংক্রান্তি সম্মিলনের" ষষ্ঠদশ অধিবেশনে পঠিত।

আরাম দিল।

প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া খান্তমণি অধিকতর রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "ধুবড় মেয়ে নিয়ে বসে থাক, আর গাঁ-ময় টি টি পড়ুক।"

হরনাথ মাথা তুলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে নীরবে খান্তমণির দিকে চাহিল মাত্র।

খান্তমণি কি বলিতে যাইতেছিল, হরনাথের পত্নী কাদম্বিনী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "থাম না দিদি ; মানুষটা খেটে খুটে এল তাকে তাতিয়ে আর লাভটা কি। এখন না হয় দুদণ্ড পরেই শুনত।"

হরনাথ ইহাদের ভাবগতিক দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িল। কি যে হইয়াছে তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে ত জানে তাহার প্রধান অপরাধ পঞ্চদশ বৎসর অতীত কন্যার বিবাহ দিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া অজ্ঞাত অপরাধের শাস্তিই যদি তাহাকে লইতে হয় তাহাতেও সে অস্বীকৃত নয়। কিন্তু অপরাধটা জানিতেও কি তাহার অধিকার নাই।

কন্যা কুমুদিনী প্রতিদিনের মত পিতার তামাক সাজিয়া পাড়ু, গামছা আনিয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। খান্তমণি কুমুদিনীকে দেখিয়া চীৎকার ক'রে বলিল, "এই যে নাটুকে মেয়ের আসা হলো কখন? আচ্ছা তোলাচ্ছ—তবু ভাল।"

হরনাথ আপনাকে আর সামলাইতে না পারিয়া তিক্ত স্বরে কহিল, "এত চীৎকার কর্‌ছ কেন? আইবুড়ো মেয়ে সবার ঘরেই ত আছে শুধু আমার একার নয়। বিয়ে দিতে পারিনি— সে কথা ত রোজই হচ্ছে, তার আর নতুন কি শুন্‌বো।"

খান্তমণি কোনদিন হরনাথকে এ রকম তীব্র স্বরে কথা কহিতে শোনে নাই। আজ সহসা তাহার তীব্র স্বরে স্তব্ধ হইয়া পড়িল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া নরম সুরে বিনাইয়া বলিল, "যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।"

হরনাথ দ্বিতীয়বার কহিল, "কি হয়েছে, কথাটা ছাই খুলেই বল না।"

"দরকার নেই আমার অত খুলে বলার, ও যার ব্যথা তাকে যদি না বাজে ত আমার কি" বলিয়া খান্তমণি গন্ গন্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

হরনাথ পত্নীকে নিকটে ডাকিয়া ধীরস্বরে বলিল, "কি হয়েছে, বড়গিন্নী অত রেগেছেন কেন?"

"ওর বোনপো কেয় চিঠি লিখেছে, তাই আমি বলুম, দিদি! তিনি যখন রাজি নন তবে আর কেন মিথ্যে তাঁকে বিরক্ত করবে। এইতে

সারাদিন খুঁটি নাটি নিয়ে ঝগড়া কচ্ছেন।"

"তা—তাতে ঢি ঢি পড়বার কি হয়েছে?"

"লক্ষ্মী ঠাকুরঝির অসুখে কুমুদ যে তাকে সেবা করেছিল, তা রাধুও তাকে দেখ্‌তে যেত, এই নিয়ে নাকি পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে।"

"চুলোয় যাকগে পাঁচজনের কথা। আমরা ত আল আছি তা হলেই হলো তবে রাধুও ত আমাদের পর নয়।"

"লোকে তা বোঝে কৈ বল।"

হরনাথ কন্যাকে স্নেহ-দৃষ্টিতে আপাদ মস্তক দেখিয়া লইয়া তাহার হাত ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইয়া ধীর-স্বরে কহিল, "না মা তুমি অন্যায় করতে পার না।"

কুমুদিনী শুনিত, তাহাকে ও রাধুকে লইয়া গ্রামে নানা আলোচনা চলিতেছে। আপনার দৃপ্ততেজে, রাধুর নিঃসঙ্কোচ সরল উদার ব্যবহারে সে কোন দিনই কোন ত্রুটি দেখে নাই যাহাতে তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, তাই সে সকলের নিষেধ ও নিন্দাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাধুর সহিত মেশামেশী করিয়া গ্রামের মিথ্যা নিন্দুকদের ঘৃণায় অবহেলা করিত।

গ্রামের লোকের অপেক্ষা নিস্তারিণীর রাগটা ছিল ইহাদের উপর অধিক। তাহার একমাত্র কারণ—তাঁহার সহোদরার পুত্রের সহিত কুমুদিনীর বিবাহ না দেওয়ায়।

রাধানাথ এই গ্রামেরই একটি শিক্ষিত যুবক। সে ডাক্তারী পাশ করিয়া জাহাজে চাকরী লইয়া দেশান্তরে ঘুরিয়া শেষে স্বগ্রামে ব্যবসা করিবার জন্য ফিরিয়া আসিল। সে হরনাথেরই দূর আত্মীয়।

জাহাজে চাকুরী করায় নাকি তাহার জাতিপাত হইয়াছে—কাজেই সমাজে আর সে স্থান পাইতে পারে না। সমাজ স্থান না দিক, তাহার পূর্ব্বপুরুষের পল্লীগৃহ হইতেও তাহাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। যাহারা সমাজের ঘৃণিত দরিদ্র, তাহাদের সহিত মিশিবার তাহাদের সুখ দুঃখের অংশভাগী হইবারও ত অধিকার আছে। তাহাদের সেবা করিয়াও শিক্ষার সার্থকতা হইবে।

গ্রামের সকলে যখন তাহাকে অবহেলা করিয়া দূরে অপসারিত করিল হরনাথ তখন সাদরে তাহাকে আহ্বান করিয়া সস্নেহে আশ্রয় দান করিল। হরনাথের এই উদারতায় গ্রামের দুষ্টলোকগণ ইহার অন্যতম গূঢ় কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল।

এই দুষ্টপল্লীর একপ্রান্তে বাস করিয়া হরনাথ এ উদারতা কিরূপে পাইল আজও রাধানাথ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

রাধানাথ যখন নিঃসঙ্কোচে হরি চাড়ালকে স্বহস্তে বহন করিয়া শ্মশানে দাহ করিয়া আসিল, তখন সমস্ত গ্রাম যেন একটা অশুভ শোচনার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একি! এযে সত্যই অনাচার! জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইতে পারে, খাদ্যাখাদ্য না হয় নাইই মানিল, কিন্তু স্বগ্রামে, স্বসমাজের সমস্ত মানুষগুলিকে বলিয়া কহিয়া চাড়ালের শব বহন করিল! তাহার আর রহিল কি? এত শুধু পরোপকার নয়; ইহা ছুতা মাত্র। ইহার অভিনয় করিয়া সমগ্র সমাজকে উপহাস করা হইল।

রাধানাথকে শাসন করিতে না পারিয়া গ্রামের লোক হরনাথের উপর তাহার ঝাল ঝাড়িল। হরনাথও কথাটা বুঝিল, কিন্তু রাধানাথের কার্য্যের প্রশংসা না করিয়াও সে থাকিতে পারিল না। তথাপি তাহার মনে হইল রাধু এতটা না করিলেও পারিত। রাধানাথকে ডাকিয়া হরনাথ বলিল, "রাধু এতদূর করা তোমার ভাল হয় নাই।"

"না করিলে উপায় ছিল না। মানুষ ম'রে ঘরের পাশে পচে উঠ্‌লে তাকে ত তাহা সাফ করিতে হইবে। অন্যের মড়া বলিয়া চুপ করে বসে থাকিলে অনিষ্ট তাহারই। কাজেই ইহা না করিয়া করি কি।"

ইহার উপর আর কথা চলে না। হরনাথ গ্রামের অত্যাচারের কথা রাধানাথকে জানাইল। ইহাতে সে বলিল, "আমার কোন ভয় নেই, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। তবে আপনি আর আমার জন্য বিড়ম্বনা ভোগ করবেন কেন। আমি ত সব বুঝেছি।"

"তোমাকে ছাড়লেও আর আমার নিস্তার নেই; এই দেখনা কুমুদিনী ও তোমাকে নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে এর কি কোন ভিত্তি আছে? কিছু না।"

"আপনি কি ওকথা বিশ্বাস করেন?"

"আমি আমার মেয়েকে চিনি।"

"তবে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

শিবচন্দ্র চৌধুরী সমাজ রক্ষার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। রাধানাথের এই অনাচার দেখিয়া তিনি তাহাকে একদিন ডাকাইয়া বলিলেন, "এ সব কি তোমার উচিত হলো?"

রাধানাথ ধীর স্বরে কহিল, "কি সব?"

শিবচন্দ্র গম্ভীর ভাবে একবার তীব্র দৃষ্টিতে রাধানাথকে দেখিয়া লইয়া বলিল, "কি সব, বুঝ্‌তে পারছ না?"

"কথাটা না হয় আপনি বলেই ফেলুন না।"

"তুমি নাকি জাত মান না, চাড়ালদের মড়া বয়েছ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আবার এ কথা নিজের মুখেই স্বীকার করছো?"

"কোন অন্যায় ত করিনি, যার জন্য লজ্জা পেতে হবে।

"তবে তুমি জাত মান না বল?"

"সে জেনে আপনার প্রয়োজন কি?

"জান আমি এ গ্রামের কর্ত্তা। এখানকার ভাল মন্দর বিচারের ভার আমার। তুমি যে এই গ্রামে থেকে সমাজের শাসন মানবে না তা হবে না, শিবচন্দ্র চৌধুরীর নামে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়; এ বড় কেহ কেটা নয়।"

"মশায়ের নাম আমিও শুনেছি কিন্তু আমার সঙ্গে মশায়ের কোন সম্পর্ক ত নেই। গ্রামের

যখন আপনি কর্ত্তা তখন আপনার শাসন সকলেই মানতে বাধ্য তবে কি না—"

রাধানাথের কথায় বাধা দিয়া চোখ রাঙাইয়া তীব্র স্বরে শিবচন্দ্র বলিল, "তুমি মানবে না?"

"এর মধ্যে মানামানি কিছু নেই। আত্মীয়ই হোক আর অনাত্মীয়ই হোক, প্রচলন হচ্ছে সকলের সকাশে অন্যায় করলে তার জন্য শাস্তি গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু চাঁড়ালের মড়া বয়েছি ত এমন কোন গর্হিত কাজ করেছি মনে হয় না।"

"তোমার না হতে পারে, কিন্তু সমগ্র সমাজ যে তোমার অন্যায়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।"

"নিম্ন জাতি বলে মড়া না বইলে তার দুর্গন্ধে আমার টেকান দায় হতো কাজেই নিজের গ্রামের স্বাস্থ্যের জন্য এ কাজ করতে আমি বাধ্য হইয়াছি।"

শিবচন্দ্র দেখিল তাহার শাসন এ সব ক্ষেত্রে সুবিধা-জনক হইবে না। তাই ভাবিয়া দেখিল অন্য কোন উপায়ে ইহার প্রতিকার করিতে পারে কি না। শিবচন্দ্র বলিল, "যা করেছ, ভাল ভেবেই যখন করেছ, তখন একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ফেল।"

"যে পাপ করে সে প্রায়শ্চিত্ত করে, আমিত জানত কোন পাপ করিনি।"

"একটা লোকাচার আছে সেটা করলে তোমার আর ক্ষতি কি?"

"আমাকে ক্ষমা করবেন এ আমার দ্বারা হবে না।"

রাধানাথ চলিয়া গেল। শিবচন্দ্র ক্রুদ্ধস্বরে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "বটে, এত বড় দম্ভ তোমার। আচ্ছা দেখা যাবে।" শিবচন্দ্রকে উপেক্ষা ক'রে এ গ্রামে কেউ বাস করতে পারেনি।

দেবী ঘোষাল হরনাথের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল হরনাথ ও রাধানাথ কথা কহিতেছে। কুমুদিনী পিতার পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে।

দেবী ঘোষালকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরনাথ বলিল, "আসুন ঘোষাল মশায়, কি সংবাদ?"

দেবী ঘোষাল মাদুরের এক পাশে বসিয়া পড়িয়া তালপাতার পাখাটা তুলিয়া লইয়া হাওয়া করিতে করিতে বলিল, "অতি সুসংবাদ। তোমার কন্যার সম্বন্ধ করেছি। একদম পাকা। ঘর বর আর দেখতে হবে না; সবই জানা। তোমার মেয়ের ভাগ্য ভাল যে এমন পাত্র জুটল।"

কুমুদিনী আপনার বিবাহ-প্রসঙ্গ শুনিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

দেবী ঘোষাল হরনাথের কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "শিবু চৌধুরী।"

দেবী ঘোষালের কথা শুনিয়া হরনাথ স্তব্ধ হইয়া পড়িল। মৃত্যুদ্বার-যাত্রী বৃদ্ধের বিবাহের ব্যবস্থা? তাহা হইতে পারে। কিন্তু সে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিবে না। অথচ শিবচন্দ্র আপনি উপযাচক হইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে, উপেক্ষা করিলে তাহার ক্ষমতার শেষ সম্বলটুকু নিয়োগ করিয়া তাহাকে উৎপীড়ন করিতে দ্বিধা করিবে না। অন্তরের বেদনা চাপিয়া মুখে কপট হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "আচ্ছা ঘোষাল মশায় আমি একটু

ভেবে দেখি।"

"ভাবৰার আর কি আছে হরনাথ! অনূঢ়া বয়স্থা কন্যা বিষধর সাপের মত। তার দ্বারা কখন কি অনিষ্ট হয় বলা যায় না।"

দেবী ঘোষালের কথা শুনিয়া রাধানাথের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল ঘোষালের মুখটা চাপিয়া রাখিয়া তাহার বাক্যের স্রোতকে বন্ধ করিয়া দেয়।

হরনাথ রাধানাথের ভাবটা বুঝিতে পারিয়া একবার তাহার মুখের দিকে একবার দেবী ঘোষালের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

দেবী ঘোষাল বলিল, "দিনে দিনে মানুষের মতি পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। তার পর ইংরাজি শিক্ষার দোষে শাস্ত্র-বিধি কিছুই আর মানে না, মেয়ে বড় হলে পিতা মাতা যাকে তাকে ধরে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না আর আজ তুমি সুপাত্র পেয়েও ষোড়শী কন্যার বিবাহের কথা চিন্তা করিতে যাইতেছ?"

ক্রোধে রাধানাথের ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। তীব্র দৃষ্টিতে দেবীঘোষালের প্রতি চাহিতেই, সে বলিল, "কি ছোকরা তুমি যে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠ্‌লে।"

"তোমাদের মত গণ্ডমূর্খের কাছে শাস্ত্র-বিধির ভুল বাক্য শোনা অপেক্ষা না শোনাই ভাল। শাস্ত্র আওড়াচ্ছ, শাস্ত্র-পুস্তকের মলাটও ত দেখনি কখন। শিব চৌধুরীর মোসাহেবী করে ত দিনপাত কর। তবু যদি না আমি তোমার কুবৃত্তির কথা জানতুম।"

দেবীঘোষালের দীপ্ত মুখ একেবারে ছায়ের মত হইয়া গেল। জোঁকের মুখে চুণ পড়িলে যেমন কুঁচ্‌কাইয়া যায়, দেবীঘোষালও সেই প্রকার রাধানাথের কথায় সহসা স্তব্ধ হইয়া মাথা নত করিল—আজ কি কুক্ষণেই সে হরনাথের বাড়ী আসিয়াছিল। তাহার মান সম্ভ্রম আজ সব ঐ ছোঁড়াটা হইতেই নষ্ট হইয়া গেল। অনেকে এ কথা অবিশ্বাস করিবে না। আর ইহা লইয়া তর্ক করিতে যাইলে অধিকতর লজ্জার কারণ হইবে।

এ অপমান সে নীরবে সহ্য করিবে না প্রতিজ্ঞা করিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িয়া রাধানাথের মুখের প্রতি চাহিতেই দেখিল রাধানাথ তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। মুখ ফিরাইয়া লইয়া হরনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে চল্লুম হরনাথ। চৌধুরী মশায়কে বলবো তবে, যে তুমি স্বীকার পাচ্ছ না।"

হরনাথ বুঝিল ঘোষাল রাধানাথের অপমানের শোধ তাহার উপর দিয়া চালাইবে। সে একটু ভীত হইলেও ধীর-স্বরে কহিল, "আমি অস্বীকার করিনি; তবে একটু ভেবে দেখি।"

ক্ষুন্ন-স্বরে ঘোষাল বলিল, "ভাল; তাই বলবো।"

ঘোষাল চলিয়া যাইলে রাধানাথ বলিল, "সত্যই কি আপনি শিব চৌধুরীকে জামাই করবেন?"

"ঘোষালের প্রস্তাবের জন্য আমি ত প্রস্তুত ছিলুম না। একেবারে অস্বীকার করলে শিব চৌধুরী আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত ক'রে তুলবে, তাই সময় নিয়ে আপনাকে সামলে নিই বাবা। মোটেও ৩, হাজার ঘরেও নেই, অথচ এই প্রস্তাব। কি করি বলত রাধানাথ?"

"আরও ত পাত্র জোটে, না এই একটী মাত্র পাত্র আপনি পেলেন ?"

"ওঃ" বলিয়া রাধানাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শিবচন্দ্রের অত্যাচারে হরনাথ দেশত্যাগ করিতে মনস্থ করিল রাধানাথ তাহাকে অভয় দিয়া বলিল, "আপনি আমার কাছে থাকুন, কেউ আপনার অনিষ্ট করতে পারবে না।"

"বেশ বাবা—আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বিড়ম্বনা ভোগ করবে।"

"বিড়ম্বনা আমার সব দিক দিয়ে, আপনি সে জন্য চিন্তা করবেন না। আমারও ইচ্ছে হয় এই ঘৃণিত স্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে যাই, কিন্তু সে ত পুরুষের কাজ নয়। অর্থশালী ব'লে শিবচৌধুরী অন্যায় অত্যাচারে আমাকে উৎপীড়ন করবে আর আমি তাই বিনা আপত্তিতে স'য়ে যাব ? তা হয় না হরনাথ বাবু।"

"সব বুঝি বাবা, কিন্তু আমরা ত পেরে উঠি না।"

রমাই মণ্ডল ধীর-পদে প্রবেশ করিয়া ক্রন্দন-স্বরে কহিল, "রাধু-দা, আমার ছেলের কলেরা হয়েছে, একবার যেতে হবে। খাবি খাচ্ছে, বোধ হয় বা এতক্ষণ হ'য়ে গেল।"

রমাইকে মিষ্ট ভৎসনায় রাধানাথ বলিল, "এতক্ষণ ত আমাকে খবর দিতে হয় হতভাগা। ছেলেটা খাবি খাচ্ছে—এমন সময় এলি। চল্ আমি যাচ্ছি" বলিয়া রাধানাথ প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া রমায়ের বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

হরনাথের মন সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ পরোপকারী রাধানাথের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া রাধানাথ রমাই মণ্ডলের পুত্রকে বাঁচাইতে পারিল না। কয়েক দিন উপরি উপরি এইরকম কলেরা রোগী দেখিয়া রাধানাথ আপনিই কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল। হরনাথ আকুল আগ্রহে তাহার সেবা করিয়া বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিল। সেবাপরায়ণা কুমুদিনী মৃত্যুকাতর রাধানাথের পদতলে বসিয়া দিবারাত্রি জাগিয়া রহিল। গ্রামের নিম্নশ্রেণী লোকসকল এই উপকারী বন্ধুর এরূপ দুঃসংবাদ পাইয়া অতিশয় কাতর হইল। রাধানাথ শুধু তাহাদের বন্ধু নহে, পিতামাতা বলিলেও চলে। তাহাদের অভাব অভিযোগে, তাহাদের রোগে শোকে, দানে সেবায় কে এমন সাহায্য করিবে ? হে ভগবান ! তাহাদের এই পরমোপকারী বন্ধুকে ফিরাইয়া দাও। তাহাদের কাহারও বিনিময়ে ইঁহাকে ফিরাইয়া দাও।

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে হরনাথ এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাহিরে অশিক্ষিত মানুষ-গুলি শুষ্ক আগ্রহে ভিতরের স্বর্গপথ-যাত্রীর আত্মার মঙ্গল কামনার অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের একজন হরনাথকে ধরিয়া বসাইল। হরনাথ তীব্র দৃষ্টিতে রাধানাথের নির্জ্জীব মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। পরক্ষণেই কুমুদিনী আছড়াইয়া রাধানাথের বক্ষের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো এ দাসীকে ফেলে কোথা গেলে গো।"

বাহিরে সম্মিলিত মানুষের শোকার্ত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বাবু, বাবু, আমাদের—"

রাসোৎসব গীতি।
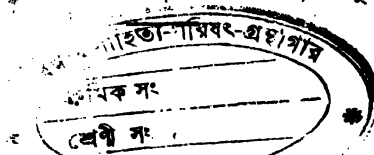
(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ।)

আজু রাসে নাচত রসরাজ!
চরণ-নূপুর ঘন, বাজত রুণু রুণু,
শারদ-ঘন গুরু গরজে পাখোয়াজ।
নব ঘন নীলবরণ চোরা,
চমকে বিজরী বসন উজোরা,
শিহরে শিখি-পালক শিরে,
পলকে ভুবন পুলকে শিহরে,
পুলকিত ব্রজপুর নারী সমাজ।
চমকি ফুকারে মধুর মুরলী,
হাসত দুলত নাচত বনমালী,
নাচত ব্রজপুর-বধূ গতলাজ!
ফুল্লশারদচন্দ্রকিরণ মধুর রজনী রাজে,
নাচত ব্রজকিশোর, মরি ভুবন-মোহন সাজে
নাচত গোপিকা-সাথ কাননে নবীন নটরাজ,
পেখত হরষে গগনে উদিত দেওতা সমাজ,
মুরছে মদন হেরিলে মধুর ভুবন মোহন সাজ
নাচত গোপিকা ঘেরিয়া ঘুরিয়া, নাচত নটরাজ।

সামান্য।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

(১)

একটু অমল আলোর রেখা
উদয় রবির রশ্মি খানি
চমকে উষার ঠোঁটে,
সারা রাতের জমাট ব্যথা
কোথায় পলায় নাহি জানি
ছরাট-হাসির চোটে!

(২)

একটি ছোট শিশির ফোঁটা
দেখি' শুভ্র যুঁথীর দলে
মোতির মত দোলে,
দিনের যত মলিন ধূলি
মুছিয়ে কে তায় সুকৌশলে
শুভ্র ক'রে তোলে!

(৩)

একটি সাঁঝের প্রণাম শুধু
রোগীর শীর্ণ করপুটে
ভোলায় রোগের জ্বালা,
ক্লান্ত আঁখির পল্লবে ঘুম
পলক মাঝে এনে' জুটে
স্নিগ্ধ বিরাম ঢালা!

ত্রিবেণী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি এ,।

ইন্দুর মৃত্যুর কয়েক দিবস পরে সাবিত্রী একদিন বলিল, "তোমার শরীরটা তো এখানে কিছুতেই ভাল থাকচে না। দিনকতক কোথাও ঘুরে এস্ না কেন।" সুরেশ তখন একখানা ডাক্তারী বই পড়িতেছিল। বইখানি মুড়িয়া সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তাই যাব মনে কচ্চি।"

"রাম টহলকে সঙ্গে নিয়ে যেও। সে পুরোণ লোক। তোমাকে দেখবে শুনবে'খন।" একটু বিস্মিত হইয়া সুরেশ বলিল, "তুমি যাবে না? তোমার শরীর তো আমার চেয়েও খারাপ হ'য়ে গ্যাছে সাবিত্রী!"

"আমি গেলে এখানে দেখবে শুনবে কে?"

কতকগুলি গরীবের ছেলেকে সাবিত্রী নিজের বাটীতে রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইতেছিল। তাহাদের খাওয়া পরার ভার, স্কুল কলেজের মাহিনা, পুস্তকাদি কিনিবার খরচা সমস্ত সে বহন করিত। ইহা ব্যতীত অতিথি অভ্যাগত তো আসিয়াই আছে। সেই কারণে সাবিত্রী সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত। প্রায়ই বিশ্রামের সময় পাইত না। তাহার এ ব্যবহারে সুরেশের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এবং সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল। তাহাদের উদ্দেশ করিয়াই সাবিত্রী বলিল, "আমি গেলে এখানে দেখবে শুনবে কে?" সুরেশ উত্তর করিল, "তাদের ভার আমি একজন উপযুক্ত লোকের হাতে দিয়ে যাব সাবিত্রী। তাদের কোন কষ্ট হবে না। আমরা তো শিগ্‌গীরই আবার ফিরে আসবো।"

"তা হ'লেও আমার যাওয়া হ'তে পারেনা। তুমি একাই যাও।"

"আমার চেয়েও যে তোমার শরীরটা বেশী খারাপ হ'য়ে গ্যাছে সাবিত্রী। দু'দিন বায়রে ঘুরে না এলে তো সেরে উঠতে পারবে না।"

"আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি বেশ আছি। তাহ'লে কবে যাচ্চ? কাল যাবে? বড় সুটকেসটাতে সব কাপড়চোপড়গুলো গুচিয়ে দি?"

একটু হাসিয়া সুরেশ বলিল, "তার সঙ্গে তোমার ট্রাঙ্কটাও ঠিক ক'রে নিও। তুমি না গেলে আমি যাব না।"

"আমি নাই বা গেলুম। আমার জন্যে তুমি যাবে না কেন?"

সাবিত্রীর নিজের স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে যাইতে বলিলে সে কখনই যাইতে চাহিবে না, সুরেশ ইহা জানিত। তাই বলিল, "বিদেশে আমায় দেখবে কে সাবিত্রী! আমায় একলা দূরে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এখানে থাকতে পারবে? নিজের জন্যেও যদি না যাও, আমার জন্যেও তো যাবে? তোমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে গেলে আমিও তো কোথাও মনস্থির ক'রে থাকতে পারবো না। সে পরিবর্ত্তনের তো কোনও ফল হবে না সাবিত্রী। আমার সঙ্গে তোমায় যেতেই হবে।"

ইহার উপর আর কোন যুক্তি তর্কই সাবিত্রীর মাথায় আসিল না। অগত্যা সে বাড়ীর সমস্ত বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, যাহাতে আশ্রিত ব্যক্তিদিগের কোন অসুবিধা না হয় এবিষয়ে বাড়ীর সরকার মহাশয়কে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া একদিন সুরেশকে লইয়া সাবিত্রী বাহির হইয়া পড়িল। বিদায়ের সময় ভৃত্যগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রিত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত বাটীর সকলেই তাহার পায়ের ধূলা লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, "কবে ফিরে আসবে মা? শিগ্‌গীর এস।" সজল নয়নে সাবিত্রী সকলকে বলিয়া আসিল, "যত শিগ্‌গীর পারি ফিরে আসবো।" বাটী হইতে খানিকটা দূর গিয়া গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া সাবিত্রী দেখিল সকলেই বারবাড়ী ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার গাড়ীর দিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে চাহিয়া আছে।

ধীরে ধীরে তিল তিল করিয়া সাবিত্রী নিজের অজ্ঞাতেই সুরেশের হৃদয়ে নিজের একটু স্থান করিয়া লইয়াছিল। বোধ হয় তাহা পারিত না যদি তাহার ন্যায্য অধিকারের দাবী, তাহার ঐকান্তিক এবং আন্তরিক আদর যত্ন, সুরেশকে নিজের হৃদয় হইতে অশ্রুকে সরাইয়া দিতে বাধ্য না করিত। সুরেশ যে অশ্রুকে ভুলিয়া গিয়াছিল তাহা নহে। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল। ইন্দুর সহিত শেষ সাক্ষাতের পরেও তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু এতাবৎ-কাল কোন খোঁজই পায় নাই।

ইদানীং আর সে অশ্রুর বড় একটা নাম করিত না। বরং সাবিত্রী তাহার কোন কথা তুলিলে তাহা চাপা দিয়া সুরেশ অন্য কথা কহিত। কিন্তু তাহা শুধু সাবিত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য, তাহার প্রতি একটা কর্ত্তব্যের খাতিরে কিংবা সেটা একটা নিজের আত্মদমনের চেষ্টা, আত্মসংযমের প্রয়াস কি না সাবিত্রী ইহা মাঝে মাঝে বুঝিতে পারিত না। এ অশ্বত্থবৃক্ষের

মূল যে কখন সমূলে উৎপাটিত হইবে না এবং হইবার নহে সাবিত্রী ইহা বেশ জানিত এবং এই জন্যেই কখন সে নিজের তরফ হইতে সে চেষ্টা করে নাই। তাই বুঝি সে সুরেশের ভালবাসা ক্রমেই আকর্ষণ করিতে পারিতেছিল।

গয়ার ব্রহ্মযোনির পাহাড়ে বসিয়া সাবিত্রী বলিল, "দিদির সঙ্গে যদি আমাদের কোথাও হঠাৎ দ্যাখা হ'য়ে যায়, বেশ হয়, না?" সুরেশ তখন দূরে বুদ্ধগয়ার দিকে চাহিয়া ছিল, বলিল, "সে আশা আমি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েচি সাবিত্রী। জীবনে বোধ হয় আর তার সঙ্গে কখনও দ্যাখা হবে না।" "দ্যাখা হ'লে কিন্তু খুব ভাল হয়। তোমাকে তাঁর হাতে দিয়ে আমি একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।"

মনে মনে একটু শিহরিয়া উঠিয়া, একটু উঠিয়া সুরেশ বলিল, "সে কি সাবিত্রী! এতদিন পরে আজ হঠাৎ একথা ব'লচ কেন?"

"আমি বোধ হয় তোমাকে দিদির মত আদর যত্ন ক'ত্তে পারি না, সেবা শুশ্রূষাও কত্তে পারি না।"

"কি ক'রে বুঝলে?"

"তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারি। তুমিই তো একবার ব'লেছিলে তোমার শক্ত রোগের সময় তিনিই তোমায় ভাল ক'রেছিলেন; কত রাত্রি জেগে, কতদিন না খেয়ে, তিনিই তোমায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন। আমি এমন ধারা কত্তে পাচ্চি না ব'লেই বোধ হয় তুমি সারতে পাচ্চ না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কি যেন একটা চাপিতে চেষ্টা করিয়া সুরেশ বলিল, "কেন সাবিত্রী আগেকার চেয়ে আমি তো অনেকটা সেরে উঠেচি। সেবার গিরিডী থেকে ফিরে এসে বড্ড কেমন হ'য়ে গিছ্লুম বটে, কিন্তু যত দিন থেকে তোমার ওপোর নিজেকে ছেড়ে দিয়েচি ততদিন থেকে তো আমি ক্রমেই ভাল হ'য়ে উঠ্‌চি সাবিত্রী। এটুকু কি তুমি বুঝতে পার না, দেখতে পাও না?"

সাবিত্রী আর কিছু বলিল না। অধিক বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া আসিল।

আরও কিছুদিন গয়ায় থাকিয়া সুরেশ এলাহাবাদে চলিয়া আসিল। একদিন সকালে সাবিত্রী গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে স্নান করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল এমন সময় সুরেশ প্রাতভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

সাবিত্রী একটু হাসিয়া বলিল, "গঙ্গায়।"

প্রত্যুত্তরে সুরেশও একটু হাসিয়া বলিল, "একলা গঙ্গায় গেলে তো পুণ্যি হবে না সাবিত্রী—আমাকে সঙ্গে নেবে না?"

"অত পুণ্যিতে আমার কাজ নেই। শীত-কালে সকালে গঙ্গায় নেয়ে তোমার অসুখ ক'র্লে কে দেখবে?" "তোমার অসুখ কত্তে পারে না সাবিত্রী? ঠাণ্ডাতো তোমারও লাগতে পারে। সঙ্গে কাকে নিচ্ছ?"

"রামটহল সঙ্গে যাবে। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত যেন বাড়ী থেকে বেরিও না।"

"মাঘ মাসের শীতে বৃষ্টি মাথায় ক'রে নাইবা পুণ্যি ক'র্ত্তে গেলে সাবিত্রী। দু'দিন বাদে গেলে হ'ত না?"

"না আমার আজই যেতে হবে।"

"কেন?

"মানৎ আছে। ঐখানে তোমার নেবু ছাড়িয়ে রেখেছি আর ঐ তাকের ওপোর রেকাবীতে জলখাবার ঠিক ক'রে রেখেছি। তক্কুয়াকে বলো পেড়ে দেবে'খন।" সাবিত্রী আর অপেক্ষা না করিয়া রামটহলকে লইয়া চলিয়া গেল।

সে দিন বোধ হয় হিন্দুর কোন পর্ব্বদিন ছিল। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে সেদিন ভয়ানক ভীড় হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের যাত্রী আসিয়া সেখানে যেন মানুষের গাঁদি লাগিয়া গিয়াছিল। পাণ্ডাদের এবং যাত্রীদের চীৎকারে সেখানটা সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ পাণ্ডাদের সহিত দক্ষিণা লইয়া ঝগড়া করিতেছিল, কেহ উচ্চৈঃস্বরে যা তা মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিল, কেহ কেহ বা চীৎকার করিয়া গঙ্গা যমুনাকে উদ্দেশ করিয়া মনের ব্যথা জানাইতেছিল। এত গোলমালেও গঙ্গাযমুনা দুই বোন হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে দুই দিক হইতে আসিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া মনের হরষে বহিয়া যাইতেছিল। মানুষের এ চীৎকার ধর্ম্মের নামে দক্ষিণা লইয়া কলহ, ইত্যাদি কিছুরই প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আপনার খেয়ালেই দুই বোন্ বাহিয়া যাইতেছিল—যেন তাহাদের একই উদ্দেশ্য, একই লক্ষ্য, একই গন্তব্য স্থান। যাত্রীদের আন্তরিক প্রার্থনাগুলি, বেদনা গুলি হৃদয়ে লইয়া যেন পরমপিতা পরমেশ্বরের চরণ-প্রান্তে সেগুলিকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত এত দ্রুত, এত বেগে বহিয়া যাইতেছিল।

ঠিক সঙ্গমে একটা ডুব দিয়া উঠিয়া করযোড়ে গঙ্গা যমুনাকে উদ্দেশ করিয়া সাবিত্রী বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর মা যেন তোমাদেরই মত মানুষের সমস্ত পাপ, সমস্ত দুঃখ হৃদয়ে বহন

ক'র্ত্তে পারি। সকলকে যেন সমান ভাবে ভালবাসতে পারি। স্বামীর চরণ দুটী যেন এমনি ক'রেই চিরকাল পূজো ক'র্ত্তে পারি।"

চোখ চাহিয়াই অদূরে সাবিত্রী কাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। পাশেই একটী পাণ্ডা একজন বৃদ্ধাকে মন্ত্র পড়াইতেছিল। সাবিত্রীকে সে ধরিয়া না ফেলিলে সাবিত্রী হয়তো গঙ্গার তীব্র স্রোতে ভাসিয়া যাইত। নিমেষের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া, নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া সাবিত্রী আবার সেই দিকে ফিরিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে যখন "দিদি" বলিয়া ডাকিল, দেখিল অশ্রু আর সেখানে নাই। সেও তাহার ন্যায় সিক্তকেশে, এবং সিক্তবস্ত্রে কটীদেশ পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া করযোড়ে কি প্রার্থনা করিতেছিল। ভিড়েতে সাবিত্রী আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

প্রথমটা যে আবেগের মাথায় সাবিত্রী 'দিদি' বলিয়া ডাকিয়া ফেলিয়াছিল হঠাৎ যেন সে আবেগটা কোথায় চলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি ঘাটের উপর উঠিয়া আসিয়া রামটহলকে বলিল, "খুব জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে দিতে বল্ রামটহল! যেন আধ ঘণ্টার ভেতর বাড়ী পৌছুতে পারি।"

রামটহলও অশ্রুকে দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে ভাল করিয়া চিনিবার পূর্ব্বেই ভিড়ের ভিতর অশ্রু কোথায় মিলাইয়া গেল, দেখিতে পাইল না। ঘোড়ার গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, "টালাকা মাইকো আপ দেখে হেঁ মা-জি।" অন্য দিকে চাহিয়া সাবিত্রী বলিল, "হ্যাঁ দেখেচি।"

"আউর থোড়া ঢুঁর লে মা-জি। মিল জা সেকৃতা।"

"না, না, রামটহল। কচুয়ানকে বল জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে দিতে।"

সেই রাত্রেই সাবিত্রী সুরেশকে বলিল, "চল আমরা কাল এখান থেকে চ'লে যাই।"

আশ্চর্য্য হইয়া সুরেশ বলিল, "কেন?"

"এখানে আর আমার ভাল লাগ্‌চে না।"

"এখন তো কিছুই ছাখা হয়নি সাবিত্রী। শুনেচি এখানকার কেল্লাটা নাকি একটা ছাখবার জিনিস্। সেখানকার মাটীর ভেতর অনেকদিনকার একটা বটগাছ আছে, অনেক ঠাকুর দেবতাও নাকি আছে।"

"তা থাক্। আমাদের কাল যেতেই হবে।"

"জিনিস পত্তর কিছুই গোচান"—সুরেশ কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সাবিত্রী বলিল, "রামটহলে আর আমাতে আজকের মধ্যে সব নেব।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন সাবিত্রী, কিছুই তো

বুঝতে পারছি না। আমাদের যেতে হবে শুধু এইটুকু বুঝে রেখে "তোমার কিছু বুঝতে হবে না। কাল দাও।" ক্রমশঃ

মুণ্ডমালিনী।

(গীতার যৌগিক ব্যাখ্যাকার লিখিত)

কি অট্ট অট্ট হাসি!—কি রুদ্ররব "মাভৈঃ"! মধ্যে মধ্যে কি শিবারবোল্লাস!—বিশ্বভুবন "শম"-শায়ী! সমস্ত প্রশমিত—নিঝুম স্তব্ধ—জীবন্ত আঁধারে জীবন্ত স্তব্ধতা! প্রশমিত সসাগরা ধরণী, প্রশমিত অগ্নি বায়ু, প্রশমিত অন্তরিক্ষ, শশী, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ—প্রশমিত দ্যুঃ ভুঃ—প্রশমে শায়িত সপ্তলোক! শমতার একার্ণব শ্মশান! শুধু এক বামাকণ্ঠে হাসির বিদ্যুদ্ঘটা দিঙ্মণ্ডলে প্রতিধ্বনিত—মধ্যে মধ্যে! মধ্যে মধ্যে সেই কণ্ঠেই রব "মাভৈঃ"—মধ্যে মধ্যে শক্তি উল্লাসের তীব্র তীক্ষ্ণ হুঙ্কার শিবাধ্বনি! আর সেই বিভীষণ শ্মশানের মাঝে, এক শুদ্ধ কল্পবৃক্ষতলে, এক মণিমণ্ডপে, এক রত্নবেদীতে—এক বিরাট শুভ্র শবের উপর এক নিত্য পুরুষ, আর তার বক্ষে—ওরে ও বীর-সাধক—ওরে কামজয়ী কামকেলিময় আপ্তকাম কুমার—ওরে দ্রষ্টা—তোর নয়নতারা তারা!—রক্তরাগ-রঞ্জিতচরণা, নগ্ননিতম্বিনী, ক্ষীণকটি, নগ্নবক্ষা, পীনোন্নতপয়োধরা, ছিন্নমুণ্ডমালিনী, চতুর্ভুজা, স্মরশিহরণময়ী, ঘোরাননা, মুক্তকেশী, ত্রিনয়না, তোর বাঞ্ছাকল্পতরু শ্যামা! মুণ্ডমালিনী শ্যামা!

ইন্দ্রজালময়ী ও সুন্দরী রে! ও হাসি ইন্দ্র-জাল!—ও হাসিতে ইন্দ্রসকল ঘুমিয়ে পড়ে—সব স্তব্ধ হয়ে যায়, অনন্ত ভুবন বিস্মৃতির ঘুম-ঘোরে লুটিয়ে পড়ে—কিছু থাকে না—কেহ থাকে না! ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যায় যত রচনার শৃঙ্খলা—চূর্ণে মিশে যায় যত মহত্ত্ব গরিমা খণ্ডসত্তা; নাস্তিত্বের অজ্ঞানতায় মগ্ন হ'য়ে যায়—যত অনুন্মেষিত চক্ষু অজ্ঞান! আবার ওই হাসির ইন্দুচ্ছটায় যত ইন্দ্রজাল রচিত হয়—ইন্দ্র-সকলের জাগরণজাল বিস্তৃত হয়—মহেশ্বর জাগে, বিষ্ণু জাগে, ব্রহ্মা জাগে—ইন্দ্রাদি জাগে—সূর্য্য চন্দ্র জাগে মৃত্যু জাগে—অনন্ত চিৎকণা স্ফুরিত হয়—ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্মাণ্ড হয়,—সব হ'য়ে পড়ে! অজ্ঞানে মনে হয় সব হ'ল; জ্ঞানের ঈক্ষণে দেখা যায়—সে কিছুই হয় নাই—অথচ একাই সব হয়েছে, সেজেছে! একবার হয় বিশ্ব-মালিনী প্রাণবিলাসময়ী, একবার হয় মুণ্ডমালিনী

অরুণিহরণময়ী। একবার হয় অর্থপূর্ণ অসীম সীমা-মোহবন্ধনময় অনর্থ। একবার হয় অর্থ-শূন্য অসীম সীমামুক্তিময় শুধু পরমার্থপ্রাণসত্বা। একবার হয় মনের প্রাণের অর্থ-বিষয়বৈচিত্র্যময়ী, একবার হয় অ-প্রাণ অ-মন মুণ্ডমালিনী। শুধু সে রক্তাধরের হাসি এ মোহনক্রীড়া সংঘটন করে। মৃদু হাসিতে সৃষ্টি—অট্টে লয়!

ওই "মাভৈঃ" রব। ওই অমৃত অভীতির প্রস্রবণ। যে জেগে থাকে, যার চেতনা জাগ্রত—যে উদ্বুদ্ধ—সে-ই ওই অভয় আহ্বানে বীর হয়—বীর্য্যবান্ হয়—শক্তির কুমার হয়। শ্রুতি বলেন,—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" যার ভয়ে অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি তপনশীল,—ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু প্রভৃতি সক্রিয়, সেই এই তোমার অভয়া যাদুকরীর অভয়বাণী লব্ধচক্ষু সাধকের ভীতি নাশ করে, মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ করে—অমৃতময় করে। ওই মহাকালের বক্ষে অট্টহাসময়ী মুণ্ডমালিনী।

ঘোরা দিগন্তব্যাপিনী মহানিশার অন্ধকারে মায়ের আমার এ মাভৈঃ রব তোরা শুনবি? তোরা শুনবি কি রে কেমন ক'রে মৃত্যুর করাল মুখব্যাদানের মধ্যে থেকে এ গুরুগম্ভীর জীবনের জাগ্রত আহ্বান মুখরিত হ'য়ে সাধককে মৃত্যুর দেশ থেকে নবজীবনের দেশে তুলে নিয়ে যায়। তোরা দেখ্‌বি কি রে কেমন ক'রে মৃত্যুর অঙ্কুশ-প্রহত আতঙ্ক-মূর্চ্ছিত তোদের প্রাণকে সঞ্জীবিত করতে অনন্ত বিশ্বের প্রাণ ওই মুক্তকেশী নগ্না মেয়ে তার অভয় কর উত্তোলিত ক'রে তোদের মুখের দিকে অনিমেষ চেয়ে মূর্চ্ছাভাঙ্গা রব ঘোষিত করে—"মাভৈঃ"। প্রলয়ের মাঝে সঙ্গীতের ঝঙ্কার—মৃত্যুর কুহেলীর মাঝে জীবনের নবীন সূর্য্যোদয় তোরা দেখ্‌বি কি রে।

এ অর্থপূর্ণ সৃষ্টির মাঝে মৃত্যুর অনর্থকর ঘাত-প্রতিঘাতে নিষ্পেষিত হয়ে যদি জীবনের সার্থকতা পেতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকিস্, তবে সংহারের রক্তক্রীড়ার মাঝে ছিন্ন বিশ্বের ছিন্ন মুণ্ডের মুণ্ডমালা বক্ষে নিয়ে কালের বক্ষে করালিনীর প্রতিষ্ঠা দেখ। সে অর্থহীন চক্ষে মরণ-স্থির চাহনি ও শিরোমালার শিরে শিরে—আর সর্ব্বসার্থকতার অর্থপূর্ণ চক্ষে জীবনদায়িনী চাহনি ও মুক্তকেশীর মুক্ত নয়নে। যদি দেখতে চাস্ তবে শোন।—

শব্দ থেকে এ বিশ্বের উৎপত্তি। সে চিন্ময়ীর প্রথম বিকাশ শব্দ। নাদ চেতনার প্রথম স্ফুরণ। নাদ থেকে শব্দময় ভাবের উৎপত্তি। ভাব থেকে জগৎ। বোধের প্রথম প্রকাশ নাদ। সেই নাদই ব্রহ্ম—প্রণব যাহার শব্দগত নাম। সৃষ্টি

স্থিতি লয় শুধু নাদের ঝঙ্কারের তারতম্য। কিন্তু এ নাদ বোধের—বোধময়, চেতনাময় বোধে গড়া; মৃত—বোধশূন্য বা চৈতন্যহীন নাদ নহে। সেই নাদের বহু বিশ্লেষণই অক্ষর—অক্ষর-সংযোজন বৈচিত্র্যে শব্দের উৎপত্তি। ভাবশূন্য শব্দ বা শব্দশূন্য ভাব হয় না। আর ব্রহ্মের ভাবই যে জগৎ, এ কথা বহুকথিত। নাদ খণ্ডিত হ'য়ে অক্ষর হয়, অক্ষরাকারে চেতনার বিশিষ্ট বিশিষ্ট অভিব্যক্তি হয়। আর ভাবের খেলা এ জগৎরচনা করতে—জগৎক্রীড়া সম্পাদন করতে সে অক্ষর চেতনাকে ভাবময় শব্দবিন্যাসে গ্রথিত করে সেই যাদুকরী। নাদময়ী নগ্না হয় শব্দময়ী সগুণা। শব্দ ভাবের প্রকাশক, শব্দশূন্য ভাব হয় না। বোধের তারতম্যে শব্দের তারতম্য, এ আমরা বুঝি; কিন্তু বোধের তারতম্যে অক্ষরের তারতম্য সাধারণ মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু অক্ষর যে বোধপূর্ণ অর্থশক্তির বীজ, এইটিই নাদ ও বীজতত্ত্বের বিজ্ঞান। জীবক্ষেত্রে বোধের দ্বারা শব্দ ও শব্দের দ্বারা বোধ যে উদ্বুদ্ধ হয়, ইহা সকলেই জানে। এক এক শব্দ এক এক প্রকার বোধ ফুটিয়ে তোলে। শব্দ সকল যখন বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খলিত হয়, তখন কতকগুলি সাধারণ অর্থ-হীন অক্ষর মাত্র বর্ত্তমান থাকে। এই অক্ষর মেখলাই মায়ের মুণ্ডমালা। বিশ্বের প্রলয় আর শব্দের বা ভাবের প্রলয় এক কথা। শব্দের অভিব্যক্তি এ বিশ্বপ্রলয়ে অক্ষরে পর্য্যবসিত হয়; আবার এ বিশ্ব-ব্যঞ্জনায় যখন সে কাল মেয়ে অভিলাষিণী হয়, তখন এই অক্ষর বিন্যাস-বৈচিত্র্যেই উহা সংঘটিত হয়, সে বলে আর হয়। সে বলে অহং ব্রহ্মাস্মি, আর অমনি বলার সঙ্গে সঙ্গে তার সে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সেই হয়ে পড়ে। ফুটে ওঠে যত তার ইন্দ্রজাল ঐশ্বর্য্য! অবশ্য তার এ বলা বা শব্দ প্রকাশ আমাদের কথাপ্রকাশের মত বাগিন্দ্রিয়ের উদ্ঘাতজনিত কণ্ঠকূপের ধ্বনি নয়। তার সে শব্দ চেতন শক্তির স্ফুট বা বোধ-স্পন্দন। মনে মনে কথা কহা বা হর্ষ বিষাদ ইত্যাদি বোধ লক্ষ্য করলে সে চেতন-স্ফুটের আভাস সাধারণ জীবও সামান্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

দেখ তোমার হৃদয়ে। তোমার হৃদয় বা দহর অন্তরে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সমস্ত নিহিত আছে। বিশ্বভুবন তোমার অন্তরে, এ কথা তোমরা জান। অন্তরে এ বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, কখনও বাক্যাকারে কখনও জগদাকারে। চেতনার স্ফুটজাত শব্দ সকল অব্যক্তের অন্ধকারে মাত্র মৃত শব্দের আকারে অবস্থান করে; তাই তোমার হৃদয়ের সেই অব্যক্ত অংশকে বলে শ্মশান। আর সেই শ্মশানপ্রান্তে ঘর বেঁধে তুমি

মায়ের শ্মশানচারী সন্তান ভূত প্রেতের বা অতীতের স্মৃতি ও সংস্কার নিয়ে নিত্য মত্ত থাক। অতীতের— ভূতের— প্রেতের পুনরভ্যুত্থানই তোমার সংসার,—মায়ের ভূতপ্রপঞ্চ ক্রীড়া। আর এখানে মত্ত থাক তুমি শুধু তাদের নিয়ে তাদের মুখের শব্দ নিয়ে। তাই মায়ের মাভৈঃ রব শুনতে পাও না। শব্দের ভৌতিকমূর্ত্তি এ বিশ্ব-সংসার নিয়ে তুমি নিত্যমত্ত; তাই সর্ব্বশব্দময়ী মাকে দেখার অধিকার পাওনা। কবন্ধ শব্দ সকলই তোমাদের আশ্রয়। শব্দের শিরোদেশ বা সহস্রার যে চেতনার কণ্ঠে, এ কথা জান না. শব্দের ভৌতিক কবন্ধ দেহ নিয়ে মত্ত হও, তাকে আলিঙ্গন কর, সেই জন্য তোমারও কবন্ধ। ঊর্দ্ধ-মূল অধঃশাখ এ সংসার—ঊর্দ্ধে মায়ে এর মূল, মূলই প্রকৃতপক্ষে শির; আর শাখা অধঃপ্রসৃত অঙ্গ সকল। শির গুপ্ত, অঙ্গ বিকাশময়।

আর কবন্ধের সঙ্গে কবন্ধ হয়ে বদ্ধ থাক এক বিরাট অনপনেয় অনুরাগে।

ওরে, এই অনুরাগই চণ্ডীতে রক্তবীজ নামে অভিহিত। এর বিন্দু রক্ত যে ভূমিতে পড়ে, সেই খানেই সে সজীব সবল অন্য রক্তবীজরূপ পরি-গ্রহণ করে, সেইখানেই সে তোকে শৃঙ্খলিত করে, বদ্ধ করে, মূঢ় জ্ঞান যেন শিরোহীন কবন্ধ করে, মোহাবর্ত্তে বন্দী করে, তোর সকল স্বাধীনতা অপহরণ করে। অনুরক্ত করবার বীজ এই রাগ বা অনুরাগ। বীজ শব্দের অর্থ শক্তি-কেন্দ্র যা থেকে কিছু জাত হয়, তারই সাধারণ নাম বীজ। চিন্ময়ী বিশ্বেশ্বরীই জগদ্বীজ। বীজ স্বরূপ ব্রহ্ম। "ব" অর্থে ব্রহ্ম, ঈকার শক্তিবাচক এবং "জ" জীববাচক। "বীজ" ও জীব অনুলোম বিলোমের ক্রম-বৈপরীত্য। আমরা "ব" এ বা ব্রহ্মে শক্তি দেখি না, "জ"এ শক্তি সংযুক্ত দেখি; জীবত্বেই কর্ত্তৃত্ব শক্তি দর্শন করি ও "জ" জীবের সত্তাই প্রধান ভাবে অনুভব করি বা আদিতে দেখি, সেই জন্য আমরা জীব। আমাদের চেতনায় আমরাই মূল আর মা পরে; আমাদের চেতনা আশ্রয় ক'রে যেন "মা অবস্থিতা, মাকে আশ্রয় করে আমরা, এটা আমাদের ভেবে আনতে হয়। "ব" এর স্থান মূলে দাও "ব'য়ে "ঈ"কার দর্শন কর; তবেই তোমরা বীজ হবে। বীজতত্ত্ব বুঝবে। শব্দ সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। অক্ষরের যে অর্থ আছে, এটা ধারণা করি না। শব্দেরই অর্থ ধারণা করি। অক্ষরে অক্ষরে বা বীজে বীজে যে পরম চেতন শক্তি-বাচক অর্থ বা গুরু বিদ্যমান, তাহার অনুভূতির জন্যই আমাদের "বীজ" রূপী মন্ত্রের সাধনা। আর এই বীজমালা মুণ্ডমালা অক্ষরমালা বা অক্ষর পুরুষ একই কথা।

কিন্তু সে কথা থাক।—বীজ অর্থে কোন শক্তিবিকাশের আদিকেন্দ্র। মন্ত্রের মধ্যে বীজসকলের বিশিষ্ট বিশিষ্ট চেতন-শক্তির কেন্দ্র লক্ষ্য করে। হ্রীং ক্রীং ইত্যাদি বীজ বিশেষ বিশেষ চেতনকেন্দ্র-বোধক। মায়াবীজ কামবীজ প্রভৃতি বলিলে মায়াবোধক, মায়া উদ্দীপক—কামবোধক কামোদ্দীপক চেতন-বিশিষ্টতা বুঝায়। তদ্রূপ অনুরাগবোধক চেতনকেন্দ্রকে রক্তবীজ বলে। অনুরাগের ধর্ম্মই—কোন কিছুতে নিজে একান্ত লিপ্ত হইয়া রঞ্জিত হইয়া অনুরক্ত হইয়া থাকা! সেই জন্য অনুরাগাত্মক চেতনাকে বা অনুরাগকে বলে রক্তবীজ।

ওরে ও শক্তির কুমার! তুই শত খণ্ডে খণ্ডে, ভূতে ভূতে তোর অনুরাগকে বিজড়িত ক'রে রেখেছিস্, সকল খণ্ডেই সে সজীব সচেতন হয়ে তোকে শব্দ মোহে শৃঙ্খলিত করেছে—বাঁশরী-মুগ্ধ মৃগশিশুর মত তুই মুগ্ধ হয়েছিস্—ব্যাধকবলিত হয়েছিস্—তুই মহামায়াকে খণ্ডমায়ায় দেখে মায়াচ্ছন্ন হয়েছিস্— তাই যোগমায়ার মাভৈঃ রব তুই শুনতে পাস্‌নি! তুই অন্ধকারের পর অন্ধকারে আপনার সত্তাহারা হয়েছিস্ বলে তোর অনুরাগের মন্ত্রে সজীব ভূতসকল আজ তোরই কণ্ঠ চেপে ধরেছে। শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে রক্তবীজের রক্ত ভূমিতে স্পৃষ্ট হ'তে না দিয়ে নিজে পান করার জন্য যে মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হয়েছিল, আজ সেই মূর্ত্তিতে মাকে দেখ। ওরে, তোর সমস্ত অনুরাগ গ্রাস করতে, তোকে ফকির ক'রে তোর প্রাণকে কেড়ে নিতে, এমন আর দ্বিতীয় মূর্ত্তি নেই।—আছে বাঁশরীর ঝঙ্কার—মোহন হাসি, ডমরুর ডিমি ডিমি, যোগমুদ্রিত চক্ষু, শূল খড়্গের প্রভঞ্জন,—কিন্তু এমন প্রাণ-পাগল-করা অট্টহাস, নির্ভীক খোলা বুকের-খোলা প্রাণের মুক্ত দিগন্ত-ছড়ান হাসি—এমন সর্ব্বপাতক-লাঞ্ছনাপরিহারী নগ্নরূপ—এমন সকল ভাবের কুয়াশা বিধ্বংসী নয়নত্রয়ের মুক্তদৃষ্টি—এমন সকল ভাবের মূলাধার শব্দরাজি-খণ্ডকরা জ্ঞানখড়্গধরা, ভাব-কুয়াশাশূন্য সত্যের নগ্নভঙ্গিমা—এমন ভাবের জনক স্মরণের আদিভূত শব্দসকলকে জ্ঞানের খড়্গে খণ্ডিত করে—ভাবার্থ শূন্য করে, পরমার্থ শক্তিবোধক অক্ষরে পরিণত করে, কণ্ঠে ধারণ—এ যে শুধু তারাই দেখে রে—যারা ভাবের খেলার ঘর বিষ্ণুগ্রন্থি উত্তীর্ণ হয়ে রুদ্রগ্রন্থিতে দাঁড়াবার যোগ্যতা পেয়েছে।

ওরে বিষ্ণু! ওরে ভাবের ভাবুক, কপট প্রাণের কপট ক্রীড়াতুর, ওরে হৃদয়চোরা—হৃদয়হারা—হৃদয়-খেলায় হারজিত-বিভোর ভাবের কুঞ্জের প্রেমিক পিক, যদি ভাবের খেলায় তোর প্রাণ-চোরাকে দেখে থাকিস্, তবে শুধু

তার মন-মজান বঙ্কিম চাহনিতে ভুলিস্ না— শুধু তার মুখ-চন্দ্রের মৃদু হাসির জ্যোছনায় তোর প্রাণ-সাগরকে উদ্বেলিত হয়ে বেলাভূমে আঘাত খেতে দিস্ না রে! শ্মশানে আয়—শ্মশানে আয়—তোর ইন্দ্রিয়ের আলো নিভায়ে দিয়ে —তোর সোহাগের পুতুল ভূতে প্রতিষ্ঠিত অনুরাগের প্রাণ গুটিয়ে নিয়ে আপনাতে সঞ্চিত কর—ভূতের শবাসন কর—ভূত ভবিষ্যতের দোলন ভুলে নিজসত্তার বর্ত্তমানতা লক্ষ্য কর,—আর উত্তর-সাধকের অপেক্ষা না রেখে—"বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতং আবিরাবীর্ম্ম এধি।" আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— তুমি আমার অন্তরে আবির্ভূতা হও। কেহ নাই কেহ নাই, প্রথম মধ্যম উত্তম পুরুষ কেহ নাই, শুধু সর্ব্বপুরুষের সমাবেশ সেই আছে আমার আত্মা; তোমার লুকোচুরীর প্রেমের খেলা—তোমার ক্ষণেক ধরা ক্ষণেক ছাড়াময় ক্ষণের খেলা আমি চাহি না—তোমাতে আমি উৎসর্গীকৃত—আমায় তুমি খড়্গাঘাত ক'রে আমার সমস্ত অনুরাগ-রুধির পান কর। তোমার খর্পরে, তোমার চরণে, তোমার করে, তোমার স্কন্ধে—ওহো, তোমার অধরোষ্ঠে আমার অনুরাগের তপ্ত রক্ত, আমার সহস্র চুম্বন-রাগময় তপ্তরাগ রুধির রঞ্জিত হয়ে থাক। ওরে ঘোরা —স্মর-শিহরণশীলা—স্মরণ কর শুধু আমার সেই অঘোর সত্তা—যে সত্তা তুমিই শুধু বর্ত্তমানতায় আত্মমিথুনশীল—যে সত্তার মুক্ত দ্বারের পার্শ্বে উঁকি মেরে দেখবার কোন "আমি" লুকিয়ে আড়চক্ষে কৌতূহলের চাহনি চেয়ে থাকে না।

তবে দেখবি তোর অতীত অনাগত সকল ভূতের, সকল ভাবের জনক শব্দরাশি শব মাত্র। —সকল প্রাণ অক্ষর হয়ে সেই অক্ষরাৎ পরতঃ পরের কণ্ঠে লগ্ন রয়েছে,—চক্ষে তাদের অর্থহীন চাহনি, রবহীন মুখ শুধু সেই আত্মরমণশক্তির রমণীয় নগ্ন বিকাশ—মুক্ত চক্ষু, মুক্ত বক্ষ, মুক্ত কেশ, মুক্ত প্রাণের প্রাণোন্মাদী মুক্ত হাসি! দেখরে—অজ্ঞানের দূরত্বে যে মিলন মাত্র সুপ্তির ঘোর মৃত্যু-বিভীষিকাময়ী—জ্ঞানের সান্নিধ্যে তাহাই অমৃত—অভয়—"মাভৈঃ"-মুখরা। ভীতি ও অভীতির নিয়ন্ত্রী তোর মুণ্ডমালিনী আত্মার আত্মাকে সাদরে আজ বরণ কর।

চতুর্ব্বেণী সঙ্গম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য।

"যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" এই প্রবাদ বাক্যটি লোকপ্রসিদ্ধ। বিদেশী সাহিত্যে নাটকীয় ভাব বা নভেলীয়ানা বেশ মুখরোচক লাগিতে পারে — বালিকার (?) প্রেম, কিশোরীর প্রেম, যুবতীর প্রেম, সধবার প্রেম, বিধবার প্রেম, গণিকার প্রেম কোর্টসিপ করিয়া বিবাহ, বিবাহবন্ধনচ্ছেদ ও পুনরায় বিবাহ ইত্যাদি বিদেশী সাহিত্যে অশোভন না হইতে পারে (কারণ তাহাদের সামাজিক প্রথাই এইরূপ । কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ বিদেশী ভাবের প্রচার নিতান্তই অমার্জ্জনীয়। স্বয়ং মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রও এ দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। তাঁহার চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল বাংলার অনেক নির্ব্বোধ তরলমতি যুবকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তবে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সৎ, লেখনী ছিল সংযত ও হাত ছিল পাকা—তাই বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় নাই ; কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহার ভ্রম বুঝিয়া তিনিও আক্ষেপ করিয়াছেন—তাই তাঁহার পরিণত বয়সের পুস্তকে "বাঙ্গালীর গৃহচিত্র" দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে নভেলী ঢং বাঙ্গালী জীবনের পক্ষে পোষায় না—সুতরাং তিনি ঐ চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু শরৎবাবুর "চরিত্রহীনের" উদ্দেশ্য কি তাহাই ? তিনি তাঁহার so called আর্টের সাহায্যে দেখাইতে চাহেন যে কিরণময়ী সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, রাজলক্ষ্মীর মত সতী আর নাই, চন্দ্রমুখী আদর্শ হিন্দুরমণী, অচলা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ইত্যাদি। চরিত্র একবার নষ্ট যে আর সংশোধিত হয় না একথা আমরা স্বীকার করি না কিন্তু তাই বলিয়াই যে গণিকাকে আদর্শ হিন্দু রমণী করিয়া তুলিতে হইবে এমন কোন মানে নাই। যে আর্ট তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করে সে ত 'Hellish Art'—সে আর্ট আর্ট নামেরই অযোগ্য। যে আর্ট প্রাণে বিমল আনন্দ দিতে পারে না অথচ কুহকে ভুলাইয়া মনে একটা পৈশাচিক উত্তেজনা বা আসঙ্গলিপ্সার সৃষ্টি করে সে কি আর্ট? সে ত বাজীকরের কুহক মাত্র। (vide Tolstoy's definition of Art) অধিক বলিতে গেলেই পুঁথি বাড়িবে আর তাহাতে পাঠক মহাশয়গণের ধৈর্য্যচ্যুতির বিশেষ

সম্ভাবনা। এই সকল কুৎসিত চিত্র দর্শনে ফল হয় এই যে, যদি বা উহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুশিক্ষার আভাস থাকে, ত সেই so called Art এর কৃপায় সেটুকু চাপা পড়িয়া যায় আর পাপের য়ই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এই সব ব্যঙ্গ আর্টের প্রভাব এত অধিক যে লেখক তাহার মোহিনী-শক্তির জোরে পাঠকের মুখ দিয়া জোর করিয়া পাপীকে নিষ্পাপী বলাইয়া লন। পাঠকের তখন নিজস্ব মত থাকে না—তাঁহারা parrots of their novelists হইয়া পড়েন। এ-ত Hypnotism মাত্র, এতে আর্ট কোথা? ক্রমে যখন পুনঃ পুনঃ এইরূপ দৃশ্যে পাঠকমণ্ডলী অভ্যস্ত হইতে থাকেন, তখন সমাজের শাসন আর অটুট থাকে না (for pen is mightier than the sword)—ব্যভিচার দোষ সমাজে সংক্রামিত হইতে থাকে—এবং ফলে এইরূপ নির্জীব নভেলী দৃশ্যগুলি প্রথমে বাঙ্গালীজীবনের পক্ষে unnatural বোধ হইলেও, এই সব মহা-পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ আর্টিষ্ট লেখকগণের কৃপায় ইহারই exact prototype বা সজীব দৃশ্য ঘরে ঘরে দৃশ্যমান হইতে থাকে।

তারপর আসিল আবর্জ্জনার কথা। শরৎ বাবু আমাদের দয়া করিয়া জানাইয়াছেন যে আবর্জ্জনাই সাহিত্যের প্রকৃত বনিয়াদ্। মূর্খ সমালোচকগণ এ সাদা কথাটা বুঝিতে চাহে না। সমালোচকেরা যে মূর্খ সে কথা একশত বার, কেন না তাহাদের এত বড় audacity যে শরৎবাবুর লেখাকে তাহারা আবর্জ্জনা বলিতে চায়! তবে তাহাতে শরৎ বাবুর ক্ষোভের কারণ কি? যদি তাঁহার লেখা আবর্জ্জনাই হয় তবে ত তাহা (তাঁহার মতে) বাংলা সাহিত্যের বনিয়াদ্—আর সত্যই যদি আবর্জ্জনা না হয়, so much the better. (তবে শরৎবাবু যদি আবর্জ্জনাকে বনিয়াদ্ করিয়া তাঁহার বাসগৃহ প্রস্তুত করেন তাহা হইলে আমরা একবার তাঁহার Theory টার practical experiment দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি; আমাদের পোড়া কপালে সে সুখ সহিবে কি?) আবর্জ্জনার মধ্যে যদি রত্ন থাকে, তবেই আমরা সে আবর্জ্জনা ঘাটিতে রাজী আছি। কিন্তু যদি রত্ন না থাকে তবে শুধু শুধু আবর্জ্জনা ঘাটিয়া রোগ ডাকিয়া আনিতে যাই কেন? আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে শরৎ বাবু নিষেধ করেন। কারণ, তাঁহার মতে আবর্জ্জনা হইতে রত্ন গজায়। আবর্জ্জনা হইতে ব্যাঙের ছাতা, Carbon Monoxide গ্যাস, রোগের জীবাণু প্রভৃতি জন্মায় ইহাই জানিতাম, এখন শরৎ বাবুর Research হইতে নূতন জানিলাম যে আবর্জ্জনা হইতে

রত্নও জন্মায়,—এজন্য তিনি আমাদের সবিশেষ ধন্যবাদের পাত্র! অবশ্য আবর্জ্জনার মধ্যে রত্ন পড়িয়া থাকিলে সে রত্ন শীঘ্রই চিনিয়া বাহির করা যায় [পাপের পাশে পুণ্য থাকিলে, পুণ্যকে বেশী উজ্জ্বল দেখায়] সন্দেহ নাই, কিন্তু রত্ন যে আবর্জ্জনা হইতে জন্মায় [পুণ্য যে পাপ হইতে জন্মায়] এ কেমন কথা? আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার দ্বিতীয় আপত্তি [অবশ্য শরৎবাবুর মতে] এই যে, 'আবর্জ্জনা আপনি যাইবে—যাহা অসার তাহা টিকে না।' খুব সত্য কথা। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংস করা উচিত নয় এ কথাও আমরা স্বীকার করি না। আবর্জ্জনা আপনা আপনি ধীরে ধীরে ধ্বংস হইয়া যায় বটে, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র উহাকে ধ্বংস না করিলে উহা পচিয়া যে ঘোরতর অনিষ্ট করিয়া যায়, তাহা প্রায় চিরস্থায়ী বলিলেই চলে। [সাক্ষী—দেশের ম্যালেরিয়া; পুরাতন আবর্জ্জনা পচিয়া যে বিষ উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে ত দেশ প্রায় উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে বলিলেও চলে—এওত আবর্জ্জনা পরিষ্কার না করার ফল।] সুতরাং যে আবর্জ্জনার গুণকীর্ত্তনে শরৎ বাবু এতদূর উন্মত্ত ও রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় পুলকিত হইয়াছেন, তাহাই যে দেশের জন-সংখ্যা হ্রাসের প্রধান হেতু, ইহা তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আর্ট ও সাহিত্য' পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।]

তাহার পর কথা উঠিয়াছে যে বঙ্কিম সাহিত্য বুঝি ডুবিয়া গেল। বঙ্কিম সাহিত্য যে ডুবিবার নহে। একথা শরৎ বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, না করিয়াই বা যান কোথা? কারণ, বঙ্কিমের রচনাকে classic রচনা বলা যায়। "A true classic is an author who has enriched the human mind, increased treasure and caused it to advance a step ....who has spoken to all in his own peculiar style, a style which is found to be also that of he whole world, a style new without neologism, new and old, easily contemporary with all time" এখন পাঠকগণই বিচার করিয়া বলুন দেখি এ সব গুণই বঙ্কিমের ভাষায় আছে কি না? কিন্তু শরৎ বাবুর লেখায় এ জিনিষ নাই। তাঁহার style ত তাঁহার নিজস্ব নহে—এ style ত পশ্চিম বঙ্গের Provincialism মাত্র। classic সর্ব্বকালের সম্পদ্ কালের স্রোতে ইহা তলাইতে,

পারে না। কিন্তু Provincialism কয়দিন টিকিবে? অধ্যাপক বটুক নাগ ভট্টাচার্য্য এম্,এ মহাশয় বলিয়াছেন "কপাল কুণ্ডলা ও রজনীতে বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীচরিত্রের অপরিচিত দিক গুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।......Psychological বা মনস্তত্ত্ব ঘটিত নভেলে দেশ ছাইয়া যাইলেও এই দুই চরিত্রের বৈচিত্র্যএখনও অপরাভূত (এখনও কেন চিরকালই থাকিবে) ......বর্ত্তমানে যাঁহারা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন—তাঁহারা বঙ্কিমের মত রাজবর্ত্মে না চলিয়া অনেক সময়ে অলিতে গলিতে পথ হারাইয়া থাকেন;—যেরূপ চরিত্র মানব মাত্রেরই ধারণার অন্তর্গত ও বোধ-গম্য—তাহার অবতারণা না করিয়া যাহা কচিৎ কদাচিৎ কষ্ট কল্পিত সঙ্কীর্ণ পরিবেশের প্রভাবে উদ্ভূত হয় বা হইতে পারে—সেইরূপ সমস্যা লইয়া ব্যস্ত থাকেন। ফলে জিনিষটা universal বা সার্ব্বজনীন না হইয়া সাম্প্রদায়িক, সার্ব্ব-কালিক না হইয়া সাময়িক, সার্ব্বদেশিক না হইয়া প্রাদেশিক হইয়া পড়ে। তা ছাড়া, আধুনিক psychological novel এ মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ যেন ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর, জটিলতম হইয়া দাঁড়াইতেছে। উপ-ন্যাস নিবদ্ধ চরিত্র বুঝিতে যদি দর্শনশাস্ত্রের কূট-শক্তির ভিতর দিয়া পথ করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার না হইয়া পরিশ্রমের অবসাদ—সহানুভূতি ও আত্মসমর্পণের পরিবর্ত্তে একটা সজাগ সমালোচকতা হৃদয়কে অধিকার করে," ইত্যাদি [ভরতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩] এখন একটু ভাবিয়া দেখুন দেখি শরৎ বাবুর চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত (২য় খণ্ড), দেবদাস, বামুনের মেয়ে প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক সম্বন্ধে বটুক বাবুর উক্ত অভিমত ঠিক মিল খায়না কি? যত সব কূট সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হইয়াছে এই সব নভেলে। Novel যদি crude problem ই solve করিবে তবে সেত আর Light Literature হইল না; আর তখন আর নভেল না পড়িয়া Psychology পড়াই ত বেশ বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ তাহাতে ঘোরপ্যাঁচ কিছু নাই—একেবারে point blank ভাবে problem solve করিতে হয়। যাক্ সে সব কথা। আসল কথা হইতেছে এই যে, বঙ্কিম-সাহিত্য হইতেছে গঠনোন্মুখী। সামাজিক কু-প্রথাগুলির বিষময় ফল দেখাইয়া তিনি সমাজকে সাবধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির দোষে ফল হইয়াছিল উল্টা—এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন এবং নিজেই সাবধান হইয়া আর এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই—প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ বিশতঃ তিনি এ কায

করেন নাই! তিনি conservative ছিলেন না Liberalই ছিলেন, নহিলে তিনি কখনই পুরাতন ছাড়িয়া নূতনকে আলিঙ্গন করিতেন না। কিন্তু যখন দেখিলেন নূতন পথ আপাতরমণীয় হইলেও মৃত্যুর পথ মাত্র, তখন কাজেই তাঁহাকে ক্ষুণ্নমনে পুরাতনের কাছে ফিরিতে হইল। তিনি দোষ দেখাইয়া সমাজকে সাবধান করিতে গেলেন, সমাজ সে নিষেধ শুনিল না, বরং সেই দুষ্ট প্রথাগুলিকেই আশ্রয় করিল। এই ত আমাদের দেশ! সুতরাং তাঁহার অগ্রসর হইবার পথ বন্ধ হইল—ইহাতে যে তাঁহার কি অপরাধ হইল বুঝিলাম না। শ্রদ্ধেয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই লইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ করিয়াছেন। গৃহিণী যদি গরম ভাতে বাতাস দিতে যান, এবং সে গরম হাওয়া যদি কর্ত্তার গায়ে ফোস্কা পাড়াইয়া দেয়, তবে অগত্যা তাঁহাকে ঠাণ্ডা ভাত দিতেই হইবে—কিন্তু একেবারে বাতাস বন্ধ করা ত চলে না। এত দিন যে বাতাস করিয়া আসিতেছেন আজ তাহা হঠাৎ থামান্ কি করিয়া? বঙ্কিম তাঁহার লেখা ছাড়িতে পারিলেন না—সুতরাং নূতন (গরম ভাত) ছাড়িয়া তাঁহাকে পুরাতনকেই (ঠাণ্ডা ভাত) আশ্রয় করিতে হইল। তারপর চিরদিন কিছু সকলের একমত থাকে না। (আজকালকার রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার উদাহরণ ভূরি ভূরি দেখা যাইতেছে)। তিনি যদি প্রথম জীবনের মত বদ্‌লান, তাহাতেই বা তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিবার কি অধিকার আছে আমাদের? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিছু চিরদিন নিজের মত ঠিক রাখিতে পারেন নাই। যে রবীন্দ্রনাথ "প্রাচীন সাহিত্য" লিখিয়াছেন, 'লিপিকা' কি তাঁহারই লেখা বোধ হয়? না—নিশ্চয়ই না। সুতরাং আমরাও পাল্টা জবাব দিতে পারি 'প্রথম-বয়সের রবি বাবু কোথায় গেলেন?' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তাঁহাদের অধিকাংশ নভেলের মধ্যে ঐ সকল সামাজিক কুপ্রথাকেই যেন প্রশ্রয় দিয়াছেন—ইহাদিগকে Condemn করা দূরে থাকুক আরও বাহাদুরী করিয়া এগুলিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। (তাহা না হইলে কোন্ সাহসে জনৈক স্বনামধন্য গ্রন্থকার তাঁহার সুপরিচিত গ্রন্থ মধ্যে divorced christian মহিলার সঙ্গে ব্রাহ্মণ সন্তানের হিন্দুমতে বিবাহ দিবার কল্পনা করেন, কোন্ সাহসে শরৎ বাবু তাঁহার কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, অচলা প্রভৃতিকে আদর্শ রমণী বলিয়া পরিচয় দেন?) ইহাঁদের সাহিত্য ধ্বংসোন্মুখী (destructive) সুতরাং ইহাঁদের নভেলী সাহিত্য অচিরাৎ ডুবিবে—অন্ততঃ শরৎ

বাবুর। তাহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। বঙ্কিমের স্মৃতিরক্ষার জন্ম নভেল ছাড়া অন্য জিনিষও আছে রবিবাবুরও অমূল্য কবিতাবলী আছে। তাঁহাদের স্মৃতি একরূপ অবিনশ্বর বলিলেও চলে। কিন্তু শরৎ বাবুর সম্বল কি আছে? কয়েকখানি দুর্নীতিপূর্ণ একই ছাঁচের নভেল মাত্র। তাঁহার স্মৃতি যে বেশীদিন থাকিবে না একথা আমরা হলফ্ করিয়া বলিতে পারি। যতদিন Provincialismএর জীবন শরৎ-সাহিত্যের জীবনও ততদিন; তারপর all blank. কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্য classics—বিশ্বের জীবন যতদিন—মানবের জীবন যতদিন—বঙ্কিম সাহিত্যের জীবনও ততদিন। যে গুণে Wordsworth Tennysonএর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ঠিক সেই গুণেই বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। (অবশ্য তুলনাটিকে বর্ণে বর্ণে সত্য মনে করিবেন না!)

শরৎ বাবু আরও বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমের নির্ভীক কর্ত্তব্য বোধের দৃষ্টান্তের অনুকরণেই তিনি বঙ্কিমের ধারা ছাড়িয়া নূতন ধারা অবলম্বন করিয়াছেন। এ অতি উত্তম কথা। ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই ভাষার উন্নতির পক্ষে আবশ্যক। একটি ধারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকা কিছু নয় এসকলই আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এ নব প্রবর্ত্তিত ধারাটি কি অন্য বিষয়ক হইতে নাই? আর শরৎ বাবুর ধারাটিতেই বা নূতনত্ব কি আছে। প্রথমতঃ, তাঁহার style, Provincialismএ পরিপূর্ণ (সংস্কৃত রচনায় কবিগণ ও আলঙ্কারিকগণ ইহাকে একটি 'দোষ' বলিয়া গিয়াছেন)। দ্বিতীয়তঃ শরৎ বাবুর প্লট অধিকাংশ পুস্তকেই মূলতঃ এক। একই কথা তিনি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বিভিন্ন নাম দিয়া বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। "স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষ যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ নয়, হৃদয়ে যদি কারুণ্য, স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম প্রভৃতি কোমলবৃত্তিগুলি অক্ষুন্ন অবস্থায় থাকে তবে সেই স্ত্রীলোকের চরিত্র বাহ্যতঃ যতই দূষিত হউক না কেন, আমরা তাহাকে আদর্শ রমণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি"—শুধু এইটুকু দেখানই কি তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি সমাজে কেবল কি এই একটিই প্রবলেম্ আছে? অন্য প্রবলেম কি নাই? আর যদি এই সব সামাজিক সমস্যার সমাধান ও দার্শনিক ভাবে মনুষ্য চরিত্র আলোচনা নভেলের ভিতর ও করিতে হয়, তবে আর Light Literature রহিল কোথা? প্রাণ যে নভেল পড়িলেও হাঁফাইয়া উঠে। আর সামাজিক Problem নভেলের ভিতর দিয়াই বা Slove

করা কেন ? এত বিলাতী আদর্শ ! তবে শরৎ বাবু এতক্ষণ যে originalityর বড়াই করিতেছিলেন, সে বড়াই কোথায় রহিল ? [শরৎ বাবু হয়ত বলিবেন যে, যে সকল স্ত্রীলোক পতিতা হইবার পর অনুতপ্তা হইয়াছে, সমাজ তাহাদিগকে ফিরিয়া লইবে না কেন ? ইহার উত্তর এই যে যাহাতে একবার পচন ধরিয়াছে তাহাকে যদি ভাল'র মধ্যে রাখা যায়, তবে ভাল জিনিষের সংস্পর্শে সেটি ভাল হইতে পারে না, বরং আরও পাঁচটি ভালকে পচাইতে পারে। সুতরাং ইহাদের দূর করাই ভাল। যদি বলেন, তবে ইহারা যায় কোথা ? আজ কাল ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্পাশ্রম সেবাশ্রম প্রভৃতিই ইহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। শরৎবাবুর মত লেখকেরা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। ইহাদের গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করানই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার অপেক্ষা শিল্পাশ্রম সেবাশ্রম প্রভৃতিতে তাহাদের নিয়োগে, তাহাদের ও সমাজের উভয়তঃই উপকার। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে ঢুকাইলে উভয়তঃই অপকার। তাহারাও ঠিক নিজেদের কর্ম্মফল অনুভব করিতে পারে না, আর তাহাদের দেখাদেখি আর পাঁচ জনে অধঃপাতে যায়। পাপের একটু শাসন আবশ্যক, নহিলে সমাজ টিকিবে কেন ? যাক্ সে সব কথা। সমাজ সমস্যার সমাধান আমরা করিতে বসি নাই—সে ভার সমাজপতিদিগের উপর।] শরৎ বাবু উপসংহারে বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমকে আঁকড়াইয়া থাকিলে বাংলাভাষা আজ মরিত। তাই তিনি করুণা করিয়া বাংলাভাষাকে গতি দিয়াছেন। এদিকে এই সব ছাইভস্মের ভিতর দিয়া চলিতে গিয়া বাংলাভাষার যে দমবন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছে, সে বিষয়ে দেশের লোকের লক্ষ্য আছে কি ? [অবশ্য শরৎবাবুর প্রতি গায়ের জ্বালা মিটাইবার জন্য আমি এ কথা বলিতেছি না। তবে সমাজ শাসনের জন্য অচিরাৎ একজন শাসকের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় সেদিনের আর বিলম্ব নাই—একটা বিরুদ্ধ হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। আসুন, পাঠক মহাশয়গণ ! আমরা স্থিরচিত্তে সেই অতিমানুষের বাণী স্মরণ করিয়া ("যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্") স্থিরচিত্তে সেই দিনের অপেক্ষা করি। উক্ত কথা কয়টি পড়িয়া যদি বাংলার তরুণ দলের একটি লোকেরও চক্ষুরুন্মীলিত হয় তবেই এ শ্রম সার্থক বোধ করিব।]

তারপর কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রকাশ। আর যিনি যাহাই বলুন না কেন সকলই একরূপ

জানাইয়া যাইতে পারে। যাঁহারা লেখাপড়ার কোন ধারই ধারেন না, 'বিদেশী সাহিত্য বিদেশী সাহিত্য' করিয়া যাঁহারা চিৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলেন—অথচ বিদেশী সাহিত্য যাঁহাদের উদরে গোমাংসস্বরূপ তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন সবই সহা যায়, কেন না 'অমৃতং বালভাষিতম্'। আর মূর্খের সঙ্গে তর্ক করিয়াই বা লাভ কি? মূর্খের logic হইতেছে whip যাহার অর্থার্থ করিয়াছেন উদ্ভট কবি—'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধিঃ।' কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে যিনি অতুল যশোলাভ করিয়াছেন—বিদেশী সাহিত্যগুলিতে যাঁহার উচ্চ অধিকার—শিক্ষিত সমাজের শিরোভাগে যিনি আজ অবস্থিত—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপামর সাধারণ যাঁহার সম্মুখে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে—তাঁহার মুখে এরূপ কথা শুনিব বলিয়া আশা করি নাই। বুঝিলাম বাংলাভাষা আজ নিরাশ্রয়া অভাগিনী। উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র যদি মাতার ভরণ পোষণের ভার না লন, তবে লম্পট ও মদ্যপ অপদার্থ পুত্রেরা যে তাঁহার যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাংলার লোকেরা কি মরিয়াছে? যে সভায় বঙ্কিমের স্মৃতি এরূপভাবে পদদলিত হইতে পারে, সে সভার বিরুদ্ধে কেহ একবার একটি কথাও বলিলেন না—কেহ একবার এ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত ও করিলেন না—ইহা দেখিয়া "বাংলায় জীবিত কেহ নাই" এ ছাড়া আর কি বলিব? বহু দুঃখে একথা বলিতে হইতেছে। সভায়ত অনেকেই গিয়াছিলেন, দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ করিবার সাহস কি একটি লোকেরও হইল না! তাই এত কথা বলিতেছি, নতুবা এ সব জাহাজের খবরে আদার ব্যাপারী আমাদের প্রয়োজন কি? হায়, অভাগিনি জননি বঙ্গভাষা! কাঁদো প্রাণ ভরিয়া কাঁদো—যদি কিছু জ্বালা জুড়ায়! এ জ্বালা জুড়াইবার নয় তাহা জানি, তবু প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেও অনেকটা তৃপ্তি—অনেকটা শান্তি আছে।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে তাঁহার মন্তব্য সমালোচনা করিতে হইবে এ কথা ভাবিতেও যে বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তাঁহার মতে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' সাহিত্যরসের জিনিষ উহা নীতি মানিয়া চলে না উহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ময়। সাহিত্য রসের জিনিষ বটে, কিন্তু রস শুধু একটা নহে। শরৎ বাবুর মত যে শুধু বীভৎস রসটারই প্রাধান্য দিয়া নভেল লিখিতে হইবে, উক্ত কথা হইতে এমন কিছু বুঝায় না। উহা যে নীতি মানিয়া চলে না একথা কে বলিল—শরৎবাবুর অলঙ্কারশাস্ত্রে এ কথা আছে

বোধ হয়—অন্য কোথাও নাই। উহা স্বাধীন বটে তবে সে স্বাধীনতা Liberty, License নহে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'সাহিত্য অপাঠ্য পুস্তক'! হায়, বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ যখন এ কথা বলেন তখন হয় তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, নতুবা শরৎ বাবু তাঁহাকে Hypnotised করিয়াছিলেন। শরৎ বাবুর মত লেখকের লিখিত সাহিত্য অপাঠ্য সন্দেহ নাই—তাই প্রাচীন উদ্ভট কবি বলিয়াছেন—'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ'। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের পক্ষে এ কথা খাটে কি? কবীন্দ্র স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে "নীতিবিরুদ্ধ বিষয়ের সমালোচনা করিবার অধিকার সমাজের আছে", কিন্তু আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন—"কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে সমাজের কোন বিচারই আমি মানিতে রাজী নই।" এ কিরূপ কথা হইল? এত "downright fallacy of contradiction" (যাকে সাদা বাংলায় বলে "একমুখে বিয়াল্লিশ বাজ্‌না")। সমাজের যদি নীতিবিরুদ্ধ বিষয়ের সমালোচনা করিবার অধিকার থাকে এবং সাহিত্য যদি সেই নীতিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রচার করে, তবে সমাজ যে কেন সাহিত্যকে শাসন করিতে পারিবে না তাহা ত বুঝিলাম না। কবীন্দ্রের যুক্তিতর্ক এখানে কিছু নাই—তাই তাঁহার মস্তিষ্কের প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে একটু সন্দেহ হয়। কবিবর আবার বলিতেছেন "সাহিত্যিকরা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা আগে একমত হইয়া কাজ করিত এখন আর করে না, ইহাতে আমি আনন্দিত।" (অংশুই—এযে পৈশাচিক আনন্দ ধ্বংসের আনন্দ!) ইহাও ত রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত কথা হইল না। কবীন্দ্র কি শেষে শরৎ বাবুর কুহকে ভুলিয়া ছ্যাব্‌লামির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন? Todd সাহেব নভেল লেখক মাত্রকেই enchanter বলিয়াছেন—Sir Walter Scott পর্য্যন্ত বাদ পড়েন নাই। ছেলেবেলায় এ কথাটির মর্ম্ম বুঝিতাম না। এখন বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের উপর শরৎবাবু এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ আত্মসম্মান ও পদমর্য্যাদা জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছেন এ কথা ভাবিলেও চক্ষে জল আসে। কবিবর বলিতেছেন—"সরস্বতীর অভয়বাণী আমরা শুনিয়াছি। কাজেই গুরুমহাশয়ের বেত আমাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না। গুরুমহাশয়ের বেত বাতাসের উপর পড়িবে, আর আমরা তাই দেখিয়া হাঁসিব।" এ অতি ভয়ঙ্কর কথা। প্রথমেই যে আত্মবিকথনা রোগের কথা বলিতেছিলাম—কবিবর স্বয়ং ও

ইহা হইতে বাদ পড়েন নাই। শরৎবাবুর রোগে তাঁহাকে ধরিয়াছে। ইহার মূল লোকের 'বাহবা' ও 'হাততালি ('হাততালির' প্রভাব যে কি ভীষণ, লোকের মুণ্ডু ঘুরাইয়া দিতে ইহার দক্ষতা কিরূপ অসাধারণ, তাহা যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়ের 'ভাই হাততালি' পাড়তে অনুরোধ করি।) শরৎ বাবুর কুহকও বড় কম শক্তিশালী নয়। "সরস্বতীর অভয়বাণী আমরা শুনিয়াছি"! (সহজ অবস্থায় না বাগবাজারে গিয়া?) —এত বড় স্পর্দ্ধা কার আছে যে একথা উচ্চারণ করে? যিনি এ কথা উচ্চারণ করিতে সাহস করেন তাঁহার অপরাধের আর মার্জ্জনা নাই হউন তিনি রবীন্দ্রনাথ হউন তিনি Shakespeare বা হউন তিনি কালিদাস। রবীন্দ্রনাথ যে দম্ভের সজীব প্রতিমূর্ত্তি তাহা ত এতদিন জানিতাম না—বুঝিলাম তাঁহার পতনের আর অধিক বিলম্ব নাই—এ সব Reactionএর ফল মাত্র। মনে পড়ে সেই দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা; যখন আর এক মহাকবি (কালিদাস) তাঁহার অতুলনীয় মহাকাব্য (রঘুবংশ) রচনার প্রারম্ভে বলিয়া গিয়াছেন—"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।" কি বিনয়, কি সৌজন্য! তাই তিনি আজ বিশ্ব-বিশ্রুত। দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া তাঁহার যশোগীতি melody of sphere এর মত অবিরত গীত হইতেছে। কোথায় সেই সারল্যের অবতার, বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি, আর কোথায় এই সজীব দম্ভ! পাঠক! কোনটি বড়? ভবভূতিও একদিন দর্প প্রকাশ করিয়াছিলেন তবে সে এতটা নয়—আর সে বহুদুঃখে। রবীন্দ্রনাথের আজ কিসের দুঃখ? জীবন্ত অবস্থায় এত যশঃ বোধ হয় কোন কবিই কখন পান নাই—তাই কি আজ এই গর্ব্বোক্তি? কবিবর বলেন সমালোচনা তিনি "হাসিয়া উড়াইবেন" সমালোচকেরা আবর্জ্জনা সৃষ্টি করে—সাহিত্যিকদের তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন নাই—সেগুলি কোন দিনই কাহারও কাজে লাগে না। ইহাতেও ত সেই License এরই আভাষ পাওয়া যাইতেছে। এত Liberty নয় এ যদি Liberty হয়—তবে Thraldomই শ্রেয়স্কর—এ যদি Liberty হয় তবে জগৎ হইতে Libertyর মূলোচ্ছেদ হওয়াই ভাল!!! *

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকই দায়ী।

প্রেমের ধর্ম্ম।

(গল্প)

(শ্রীউমাশশী কুমার)

(১)

সকাল বেলা ব্রেকফাষ্টের সময় জনসন্ চায়ের বাটীতে ঠোঁট্‌টা ঠেকাতেই, উইলী ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে এসে মাথার টুপীটা হ্যাট্ ষ্ট্যাণ্ডের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বন্ধুর দিকে লক্ষ্য করে বল্লে "ব্যাপারটা শুনেছ জনসন্ ?"

"না—ভোটে জিতলে কে ? হাউস্ অফ কমন্স না হাউস্ অফ লর্ড্‌স্ ?"

"আরে রেখে দাও তোমার ভোট। ও নিয়ে মাথা ঘামাবার একটুও দরকার নেই। ও হাউস্ অফ লর্ড্‌স জিতলেও আমাদের পক্ষে যা আর হাউস অফ কমন্স জিতলেও আমাদের পক্ষে তাই।" বলে সে একটা প্রকাণ্ড সিগার ধরিয়ে বল্লে ডেলি মেলে খবরটা বের হ'য়ে পর্য্যন্ত লণ্ডন সহরে রীতিমত হুলুস্থুল পড়ে গেছে আর তুমি, কিছুই জাননা ? আশ্চর্য্য বটে—কোথাও প্রেমে টেমে পড়েছ নাকি হে ? তাই বহির্জ্জগতের খোঁজ আর একেবারেই রাখ না ?"

জনসন্ একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে হাত দুটোকে মুঠো কোরে এক্সেসাইজ করে নিয়ে বল্লে "না প্রেমে আর পড়লুম কোথায় ? তবে হ্যাঁ মিস্ থারের চোটটা—

জনসনের মুখের কথা উইলী কেড়ে নিয়ে, হেসে বল্লে "বড্ড বেশী লেগেছিল নয়।"

জনসন্ হেসে বল্লে "সাংঘাতিক সে ধাক্কা—এখনও সামলান গেলনা হে, সামলান গেলনা।" বলে জনসন্ খুব নিবিষ্ট মনে ডিমে মাষ্টার্ড মাখাতে লাগলো।

উইলী রেগে টেবিলের ওপর একটা খাঁটি ইউরোপীয়ান মুষ্টাঘাত করে বল্লে "তাহলে তুমি নূতন খবরটা শুনতে চাও না ?"

"ওঃ তুমি যে নূতন খবর বলবে আমি তোমার মুখ দেখেই তা বুঝে নিয়েছি।"

"কি বুঝেছ বল ?"

"সেই লর্ড বেকারের মোকর্দ্দমার বিষয় নিয়েত ? তা এই ল-বুকে কি বলছে দেখনা।" বলে জনসন্ ল-বুক আনবার উপক্রম করতেই উইলী তাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বল্লে "ভাই তোমায় নূতন খবর শোনাতে আসাই আমার ঝকমারী হ'য়েছিল। আমি নাকে

কাণে খত্‌ দিয়ে এমনিই পালাচ্ছি। তোমায় আর ওই ল-বুকের পাতা খুলে আমায় তাড়াতে হবে না। ওই মোটা মোটা বইগুলো দেখলেই স্ফূর্ত্তি জিনিষটা যেন জমে কুল্পী বরফ হ'য়ে যায়। আমি তোমায় বাজী রেখে বলতে পারি জনসন, তুমি যেদিন ওই ল-বুকগুলো ইংলিস চ্যানেল পার করে দেবে, সেইদিন দেখবে তুমি এক নূতন মানুষ হ'য়ে গেছ।"

"আগা গা—চট কেন? ব্যাপারটাই ছাই খুলে বল না।"

"আজকের ডেলিমেল কি লিখেছে দেখ" বলে উইলী জনসনের হাতে সেদিনকার ডেলিমেল খানা দিলে।

জনসন্ দেখলে একটা হেডিং রয়েছে "অদ্ভুত খবর।"

"গত সপ্তাহে যখন পি এণ্ড ও কোম্পানীর ইণ্ডিয়া নামে জাহাজখানা আসিতেছিল, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। উক্ত জাহাজখানি যখন নঙ্গর করিবার জন্য গভীর রাত্রে পোর্ট সৈয়দ অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল তখন এক ফরাসীনী মহিলার ছায়ামূর্ত্তি বারংবার হাত নাড়িয়া জাহাজ থামাইবার জন্য ইসারা করিয়াছিল। শুধু একখানি নয় ইণ্ডিয়া হইতে যতগুলি জাহাজ আসিতেছে, প্রত্যেক জাহাজকেই সেই রমণীমূর্ত্তি থামিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে লণ্ডন হইতে কোন ইণ্ডিয়াগামী জাহাজে এরকম ছায়ামূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয় নাই।"

জনসন্ হাতের কাগজখানা টেবিলের ওপর রেখে বল্লে "তাইত হে এযে বেজায় ভাবিয়ে তুল্লে! তুমি কি রকম মনে করছ উইলী? আমার ত মনে হচ্ছে যে লণ্ডনগামী জাহাজে তার কিছু জহরত টহরত গোছের কোন দামী জিনিষ নষ্ট হয়েছে, বেচারী হয়ত তারই শোকে অমনি করছে।"

"মোটেই তা নয়, এর ভেতর কোন রহস্য আছে। আমার মনে হয় যে হয়ত তার কোন প্রণয়ীর ইণ্ডিয়া থেকে আসার কথা ছিল, এমন সময়ে ঐ মহিলার মৃত্যু হয়। ফলে সে পূর্ব্বের সংস্কার ত্যাগ করতে না পেরে আজও প্রত্যেক জাহাজকে সে থামতে বলে। মনে করে যে এই জাহাজেই হয়ত তার প্রণয়ী আসছে।" জনসন্ হেসে বল্লে "তোমরা নভেলিষ্ট কিনা প্রেমের দিকেই দেখ।"

"আর তোমরা ল-ইয়ার কিনা সর্ব্বদা বিষয় সম্পত্তি মোকর্দ্দমার দিক দিয়েই দেখ। ও সমস্ত কোন কাজের কথা নয়, আজই পোর্ট সৈয়দ যেতে হবে, এর রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে

আমার টিকিট পর্য্যন্ত কেনা হ'য়ে গেছে।" বলে উইলী পকেট থেকে দুখানা টিকিট বার করে টেবিলের ওপর রাখলে।

"যাক বাঁচা গেল। তোমার মত লক্ষীছাড়া আরও একটী লণ্ডন সহরে আছে দেখছি, যে তোমার সঙ্গী হ'য়ে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাবে।"

উইলী হেসে বল্লে "নিশ্চয়ই এখন চট্‌পট্ খেয়ে লক্ষীছেলের মত বেরিয়ে পড় দেখি, আর দেরী হ'লে ট্রেণ পাওয়া যাবে না।"

"আমি! আমি বেরিয়ে কি করবো?"

"আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"দোহাই তোমার—আমায় ছেড়ে দাও ভাই—তোমার মত একজন ভাবুক, প্রেমিক বেছে নাও।"

"তা হচ্ছে না" বলে উইলী জোর করে জনসনের হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে গেল।

২।

উইলী আর জনসন্ প্রায় দেড়মাস পোর্ট সৈয়দে এসেছে, কিন্তু সেই ফরাসিনী প্রেতাত্মার সম্বন্ধে এমন বিশেষ কিছু বিবরণ সংগ্রহ করতে পারেনি। জনসন্ দিনের বেলায় মাছি তাড়ায়, আর উইলীকে গাল দেয়, ওই লক্ষীছাড়াটার জন্যেই ত তার এত দুর্গতি। রাত্রে কষে ঘুম দেয়, আর সকালবেলা উঠেই উইলীকে জানিয়ে দেয় যে আজই সে কোন লণ্ডনগামী জাহাজে চলে যাবে। কিছুতেই সে আর এখানে থাকবে না, এক মিনিটও নয়। কিন্তু এই দেড়মাসে কত লণ্ডনগামী জাহাজ এলো গেল, জনসনের যাওয়া আর ঘটে উঠলো না।

আর উইলী প্রত্যেক ফরাসী পল্লীতে খুঁজে সেই ছায়ামূর্ত্তি সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করে। নিঃশঙ্কে জনসনের গালাগাল হজম করে। রাত্রে জনসন্ যখন রীতিমত নাক ডাকায় সে তখন একমনে চিন্তা করে কে সেই ফরাসিনী মহিলা? কিসের জন্যে কোন্ আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ পশরা নিয়ে এই দীর্ঘ দীর্ঘ রজনী কাহার আশায় সে এই সমুদ্রের বেলা ভূমিতে অপেক্ষা করে থাকে, কে জানে? সেদিন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে ওই কথাগুলিই সে ভাবতে ভাবতে এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিল, যে কোন দিকে তার খেয়াল ছিল না। এমন সময় একটা আরব বালক এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বল্লে "সাহেব, ছবি কিনবেন? ভাল ছবি।" "দেখি" বলিয়া উইলী হাত বাড়াইতেই সে একখানি ছবি উইলীর হাতে দিল। উইলী বিস্ময়ে দেখিতে লাগিল—হাঁ সুন্দরী বটে। এমন সুন্দরী তার জীবনে সে দেখেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু একি! এমন

সুন্দরীর মুখে একি বিষাদের চিহ্ন, একি বেদনার কাতর ভাব ফুটে উঠেছে? উইলী আরব বালকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লে "এর বাড়ী কোথায়? আমায় নিয়ে যেতে পার? বকশীস্ দোব।"

"উনিত বেঁচে নেই সাহেব—আজ দু'তিন মাস হ'লো মরে গেছেন।"

"মরে গেছেন? কি হয়েছিল?" ছল-বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে উইলী আরব বালকের দিকে চাইলে।

"নিজেই নিজেকে ফায়ার করেছিলেন। আমি মেমসাহেবের কাছে চাকরী করতুম। তাই এই ছবি আর খাতাখানা আমি পেয়েছি। আমরা গরীব লোক—এ নিয়ে কি করব সাহেব? তাই বিক্রি করে দোব।"

"দেখি খাতা দেখি" বলে উইলী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে খাতাখানি নিয়ে দেখলে তার ভেতর ফরাসী ভাষায় কি লেখা আছে। ফরাসী ভাষা না জানার দরুণ সে লেখাটা পড়তে পারলে না বটে কিন্তু অনুমানে বুঝলে এটা একটা ডায়েরী। সে বালকের আশাতীত মূল্যে ছবি এবং ডায়েরী কিনে নিয়ে হোটেলের অভিমুখে ছুট্‌লো। তখন এক নবাগত ইংরাজ ভবঘুরের সহিত জনসন্ জাঁকাইয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছে, আর পৃথিবীর ক্ষতির কারণ যে এই সেন্টিমেণ্টাল লোকেরা তাই সে বর্ণনা করছে। এমন সময় উইলীকে দেখে বলে উঠ্‌লো "কিহে তোমার ভূতের খবর টবর কিছু মিললো?"

"ভূতের কি মানুষের তা ঠিক বলতে পারি না, তবে খবর একটা মিলেছে। পড়ে দেখ দেখি ডায়েরীখানা।"

জনসন্ ডয়েরীখানা নিয়ে প্রায় আধঘণ্টা পড়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বল্লে "পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে। এ তারই ডায়েরী" বলে সে পড়তে আরম্ভ করলে।

৩।

প্যারিস—

২৪শে অক্টোবর।

আমার নাম সিল্‌ভি। আমি ডায়েরী লিখতে বসেছি, কিন্তু এটা অমার লেখার কোন দরকার ছিল না, যদি না কাল আমাকে প্যারিস ছেড়ে চলে যেতে হ'তো। আমার বাবা, বা মাকে আমি চিনিনা। আত্মীয় স্বজন কেহ আছে কি নেই তাও জানি না। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মাদাম আর মসিয়েকে দেখে আস্‌ছি। মাদামের আঁট সাঁট চেহারার ওপর ইংরাজ মিশনারীর মত একটা গোঁফের মত ঝুঁটী যা একেবারেই ফরাসী জাতের সঙ্গে খাপ খায় না। আর

মসিঁয়ের প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়াটার ওপর ছোট ছোট দুটো লাল চোখ। যা দেখলে হয়ত অপর কেউ আনন্দ পেতে পারে কিন্তু আমার বড় ভয় করে। মসিয়ে যখন রেগে রক্তবর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চায়, তখন আমার ভয়ে অর্দ্ধেক প্রাণ শুকিয়ে যায়। আজ এই পর্য্যন্ত—মাদামের মোজা ছিঁড়ে গেছে আজই রিপু করে দিতে হবে।

পোর্ট সৈয়দ—

২রা নবেম্বর।

কাল আমরা পোর্ট সৈয়দে এসেছিলাম। কি বিশ্রী জায়গা। আমার কাছেত অতি বিশ্রী লাগছে, শুধু আমার কাছে কেন? আমার মনে হয় যারা প্যারীস থেকে পোর্ট সৈয়দে আসবে, তারাই বল্‌বে কি বিশ্রী জায়গা। তবে এটা খুব নতুন হবে যদি কোন ফরাসী প্যারিস থেকে এসে পোর্ট সৈয়দের রূপে মুগ্ধ হয়ে আর না প্যারিসে যেতে চায়। আমার ত এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছে কর্‌ছে না। ওই যে সি-গালগুলো উড়ছে না? আমার মনে হচ্ছে আমিও যদি ঐ রকম উড়তে পারতুম্‌ তাহ'লে নিশ্চয়ই প্যারিসের দিকে উড়ে যেতুম্‌। সি-গাল-গুলো নিশ্চয়ই প্যারিস দেখেনি তাই সমুদ্রের ওপর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মনে হয় ওরা যদি প্যারিস দেখতো তাহ'লে নিশ্চয়ই সেখানে উড়ে যেত একথা আমি বাজী রেখে বল্‌তে পারি। মাদাম আর মসিঁয়ে এখানে এসে যেন এক একটী টার্কির সুলতান হ'য়ে পড়েছেন। আর সব ভার পড়েছে আমার ওপর। আজ মাদাম আমাকে কি বলবে তাই চারটের সময় ডেকেছে। চারটে ত বাজলো বলে!

পোর্ট সৈয়দ—

৫ই নবেম্বর।

এই মাত্র আমার ফটো তোলান হ'লো। মাদাম আমাকে যা একটা চমৎকার পোষাক দিয়েছে ভারী সুন্দর। কাল থেকে মাদাম আমার ওপর খুব ভাল ব্যবহার কর্‌ছে এমন কি মসিয়ে পর্য্যন্ত। মসিয়ের ত এতদিন ধারণাই ছিল, যে আমি কেবল বসে বসে তাঁর রুটী এবং মাংসের শ্রাদ্ধ করি। আজ তিনি আমার কম খাওয়া দেখে ভারী দুঃখ করলেন, আমার তখন এত হাসি পেয়েছিল। আমার কিন্তু কিছু ভাল লাগছে না। আমার কেবল মনে হচ্ছে প্যারিস ফিরে যেতে। আচ্ছা ওই যে বড় জাহাজ খানা ছাড়লো। ওখানা নিশ্চয় প্যারিসে যাবে। ঐ জাহাজের লোকগুলো কি সুখী! ওরা প্যারিসে যাবে, আর আমি এখানে পড়ে থাকবো। আর কবে যে প্যারিস যাব! আজ আমরা এ হোটেল

ছেড়ে যাব। আমাদের জন্যে নাকি কোথায় আলাদা বাড়ী ভাড়া করা হয়েছে। ওঃ— মাদাম আমায় বুঝি যেতে ডাকছে। প্যারিসের মাদাম এখনকার মাদাম যেন আলাদা। সত্যি মাদাম আমায় যথেষ্ট স্নেহ করে। আজ সকালে ফটো তোলার সময় নিজে আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিলে।

পোর্ট সৈয়দ—

৮ই নবেম্বর।

মাদাম কেন যে আমাকে এত যত্ন করছে তা বুঝেছি। মাদাম আমায় দিয়ে ফরাসী বারবিলাসিনীর সংখ্যা আর একটী বাড়াতে চায়। ছিঃ কি ঘৃণার কথা। আমিও বলেছি চাকুরী করে মাদামের টাকা শোধ করবো। কিন্তু তাকি শুনবে। সত্যি ওইযে সেজেগুজে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে শিসে গান করছে, ওদের দেখলে ভারী দুঃখ হয়। কি কাতর হাসি ওদের কি ব্যথাপূর্ণ করুণ শিস্ দেয়। আমার ত মনে হয় ওদের শিসের প্রতিধ্বনি বাতাসের সঙ্গে কেঁদে কেঁদে মিশিয়ে যায়। উঃ আমাকেও ঐ শ্রেণীভুক্ত করবে। না না আমি যেমন করেই হোক পালাব। এই ঘৃণিত এই দুঃসহ জীবন কি মানুষে বইতে পারে? ওঃ রাত বারটা বেজে গেল আর জাগলে মাদাম এক্ষুণি বকবে

পোর্ট সৈয়দ—

৩রা জানুয়ারী।

কাল রাত্রে পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়ে গেছি। মসিঁয়ে আর মাদামের কাছ থেকে এমন মার খেয়েছি যে এখনও আহত স্থানগুলো ফুলে রয়েছে। সমস্ত দেহ ব্যথায় আড়ষ্ট হয়েছে। কিন্তু এতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ হচ্ছে না। যত দুঃখ হচ্ছে পালানর রাস্তা বন্ধ হওয়াতে।

মাদাম আর মসিঁয়ে আমাকে বাঘের মত পাহারা দিচ্ছে। আমি ঘরে আছি কি না এর মধ্যেই দু' তিনবার এসে খোঁজ নিয়ে গেল। আচ্ছা যদি মাদাম আর মসিঁয়ের ভেতর আজ কেহ হঠাৎ মারা যায়, তাহ'লে যেমন করেই হোক আমি মুক্ত হোতে পারি। কিন্তু তাকি মরবে? শুনেছি মানুষের মৃত্যু প্রার্থনা করলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন। আমার মত অবস্থার মধ্যে পড়েও কি মানুষের মৃত্যু প্রার্থনা করা পাপ? আজ মাদাম দুজন জার্ম্মাণীকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমাকে তাদের মনোরঞ্জন করতে হবে। আমি দুচক্ষে পড়ে এই জার্ম্মাণ জাতটাকে দেখতে পারি না। আমার মনে হয় ঈশ্বরের মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে গেছে।

পোর্ট সৈয়দ—

২৮শে জুলাই।

আজ প্রায় ৬টা মাস ডায়েরীর পাতা খুলিনি। কারণ আমার নূতন জীবনের হল্লা আর আমোদ প্রমোদ নিয়ে এত ব্যস্ত থাক্‌তে হয় যে ডায়েরী লেখার সময়ই পাওয়া যায় না। আজ ছয় মাস আমি এই নূতন জীবন যাপন কর্‌ছি। প্রথম প্রথম ভারী খারাপ লাগ্‌তো। লজ্জা কর্‌তো, মাতাল দেখলে ভয় পেতুম্। আজকাল আর লজ্জা, ভয় কিছুই নেই, যেন বরং দিন দিন এতে আসক্তিই জন্মাচ্ছে। আগে যেটা বিরক্তিকর বলে মনে হ'তো, এখন তাই আনন্দের বলে মনে হয়। ছলা, কলা, হাব, ভাব এই ছয় মাসের মধ্যে এমন চূড়ান্ত কায়দার সঙ্গে শিখে নিয়েছি যে, তা দেখে অত বড় বিশ্ব-নিন্দুক মসিয়েকেও পর্য্যন্ত স্বীকার কর্‌তে হ'য়েছে "হাঁ লিল্‌ভি একটি জুয়েল বিশেষ।"

প্রথমে ভেবেছিলুম যে আমি হয়ত একদিনও এই দুঃসহ জীবন বইতে পারব না। বারান্দায় যে সমস্ত ফরাসী বারবিলাসিনী সেজে গুজে গালে রুজ মেখে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের দেখে কতদিন দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি। আর ভেবেছি ওরা হয়ত খুব দুঃখী। আজ আমাকে বারান্দায় দেখে কেউ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিনা জানি না, কিন্তু আমায় মনে হয় সব চেয়ে আমরাই সুখী। হাঁস যেমন দুধের জলভাগটা বাদ দিয়ে দুধভাগটা খায়, আমরাও তেমনি সংসারের দুঃখের দিকটা বাদ দিয়ে, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, মাসের পর মাস অবিশ্রান্ত আমোদ লুটে চলেছি। হাঃ—হাঃ—আমার ভারী হাসি আস্‌ছে—আমিই একদিন না পালিয়ে যেতে চেয়েছিলুম? আজ আর লেখা হ'লো না—আজ আমাদের বাইচ খেলা আছে। পাশের ঘরে জনচারেক প্রুসিয়ান আর স্পেনীশ এরই মধ্যে বিয়ারের ধ্বংস কর্‌ছে আর হল্লা কর্‌ছে। বাবাঃ! ঐ প্রুসিয়ানগুলো কি চেঁচাতে পারে। ওদের আমি দু'চক্ষে পড়ে দেখতে পারি না।

পোর্ট সৈয়দ

২০শে ডিসেম্বর

আজ সপ্তাখানেক হ'ল আমার জীবনের ধারা একেবারে বদলে গেছে। সেদিন যে ইণ্ডিয়াগামী জাহাজখানা লণ্ডন থেকে এসে নজর করেছিল সেই জাহাজেরই জন কয়েক যাত্রী আমাদের পাড়ার দিকে এসেছিল। আমার কাছে এসেছিল একজন বাঙ্গালী যুবক। কি সুন্দর, সরল কোমল মাধুর্য্যমণ্ডিত তার মুখখানা। আজ কদিন ঘুরে ফিরে বার বার

কেবল তার সেই শ্যামবর্ণ মুখ খানা মনে পড়ছে। কত সুসভ্য ইউরোপীয়ান ত আমার কাছে এসেছে কই কারো জন্যে একটী দিনের তরেও ত আমার মন কেমন করেনি। কাল রাত্রে যখন দুজন স্পেনীশের সঙ্গে আমোদে যোগ দিতে হ'লো তখন যেন আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল।

আহারে বিহারে সর্ব্বদা মনে পড়ছে একটী শ্যামবর্ণ মুখ। কি জানি সে মুখে কি ছিল যা আমার মত হৃদয়হীন ফরাসিনীর মনকেও আকৃষ্ট করে নিলে।

সে হয়ত এতক্ষণ কতদূরে যাচ্ছে। আমার কথা মনেও পড়ছে না। সে হয়ত জানতে পারছেনা যে আমি এখানে বসে কেবল তারই কথা ভাবছি। আজ মনে হচ্ছে যেন এতে সুখ নেই। সুখ বলে যে মদিরা আমরা আকণ্ঠ পান করছি তা হয়ত সুখের নকল। সত্যিই কি অসহ্য কি দুঃসহ আমাদের জীবন। যাকে চিনি না, জানি না, এমন কি স্বদেশীয়ও নয়—এমন একজন লোক শুধু একটী রাতের জন্য এসে সারা জীবনটা ওলট পালট করে দিয়ে গেল। আজ মনে হচ্ছে আকাশে এই মুক্ত বাতাস—এও আমায় যেন শ্বাস বন্ধ করে মারবার চেষ্টা করছে। কিছু ভাল লাগছেনা। আমার মনে হচ্ছে আমি কোথাও পালিয়ে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আজ নিজেকে ভারী ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে। এই পর্য্যন্ত আজ থাক।

পোর্ট সৈয়দ

১লা জানুয়ারী

আজ এইমাত্র নূতন বৎসরের উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেল। উৎসবে যোগও দিয়েছিলুম, গানও গাইতে হয়েছিল কিন্তু সকলেই বলছে আমার গান নাকি খুব করুণ হ'য়েছিল। তাই নিয়ে একজন বেলজিয়ান ঠাট্টা করতেও ছাড়লে না। কেন? হলোই বা—আমিত ইচ্ছে করে করুণ গান গাইনি। তবে যে ব্যথা যে অসহ্য যন্ত্রণা ছাই ঢাকা আগুনের মত বুকের মধ্যে পুষে আসছি তাই কি আজ এই গানের আকার ধরে বেরিয়ে পড়েছে? কিন্তু কেন? কিসের জন্য আমি তার কথা ভাবি? ভুলতেত চেষ্টা করছি পারছি না যে। ভোলবার কথা মনে হ'লেও যে কষ্ট বোধ হচ্ছে। কেবল সেই শ্যামবর্ণ মুখ খানাই বারংবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আজ কত জনেরই মুখ উৎসবক্ষেত্রে দেখলুম, কিন্তু কারো মুখে তেমন কোমলতা তেমন স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যত দেখলুম না। ইণ্ডিয়া থেকে যখনই জাহাজ আসে আমার বুক অমনি সন্দেহে আশায় দুলে ওঠে। হাঁ করে চেয়ে থাকি মনে

হয় ওই বুঝি সেই মুখখানি। কিন্তু না না সেত নয় চুপ করে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। জাহাজ মানুষ সবই চোখের জলে ঝাপ্সা হ'য়ে যায়। কখন এই ব্যথা চেপে রেখে হাসতেও হচ্ছে, কথা কইতেও হ'চ্ছে। উঃ সে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা, তা সে কেবল তারাই বোঝে—যারা ভোগ করে।

কি চমৎকার সূর্য্যের সোণালী আলো সমুদ্রের বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়ে ঝিক্ মিক্ করছে। দূরে সি-গাল গুলো কেমন মনের আনন্দে উড়ছে। আমার মনে হচ্ছে যদি আমারও অমনি ওড়বার ক্ষমতা থাকতো তাহ'লে অমনি করে দূরে দূরে আরও দূরে উড়ে যেতুম। এই সুখ এই জীবন মনে হচ্ছে সব যেন একটা মস্ত বড় ফাঁকি।

পোর্ট সৈয়দ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী

লণ্ডনগামী জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করা যেন একটা রোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ সময় যেন আর কিছুতে স্থির থাকিতে পারি না, মনে হয় আজ সে নিশ্চয়ই আসবে। আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত কালের কোন বিরহী হৃদয় যে এমন করে ঘুমিয়েছিল তা যদি আগে জানতুম। সর্ব্বদা চোখের সামনে ভেসে উঠছে একখানি শান্ত সুন্দর শ্যামবর্ণ মুখ।

উঃ! আর পারি না—অসহ্য এই দুঃসহ জীবন বয়ে বেড়ান। আজ মাস খানেক হ'লো আমার ঘৃণিত ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি। কাল রাত্রে ঘরের ভেতর বন্ধ করে মসিয়ে যখন মারলে, তখন আমি একটুও কাঁদিনি। তাই দেখে মাদাম আর মসিয়ে রীতিমত অবাক হ'য়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ! ওরা যদি আমার ব্যথাটা বুঝতে পারতো তাহলে জানতে পারতো, মার—আমার সেই বেদনার কাছে কতখানি তুচ্ছ। ওরা এখন আমাকে প্যারিসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমি পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। এই পোর্ট সৈয়দ আমার কত আনন্দের কত ব্যথার জায়গা তা একা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। ওই সমুদ্রের বেলাভূমির উপর সে বেড়িয়েছিল। ওই চেয়ার খানাতে সে বসেছিল। ওই শয্যাটীতে সে শুয়েছিল। চারিদিকেই তার স্মৃতি মাখান আছে। একদিন না একদিন সে নিশ্চয়ই আবার এই পোর্ট সৈয়দে ফিরে আসবে।

কিন্তু মাদামের হাত থেকে বাঁচবার উপায় কি? বুকের ভেতর প্রাণভরা আগুন নিয়ে কি মানুষের মন যোগান যায়? হাঁ ঠিক হয়েছে। একটা রিভলভার আছে না? ঠিক হবে। মৃত্যুকে ভয় কি? হাঃ হাঃ হাঃ!

বেশ হবে। মাদাম আর মসিয়েকে রীতিমত ফাঁকি দেওয়া হবে। তাহ'লে আজ এই খানাই আমার ডায়েরীর শেষ পাতা। ওগো আমার সাগর পারের বন্ধু! বিদায়! তোমারই জন্যে যুগ যুগ ধরে আমার এই অতৃপ্ত কামনা নিয়ে এখানে অপেক্ষা করে থাকবো।

জনসন্ পড়া শেষ করে বলে উঠলো "ছিঃ ছিঃ! এত সুসভ্য ইউরোপীয়ান থাকতে ভাল বাসতে গেল কি না একটা ইণ্ডিয়ানকে? কি ঘেন্নার কথা।"

উইলী গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে "এটা ঘেন্নার কথা কি অঘেন্নার কথা তা জানি না, তবে এটা জেন, এইটেই হচ্ছে **প্রেমের** ঐশ্বর্য্য।"

কানন বধু।

(শেখ মোহাম্মাদ ইদ্‌রিস আলী)

সবাই যখন গেল ছেড়ে,
অবহেলা ভরে;
সবাই যখন দিল তেড়ে,
হেয় মনে করে।
চাইল না কেউ আপন জনা,
দংশাল দুখ ধরে ফণা,
যখন আমার করল দু'নয়নে,
ব্যথার শীতল ধারা;
তখন আমার পড়ল বধু মনে,
তোর সে স্মৃতি হারা।
বন্ধ সবাই করল দুয়ার,
অন্ধ নয়ন খুল্‌ল আমার,
লাঞ্ছনার সে ভারি বোঝা,
বুকে বেঁধে নিয়ে;
তোর দ্বারে গে হলুম সোজা,
সেটী ফেলে দিয়ে।
তোর ভবনে সবাই আপন,
সবার কাছেই আদর যতন,
সুধামাখা সদাই হাওয়া,
শীতল করে কায়া;
তৃপ্তি দানে গাছের মেওয়া,
প্রাণ জুড়ান ছায়া।
বিহগ বাজায় মোহন বাঁশি,
কুসুম ছড়ায় সুবাস হাসি,
তারা শশীর আলোর মেলা,
গন্ধ ভরা বন,
হরিণ শিশুর নৃত্য খেলা,
মুগ্ধ করে মন।
নাইক কোথায় পরাণ ছেঁড়া,
স্বার্থ কাঁটার কুটিল বেড়া,
অত্যাচারীর চাবুক নাড়া,
শঠের আলাপন,
হেথা সরল প্রাণের সাড়া,
চিত্ত বিনোদন।
বধু তোর এ কানন ভূমি-
মাঝে থাকব সদাই ঘুমি,
যাব নাক কোথাও কখন,
তোরে ছেড়ে আর;
তুই হরেছিস্ রোদন বেদন,
দিয়ে প্রীতি ভার।
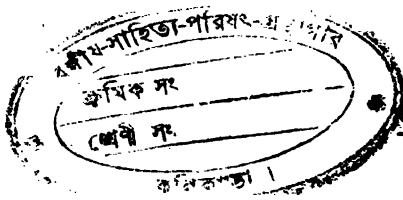
ব্রাহ্মণ।

শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব।

ওহে বটু! ক্ষুব্ধ কেন আজ ব্রহ্মতেজ?
কোন মায়া-যাদুকরী কোন মন্ত্রবলে
শার্দ্দূলে শৃগাল করি ক্রীড়িতেছে এবে,
ক্রীড়ণকে যথা শিশু খেলে অবহেলে॥

কোথা শম দম শৌচ তপস্যা তোমার,
কোথা সত্য সরলতা ব্রাহ্মণ-তনয়!
ক্ষমা কোথা, কোথা দয়া, অহিংসা অদৃশ্য,
নগ্নমুখ পাত্রে যথা কর্পূর-বিলয়॥

আচারবিহীন তুমি অশনে বসনে,
শয্যাপরিগ্রহে আর মলমূত্রত্যাগে।
সন্ধ্যাবিবর্জ্জিত তুমি গায়ত্রী-বিহীন,
সর্ব্বদা ব্যসনাসক্ত ইন্দ্রিয়ের রাগে॥

ব্রাহ্মণ—ইন্দ্রিয়জয়ী সর্ব্বশাস্ত্র-মত,
সর্ব্ববাদী এক বাক্যে করেছে স্বীকার।
ইন্দ্রিয় নিমিত্ত কেন হারায়ে বিবেক,
"নশ্ববৃত্ত্যা কদাচন" কর অঙ্গীকার?

বিলাস-বহ্নিতে হোমে হয়ে রত সদা,
ব্রাহ্মণ-অকার্য্য কর্ম্ম করিতেছ কত।
নাহি জাগে বৃত্তি-বিধি-নিষেধ হৃদয়ে,
দাস্তবৃত্তি হয়েছে-গো চির আকাঙ্ক্ষিত॥

কোথা ঋষি ভরদ্বাজ ব্যাস পরাশর;
ব্রহ্মবাদী জমদগ্নি, শৌনকাদি সুত,
যাহাদের ত্যাগে আজ জগতের স্থিতি,
ব্রাহ্মণের ত্যাগধর্ম্মে ব্রাহ্মণত্ব পূত॥

সেই ত্যাগ কোথা, কোথা তোমাদের ত্যাগ
যে ত্যাগে ছিলেন তাঁরা জগ'বরণীয়?
ত্যাগ বিনিময়ে হয়ে সর্ব্বতঃ ঘৃণিত,
জাগেনা বাসনা "সেই ত্যাগ চরণীয়"॥

ব্রাহ্মণ নামেতে তব বক্ষঃ সদা স্ফীত,
"ব্রাহ্মণোঽহং" বলি সদা জানাও জগতে।
নামের ব্রাহ্মণ যদি এতই মধুর,
ভাব দেখি কত সুখ ব্রহ্মণ্যগুণেতে॥

ব্রাহ্মণের চিহ্ন মাত্র উপবীত গলে,
যার জন্য স্পৃহে সদা আচণ্ডাল জাতি।
সেই সূত্রে হস্ত কভু করেছ কি দান,
জপেছ কি বেদমাতা ব্রাহ্মণের স্থিতি?

আজি এই ধর্ম্মাচার-বিবর্জ্জিত দিনে,
একমাত্র হে ব্রাহ্মণ! তুমিই কারণ।
নমস্কৃত্য যাচি দেখ আপন স্বরূপ,
তাপতপ্ত জীবে দাও অমৃত সন্ধান॥

বাঙ্গালী ও তাহার বর্ত্তমান অর্থসমস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীতিনকড়ি সরকার এম্, এ, বি-এল্।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও বলিতে চাই যে বাঙ্গালী বড়ই আত্মাভিমানী, তাই তার এত দুর্দ্দশা। সকলেই মনে করেন যে সবাই কে মহেশ্বর একটা কিছু হ'বেন এবং সকলেই চোখ বুজিয়া কি একটা অনিশ্চিতের দিকে ছুটে চলেছেন। সকলেই মনে করছেন যে, প্রত্যেকেই এক একটা রাসবিহারী ঘোষ হ'বেন। কাজেই ছোট খাট কাজগুলি যেগুলি বেশ লাভজনক, সেগুলি আর কেহই লক্ষ্য করিতেছেন না এবং ফলে সেগুলি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা এসে অধিকার করে বস্‌ছে। আমি এক্ষণে যে কাজগুলির কথা বলিব—সেগুলি আমাদের মধ্যবিত্ত ভদ্র-লোকের ছেলেরাও তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া করিতে পারেন। কারণ আমাদের ধারণা যে মধ্যবৃত্ত ভদ্রলোকের পক্ষে, না খেতে পেলেও হাতের কাজ (manual labour) করাটা একটা নীচ কাজ। এটা যে একটা ভুল ধারণা এবং হাতের কাজেরও যে একটা মর্য্যাদা [dignity of labour] আছে সে সম্বন্ধে আমি পরে বলিব।

প্রথম কথা হচ্ছে ব্যবসাবাণিজ্য। আমাদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করেন, তাঁরা ছোট খাট ব্যবসা ব্যাণিজ্যগুলিকে ছোট কাজ বলে উপেক্ষা করেন। তাঁরা চান, একেবারে Whiteawaylaidlawর মত সাহেব, চাকর রেখে, মটর গাড়ী চালাইয়ে চৌরঙ্গীর উপর কারবার করতে। তাঁরা চান টেবিল চেয়ার,—ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান্; এই সব হলে তবে কারবার করাটা তাঁদের পোষায়। কিন্তু আমরা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিব যে একেবারে একটা বড়ভাবে কারবার করা—আমাদের মত শিক্ষা-নবীশদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উদাহরণের জন্য আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে না, আমরা চোখের সামনেই দেখিতে পাইব, কলিকাতায় যে সব মাড়োয়ারিরা ও ভাটিয়ারা কারবার করিতেছে—যারা অনেকেই আজ লক্ষপতি, ক্রোরপতি তারা সকলেই খুব ছোট থেকে আরম্ভ করেছিল অনেককেই মাথায় মোট করে ফিরি করতে হয়েছিল, তারপর এক

একজন এক একটী ধনকুবের হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের শিক্ষানবিশী ত করিতেই হইবে এবং সেই সময় খুব বেশী টাকা রোজগার করিবার আশা যে একটা দুরাশামাত্র এটাও ভাবা উচিত। আমাদের এতই মনের দুর্ব্বলতা যে আমরা বরঞ্চ লাথি ঝাঁটা খেয়ে খোসামোদ করে ২০৲ টাকা ২৫৲ টাকা মাহিনার চাকরী করিতে যাইব তবুও স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিব না। ইহার ফলে আমাদিগকে লাভজনক ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে আজ একেবারে দূরীভূত হইতে হইয়াছে। এখানে যখন ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশী বণিকেরা বড় বড় আপিস্ খুলিতে লাগিল তখন বাঙ্গালীরাই যত সব আপিসের বেনিয়ান্, মুৎসুদ্দী ছিল এবং বেশ দুপয়সা রোজগারও করিতেছিল এক্ষণে সেখানে আর বাঙ্গালীর স্থান নাই তাহাদের স্থান অধিকার করেছে সব মাড়োয়ারী। তার পর দেখুন কলিকাতার যত সব বড় বড় কারবার তা প্রায় সবই মাড়োয়ারিরা গ্রাস করেছে। শুধু কলিকাতা কেন বাঙ্গালায় ওরই মধ্যে একটু সমৃদ্ধিশালী স্থানগুলিতেও মাড়োয়ারী। তাহারা আমাদের দেশের সব টাকা কড়ি নিয়ে যাচ্ছে আর আমরা পেটের দুটি অন্নের জন্য লালায়িত। আমাদের এত দুর্গতি তবু আমরা চোখ বুজিয়া বসিয়া আছি আর বিশ পঁচিশ টাকার চাকরীর জন্য উমেদারি করে বেড়াচ্ছি,এধারে মাড়োয়ারির দল আমাদের যত ধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা এখন দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছি, অপরঞ্চ কিং ভবিষ্যতি। এই প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন আমি নূতন এম্-এ পাশ করেছি, মনে কলেজে প্রফেসারি করবার নেশাটা খুবই প্রবল, এখান, ওখান সেখানে চাকরীর জন্য দরখাস্ত করছি। একদিন ঐ চাকরীরই সুপারিশের জন্য আমাদের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তিনি তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজন করছেন আর আমার সঙ্গে এধার ওধারের গল্প করছেন। সেই সময় একটী মাড়োয়ারি তাঁর কাছে দেখা করবার জন্যে একটী কার্ড পাঠিয়ে দিলে। খানিকটা বাদে তাঁর খাওয়া দাওয়ার পর তিনি মাড়োয়ারিটিকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। তখন ইউরোপে মহাসমর চলিতেছে এবং বাজারে এ্যালুমিনমের দর খুব বেশী হয়ে গেছে। বিদেশ থেকে আর মাল আসছে না তাই সেই মাড়োয়ারীটী কলিকাতায় এ্যালুমিনমের প্লেট তৈরী করবার জন্য ওঁর কাছ থেকে মৎলব নিতে এসেছে। তিনি বলিলেন যে কলিকাতাতে এ্যালুমিনম্ প্লেট তৈরী করতে

গেলে বেশী ইলেক্‌ট্রিক্ পাওয়ারের দরকার এবং খুবই খরচা সাপেক্ষ। ফলে শেষাশেষি বেশ লাভজনক হবে বলে তাঁর মনে হলো না। মাড়োয়ারিটী খুব জেদাজেদি করতে লাগলো যে কত আন্দাজ খরচা হ'তে পারে। তিনি তার উত্তরে এই কথা বলিলেন যে "২০, ২৫ লক্ষ টাকা লাগিতে পারে"। মাড়োয়ারীটী তার উত্তরে কি বলিল জানেন? সে বলিল "হাঁ উ-ত লাগেগা," যেন ২০।২৫ লক্ষ টাকাটা একটা তেমন কিছুই নয়। কিন্তু আমরা বাঙ্গালীরা— শিক্ষিত হ'য়েও হা টাকা আর জো টাকা এই করিয়া বেড়াইতেছি, পেটে দুটী খাইতে পাইতেছি না।

এ ত গেল ছোট খাট ব্যবসার কথা। তার উপর ইলেক্‌ট্রিকের কাজ, মটরগাড়ীর কাজ, মেকানিক্যাল্ কাজ এ সব কাজে যদিও দুপয়সা আছে তবু ও সেখানে বাঙ্গালীর স্থান নাই। ভিন্ন ভিন্ন জায়গার লোকেরা এসে এই সব কাজগুলি করতলগত করিয়া ফেলিয়াছে। তারপর চাষের কাজ, বা দুধের, সন্দেশের কাজ এগুলি শিক্ষিত বাঙ্গালীরা করিতে চায় না। ফলে আমাদের আর্থিক দৈন্য আর ঘুচিতেছে না। তার উপর sheep farming ভেড়ার চাষ goat farming ছাগল চাষ poultry farming হাস মুরগীর চাষ sericulture মাছের চাষ gardening বাগান করা ইত্যাদি কাজগুলিও বেশ লাভজনক এবং এথেকে বেশ দুপয়সা রোজগার হ'তে পারে, কিন্তু আমরা এ কাজ করিতে চাই নাই। এর মূলে দেখবো যে আমাদের মিথ্যা আত্মাভিমান। এই আত্মাভিমানই আমাদের যত দুর্দ্দশার কারণ।

এ-ত গেল শিক্ষিত বাঙ্গালীদের কথা। আমি এবার আমাদের এখানকার চাষী-বাসী ইত্যাদি লোকেদের কথা বলিব। এখানেও দেখা যায়— সেই আত্মাভিমান। বেশীর ভাগ লোকেই চাষ-বাসের কাজে আছে, তা ছাড়া অন্য কাজ লাভ-জনক হ'লেও তা করতে নারাজ। কারণ তাদের ধারণা সেগুলো ছোট কাজ। ফলে যত সব লাভজনক কাজগুলি উড়ে, মেড়ো ইহারা এসে অধিকার করে বসেছে। রেল ষ্টেশনে কুলীর কাজে বেশ দুপয়সা পাওয়া যায়। কিন্তু এ কাজে বাঙ্গালীকে, আপনি দেখিতে পাইবেন না। তারা ঘরে বসে অর্দ্ধাশনে, অনশনে দিন কাটাবে, কিন্তু এ সব কাজ মনে ধরে না, এতে মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। তার পর দেখুন জলের কলের কাজ, রেল লাইনের মিস্ত্রীর কাজ, গ্যাসের কাজ ইলেক্‌ট্রিকের কাজ এগুলিও বেশ লাভজনক, এখানেও বাঙ্গালী নাই। তাছাড়া পালকী

বেয়ারাদের কাজ, এখান থেকেও আমাদের দেশের লোকেরা ক্রমেই অপসারিত হইতেছে আর তাদের স্থান অধিকার করছে সব উড়িয়ার দল।

এই সঙ্গে আমার একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। যারা গ্রামে কিছু দিনও বাস করেছেন তাঁরা দেখ্‌তে পাবেন যে আমাদের দেশের দুলে বাগ্‌দীরা ঘরে শুয়ে শুয়ে ঘুমুবে আর মাথায় তেড়ী কেটে ছিপ্‌ নিয়ে মাছ ধরতে যাবে আর বাড়ীর মেয়েরা কাট ভাঙ্গতে যাবে। কিন্তু মাছ দিয়ে যে কি খাইবে তাহার যোগাড় নাই। তার উপর ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের কাজ গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের কাজ, রেলওয়ে ইঞ্জিন ড্রাইভারের কাজ, জাহাজে খালাসীর কাজ, এগুলিও বেশ লাভজনক কাজ, এখানেও বাঙ্গালী নাই। ইহার কারণ হচ্ছে, আমাদের জাতিগত একটা মিথ্যা আত্মাভিমান এবং আলস্যপ্রিয়তা। বাঙ্গালীরা যতদিন পর্য্যন্ত এগুলি বেশ বুঝিতে পারিবে না, ততদিন তাহাদের এই বর্ত্তমান অন্নসমস্যার নিরাকরণ হইবে না। এই হা অন্ন, জো অন্ন ঐ আর ঘুচিবে না।

এই সঙ্গে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। আমাদের এই দারুণ অন্নকষ্টের আর একটা কারণ হচ্ছে, আমাদের জাতীয় বৃত্তিত্যাগ। আমাদের এই যে জাতি বিভাগ এটা যে কেবল একটা মনগড়া artificial থাক তাহা নহে, ইহার একটা অর্থনৈতিক দিকও আছে। পূর্ব্বে কার্য্যকুশলতা দেখিয়া এক একটীর জাতির সৃষ্টি হয়। এবং প্রত্যেক জাতিই তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তিগুলি করিত এবং তাহার উন্নতিরও চেষ্টা করিত। এই রকমে শিল্প কলার উন্নতি হয়েছিল। যতদিন এই রকম একটা বন্দোবস্ত ছিল, ততদিন একটা আর্থিক অস্বচ্ছলতা ছিল না, লোকে কিছু না হোক, দুবেলা দুমুঠো খেতে পেতো। বাঙ্গালার মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব ছিল না। কিন্তু আজ সব যে যার বৃত্তি ত্যাগ করে এক অনিশ্চিত নূতনের দিকে ছুটেছে। ফলে আমাদের দেশের ভাল, ভাল শিল্প আজ লোপ পাইয়াছে। আমাদের দেশে ঢাকাই মস্‌লিন্‌ বিখ্যাত জিনিষ ছিল। কিন্তু আজ আর সে সব জিনিষ চোখে দেখা যায় না। ছুরি, কাঁচি বা লোহের জিনিষ আমাদিগকে আজ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইতেছে। সেই রকম আমরা দেখিব যে আমাদের দেশীয় শিল্প সব লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এবং ইহার ফলে আমাদের দেশ থেকে নানা রকমে অর্থনির্গম হইতেছে। আমার মনে হয় যে আমাদের এই জাতীয় বৃত্তি-গুলি বজায় রাখিতে পারিলে এই ঘোর

অন্নসমস্যার একটা নিরাকরণ হয়।

এই ত গেল আমাদের অন্নকষ্টের মোটামুটি কারণগুলি। এখন আমি হাতের কাজের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। আমি অগ্রেই বলিয়াছি যে আমরা শিক্ষিত মানে হাতের কাজে অনাস্থা বা অক্ষমতা এই বুঝি। কিন্তু বাস্তবিকই যদি আমরা স্থিরচিত্তে ভেবে দেখি, আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব যে—আমি যদি শিক্ষিত হই এবং হাতের কাজও করি তাহাতে আমাদের মর্য্যাদার কি হানি হইতে পারে? আমেরিকা আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে ধনে অগ্রণী। ইহার কারণ হচ্ছে—ইহাদের কাছে "Time is money" সময়ই টাকা। ইঁহারা হাতের কাজের মর্য্যাদা এমনই বুঝেন যে যখন ইঁহাদের অন্য কোন কাজ না থাকে ইঁহারা কুলী গিরি করিয়া মুচীর কাজ করিয়াও স্বাধীন ভাবে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই বা ইহাতে ইঁহাদের আত্মমর্য্যাদার কিছু হানি হয় নাই। তাঁরপর যখন আবার নিজের শিক্ষার উপযোগী ভাল কাজ পান, তখন সেই কাজ করেন। এই প্রসঙ্গে আমি একটী গল্প বলবার লোভ সামলাতে পারলুম না। এখান থেকে কোন ভদ্রলোক আমেরিকায় গিয়াছিলেন। তিনি 'বাস্' থেকে নেমে একটী সামান্য মোট বহিবার জন্য একটী কুলীর সন্ধান করছেন, সেই সময় দেখলেন যে একটী বেশ কাপড় চোপড় পরা ভদ্র লোক তাঁর মোটটী লইয়া বাইতে চাহিল, তিনি ত অবাক! তারপর মোটটী গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ে তার হিসাব মত পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া গেল। তারপর সেই ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকটীর একটী মোকদ্দমা উপলক্ষে কোর্টে যাইতে হইয়াছিল এবং সেই কোর্টের হাকিম কে ছিল জানেন—সেই কুলী ভদ্রলোকটী। আমেরিকার অনেক ছাত্র কলেজে মালির কাজ করে এবং বিনা বেতনে ওখানে পড়ে। তার উপর খাইবার জন্য কোন ভদ্র গৃহস্থে 'বয়ের' কাজ করে আর সেখানে দুটী খেতে পায়। এই রকম করে স্বাধীন ভাবে নিজের খরচ নিজে চাল্‌ইয়ে পড়াশুনা করে। ইহাতে তাঁহাদের মান অপমান কিছুই নাই। কিন্তু আমাদের এখানে সবই বিপরীত। কাপুড়ে বাবু হবে, আর পেটের অন্নের জন্য লালায়িত হবে, এই ত আমাদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান। কিন্তু আমি বলি যে এর চেয়ে আমরা নিজেদের মান সম্ভ্রম বজায় রেখে সৎপথে থেকে হাতের কাজ করেও যদি দুবেলা দুটী পেট পূরিয়া খেতে পাই তা কি বাঞ্ছনীয় নহে?

ত্রিবেণী।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।

৩৪।

কেমন করিয়া কি হইয়া গেল সাবিত্রী কিছুই বুঝিতে পারিল না। কোথা দিয়া একটা দিন কি ভাবে কাটিয়া গেল সে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিল না।

একমাস মথুরায় থাকার পর সাবিত্রী যেন আবার নিজেকে ফিরাইয়া পাইল। প্রয়াগে সেদিন স্নানের পর কে যেন তাহাকে কোন একটা অজানা স্বপ্নের রাজত্বে লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে। এতদিনে সেখান হইতে সে যেন ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে।

কিন্তু চেতনার প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবার অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হইল; আবার আত্মগ্লানি! আবার আক্ষেপ! আবার ধিক্কার!

ইন্দুর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে অশ্রুকে দেখিয়া সাবিত্রী যেরূপ নিজের মনের বল হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবারেও ঠিক তাহাই হইল। মনের আবেগে একবার মাত্র অশ্রুকে ডাকিয়া আর তাহার কোন খোঁজ খবর লইল না, কেন কিছু একটা ডাকাতি হইবার ভয়ে, চুরি হইবার ভয়ে, সর্ব্বস্ব অপহরণ হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি বাটী চলিয়া আসিল এবং হৃদয়ের অমূল্য ধনটিকে লইয়া এলাহাবাদ হইতে পলাইয়া আসিল।

যেরূপ মনের অবস্থা লইয়া সাবিত্রী প্রথমবার অশ্রুকে দেখিয়া ইন্দুর অজ্ঞাতেই চলিয়া আসিয়াছিল, এবারকার মনের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হয় নাই। সেবার সে অনেকটা নিজের জন্যই চলিয়া আসিয়াছিল। অশ্রুকে দেখিয়া তখন তাহার সুরেশকে মনে পড়ে নাই। মনে পড়িয়াছিল নিজেকে, নিজের অবস্থাকে, অশ্রুর তুলনায় সুরেশের নিকট নিজের স্থানকে—যদিও অশ্রুকে দেখিবার পূর্ব্বে এসব কথা একদিনের জন্যও সাবিত্রীর মনে হয় নাই। বরং সে সুরেশের নিকট অশ্রুর সম্বন্ধে কত কথা আলোচনা করিয়াছিল এবং এক হিসাবে অশ্রুর প্রাধান্যই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অশ্রুকে দেখিবামাত্রই কে যেন তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া মানুষের এবং পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মের ভিতর ফেলিয়া দিয়াছিল।

তারপর অশ্রুর সহিত বৎসরাবধি দ্যাখা সাক্ষাৎ না হওয়ায় সাবিত্রী আবার হৃতবল ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিল এবং খুব ভাল করিয়াই হৃদয়ের ভিত্তি কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল। সেই কাঠিন্যের দরুণই প্রয়াগে সে একবার মাত্র 'দিদি' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অবাধ্য মস্তক অবনত হইয়া পড়িল, শিরায় শিরায় রক্তের গতি চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে দমন করিয়া যখন সে মাথা তুলিয়া চাহিল অশ্রুকে আর দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে কি করিত বলা যায় না, হয়তো তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাটী লইয়া আসিত। কিন্তু পুনর্ব্বার তাহার অদর্শনই সাবিত্রীকে যেন কেমন করিয়া দিল। সেবারকার মত তখন তাহার নিজেকে মনে পড়িল না; মনে পড়িল সুরেশকে। অনেক কষ্টে সে স্বামীকে সমুদ্রের মাঝখান হইতে তীরে আনিতে পারিয়াছিল। হয়তো অশ্রুকে দেখিয়া, অশ্রুর কথা শুনিয়া সাবিত্রীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আবার সে অশ্রুর সহিত অতীতের স্রোতে ভবিষ্যতের দিকে ভাসিয়া যাইতে পারে। সুরেশ যতই কেন মনে করুক না সে অশ্রুকে ভুলিয়া গিয়াছে সাবিত্রী একদিনের জন্যও সে কথা মনে করিতে পারে নাই সাবিত্রী জানিত ইহা ছাই ঢাকা আগুন ভিন্ন আর কিছুই নহে। একটা দমকা বাতাস আসিলেই ছাই উড়িয়া গিয়া আবার আগুন বাহির হইয়া পড়িতে কিছুই বিলম্ব হইবে না। সেই জন্যই সেদিন সে অশ্রুর আর কোন খোঁজ খবর লইল না; তার পরদিনই সুরেশকে বুকে করিয়া লইয়া পলাইয়া আসিল।

যখন স্বপ্নের ঘোর সাবিত্রীর কাটিয়া গেল, যখন সে স্বাভাবিক নিয়মের উপরে আবার চলিয়া আসিল তখন তাহার হঠাৎ একদিন মনে হইল এইরূপে পলাইয়া আসার মধ্যে স্বার্থ বলিয়া কি কিছুই নাই! শুধু কি সে সুরেশের জন্যই চলিয়া আসিল! কে যেন তাহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল যে, সুরেশের সুখই যদি সাবিত্রীর সুখ হয় তাহা হইলে সে সুখ তো অশ্রুর সহিত সুরেশের মিলনে! সাবিত্রীর স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলিয়াই তো সে সুরেশকে লইয়া চলিয়া আসিল!

সাবিত্রী তখন একরকম হতাশ হইয়াই ভাবিল, নিজের মনও বুঝি আপনার নহে। যাহাকে সে এত করিয়া বলবান করিতে চেষ্টা করিল, যাহার উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস, সেই মনই পদে পদে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেছে। এবার সে প্রতিজ্ঞা

করিল আর কখন মনকে বিশ্বাস করিবে না, মনের উপর আর কখন নিজেকে ছাড়িয়া দিবে না। মনের চেয়েও যেটা উচ্চ, মনের চেয়েও যেটা পবিত্র সেই আত্মার আশ্রয় লইবে বলিয়া শপথ করিল।

মথুরায় কিছুদিন থাকার পর সাবিত্রী বলিল, "আর আমার দেশে না গেলে চ'লবে না। রামটহলকে নিয়ে আমি চ'লে যাই। তুমি না হয় আর কিছুদিন এখানে থাক।"

সুরেশ বলিল, "আর থাকবার দরকার নেই সাবিত্রী। আমি বেশ সেরে উঠেছি। আমিও তোমার সঙ্গে যাই চল।"

"এত শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর তুমি গিয়ে কি করবে ?"

"তোমারও যে কারণ সাবিত্রী আমারও তাই। শুধু কুঁড়ের মত এ রকম ক'রে ঘুরে বেড়াতে তোমারও যে রকম ভাল লাগচে না আমারও তাই। তার ওপোর যোগেশ কাকার চিঠি পেলুম যে, ইন্দুর নামে যে অতিথি-শালা আর একটা দাতব্য হাসপাতাল গ্রামে প্রতিষ্ঠা করবার কথা তাঁকে বলেছিলুম সেটা প্রায় হ'য়ে এসেচে। তাই তিনি আমায় যত শিগ্‌গীর পারি যেতে লিখেচেন।"

"আগামী বুধবারে ভাল দিন আছে। চল সেই দিনই আমরা ফিরে যাই।"

"কালকেই চল না কেন ?"

"কালকে অশ্লেষা মঘা—বড্ড খারাপ দিন।

"তবে থাক্।'

সুরেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া গেল। সাবিত্রী কক্ষের বাহিরে আসিয়া জিনিষ পত্রাদি প্যাক্ করিবার জন্য ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিল।

৩৫।

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল তখনও সুরেশ ফিরিল না দেখিয়া সাবিত্রী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে তো কখনও এত বিলম্ব করে না! সন্ধ্যার একটু পরেই বাড়ী ফিরিয়া আসে! আজ তবে এখন ফিরিল না কেন? এত বিলম্ব কিসের!

সন্ধ্যা পরেই বাড়ী ফিরিয়া সুরেশ কোন দিন হয়তো গ্রামোফন বাজাইয়া সাবিত্রীকে শুনায়, কোন দিন নিজে 'বেলো' করে এবং সাবিত্রী গান গায়, আবার কোন কোন দিন বা নিজের ঘরে বসিয়া অনেক বই টই পড়ে। এত রাত তো কোন দিন করে না! আজ কি হইল!

আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর হইতে সাবিত্রী অনিমেষনেত্রে পথের দিকে চাহিয়াছিল। ভৃত্যেরা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে বিরক্ত হইয়া তাহাদের তাড়াইয়া

দিতেছিল। তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। থাকিয়া থাকিয়া দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন করিয়া উঠিয়া তাহাকে আরও চিন্তিত করিয়া তুলিতেছিল।

কিন্তু রামটহল যখন আসিয়া বলিল, "বাবু আপকো বোলাতেঁহেঁ মাজী" সাবিত্রী কি যেন একটা আশু বিপদের আশঙ্কায় একটু কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার বাবু কোথায় রামটহল? আজ তোমাদের ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন?"

"হামলোকতো বহুৎখন্ ঘুম আঁয়ে মাজী।" অবাক্ এবং বিস্মিত হইয়া সাবিত্রী বলিল, "সে কি রামটহল। কতক্ষণ তোমরা ফিরেচ?"

"সাঁজ হোনেকা বহুৎ পাহিলে। বাবুতো দাক্ষিণওয়ারী বারেণ্ডেকো কোণেমে সাঁজসে বাইঠা হুঁয়ে হেঁ।" সাবিত্রী একরকম দৌড়াইয়াই যেন দক্ষিণ দিক্‌কার বারাণ্ডার কোণে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, যমুনার দিকে মুখ করিয়া সুরেশ নিস্তব্ধ ভাবে একটি আরাম চেয়ারে বসিয়া আছে। সাবিত্রী বলিয়া উঠিল, "সন্ধ্যে থেকে এখানে ব'সে আছ আর আমি তখন থেকে তোমার জন্যে ভেবে মরচি।" সুরেশ বোধ হয় শুনিতে পাইল না। সাবিত্রীর কথার কোন উত্তর না দিয়া যমুনার দিকে চাহিয়া যেমন অবস্থায় বসিয়াছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই বসিয়া রহিল। সাবিত্রী বলিল, "অন্ধকারে এখানে একলাটী ব'সে আছ কেন?" এবারেও সুরেশ কোন উত্তর করিল না। সাবিত্রীর আশঙ্কা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। গলার স্বর আপনা হইতেই কাঁপিয়া উঠিল। সুরেশের মাথায় হাত দিয়া সাবিত্রী বলিল, "আমায় ডাক্‌ছিলে?"

গোপনে কিছু করিবার সময়ে কাহারো গলার আওয়াজ পাইয়া যেমন চম্‌কিয়া উঠিতে হয়, সাবিত্রীর গলার স্বর শুনিয়া সুরেশ তেমনি একটু যেন শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "হ্যাঁ তোমায় ডেকেছিলুম।" সাবিত্রী দেখিল কাল-বৈশাখি মেঘের মত সুরেশের মুখখানা কালো, অন্ধকার এবং গম্ভীর। একটু ভীত হইয়া বলিল, "এখানে বসে আছ কেন ঘরে চল না।" অন্যমনস্ক ভাবে "হ্যাঁ যাই" বলিয়া সুরেশ আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমায় ডেকেছিলুম কেন জান?"

"কেন?"

"চল আমরা কালই চ'লে যাই।"

"কাল কি ক'রে যাওয়া হবে, কাল যে মঘা অশ্লেষা!"

"তা হোক্। কালই যেতে হবে।"

"মঘা অশ্লেষা মাথায় ক'রে যাওয়া হ'তেই

পারে না।"

যমুনার দিকে চাহিয়া সুরেশ বলিয়া ফেলিল, "মঘা অশ্লেষা মাথায় ক'রে এখানে থাকাও ভাল হবে না সাবিত্রী। কপালে থাকলে বিপদ্ এখানেও হ'তে পারে। চল, কালই যাই।"

উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে সাবিত্রী বলিল, "তবে না হয় তাই চল। ভজুয়াকে সঙ্গে করে আমরা যাই। পরে জিনিস্ পত্তর নিয়ে রামটহল যাবে'খন।"

একটু ভাবিয়া সুরেশ বলিল, "না থাক্। বুধবারে যাওয়াই ভালো।" সাবিত্রী জিদ্ ধরিয়া বলিল, "না, না, কালই চল। জিনিস্গুলোর জন্যে ভাববার দরকার নেই। রামটহল ঠিক নিয়ে যাবে।"

চেয়ার হইতে উঠিয়া সুরেশ বলিল, "সত্যি সাবিত্রী, মঘা অশ্লেষা মাথায় করে গিয়ে কাজ নেই। বুধবারেই যাব।"

সাবিত্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুই বলিল না। সুরেশের সহসা এ পরিবর্ত্তনের কারণ সাবিত্রী কিছুই খুঁজিয়া পাইল না; শুধু অন্তরে অন্তরে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুরেশ আজ হঠাৎ এমন হইয়া গেল কেন?

সেইদিন হইতে সে আর বাটীর বাহির হয় নাই। সাবিত্রীর প্রত্যেক অনুরোধের উত্তরেই একটা না একটা ওজোর আপত্তি করিয়া বাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিত। সেইদিন হইতে আহারে রুচি গিয়াছে, রাত্রে নিদ্রা গিয়াছে, মনের সুখ গিয়াছে, সাবিত্রীকে দেখিলেই যেন কেমন হইয়া যাইত। তাহার সহিত কোন কথা না কহিয়া পাশ কাটাইতে পারিলেই যেন বাঁচিত।

সেইদিন হইতে সাবিত্রীরও চোখের জলের অন্ত ছিল না। জ্ঞানে সে তো কোনই অপরাধ করে নাই, সুরেশকে তো কিছুই বলে নাই। তবে কেন সুরেশ তাহার উপর হঠাৎ এত বিরূপ হইয়া গেল! তাহাকে দেখিলেই কেন চোখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত! সাবিত্রী শুধু চোখের জলে ভাসিয়া ভগবানকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "এ আবার কি ক'র্লে প্রভু!"

বুধবার দিন যাত্রা করিবার জন্য সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল। যা দু'একটা জিনিস্ বাহিরে পড়িয়া ছিল রামটহল সব গুছাইয়া লইতে লাগিল। নিজের ট্রাঙ্ক, সুরেশের সুটকেশ প্রভৃতি সাবিত্রী পূর্ব্বেই গুছাইয়া রাখিয়াছিল। যতই ট্রেণের সময় নিকট হইয়া আসিতে লাগিল, ভৃত্যদের হাঁক ডাক, রামটহলের চীৎকার ততই বাড়িয়া উঠিল।

রামটহল পুরাণো ভৃত্য বলিয়া অন্যান্য চাকরদের উপর তাহার জোর খাটিত বেশী। কোথাও কিছু পড়িয়া রহিল কিনা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্য চাকরদের হুকুম করিতে লাগিল। রেলে আহার করিবার জন্য সাবিত্রী লুচী বেলিয়া দিয়াছিল, তরকারী কুটিয়া দিয়াছিল। বামুন-ঠাকুরের এখন সে সব প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই দেখিয়া রামটহল তাহাকে খুব ভৎর্সনা করিতে লাগিল, তাড়াতাড়ি হাত চালাইয়া লইতে বলিল। ভৃত্যদের চীৎকারে এবং ব্যস্ততায় বাড়ীখানি সব গরম হইয়া উঠিল—যেন কত লোক যাইতেছে, একটা মস্ত বড় সংসার উঠিয়া যাইতেছে। সকাল হইতে সাবিত্রীও খুব ব্যস্ত ছিল। সুরেশের সহিত একবারের জন্যও দ্যাখা হয় নাই। যখনই দ্যাখা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে সুরেশ অমনি ঘাড় নীচু করিয়া পলাই-বার চেষ্টা করিয়াছে। ওবেলায় খাবার সময়ে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল মাত্র। তারপর আর সাবিত্রী ইচ্ছা করিয়াই সাক্ষাৎ করে নাই। তাহার উপর নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় সময়ও পায় নাই। রামটহলের অত চীৎকারেও ভৃত্যেরা কেহই কথা শুনিতেছিল না। সাবিত্রী নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছিল।

বৈকালে যখন ভজুয়া আসিয়া বলিল সুরেশ তাহাকে ডাকিতেছে সাবিত্রী তখন একটা 'টিফিন্ বাস্কেটে' লুচি তরকারী পুরিতেছিল, বলিল, "বল গে যাও যাচ্চি।" সে ভারটী রামটহলের হাতে দিয়া সাবিত্রী তাড়াতাড়ি সুরেশের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কলিকাতা হইতে যে চাকরেরা সুরেশের সহিত আসিয়াছিল তাহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। এতদিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছে, আনন্দ তো হইবারই কথা। কলিকাতায় যাইয়া বন্ধুবান্ধবের কাছে কে কি গল্প করিবে এই সব কথাই তাহাদের মধ্যে হইতেছিল। সেই সভার রামটহলই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিল, বলিতেছিল, "হাম তো ভাই বহুৎ বাৎ বানায়কে বোলদেঙ্গে। থোড়া ঝুঁট নেহি বোলনেসে ঠিক না হোগা।" অন্যান্য ভৃত্যেরা তাহাতেই সায় দিতেছিল। তাহাদের কত প্রাণের কথা, কত আনন্দের কথা হইতেছিল। স্বদেশ না হইলেও কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এতকাল পরে আজ ফিরিবার দিন আসিয়াছে এইটুকু ভাবিয়াই তাহারা আমোদ পাইতেছিল।

এমন সময়ে সাবিত্রী আসিয়া বাড়া ভাতে

ছাই দিয়া বলিল, "আজ আর যাওয়া হবে না রামটহল। দরকারী বাক্সগুলোর প্যাকিং খুলে ফ্যাল।"

ভৃত্যেরা সকলে হতাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের মুখের হাসি মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গিয়া মুখগুলি শুকাইয়া উঠিল। হতাশ এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া রামটহল বলিল, "কাহে মাজী?

"তোমার বাবুর বড্ড জ্বর এসেচে রামটহল।" বিস্ফারিত নেত্রে "বোখার!" বলিয়া রামটহল নিজের অজ্ঞাতেই হাঁ করিয়া রহিল। অন্যান্য ভৃত্যেরা নিরাশ নয়নে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রভুর জ্বর শুনিয়া একটু বিমর্ষও হইল। দরকারী বাক্সগুলি খুলিয়া ফেলিতে আর একবার আদেশ করিয়া সাবিত্রী সুরেশের কাছে চলিয়া গেল।

সুরেশ বলিল, "জ্বর গায়েই যেতুম সাবিত্রী। যাওয়াটা বন্ধ করা ভালো হ'লো না।"

"জ্বরটা ছেড়ে যাবার পর গেলেই চ'লবে। এ অবস্থায় যাবে কি ক'রে?"

"যেমন ক'রে হ'ক যেতুম। তেমন বেশী জ্বর তো হয়নি।"

সাবিত্রী কিন্তু থারমমিটার লাগাইয়া দেখিয়াছিল জ্বর ১০৩ ডিগ্রীরও কিছু উপরে। বলিল, "তা না হোক্, দুদিন বাদেই না হয় যাব।" একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশ চুপ করিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ম্যালেরিয়া ও কুইনিন।

(ডাক্তার সতীশচন্দ্র কুমার)

ম্যালেরিয়া বিষের স্বরূপ ও নিদান এবং বাংলাদেশে প্রসার।

পূতি-বাষ্প-দুষ্ট আর্দ্র ভূমিই যে ম্যালেরিয়ার অনুকূল ক্ষেত্র এবং ম্যালেরিয়া বিষ যে মশক সাহায্যে দেহ হইতে দেহান্তরে নীত বা সংক্রামিত হয় তাহা অনেকেই জানেন। প্ল্যাজ-মোডিয়াস জাতীয় এক প্রকার জীবাণুই এই ব্যাধি উৎপন্ন করে। উহারা শোণিত মধ্যে অবস্থান করিয়া রক্তকণিকা হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করে ও শোণিত মধ্যেই আপনাদিগের বংশ বৃদ্ধি করে। আজ ম্যালেরিয়ার নির্ম্মম অত্যাচারে সোণার বাংলা শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম নগরের পর নগর ম্যালেরিয়ার কবলে

আত্মসমর্পণ করিতেছে। পূর্ব্বেও বাংলাদেশে ঘন জঙ্গল, ধানের ক্ষেত ও আর্দ্র ভূমি অনেকটা এই রকমই ছিল; কিন্তু তখন দেশব্যাপীরূপে ম্যালেরিয়া ছিল না। আজই বা এরূপ পরিবর্ত্তন হইল কেন? ইহার কারণ রূপে দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রথম—রেলপথ বিস্তারের ফলে এবং পুরাতন নদী গুলির সংস্কারের অভাবে জল নিষ্কাশনের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হওয়ায় অবরুদ্ধ জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদ্ পচিয়া পূতি-বাষ্পের তথা ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করিতেছে। দ্বিতীয়—পূতি-বাষ্পই ম্যালেরিয়ার আদি কারণ হইলেও সুস্থ ও সবল দেহে ম্যালেরিয়া বিষ প্রবেশ করিয়া সহজে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে না। কোনও আগন্তুক ব্যাধি-বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে শরীর স্বভাবতঃই ঐ আগন্তুক শত্রুকে দূরীভূত করিতে বা অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে এবং জীবনী-শক্তি অটুট থাকিলে ঐ চেষ্টায় প্রায়শঃ সফলকাম হয়। বর্ত্তমান সময়ে অসম্যক্ এবং অপকৃষ্ট আহারে অভ্যস্ত, চিন্তাজীর্ণ, দুর্ব্বল বাঙ্গালী-শরীর উপযুক্ত প্রতিরোধকারী শক্তির অভাবে আগন্তুক ম্যালেরিয়া বিষকে দূরীভূত করিতে কিম্বা অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং সহজেই ম্যালেরিয়ার কবলে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এখন এই দুইটী সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত করিবার কল্পনা বৃথা।

কুইনিনের প্রচার।

তারপর চিকিৎসার কথা। চিকিৎসক-মণ্ডলী যখন বুঝিতে পারিলেন যে বিশিষ্ট প্রকারের জীবাণুই ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন করে; তখন তাঁহারা এই রোগ-বীজ ধ্বংসকারী একটী অমোঘ ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুইনিন পূর্ব্ব হইতেই জ্বর চিকিৎসায় অন্যতম ভেষজরূপে ব্যবহৃত হইত; এখন কুইনিন লইয়াই পরীক্ষা চলিতে লাগিল। চিকিৎসকগণ দেখিলেন কুইনিন্ প্রয়োগে ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। অতএব তাহারা ধরিয়া লইলেন কুইনিন শরীরস্থ ম্যালেরিয়া-বীজাণু ধ্বংস করিয়া ফেলে। সুতরাং কুইনিনই ম্যালেরিয়ার একমাত্র অমোঘ ঔষধ বলিয়া প্রচারিত হইল। কুইনিনের দ্বারা এতাদৃশ ফললাভ হইলে বাংলা-দেশের একটী মহদুপকার সাধিত হইত; কিন্তু তাহা হয় নাই। কেন হয় নাই তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

কুইনিনের তাপনাশক ক্রিয়া।

১। কুইনিন্ একটী প্রবল তাপনাশক ঔষধ (antipegretic); অধিকাংশ স্থলে অনুপযুক্ত-ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় কুইনিন প্রয়োগে শরীরের বাহ্যতাপ নষ্ট করিয়া জ্বর বন্ধ করা হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হয় না। বরং কেন্দ্রীভূত হইয়া বর্দ্ধিত শক্তিতে অলক্ষ্যে আপন ধ্বংস কার্য্য সাধন করিতে থাকে।

[জৈবী বিষরূপে জীবাণু ও রক্ত-কণিকার উপর কুইনিনের ক্রিয়া।]

২। কুইনিন জৈবী পদার্থের ধ্বংসকারী বিষ (protoplasmic poison)। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বা শরীরের বাহিরে পৃথগীকৃত (isolated) ম্যালেরিয়া বীজাণুর ধ্বংস কুইনিন্ দ্বারা সম্ভবপর হইলেও শরীরাভ্যন্তরস্থ, রস-রক্তাদি উপাদান মণ্ডলীর সহিত সংমিশ্রিত ম্যালেরিয়া বীজাণুকে শরীরের অন্যান্য উপাদানের প্রভূত অনিষ্ট না করিয়া সাক্ষাৎভাবে সমূলে বিনষ্ট করিবার প্রয়াসকে বুদ্ধিমানের কার্য্য বলা যায় না। ডাক্তার Hale White তাঁহার Materia Medica নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন "We do not know of any drugs which when taken internally * * will certainly destroy micro-organism * * * * unless they are sufficiently concentrated to be fatal to the patient". পুনশ্চঃ—"Many attempts have been made to combat diseases due to micro-organisms by the injection of antiseptics into the blood, but there is no evidence of any success". শরীরের রক্ত-কণিকানিচয়ও জীবাণুর ন্যায় জৈবী পদার্থে (protoplasmএ) গঠিত। কুইনিনের বহুল ব্যবহারে রক্ত-কণিকার সহিত সংমিশ্রিত ম্যালেরিয়া বিষের সমূলে ধ্বংস সাধন সম্ভবপর নহে। এই প্রক্রিয়ায় রোগীর প্রাণ-স্বরূপ রক্তকণিকা নিচয় এত অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হয় যে তাহার জীবনী-শক্তি একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

[কুইনিন পরিপোষণ ক্রিয়া নষ্ট করে]

৩। কুইনিন রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাবে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ রোগের আকরে পরিণত হয়।

[কুইনিনের বিষময় ফল]

এখন বুঝিতে পারা গেল কার্য্যক্ষেত্রে কুইনিনের সাহায্যে শরীরস্থ ম্যালেরিয়া বীজাণুকে সমূলে বিনষ্ট করা যায় না ; ইহার তাপনাশক ক্রিয়ার সাহায্যে জ্বরকে অন্তর্নিবিষ্ট করা হয়

মাত্র। এইরূপে অবরুদ্ধ জ্বর শক্তি সঞ্চয় করিয়া মধ্যে মধ্যে যতই প্রবলতররূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকে এবং কুইনিন দ্বারা পুনঃ পুনঃ রুদ্ধ হইতে থাকে শরীরের অবস্থা ততই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া অবশেষে অচিকিৎস্য হয় ও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

[কুইনিন ও কালাজ্বর]

ডাক্তার ষ্টিফেন্স (Dr. Stephens) প্রমুখ চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কুইনিন ব্ল্যাক্‌ওয়াটার ফিবার (রক্ত প্রস্রাব উপসর্গযুক্ত আফ্রিকা খণ্ডের ম্যালেরিয়ার ন্যায় এক প্রকার জ্বর) উৎপন্ন করিতে সক্ষম। কুইনিন যে ম্যালেরিয়া জ্বর সদৃশ এক প্রকার কৃত্রিম সবিরাম জ্বর উৎপন্ন করিতে পারে তাহা শতবর্ষ পূর্ব্বেই পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। আজ-কাল বাংলা দেশে কুইনিনের অপব্যবহারের পর অনেক ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীর শোচনীয় অবস্থায় ~~ডাক্তারগণ~~ কালাজ্বর বলিয়া রোগ নির্ণয় করিতেছেন। এই প্রকার কালাজ্বর অতিরিক্ত মাত্রায় কুইনিন ব্যবহারের ফল নহে ত ?

[কুইনিনের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র]

কুইনিনের অপব্যবহারে এইরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইলেও ক্ষেত্র বিশেষে ইহার যথেষ্ট উপকারিতা আছে। জঙ্গলময়, আর্দ্র ভূখণ্ডে উৎপন্ন যে সকল ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বরে শীতকম্প, তাপ ও ঘর্ম্ম এই তিনটী অবস্থাই বিশিষ্টরূপে পরিস্ফুট তাহাতেই কুইনিন্ উপযোগী। একদিন অন্তর বা দুইদিন অন্তর আক্রমণ বিশিষ্ট স্বল্পাধিক দেশব্যাপক জ্বরের পক্ষেই ইহা বিশিষ্ট ফলপ্রদ। এই সকল রোগীর প্রভূত ঘর্ম্ম হয় ও ঘর্ম্মকালে রোগীর পিপাসা থাকে। তাপাবস্থায় প্রায় পিপাসা থাকে না কিন্তু গাত্রদাহ থাকে। বস্তুতঃ নূতন সবিরাম জ্বরে তাপের পর সর্ব্বশরীরে প্রভূত ও দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম উপস্থিত হইয়া জ্বর বিচ্ছেদ হইলে কুইনিন্ তাহার ঔষধ নচেৎ ইহা নিষ্ফল। যকৃৎ ও প্লীহার রক্তাধিক্য বশতঃ সহজ স্ফীতি সহ তরুণ ও জটিলতা বিহীন জ্বর ব্যতীত যকৃৎ ও প্লীহার পুরাতন বিবৃদ্ধিযুক্ত জটিল ও কঠিন রোগে কুইনিন কার্য্যকরী নহে।

[রোগারোগ্যে কুইনিনের ক্রিয়া প্রণালী]

ব্যক্তি বিশেষের কোনও বিশিষ্ট রোগাক্রান্ততা দূরীভূত করিয়া যাহাতে রোগ বীজাণু তাহার দেহে উপযুক্ত বাসোপাদান প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বংশ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ না হয় সেই ভাবে

রোগারোগ্যের চেষ্টা করিলেই আরোগ্য স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণাঙ্গ হয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে কুইনিন্ কথিত প্রকারেই রোগারোগ্য করিয়া থাকে; সাক্ষাৎ ভাবে রোগ বীজাণু ধ্বংস করে না। এই সকল স্থলে অতি অল্প মাত্রায় কুইনিন্ ব্যবহারেই ঈপ্সিত ফল লাভ হয়। উপরোক্ত কারণেই এক ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসায় জ্বরের প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন ঔষধের আবশ্যক হয়; কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগারোগ্যে কুইনিনের ক্ষমতা অসীম এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ হইয়াছেন

[উপসংহার]

আশা করি রোগীর প্রকৃত কল্যাণকামী চিকিৎসকগণ ও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ধীর ভাবে কুইনিনের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ হইয়া যাইবে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া কুইনিন্ ও অমৃতময় ফল প্রদান করিয়া সমাজের মহাকল্যাণ সাধন করিবে।

আশার শেষে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ।
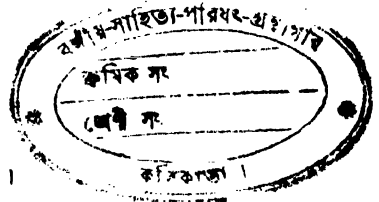
অনন্ত আশার উৎসের তীরে
বসেছিনু হরি! আমি,
বঞ্চনা ক'রে বারে বারে বারে
বাঁচালে আমারে তুমি।
পথ ভুলাইয়া আনিলে আমারে
দীনহীন ক'রে পথে দিলে ছেড়ে,
দেখো যেন পুনঃ দয়াল আমার
পথ নাহি ভুলি আমি॥
আশা কাণা কড়ি হইল অচল,
কেড়ে নাও মিছা পথের সম্বল,
ক'রে নাও হরি আমারে তোমার
তোমারই কাঙ্গাল আমি॥
আরত চলেনা চরণ আমার
নয়নের আলো হইল আঁধার
জ্বালিওনা আর আলোক আশার
এই ভিক্ষা মাগি আমি।
মজেছিনু আমি আশার আশায়
নিরাশ করিয়া বাঁচালে আমায়
কি আর বলিব দয়াল তোমায়
কর যাহা ইচ্ছা তুমি॥

সহানুভূতি

স্বামী মিলনানন্দ স্বরস্বতী।

(১)

এযে শ্যামার আঁচল ধোরেছে।
(দেখি) গোরাদিদি গরম গরম
ছোলা ভাজা ভেজেছে।
এত "প্রেমের ধর্ম্ম", পেটুক দায়,
(আমার) প্রেমীক হোয়ে জুটেছে।
মায়ের ফল মিষ্টিতে, বিগ্‌ড়েছে মুখ,
তাই নৈবিদ্যে এই মিলেছে।

(২)

ওগো পাঁচ ভূতের এ দেহ ধোরে,
এই পঞ্চ সংএর ঘোর বাজারে,
মা তাইত এবার পঞ্চ রংএ
"নামাবলী" রংয়িয়েছে।
পুরহিতের মঙ্গল ঘটে
মা লক্ষ্মী ঐ বসেছে।
আমার ব্রাহ্মন জোরে জোরে পঞ্চ শঙ্খ বেজেছে।

(৩)

লক্ষ্মী নইলে সরস্বতী,
পান না কত ঠাঁই বসতি,
তাইত দেখি হাতীর পালে,
প্রজাপতি উড়েছে,
লক্ষ্মীর পদ্মের ফড়ীং, মাছি,
সবারই ভয় ভেঙ্গেছে।

(৪)

পাঁচ জনাতে আস্‌বে ছুটে,
নেবে প্রসাদ লুটে পুটে।
প্রণামী সব পড়্‌বে দ্বারে,
মায়ের ফকির ফলেছে,
এই অচল বাজার স্বচলের কল
গোলা কারি চলেছে।
ভেজাল—গোঁজাল—সব একাকার
যেথায় ভিক্ষা রোয়েছে।

বাংলার পৌষ

(শ্রীব্যোমকেশ অধিকারী)

বাংলার পৌষের সার্থকতা সেদিন, যেদিন শঙ্খরোলে—ভরে যায় উৎফুল্ল বাঙ্গালী-বধুর তার শেষ দিনের প্রভাত জেগে ওঠে মধুময় অনাবিল হাস্য কলরবে। যেদিন বাংলার

বর্ষীয়সীদের প্রতি পৌষের অক্ষুন্ন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে সোনার বাংলার সোনার শ্রীর সকল রকম সম্পদের ছবি হৃদয়ের ভেতর ফুটে ওঠে। সারা বছরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাংলার অভাগা কৃষক বাংলা-মায়ের শ্যাম-অঞ্চলের সুখ শয্যায় তার গা ঢেলে দেয়—এই বাংলার পৌষে। জানি না কী সে সুখ! যাদের আমরা ঘৃণা করি, যাদের চাষা ব'লে তাড়িয়ে দিই, আমাদের সুখ সম্পদের কাছ থেকে, সেই চাষাই বাংলা-মায়ের পরিপূর্ণ ছবি এই পৌষে দেখ্‌তে পায়—আর এই দেখ্‌তে পাওয়াতেই সে সুখ উপভোগ করে। আমাদের সাধ্য কি যে আমরা সে সুখের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারি। আমাদের চক্ষু নেই, আমরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি, আমাদের বিবেক নেই, আমরা কাম্য ভুলেছি আমরা অনুকরণ কত্তে শিখেছি, আমাদের "বড় হওয়া" সাধ আছে আমরা ঠিক পথ ছেড়ে দিয়েছি। বাংলার মাটীকে আমরা "মাটী" ব'লেই পায়ে মাড়াচ্ছি—"মা"টী বলে তো মাথায় তুলতে পাচ্ছি নি। তবে চাষার সেই সুখের মর্ম্ম কি ক'রে বুঝ্‌ব বল? সে সুখে যে "মা"টীর হাসি আছে, মাটীর আবর্জ্জনা নেই, যে আবর্জ্জনায় প'ড়ে আজ আমরা কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছি। ওগো বাংলার ঘৃণিত অভাগা চাষীর দল! ভাল ক'রে ফুটিয়ে তোল বাংলা মায়ের সেই সোনার শ্রী আমাদের চোখের সাম্‌নে। আমরা যে চোখ খুলি' খুলি' ক'রেও খুল্‌তে পাচ্ছি না। দাও বন্ধু, দাও ভাই, দাও সখা, দাও বাংলার নিঃস্বার্থ অভাগা সখা, অঞ্জনের মত আমাদের চোখে ঐ সোনার মাটী একটু বুলিয়ে দাও, আমরা চোখ চেয়ে দেখি। মাকে না দেখে আর কতদিন থাকব? দিন যে ফুরিয়ে এল, পথ চলা যে শেষ হ'য়ে এল চাষা ভাই! আহা! তোমার বাংলার "পৌষ" ধনধান্যে ভরা, তোমার সেই বাংলার পৌষ—তার তুলনা নেই। তার শেষদিনের সেই পার্ব্বণ—সেই পৌষপার্ব্বণ, বাংলার পূর্ব্বতন সুখ-সৌভাগ্যের স্মৃতিবার্ত্তা নিয়ে যুগ-যুগান্তরের উৎসব—তারও তুলনা নেই। শাস্ত্রের কথা মনে পড়ে—এই দিনই রবিদেব উত্তরায়ণে যাত্রা করেন এবং সেই সঙ্গে সুপ্তিমগ্ন দেবতারা জাগ্রত হন; তবে চোখ চাইবার এই তো পুণ্যদিন আমাদের! জাতীয় উৎসবের মাঝে এই তো মহোৎসব। সব তো হারিয়েছি আমরা, সব তো গিয়েছে আমাদের! তবুও জাগাও ভাই চাষী, দেখাও ভাই চাষী। ভাল ক'রে জাগাও, ভাল ক'রে দেখাও! এই

পুণ্যদিনে—এই মহা উৎসবের দিনে বাঙ্গালী কুললক্ষ্মীর লক্ষ্মী পূজার ভক্তি ও প্রীতির প্রবাহে এই অজ্ঞ ভাইদের ভাসিয়ে দিয়ে বাংলার সোনার সম্পদে ভরা অতীত শ্রীর আবাহন মন্ত্রে তাদের মুগ্ধ ক'রে অন্নপূর্ণার অক্ষয় ভাণ্ডারের দুয়ার দেখিয়ে দাও ভাই চাষা। আজ অন্নাভাবে আমরা কাতর, বাংলার ঘরে ঘরে আজ অন্ন সমস্যা। তাই বল্‌ছি আমাদের যুগ-যুগান্তরের অপরাধ ভুলে গিয়ে দেখাও ভাই চাষা—আমাদের "বাংলার পৌষ" তোমার সোনার বাংলার সেই সোনার পৌষ—তোমার সোনার পৌষের সোনার বাংলার সেই সোনার "মা"টী।

পলকে প্রলয়।

(শ্রীশ্যামাচরণবিশ্বাস)

লীলাময়ের লীলা বুঝা ভার। দাদা বলরাম এই লীলার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের পশ্চাৎধাবন, তাঁহাদের অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ, কখন বা গোপীগণকে বনে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন, শারদ-পূর্ণিমা-নিশীথে রাসমঞ্চে তাঁহাদের কণ্ঠদেশ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া নৃত্য, তাঁহাদের সহিত কামভাবোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি কটাক্ষপাত হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি দর্শন করিয়া তাঁহার মনে 'কৃষ্ণলীলা' সম্বন্ধে ভীষণ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে মনে ভাবিলেন "ভায়া এ কি লীলা আরম্ভ করিয়াছে। লোক চক্ষুতে ইহা বড়ই কদর্য্য বলিয়া বোধ হয়।" এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া বলরাম কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভক্ত বৎসল অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ, দাদা বলরামের লীলা সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছে জানিতে পারিয়া,—সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য এক অভিনব লীলা আরম্ভ করিলেন।

একদিন রাম-কৃষ্ণ ব্রজ-রাখালগণের সমভিব্যাহারে গোধেনু লইয়া যমুনা পুলিনে গমন করিলেন। তথায় গোবৎসগণকে ছাড়িয়া দিয়া এক কদম্ব তরুর মূলে রাখালগণের সহিত খেলাতে মত্ত হইলেন। অনেকক্ষণ খেলার পর দাদা বলরামকে কহিলেন "দাদা আজ বড় ক্ষুধা পাইয়াছে! চল আমরা মা যশোদার

ব্যাটরা পারিজাত সমাজের সংক্রান্তি সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশনে পঠিত।

নিকট যাইয়া ভাত খাইয়া আসি ?” বলরাম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কহিলেন “তবে চ'ল বাড়ী যাই!” তখন শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণকে কহিলেন “ভাই সখাগণ! আজ আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। তোরা আমাদের গো-বৎসগুলিকে কিছুকালের জন্য ঠেকাইয়া রাখিস্। আমরা বাড়ীতে যাইয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া আসি।” রাখালগণ কহিলেন “যা ভাই এখনি যা। আসবার সময় মা যশোদার নিকট হ'তে আমাদের জন্য কিছু ক্ষীর, সর, নবনীত লয়ে আসিস্ ?” শ্রীকৃষ্ণ “লইয়া আসিব” বলিয়া দাদার সহিত গমন করিলেন। নন্দরাণী সেই সময় গৃহ কার্য্যে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। দুই ভাইকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন “হারে রাম-কৃষ্ণ! তোরা ছোট ছোট দুধের বালকদের হাতে গো-পাল দিয়া কি ব'লে ঘরে এলি ?”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন “মাগো! আজ আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে তাই তাদের হাতে গো-পাল দিয়ে বাড়ীতে ভাত খেতে এসেছি।”

যশোদা কহিলেন “হারে রাম কৃষ্ণ! তোরা ত এই বৃন্দাবনে আসা অবধি কোন দিন ভাত খেতে অভিলাষ করিস্ নি! তবে আজ ক্ষীর সর নবনীত ছেড়ে ভাত খেতে অভিলাষ কেন ?”

কহিলেন “মাগো? আজ তোমার হাতে ভাত খেতে আমাদের বড়ই সাধ হয়েছে; তাই আজ আমরা ভাত খাবো।”

মা যশোদা আর প্রতিবাদ না করিয়া কহিলেন “তোদের যখন ভাত খেতে সাধ হয়েছে; তখন আমি গৃহকর্ম্ম ফেলে এখনি ভাত চড়াইতে চল্লাম। তোরা দুই ভাই শীঘ্র যমুনায় যেয়ে স্নান ক'রে আয় ?” এই বলিয়া নন্দরাণী ভাত চড়াইতে চলিলেন, কৃষ্ণ বলরাম যমুনায় স্নান করিতে গেলেন।

যমুনার তটে উপনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন “দাদ! আগে আমি স্নান করি, তারপর তুমি স্নান করিও।”

বলরাম কহিলেন “সেই ভাল ভাই! আগে তুমি স্নান কর—পরে আমি ক'রবো।”

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের হাতে ধড়া চূড়া অর্পণ করিয়া যমুনায় নামিয়া উত্তম রূপে অবগাহন করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং ধড়া চূড়া পরিধান করিয়া কহিলেন “দাদা! তোমার ধড়া চূড়া আমার কাছে দিয়া স্নান করে এস।” বলরাম কৃষ্ণের করে ধড়া চূড়া অর্পণ করিয়া যমুনার জলে নামিয়া ডুব দিলেন। মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে যমুনাও নাই, বৃন্দাবনও নাই, কৃষ্ণও নাই। তিনি বালুকার উপর দাঁড়াইয়া আছেন। তখন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত

করিয়া দেখিলেন, অনন্ত বালুকারাশি চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করিতেছে। প্রখর তপনদেব সহস্র সহস্র কর প্রসারণ করিয়া বালুকারাশি উত্তপ্ত করিতে-ছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন "হায়! আমি কৃষ্ণ-হারা হলাম। হায়! আমি সাধের বৃন্দাবন-হারা হলাম। ভাই কৃষ্ণ তোর এ কি লীলা। আমায় অনন্ত মরুভূমির মধ্যে ফেলে কোথায় গেলি? একবার দেখা দে ভাই।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং মরুভূমির উপর পড়িয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আরও বলিতে লাগিলেন "হায়! হায়! কেন আমি কৃষ্ণ-লীলার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলাম, সেই সন্দেহের জন্য আজ আমায় বৃন্দাবন-হারা, কৃষ্ণ-হারা হ'তে হ'ল। ভাই কৃষ্ণ আর কখন তোর লীলায় আমি সন্দেহ ক'রবো না। একবার দেখা দিয়া জীবন রাখ" বলিতে বলিতে আরও অধীর হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে চিত্তকে দৃঢ় করিয়া কহিলেন "এরূপ অধীর হইলে চলিবে না। মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন শ্রেয়। অতএব আমাকে ধৈর্য্য ধারণ ক'রতে হ'ল।" "এখন কোন দিকে যাই" চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার সেই মরুভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তাহাতে বালুকা ছাড়া আর কিছু নাই কেবল মাত্র মাঝে মাঝে দুই একটী মরুভূমির বৃক্ষ আছে। তখন দিক নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দিক নিরূপণ করিতে সক্ষম হইলেন না। "এখন কি করি! কোন দিকে যাই?" এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন "যে দিকে দুই নয়ন যায় সেই দিকেই গমন করি।" এই বলিয়া একদিকে গমন করিতে লাগিলেন।

বহুদূর গমন করিয়া একটী বৃক্ষ পাইলেন। তাহার তলায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন চক্ষু কোটরাগত অস্থিচর্ম্মসার জরাজীর্ণ এক অতি-বৃদ্ধ এক পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তখন তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোথা হ'তে আস্‌ছেন?"

বৃদ্ধ বলরামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "সে পরিচয়ে তোমার দরকার কি বাপু?"

বলরাম অতি বিনয় বচনে কহিলেন "দেখুন আমি কৃষ্ণ-হারা পথিক। সাধের বৃন্দাবনও হারায়েছি। যদি আপনি বৃন্দাবনের খোঁজ খবর জানেন তাহা হইলে বলিয়া দিয়া এ দাসকে

চিরকালের জন্য আপনার চরণের দাস করুন ?”

বৃদ্ধ কহিলেন “সেই বৃন্দাবন কি এখানে ? আমি ছেলে বেলায় বৃন্দাবন হ'তে বার হয়েছি, পথে আস্‌তে আস্‌তে বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছি। এখন উত্থান শক্তি রহিত হ'য়ে এই মরুভূমির মাঝে পড়ে রয়েছি।”

বলরাম কহিলেন “যদি সেই বৃন্দাবন আপনার জানা থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত গমন ক'রে—দেখাইয়া দিয়া কৃতার্থ করুন।”

বৃদ্ধ কহিলেন “তুমি ত আচ্ছা ছোক্‌রা হে। আমার দশা দেখ্‌তে পাচ্ছ না ? তোমার কি চোক্ কানা হয়ে গিয়েছে ? আমার যদি উত্থান শক্তি থাক্‌তো তা হলে তোমার মত ছোক্‌রার সঙ্গে লাফা লাফি ক'রে যেয়ে দেখাইয়ে দিয়ে আসতাম। এ দিক দিয়ে যাওনা বাবু! মাথার চুল পাক্‌লে বৃন্দাবনে পঁহুছিতে পারবে।”

বলরাম কহিলেন “দেখুন আমার দিক-ভ্রম বুদ্ধি-ভ্রম দুই হয়েচে কোন্ দিকে যাবো তার কিছুই নির্ণয় করিতে পারছিনে।”

বৃদ্ধ কহিলেন “যদি দিক নির্ণয় করিতে না পার—তবে আমার মত এই গাছ তলায় বসে হরিনাম জপ ক'র। আর আমাকে বকাইও না ! এখন আমি ইষ্ট নাম জপ করি। আমার সময় বনাইয়া আসিয়াছে।”

বলরাম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন “দেখুন ! যদি আপনাকে আমি কাঁধে ক'রে লয়ে যাই ; তাহা হলে আমার সঙ্গে গমন ক'রে বৃন্দাবনের রাস্তা দেখাইয়া দিতে পারেন ?”

বৃদ্ধ কহিলেন “হাঁ ! যদি আমাকে কাঁধে ক'রে লও তবে রাস্তা দেখাইয়া ল'য়ে যেতে পারি।”

বলরাম তখন বৃদ্ধকে কাঁধে করিলেন। যে সময় স্কন্ধে তুলিলেন তখন বৃদ্ধ তুলার ন্যায় ভারী হইলেন। খানিকদুর গমন করিয়া বৃদ্ধ ক্রমশঃ গুরুভার হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বিশ্বম্ভর হইয়া পড়িলেন। বলরাম বৃদ্ধকে একবার এ কাঁধে একবার ও কাঁধে করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহন করিতে না পারিয়া এক বৃক্ষের তলায় নামাইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিলেন “আর আমি আপনাকে বহন করিতে পারি না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখন একটু হাঁটিয়া চলুন—পরে আবার কাঁধে তুলিব।”

বৃদ্ধ রাগে গর গর হইয়া কহিলেন “তুমিত ভারি বদ ছোকরা হে ? যদি না পারিসে তবে আনিলে কেন ? আগে জানলে তোমার মত চক্ষলের সঙ্গে কখনই আস্‌তাম না।”

বলরাম বৃদ্ধের ক্রোধ উপশমিত করিবার

জন্য অতি বিনয় বচনে স্তব স্তুতি করতে লাগিলেন। অবশেষে বৃদ্ধের পদ ধরিলেন। তাহাতে বৃদ্ধের ক্রোধ প্রশমিত হইল। তখন বৃদ্ধ কহিলেন "যাও এই রাস্তা দিয়ে বরাবর উত্তর দিকে চ'লে যাও। দেখ যেন বেঁকা চোরা যেও না ? খাড়া সোজা চলে গেও। আর মাত্র পাঁচক্রোশ আছে ! এই পাঁচক্রোশ গমন ক'রে মরুভূমির পারে একটা ক্ষুদ্র নগর দেখ্‌তে পাবে। সেই নগরে একদল রাখাল বালক আছে। তাদের মধ্যে আবার একজন রাখাল রাজা আছে। তাহার নিকট বৃন্দাবনের কথা জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকে সঠিক খবর বলে দিবে।" বলরাম বৃদ্ধের উপদেশানুসারে তাহাকে অভিবাদন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মরুভূমির পারে একটী ক্ষুদ্র নগর স্থাপন করিয়া তাহার প্রবেশ রাস্তায় একটী ক্ষুদ্র মনোরম পুরী নির্ম্মাণ করিলেন, এবং একটী পরম রূপলাবণ্যবতী মনোহরা মায়া-কন্যা সৃজন করিয়া ঐ পুরীর ভিতরে রাখিলেন। ঐ কন্যার নাম রাখিলেন মৌরুবী। নিজে রাখাল রাজা সাজিয়া রাখালগণে বেষ্টিত হইয়া রাজদরবারে যাইয়া বসিলেন। এমন সময়ে বলরাম অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাখালগণ তাহাকে আগত দেখিয়া আদর অভ্যর্থনা করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রদান করিলেন এবং সুশীতল জল ও সুস্বাদু ফল মূল আনিয়া দিলেন। বলরাম তাঁহাদের অনুরোধে পদ প্রক্ষালন করিয়া সুস্বাদু ফল মূল ও সুশীতল জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

তখন এক রাখাল আসিয়া বলরামকে কহিলেন "তোমাকে যেন চিনি চিনি মনে করছি ! তুমি বৃন্দাবনের কৃষ্ণের ভাই বলরাম নও ? তোমার এ দুর্দ্দশা কেন ?" (ক্রমশঃ)

তোমরা।

(শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র)

কে তোমরা ভারতের প্রতি অন্তঃপুরে
বেঁধেছ হৃদয়-তন্ত্রী কি কোমল সুরে !
আদর্শের রক্ষয়িত্রী আছ চির দিন ?—
নিত্য-সেবা-পরায়ণা শ্রমবিন্দু ঝুরে.
শোধিবে কে তোমাদের এই পুণ্য ঋণ ?
দেহ-বোধ-বিরহিতা আছ হ'য়ে লীন ;

পলকে পলকে তনু করিতেছ ক্ষীণ,
পরিধানে একখানি শাড়ী আটপৌরে।
আমরা সগর্ব্বে ফিরি বিলাসী পুরুষ,
ঘরে আসি, গালি দেই, দেখাই পৌরুষ!

জগতের চক্ষে যারা সব-চেয়ে হেয়,
হে দেবি! তারাও তোমা হেলাভরে ছলে,
অকাতরে বিলাতেছ স্বাদু অন্ন পেয়,
বানর আমরা ফিরি মণিমালা গলে!

দুর্য্যোগে।

(শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস্ আলী)

দারুণ শীতের হিমেল হাওয়া,
বইছে তুমুল কাঁপিয়ে কায়া,
রোধ করেছে আলোক রেখা নিবিড় তুষার জালে।
নাইক তপন নাইক তারা,
আঁধার ভয়াল দুনিয়া সারা,
তোমার কথা পড়ল মনে এমন নিদেন কালে।
অধীর পরাণ গুমরে সারা,
দেখতে তোমায় পাগল পারা,
খুঁজব তোমায় কেমন করে জমাট মেঘের রাতে;

দূর সুদূরের অসীম রেখা,
পথটী কোথায় যায় না দেখা,
ব্যথার বারি ভরা আমার যুগল নয়ন তাতে;
বারেক তোমার রূপের আলো,
আমার গমন পথে জ্বালো,
ঘুচাও মম ব্যর্থ প্রাণের বেদন রোদন সারা;
সজল আমার নয়ন দু'টী,
পড়ুক তোমার চরণ লুঠি'
পরাণ মম মুক্তি লভুক ভাঙ্গি কঠিন কারা।

কোহিনুর বা ভারত-ভাগ্য

(শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-ডি)

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর উপকূলে গোলকুণ্ডা নামে এক অতি প্রাচীন নগর প্রতিষ্ঠিত আছে। মহামূল্য হীরকের আকর আছে বলিয়া এই প্রদেশ পুরাকালাবধি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কোহিনুর নামক অমূল্য হীরকখণ্ড এই দেশীয় আকর সম্ভূত এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই হীরকের মূল্য ৩৫০০০০০০ তিনকোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। প্রসিদ্ধ ফরাসী

বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়শিয়র ও দেপ্রেত্তর গভীর গবেষণায়, হীরক ও অঙ্গার একই পদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেও কোহিনুরের মূল্য অন্যরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। কোহিনুর অধিকারী "ভারতের রাজাধিরাজ" শব্দজ্ঞাপক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সুপ্রসিদ্ধ হীরকের আদি বৃত্তান্ত, ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায় অদ্যাপি তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে যে কৌস্তুভমণির প্রসঙ্গ আছে, অনেকে ইহাই সেই হীরকখণ্ড বলিয়া অনুমান করেন। *

শ্রীমদ্ভাগবতে যে স্যমন্তক উপাখ্যান বর্ণিত আছে তাহা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে এই স্যমন্তকই কোহিনুর। ভাগবত হইতে সংক্ষেপে স্যমন্তক ইতিহাস লিখিত হইল। ভগবান অংশুমালী প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া দ্বারকাবাসী নিজ শিষ্য সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণি দান করেন। সূর্য্যোপাসক সত্রাজিৎ কণ্ঠে সেই মণিরত্ন ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া দ্বারকা নগরী প্রবেশ করিলেন। পরে স্বীয় শোভনীয় হর্ম্মে প্রবেশ পূর্ব্বক বিপ্রগণ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করাইয়া দেবগৃহে মণি স্থাপন করিলেন। সেই অমল মণি পূজিত হইয়া যেস্থানে থাকিত সেই দেশে দুঃখের কারণ অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, অমঙ্গল, সর্প, আধি, ব্যাধি, চৌর্য্য, অশুভ ও মারী সকল থাকিতে পারিত না। দেবকীনন্দন একদা সত্রাজিৎ সমীপে, যদুরাজ উগ্রসেনের নিমিত্ত, ঐ মণি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃপণ-স্বভাব সত্রাজিৎ যদুরাজকে মণি প্রদান করেন নাই। জ্ঞাতিবিরোধভয়ে শ্রীকৃষ্ণও সেই রত্ন সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করেন নাই। প্রসেনজিৎ সত্রাজিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি একদিন ঐ মহাপ্রভমণি কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক, অশ্বে আরোহণ করিয়া, বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিলেন। সেই অরণ্যে এক কেশরী, অশ্বসহ প্রসেনকে বধ করিয়া মণিগ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইল। ঋক্ষরাজ জাম্বুবান মণি গ্রহণে অভিলাষী হইয়া ঐ কেশরীকে বধ করিলেন এবং বিলমধ্যে লইয়া গিয়া, সুকুমারক নামে নিজ সন্তানের ক্রীড়নক করিয়া দিলেন।

এদিকে ভ্রাতাকে দেখিতে না পাইয়া

* কৌস্তুভ বিবরণ—কৌস্তুভ সম্বন্ধে পৌরাণিক উপন্যাস এইরূপ বর্ণিত আছে যে পুরাকালে দেবতা ও দানবগণ যখন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করেন, তৎকালে সেই মহাসমুদ্র হইতে সূর্য্যসম তেজস্বী মহাপ্রভাবশালী, ত্রিজগৎ-প্রদীপ্তকারক, রত্নশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবগণ নারায়ণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেই মহারত্ন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভগবান নারায়ণই সেই কৌস্তুভমণি লাভ করিলেন।

সত্রাজিৎ তাপিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন "আমার ভ্রাতা গলদেশে মণি ধারণ করিয়া বনে গমন করিতেছিলেন ; নিশ্চয়, শ্রীকৃষ্ণই তাহাকে বধ করিয়া স্যমন্তক অপহরণ করিয়াছেন।" এইরূপ অপবাদ লোকসমাজেও শ্রুত হইতে লাগিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ণপরম্পরায় তাহা শ্রবণ করিলেন এবং নিজ কলঙ্কভঞ্জনার্থ নাগরিকগণের সহিত প্রসেনের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অরণ্যে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহারা কেশরী কর্ত্তৃক নিহত অশ্ব ও প্রসেনকে এবং তদনন্তর জাম্বুবান কর্ত্তৃক বিনষ্ট সেই কেশরীর মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। তথায় ঋক্ষরাজের ভয়ানক বিলও তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। শ্রীকৃষ্ণ বহির্দ্দেশে স্বীয় জনগণকে রক্ষা করিয়া একাকী সেই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। তথায় মণি লইয়া বালক ধাত্রীসহ ক্রীড়া করিতেছিল। রোরুদ্যমান সুকুমারককে শান্ত করিবার জন্য ধাত্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সান্ত্বনাবাদ শ্রবণ করিলেন "সুকুমারক, তুমি রোদন করিও না ; এক কেশরী প্রসেনজিৎকে বিনাশ করিয়া যে রত্ন গ্রহণ করে, তোমার পিতা ঋক্ষরাজ সেই সিংহকে বিনাশ করিয়া এই দুর্লভ রত্ন তোমাকে প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে এই রত্ন তোমার।" অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে তথায় সমাগত দেখিয়া ধাত্রী ভয়ে "রক্ষা কর—রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জাম্বুবান ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণ সহ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দুই জনের অতি তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। জাম্বুবান পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মণিসহ আপন কন্যা জাম্ববতীকে সমর্পণ করিল। যাদবগণ ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বিল হইতে নিষ্ক্রামণে বিলম্ব দেখিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক—"শ্রীকৃষ্ণ প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে" এইরূপ রটাইয়া দিল। কয়েক দিবস পরে গলদেশে মণিধারী হৃষিকেশকে জাম্ববতী সহ দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া সকলেরই মহা উল্লাস জন্মিল। অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে রাজাদিগের সমক্ষে সত্রাজিৎকে আহ্বান করিলেন এবং যেরূপে মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তৎসমস্তই বর্ণনা করিয়া, তাঁহাকে স্যমন্তক অর্পণ করিলেন, সত্রাজিৎ লজ্জিত হইয়া, অবনত মুখে রত্নগ্রহণ পূর্ব্বক নিজ অপরাধে অনুতপ্ত চিত্তে ভবনে গমন করিলেন। কি প্রকারে এই অপরাধ ক্ষালন করি, এই ভাবিয়া কেশবকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা নিজকন্যা সত্যভামা ও মণি উপহার দিলেন। ভগবান যথা-বিধানে সত্রাজিৎ-নন্দিনী সত্যভামাকে

বিবাহ করিলেন। কিন্তু মণি গ্রহণ করিলেন না। কৃষ্ণ বলিলেন "আপনি সূর্য্যের ভক্ত, মণি আপনারই থাকুক। আমরা ইহার ফল ভোগী হইব।"

অক্রুর, কৃতবর্ম্মা ও শতধনু প্রভৃতি যাদব-বীরগণ পূর্ব্বে সত্যভামাকে বিবাহার্থ সত্রাজিৎ-সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সত্যভামালাভে বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহারা সকলে সত্রাজিতের প্রতি বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জতুগৃহদাহ সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে পর পাপাচার শতধনু লোভ-নিবন্ধন নিদ্রাবস্থাতেই সত্রাজিতের প্রাণসংহার করিল ও মণি লইয়া প্রস্থান করিল। সত্যভামা পিতাকে নিহত দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং সত্বর রথারোহণে বারণাবতে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পিতার নিধন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভার্য্যা ও অগ্রজের সহিত হস্তিনা নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। দুরাচার শতধনু কাহারও সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া, অগত্যা অক্রুর সমীপে স্যমন্তক ন্যাসরূপে সমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তদনুগমন পূর্ব্বক পলায়নপর শতধনুকে মিথিলানগরে ধৃত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন, কিন্তু তাহার নিকট মণি পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণও অতঃপর দ্বারকাপুরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শতধনুনিধন ও মণির অপ্রাপ্তি সংবাদ প্রেয়সীকে বিজ্ঞাপন করিলেন। এদিকে শতধনুর মণিহরণ বিষয়ে প্রয়োজক অক্রুর ও কৃতবর্ম্মা তাহার বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে কৃষ্ণভয়ে দ্বারকা হইতে পলায়ন করিলেন। অক্রুর দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে পর তদ্দেশবাসীগণ সদাই শারীরিক, মানসিক, দৈবিক ও ভৌতিক নানাপ্রকার সন্তাপ ও অনিষ্টভোগ করিয়াছিল। অকস্মাৎ এইরূপ দৈববিড়ম্বনা উপস্থিত দেখিয়া যাদবগণ ইহার কারণ নির্ণয়ে অনুসন্ধিৎসু হইলেন। অন্ধক নামে একজন যদুবৃদ্ধ অক্রুরের পিতা শ্বফলক কাশীরাজ্যে কিরূপে অনাবৃষ্টি নিবারণ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন। শ্বফলক কাশীরাজদুহিতা গান্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন। গান্দিনী পরম পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। শ্বফলকের ঔরসে, গান্দিনীর গর্ভে অক্রুর জন্মগ্রহণ করেন। শ্বফলকের দৈববিড়ম্বনা নিবারণের যে ক্ষমতা ছিল সম্ভবতঃ অক্রুরও তাদৃশী ক্ষমতাপন্ন হইবেন। অতএব অক্রুরকে দ্বারকায় পুনরানয়ন করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বসম্মতিক্রমে অক্রুর দ্বারকায় পুনরাগমন করিলে সত্বরই অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত হইয়া গেল।

কৃষ্ণ স্যমন্তক প্রাপ্ত হয়েন নাই— এই সংবাদ

বলদেব অলীক মনে করিয়া ভ্রাতাকে ভৎর্সনা করিলেন ও রোষভরে বিদেহনগরীতে গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ দুর্য্যোধন এই সময় তাঁহার নিকট হইতে গদাযুদ্ধে পারদর্শিতা লাভ করেন। তিন বৎসর পরে কৃষ্ণের নির্দ্দোষিতা বুঝিতে পারিয়া বলভদ্র দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন কেশব বুঝিতে পারিলেন যে, অক্রূরের অনুপস্থিতিই এই সকল বিপদের কারণ নহে। মণির অপগমই ইহার কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনন্তর তিনি অক্রূরকে তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন. যথাবিধি সপর্য্যাপূর্ব্বক নানা মনোহর কথা কহিয়া তাঁহাকে সহাস্যবদনে কহিলেন "হে দানপতে! শতধন্বু তোমার নিকট স্যমন্তকমণি রক্ষা করিয়াছে। সত্রাজিৎ নিঃসন্তান। অতএব তদীয় দৌহিত্রই মণির প্রকৃত অধিকারী। কারণ যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষকে শেষ ঋণ হইতে মুক্ত ও তাঁহাকে জলপিণ্ড প্রদান করে, শাস্ত্রানুসারে সেই দায়গ্রহণের যোগ্যপাত্র। কিন্তু সে মণি ধারণ করা অন্যের দুষ্কর! অতএব উহা তোমার নিকটেই থাকুক। তুমি সুব্রত, কিন্তু মণির বিষয় আমার অগ্রজও আমাকে বিশ্বাস করিতেছেন না। অতএব তুমি তাহা অন্ততঃ একবার আমাকে দেখাইয়া বন্ধুগণের শান্তিবিধান কর।" এই প্রকারে প্রবোধিত হইয়া অক্রূর বসনাবৃত সূর্য্যপ্রভ স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ করিলেন। কেশব জ্ঞাতিদিগকে সেই মণি দেখাইয়া, মণিহরণরূপ আত্মকলঙ্ক ক্ষালনপূর্ব্বক অক্রূর হস্তে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বেলা।

(শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

(১)

আমি আমাদের বসৎবাটী হইতে কলিকাতার কলেজে পড়িতে যাই। মেসে বা হোস্‌টেলে আমার থাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। আমি বিবাহিত। আমার খরস্রোতঃ-পরিপুষ্ট-জীবন-নদে যৌবন জোয়ারের উদ্দামতা সবে মাত্র প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু ইতোপূর্ব্বেই এক কিশোরী আসিয়া তাহার বুকভরা ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া এই নদের দুই কূল কলিকাতার গঙ্গার মত পোক্ত ভাবে বাঁধিতেছিল,—যেন যৌবনের চাঞ্চল্য উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিপথগামী না হয় একারণ একটা নির্দ্দিষ্ট পথে বহাইতে চায়,—যেন সে আমার জীবনকে তাহার—কেবল তাহারই—প্রেম নদীতে পরিণত করিতে চায়। সে চায়,

আমি চাই, সকল মানুষই চায় ; কিন্তু সকলকার সব চাওয়া কি পাওয়া যায় ? না তা যায় না। যায় না বলিয়াই চাওয়ার আগ্রহ মানুষের এত বেশী,—আর পাওয়াতেই এত সুখ। যাক্ সে কথা।

আমি কলেজে যাই, ঘরে আসি। আসিয়া মানস প্রতিমার মুখখানি দেখিয়া তৃপ্ত হই—বড় তৃপ্ত হই। আমি তাকে ভালবাসি, সে আমায় ভালবাসে,—এ এক মজার কথা। সে আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে তাহার নিজস্ব করিতে চায়, আমি তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে আমার নিজস্ব করিতে চাই। একে অন্যের নিকট অমূল্য নিধি। এ উহাকে আগ্‌লাইয়া রাখিতে চায়। হায়! এই আগ্‌লা আগ্‌লির মধ্যেও কখন যে চোর আসিয়া সিঁদ কাটিয়া ঢুকিয়া উভয়ের আকাঙ্খিত রত্নের খানিকটা অথবা সবটা চুরি করিয়া লইতে পারে একথা সেই প্রথম প্রণয়ের গোলাপী নেশার সময়ে আদৌ মনে হয় না। নেশা যতক্ষণ ফিকে থাকে, কোনও একটা বিশিষ্ট বস্তুগত বা ভাবগত থাকে ততক্ষণ সে ভয়ঙ্করী ; পরন্তু, ভরপূর নেশায় মস্‌গুল হইতে পারিলে আর কোনও বালাই থাকে না। সে নেশা স্বীয় অগাধ আনন্দে ভলাইয়া গিয়া আত্মহারা হইয়া থাকে। ইহাই তাহার সুখ, ইহাই তাহার আকাঙ্খা, ইহাই তাহার জীবন। তখন তাহার কোন চাওয়া কোন পাওয়া থাকে না। দেওয়াই তখন তাহার স্বাভাবিকী বৃত্তি। কিন্তু এত কথায় আমার প্রয়োজন কি ?

একদিন কলেজে যাইয়া দেখিলাম, নোটিশ বোর্ডের নিকট অনেক ছাত্র ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা ঠেলা ঠেলি করিয়া নেঙচাইয়া, গলা বাড়াইয়া কি দেখিতেছে। আমারও কৌতুহল হইল। আমিও তথায় অগ্রসর হইয়া ঠেলাঠেলি করিতে পথ করিয়া লইযা ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য, তখন আমার শরীরে বেশ শক্তি সামর্থ্য ছিল। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, আমি একটা ডানপিটে গুণ্ডা গোচের ছিলাম। সম্মুখে দেওয়ালে প্রলম্বিত কাগজের পটি লাগান কাল নোটিশ বোর্ডের উপর নজর পড়িল। তাহাতে যাহা লেখাছিল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই ; গ্রীষ্মাবকাশ আগত প্রায় ; অতএব ছাত্রমণ্ডলীকে হাল মাসের ও ছুটীর মাসের মাহিয়ানা এক সঙ্গে জমা দিতে হইবে। দুই মাসের মাহিয়ানা একেবারে বাহির করাটা যে ছাত্রমণ্ডলীর একটা আগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছে তাহা নহে, বরং বিগ্রহ আনিবারই কথা—অন্ততঃ ছাত্রদিগের অভিভাবকগণের পক্ষে তো বটেই।

ঐ যে গ্রীষ্মাবকাশ আগতপ্রায়, এই কথাটাই তাহাদের আনন্দের কারণ। আনন্দের কথা হইতে পারে, এত ঠেলাঠেলি কেন?

যখন আমরা প্রত্যহ নিয়মিত পরিশ্রম করি তখন মনে হয় একটা দীর্ঘ অবকাশ না পাইলে বুঝি জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে, এক ঘেয়ে জীবন স্রোতকে ফিরাইয়া মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য নূতন ধরণের কিছুতে বহাইতে পারিলে তবে জীবনীশক্তির স্ফুরণ হয়। তাই ছুটির কথা বড় ভাল লাগে। ছুটি পাইবার পূর্ব্বে ভাবি, এবার ছুটিতে কত কি করিব, কত স্থানে যাইব, কত নূতন নূতন গ্রন্থ পাঠ করিব। বলিতে কি,—নোটিশ পড়িয়া আমার মনে ছুটি পাইবার আনন্দ তো হইয়াছিল, তাহার উপর আর একটা আনন্দে আমার মন দুলিয়া দুলিয়া উঠিয়াছিল। সেটা এই চিন্তা যে, এই দীর্ঘাবকাশের দীর্ঘ দিনগুলি আমার কলেজের পাঠপরীক্ষাচিন্তামুক্ত স্বচ্ছন্দ মনে অক্রূর সঙ্গে প্রেমালাপ করিবার কেমন সুবর্ণ সুযোগই না দান করিবে? কিন্তু দেখা যায়, ছুটি হইবে এই আশাটাই ভাল। ছুটি হইল, আমার সমস্ত কল্পনা যল্পনা ওলটপালট হইয়া গেল। নূতন কিছু হওয়া দূরে থাক পুরাণ যাহা কিছু ছিল তাহাও অব্যবহারে নষ্ট হইতে বসিল। ছুটির দিন গুলা কোন দিক দিয়া অলস ভাবে কেমন করিয়া কাটিয়া যায় তাহা জানা গেল না। জানা গেল কেবল আর অল্প দিনের মধ্যেই ছুটি ফুরাইবে। তখন স্তূপীকৃত বাকী কাজের কথা মনে পড়ে। প্রাণটা খারাপ হইয়া যায়। কাজে মনও লাগে না, অথচ আকুলি বিকুলি বাড়ে।

মায়ামুগ্ধ জীব সংসারে থাকিয়া দেখে, ঠেকে, শেখে, পরীক্ষা দেয়। কেবল চায়—কেবল উপরে উঠিতে চায়—কেবল নূতন চায়। যাহা পাওয়া হয় নাই তাহা পাইবার জন্য ঠেলাঠেলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। মনে করে, তাহা পাইলেই বুঝি তাহার সব হইবে, চতুর্ব্বর্গ লাভ হইবে, আশা মিটিবে। ভগবৎকৃপায় যখন তাহা পাওয়া গেল, তখন আর তাহার প্রকৃত ব্যবহার করা হইল না! পাইতেই তাহার নবীনত্বের আকর্ষণ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া লোপ পাইল, কাজেই তাহাতেও মন ওঠে না, আশা মেটে না! মন তখন আকুলি বিকুলি করিয়া পুরাতনকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়; কিন্তু তখন আর তাহাও পাওয়া যায় না। এমদবস্থায় আবার নূতন চাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং কেবল নূতন চাই। অনবরত চাওয়া, পাওয়া, অতৃপ্ত হওয়া। শেষে তাই বুঝি মন যাইবার সময় "ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়

সব পাওয়া সব চাওয়া?" যাক্। আমার নগণ্য জীবনের একটা ছোট ঘটনা বলিতে গিয়া কি বলিয়া চলিয়াছি—।

হাঁ, মনে পড়িয়াছে। নোটিশ পাঠ করিয়া মনের আনন্দে ফিরিলাম। আমার সাধের অঙ্কুর মুখ কল্পনায় মনে করিতে করিতে ফিরিলাম। অবশ্য যেমন করিয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়াছিলাম সেই রকম বা তদপেক্ষাও কিছু বেশী রকম ঠেলাঠেলি করিতে করিতে ফিরিতে হঠাৎ আমার সহাধ্যায়িনী এক বর্ম্মা যুবতীর উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। সে ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া বিধিমত চেষ্টা করিয়াও বাহির হইতে পারিতেছে না। তাহার যৌবনের ভরা গাল রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। দেহলতা কোমল হইলেও শক্তিহীনা নহে ইহা তাহার বাহির হইবার প্রচেষ্টা দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। কিন্তু যুবকগণ যেন ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে,—বাহির হইতে দিবে না। রমণীকে লইয়া প্রকাশ্যভাবে এরূপ উৎকট তামাসা করায় কিরূপ রসিকতা প্রকাশ পায় তাহা আমার বোধগম্য হয় না, বরং এ ব্যাপার যে সাতিশয় অভদ্রতার পরিচায়ক ইহাই মনে হয়। আমার কি মনে হয় না হয় তাহাতে আর পাঁচজনের কি যায় আসে। তাহারা যাহা করিতেছে তাহা করিবেই। এখন বুঝিলাম এত ঠেলাঠেলি কেন?

যুবকেরা রসিকতার লীলা তেমনি চালাইতেছিল। আমি বদ্‌রসিকের মত জোর করিয়া ভিড় ঠেলিয়া রমণীর কাছে গেলাম এবং তাহার হাত ধরিয়া তেমনি সদর্পে তাহাকে ভিড়ের বাহিরে আনিলাম। রসিক দলের রসভঙ্গ হইল দেখিয়া তাহারা আমার উপর বোধহয় বিরূপ হইল। দু' একটা তীব্র উপহাস করিয়া তাহারা আমার উপর শোধ লইল। তাহাদের অপেক্ষা আমার শক্তি অধিক হইবার পরিচয় পাইয়া হয়ত তীব্রতর প্রতিশোধ লইতে ভরসা না করিয়া তথা হইতে অন্যত্র সরিয়া পড়িল। বর্ম্মা যুবতী তৎপূর্ব্বেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। পরে দেখিলাম, সে অফিস ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া অনুচ্চস্বরে বড় কেরাণীবাবুকে কি বলিতেছে। যাহা ইচ্ছা বলুক। আমি কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া ক্লাশের মধ্যে চলিয়া গেলাম।

(আগামী বারে সমাপ্য)

সমালোচনা।

সাকী—শ্রীউমাশশী কুমার প্রণীত একখানি ছোট গল্পের বই। আমাদের বইখানি বেশ লাগিল। ভাষা বেশ ঝরঝরে, কোথাও আড়ষ্ট নহে। প্লটেও কিছু শিখিবার জিনিষ আছে। দাম মাত্র বার আনা।
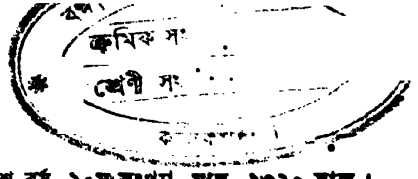
যাত্রী।

(শেখ মোহাম্মাদ ইদ্‌রিস্‌ আলি)

অমল-শীতল জলে,
চলেছে তরণী ভাসিয়া,
সুনীল গগন তলে,
চন্দ্রমা অধীর হাসিয়া,
সুধীরে বহিছে সমীর মন্দ,
লয়ে কুসুমের মধুর গন্ধ,
ওগো কাণ্ডারী! ওগো প্রাণহারী!
দাওনা গো পাল তুলিয়া।

নৃত্য-বিভঙ্গ তটিনী,
উচ্ছ্বাসময়ী বেলা,
প্রতিভা-দীপ্তা-যামিনী,
বিমল জ্যোৎস্না-মেলা,
তারায় তারায় সুধা অফুরান,
মন্দ তরঙ্গে ভাসে কলগান,
ওগো প্রাণবধু! ঢাল ঢাল মধু,
চলগো তরণী বাহিয়া।

রস-উছলিতা নিশি,
সুষমা-ভাসিত বিশ্ব,
পুলক-পূরিতা দিশি,
প্রাণ-আকুলিত দৃশ্য,
অনিলে সলিলে মোহন ছন্দ,
স্বভাবের গায় শত আনন্দ,
এ সুখের রাতি, প্রণয়ের বাতি,
দাও গো হৃদয়ে জ্বালিয়া।

প্রকৃতি মধুরে হাসিছে,
পাপিয়া আকুল গাহিয়া,
তরণী তরঙ্গে নাচিছে,
আলোক মালিকা পরিয়া,
নিখিলের এই বিকাশ ধরায়,
যতনে জড়ায়ে হিয়ায় হিয়ায়,
আলোকের দেশে, পুলকেতে ভেসে,
চলগো কাণ্ডারী হাসিয়া।

বাঙ্গালার প্রাণ-কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ।

অরে অরে বঙ্গ-অঙ্গ নিত্য জলে যায়,
ম্যালেরিয়া-বিভীষিকা দেশ জুড়ে হায়!
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কুষ্ঠ, ডেঙ্গু কেহ নহে কম,
কলেরা, বসন্ত, প্লেগ্ রূপে আছে যম।
রোগে-শোকে স্বর্গ-ভূমি শ্মশান-অঙ্গার,
বুকভাঙ্গা দুঃখ-দৈন্যে করে হাহাকার।
প্রাণাধিক প্রাণপ্রিয় দয়িতা-নন্দন,
ক্ষুধার জ্বালায় হেথা কাঁদে অনুক্ষণ।
দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ পল্লী সদা ম্রিয়মান,
অন্নজলহীন হায় যেন প্রেত-স্থান।

বঙ্গের জন্ম-মৃত্যু-সংখ্যা-রহস্য যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়, বিস্ময় ও যারপর নাই দুঃখজনক। শুধু যে বঙ্গের ½ শিশুই সূতিকা-গৃহে কাল-কবলিত হয়, তাহা নহে; অর্দ্ধাংশ আবার ৮ বৎসর বয়স মধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ করে। বঙ্গীয় হিন্দু-মহিলাগণ ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স মধ্যে ½ এবং ৪৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স মধ্যে ¾ বিধবা হইয়া থাকেন। এদেশে সাধারণতঃ হিন্দু পতি-পত্নীর বয়সের ৫ হইতে ১০ বৎসর পার্থক্য হইয়া থাকে; অর্থাৎ স্ত্রী অপেক্ষা স্বামী ৫ হইতে ১০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়া থাকে; সুতরাং হিন্দু-পুরুষের ½ অংশ ৩৬ হইতে ৪০ বৎসর এবং ¾ অংশ ৫০ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স মধ্যেই পরলোকগত হয়।

আমরা "এডুকেশন গেজেটের" সংখ্যা নির্দ্ধারণ হইতে উক্ত সংখ্যা নির্ণয় করিলাম। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঐ হিসাব ঠিক নহে, উহাতে ৪৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের বিধবা ¾ স্থলে ৩৫ হইতে ৪০ বৎসরের বিধবা ¾ হওয়াই যেন সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। অন্যথা মধ্যের ৩৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের নারীগণ আদৌ বিধবা হইয়া থাকেন না বলিয়া ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে। উক্ত বয়সের রমণীগণ আদৌ বিধবা হইয়া থাকেন না, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং দেখা যায় যে, হিন্দু পুরুষগণের ½ অংশ ৩০ হইতে ৪০ বৎসর এবং ¾ অংশ ৪০ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স মধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া থাকে। ইহাতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দুই মৃত্যু-পতির

শ্রেষ্ঠতম প্রীতিভাজন; অন্যথা বঙ্গীয় হিন্দুর বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে মরিবার ক্ষমতা এত অধিক হইবে কেন?

বঙ্গে নর অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কম হইয়া পড়িয়াছে; প্রতি সহস্র পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯ শত ৩২ জন মাত্র। প্রজনন বা সৃষ্টি-তত্ত্ব হিসাবে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-সংখ্যা-হ্রাস পাওয়া শুভ লক্ষণ নহে। তাহাতে লোক সংখ্যা হ্রাস ও জাতির ধ্বংস-পথে অগ্রসর-বার্ত্তাই সূচিত হইয়া থাকে। ধ্বংসোন্মুখ সুধী-বাঙ্গালী হিন্দু-গণ বিষয়টা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? মৃত্যু শিরে দণ্ডায়মান, এ সময় সুখ-নিদ্রার শুভকাল নহে।

এই প্রেত-ভূমি রোগ-শোকের আকর বাঙ্গালাকে আবার স্বাস্থ্যনিবাসে অকাল-মৃত্যু-হীন নীরোগ সুখ-শান্তিপূর্ণ স্বর্গধামে পরিণত করিতে প্রচেষ্টা করিতে হইবে। 'সাধনায় সিদ্ধি।' বাঙ্গালী সে সাধনায় এত পশ্চাৎপদ কেন? আপন আপন স্বাস্থ্য-সুখ বর্দ্ধন ও জীবন-রক্ষার প্রচেষ্টায় এত অমনোযোগ—এত উপেক্ষা কেন? শিক্ষার অভাবই আমাদের এ অধোগতির—এ অশান্তি দুর্গতির—এ অকাল-মৃত্যুর প্রধানতম কারণ নহে কি?

এ দেশের শতকরা ৫ জন মাত্র লিখা-পড়া জানে; যারা কোনরূপে স্বীয় নামটী লিখিতে পারে, তারাও এই শিক্ষিতের (?) তালিকা-ভুক্ত! বাকী ৯৫ জন নিরক্ষর—মূর্খ। আর পৃথিবীর অন্যত্র বহু উন্নত স্থান সমূহে শতকরা ৯৫ জনই সুশিক্ষিত; ৫ জন মাত্র অশিক্ষিত। আমাদের বার্ষিক আয় জন প্রতি ২৭৲ টাকা—মাসে ২।০ মাত্র। পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য্যশালী দেশ সমূহের তুলনায় এ আয় অতি নগণ্য। দরিদ্র আমরা—অনশনে মরিব, তাহাতে বিচিত্র কি? তাই আমাদের—

"পাঁজর ভাঙ্গিয়া নিশি দিনমান বহিছে দীর্ঘশ্বাস
নাহিক একটুকু সুখ।"

অভিজ্ঞের মতে দৈন্যই আমাদের এ অকাল-মৃত্যুর কারণ—অন্ন-বস্ত্রের অভাবই আমাদের এ জাতীয় ধ্বংস-যজ্ঞের নিদান। আমাদের গৃহে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, মাথায় তৈল নাই, পিপাসার জল নাই, রোগে ঔষধ-পথ্য নাই,—ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইনটুকু পর্য্যন্ত নাই! অনন্ত অভাবের তীব্র তাড়নায় আমাদের গৃহসুখ অন্তর্হিত হইয়াছে! কঠোর জীবন-সংগ্রামে পড়িয়া আমরা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি! সময় পাইয়া মৃত্যুর অগ্রদূত জ্বর, ওলাওঠা, প্লেগ, বসন্ত ও ইনফ্লুয়েঞ্জা যেন পূর্ণ বিক্রমে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তাহাদের

চির সহচর মহামারীকে সাদরে আহ্বান করিতেছে।

এই যে আমাদের দরিদ্র নারায়ণেরা ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, রোগে ঔষধ পথ্য পায় না, এই যে সর্ব্বব্যাপী ম্যালেরিয়া, এই যে অসুখ অশান্তি, এই যে নানা ব্যাধির অত্যাচারে বঙ্গ-গৃহ শ্মশানে পরিণত হইতেছে, ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই?—ইহা কি এদেশ হইতে বিদূরিত করা যায় না?

ইহা আমাদের অদৃষ্টলিপি নহে; ভাগ্য দেবতার নিষ্ঠুর অভিশাপ নহে। ইহা আমাদের আত্মকর্ম্মফল। ইহা বাঙ্গালীর আত্মজ্ঞানের অভাব জনিত ভাগ্যলক্ষ্মীর ভীষণ পরিহাস! বিষম অভাব অশান্তিতে আমরা নিয়ত শিহরিয়া উঠিতেছি—চীৎকার করিতেছি, হাহাকার করিতেছি, অদৃষ্টকে ধিক্কার করিতেছি, কিন্তু প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছি কি?

জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার প্রচেষ্টা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক। বনের পশু পক্ষী, ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নিজ-প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সদা যত্নশীল। তবে মানুষ আমরা এত অলস অকর্ম্মণ্য ও উদাসিন কেন? আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার সে প্রচেষ্টার এত অভাব কেন?—আমরা জীবন্মৃতের ন্যায় জীবন ধারণ করি কেন? ছিঃ! আমরাই না মানুষ!

ঘোর দৈন্য, শিক্ষার অভাব। আমরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানি না, ভাল-মন্দ জানি না! আমরা অনশনে-অর্দ্ধাশনে বা কুখাদ্য ভক্ষণে জীবন পাত করিব, অথচ মামলা-মোকদ্দমায় সর্ব্বস্ব উড়াইব! আমরা রোগীর মুখে ঔষধ পথ্য তুলিয়া দিতে—জীবিতের দেহ রক্ষার জন্য পুষ্টিকর সুপথ্য সংগ্রহে অসমর্থ; কিন্তু মৃতের শ্রাদ্ধে ভূরি ভোজের অনুষ্ঠান না করিলে—বিবাহোৎসবে মুক্ত হাত না হইলে, আমাদের অধর্ম্ম হইবে—অপযশ হইবে। আমরা বিদেশী বস্ত্রের প্রতীক্ষায় নগ্ন থাকিব, বিদেশী উগ্রবীর্য্য ঔষধ পথ্যের জন্য শোনিত তুল্য অর্থরাশি ব্যয় করিব, অথচ ঘরে তাঁত করিব না, বাটীতে তুলা গাছ বপন করিব না, চরকা কাটিব না—স্বদেশ-জাত দ্রব্যের ও ঔষধ পথ্যের প্রতি আদর যত্ন করিব না। আমরা আহারে বিহারে ঘোর অনাচারী হইব, আর ব্যায়ামে ও ব্রহ্মচর্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিব! ইহাই কি জীবন্ত জাতির লক্ষণ?—এযে দ্রুত ধ্বংসশীল মৃতজাতির শ্মশান-পথ।

আমদের ঘোর অদৃষ্টবাদ—বিষম অলসতা ও লজ্জাজনক কুসংস্কার সমূহ দূর করিয়া আত্মশক্তিকেই দুঃখ-মুক্তির — আত্মমঙ্গলের উপায় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতে না পারিলে,

আমাদের সকল শক্তি—ষোল আনা মনটাই এই দুঃখ-দুর্ব্বিপাক দূর করিবার জন্য প্রয়োগ না করিলে, বাঁচিয়া থাকাটাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন বলিয়া না বুঝিতে পারিলে আর উপায় নাই।

আমাদিগকে হিন্দু-মুসলমানে, বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলিয়া সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মীর মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন—প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে; 'রামা খুড়া' ও 'করিম চাচা' কে দুই ভ্রাতার মতই মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে; সুখে-দুঃখে একে অন্যের দারস্থ হইতে—সহায় হইতে—আত্মমঙ্গল চিন্তা করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্যে, ধর্ম্মে, ও প্রাত্যহিক ব্যবহারিক কর্ম্মে এই জাতীয় মহামিলনের পুণ্য-প্রভাব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

উত্তিষ্ঠ! উঠ, জাগ; উঠ হিন্দু!—উঠ, ভাই মুসলমান! সত্বর উঠ। ঐ দেখ, সম্মুখে মহাকালের বিজয় বিষাণ কি ভীষণরবে বাজিতেছে। উঠ, অগ্রসর হও, এবার তোমাদিগকে মৃত্যুকে পরাভব করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে হইবে। ঐ দেখ, সম্মুখে মৃত্যুর অগ্রদূত জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কেমন সদর্পে আস্ফালন—মহা বিক্রম প্রকাশ করিতেছে! উহাদিগকে পরাভব করিতে—রোগ শক্তির মূলাধার দৈন্যকে দূর করিতে না পারিলে আমাদের আর বাঁচিয়া থাকিবার উপায় নাই।

উঠ, জাগ, সুপ্তসিংহ ঘুমিও না আর,
ঐ দেখ, মহাকাল সম্মুখে তোমার!
বাজিছে মৃত্যুর মহা ভীষণ বিষাণ,
অচিরে বাঙ্গালী-গৃহ হইবে শ্মশান!

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

(৩৬)

ক্রমেই সুরেশের জ্বর বাড়িয়া গিয়া বিকারে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বিকারের ঝোঁকে অচেতন হইয়া যখন সে ক্রমাগত অশ্রুর নাম করিতে লাগিল তখন হঠাৎ এ জ্বরের কারণ বুঝিতে সাবিত্রীর বাকী রহিল না। আরও পরিষ্কার

করিয়া বুঝিল তখন যখন সে রামটহলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে সেই মধ্য অশ্রেবার পূর্ব্বদিন যমুনার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ সুরেশ অশ্রুকে দেখিতে পাইয়াছিল। কৌতুহল পরবশ হইয়া সাবিত্রী এইটুকুও জিজ্ঞাসা করিয়া লইল অশ্রু সুরেশকে দেখিতে পাইয়াছিল কিনা। রামটহল বলিল অশ্রু দেখিতে পায় নাই। সুরেশকে দেখিবার সুযোগ হইবার আগেই সে একটী বাটীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিল এবং সেটাই যে অশ্রুর বাটী রামটহল সুরেশের আদেশে ইহাও জানিয়া লইয়াছিল। এসব শুনিয়া সাবিত্রী একটু গম্ভীর হইয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া রামটহলকে বলিল, "আমায় তো কিছু বলনি রমটহল! বাবু তোমায় মানা ক'রে দিছলেন বুঝি?" মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে রামটহল উত্তর করিল, "জি হাঁ।"

রমটহলের কথা শুনিয়া সাবিত্রীর আপাদ-মস্তক প্রথমটা রাগে এবং ঈর্ষায় জলিয়া উঠিল; পরক্ষণেই কিসের আশঙ্কায় থর থর কবিয়া কাঁপিয়া উঠিল—মনে হইল তাহার পায়ের নীচে হইতে যেন মাটী সরিয়া যাইতেছে, সমস্ত বাড়ীখানাই যেন ঘুরিতেছে। প্রথম উদ্বেগটা কাটিয়া গেলে সাবিত্রী কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া, অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া, সুরেশের মাথার কাছে আসিয়া বসিল।

সুরেশ বলিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" সহজস্বরে সাবিত্রী বলিবার চেষ্টা করিল, "একটু বাইরে গিছ্‌লুম। এখন কেমন আছ?"

"ভালই আছি"। সাবিত্রীর জবা ফুলের মত রাঙা চোখ দুটো দেখিয়া বলিল, "কাঁদছিলে সাবিত্রী? আমার জন্যে?" সাবিত্রী আরও আত্মদমন করিয়া বলিল, "কৈ না। একবার ডাক্তার বাবুর বাড়ী খবর দেব?" একটু হাসিয়া সুরেশ বলিল, "না, না, সে ভদ্দর লোককে বার বার বিরক্ত কোরো না। ভয় কি সাবিত্রী? আমি দু একদিনের ভেতরেই সেরে উঠবো।" সাবিত্রীর একটী হাত নিজের হাতের ভিতর লইয়া সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী বলিল, "দেশে একটা তার ক'রে দেব?" সুরেশ বলিল, "যোগেশ কাকার কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"পাগল হ'য়চ সাবিত্রী। তিনি এসে কি করবেন? তিনি কি তোমার চেয়ে বেশী ক'রে

আমার সেবা সুশ্রুষা কত্তে পারবেন ?"

"তবুও তিনি এলে একটা ভরসা হয়। আমার একলা কেমন কেমন যেন ঠেকচে।"

"কারুর এসে কায নেই সাবিত্রী। তুমি শুধু আমার কাছে ব'সে থাক তাহ'লেই আমি সেরে উঠবো।"

সুরেশ আর কিছু বলিল না। সাবিত্রী ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সুরেশ ঘুমাইয়া পড়িল। একই ভাবে সাবিত্রী তাহার মাথার কাছে বসিয়া রহিল।

সাবিত্রী ভাবিতে লাগিল ঠিক যে ভয়টা সে করিয়াছিল তাহাই হইল। যে প্রভাব হইতে সুরেশকে বাঁচাইবার জন্য প্রয়াগ হইতে পলাইয়া আসিল এখানে আসিয়াও তাহার হাত এড়াইতে পারিল না। যে অমূল্য জিনিসটিকে সে অন্তরের অন্তস্থলে মধ্যতম প্রদেশে এত যত্নে, এত কষ্টে রাখিয়া দিয়াছিল, সেটাকে যেন কে তাহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইবার জন্য তাহার পিছনে পিছনে আজ কয়েক বৎসর হইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাবিত্রীর আহারে সুখ নাই, নিদ্রায় তৃপ্তি নাই, জীবনে শান্তি নাই। সদাই ভয় ঐ বুঝি কে হৃদয়ের দ্বার জোর করিয়া খুলিয়া মহামূল্য দ্রব্যটীকে লইয়া পলাইয়া গেল। সেও সেটাকে যেন লইয়া তবে ছাড়িবে এবং সাবিত্রীও কিছুতেই তাহা দিবে না। মাঝখানে পড়িয়া বেচারা সুরেশেরই প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে।

সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিল কতকটা নিজের দুরদৃষ্টের দরুণ এবং কতকটা সুরেশের অবস্থা বুঝিয়া। সে বেচারা অশ্রুকেও ভুলিতে পারিতেছে না, আবার সাবিত্রীকেও তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে একেবারেই ইচ্ছুক নহে। শুধু অধিকারের খাতিরে নহে। তাহার ভিতর একটু ভালবাসা, একটু স্নেহও আসিয়া পড়িয়াছিল। অশ্রুকে মনে পড়িলেই সাবিত্রীর জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত, আবার সাবিত্রীকে দেখিলেই হাজার ভুলিবার চেষ্টা করিলেও অশ্রুকে মনে পড়িয়া যাইত। তুফানের মধ্যে মাঝ দরিয়ায় দুই নৌকাতে পা দিয়া সুরেশ যেন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সাবিত্রী সুরেশের এ মনের ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু কোন পথ অবলম্বন করিতে পারিলে সুরেশকে প্রাণে বাঁচাইতে পারিবে ইহার কিছুই সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সুরেশের মলিন মুখের দিকে চাহিয়া সাবিত্রী শুধু ইহাই ভাবিতেছিল এবং চক্ষের

জলে নিজের দেহ ভিজাইতেছিল।

রাত্রে সুরেশের আবার বিকারের লক্ষণ দেখা দিল, আবার সে জ্বরের আধিক্য হেতু প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। নিরুপায় হইয়া সাবিত্রী শুধু ভগবানকে ডাকিতে লাগিল এবং সুরেশের মাথায় বরফ দিতে লাগিল।

সুরেশ একবার বলিয়া উঠিল, "অশ্রু, অশ্রু, আর আমায় ছেড়ে যেও না। দোহাই তোমার। অনেক কষ্ট দিয়েচ, অনেক কাঁদিয়েচ; আর যেন চ'লে যেও না, নিষ্ঠুরের মত আমায় ফেলে যেও না। তাহ'লে বাঁচবো না, নিশ্চয়ই ম'রে যাব।"

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সাবিত্রী বলিল, "অমনধারা কচ্চ কেন? বড্ড কি কষ্ট হ'চ্চে?" প্রলাপের ঝোঁকেই চোখ চাহিয়া সুরেশ বলিল, "কে? অশ্রু এসেচ? ব'স ব'স আমার কাছে ব'স। একটুখানি ব'স। আঃ, কি সুন্দর, কি ঠাণ্ডা তোমার হাত।" সাবিত্রী বলিল, "আমি আমি সাবিত্রী। দেখ্‌তে পাচ্চ না।" অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় সাবিত্রীর নাম শুনিয়া সুরেশ তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "দূর হ'য়ে যাও আমার সামনে থেকে। তুমিই তো আমার সর্ব্বনাশ ক'রেচ। তোমার জন্যেই তো আমি অশ্রুকে পাইনি। তোমার জন্যেই তো সে দেশ-ত্যাগী হ'য়েচে।" কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিল, "আমার অশ্রুকে এনে দাও। সে না এলে আমি বাঁচতে পারবো না। সে না হ'লে কেউ আমায় ভাল কত্তে পারবে না। নইলে আমি ম'রে যাব। আর আমি বাঁচবো না।" সাবিত্রী মাথায় বরফজল দিতে দিতে বলিল, "অমনধারা ক'চ্চ কেন? একটু স্থির হও।" সুরেশ আপনার মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল, "সাবিত্রীকে আমি কখন ভালবাসিনি, কখন ভালবাসতে পারব না। সেই আমার অশান্তির কারণ। সেই অশ্রুকে মেরে ফেলেচে। উঃ সাবিত্রী! সাবিত্রী!—না, না, বেচারা সে, দুঃখী সে, তার দোষ কি! সব দোষ আমার। আমি তাকেও পথে বসিয়েচি, অশ্রুরও সর্ব্বনাশ করেচি।"

সাবিত্রী দেখিল, সুরেশের দুই চক্ষু দিয়া অজস্র ধারায় জল গড়াইয়া পড়িল। নিজের অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া সাবিত্রী বলিল, "একটু চুপ কর। অত বক্‌লে আরও শরীর খারাপ হবে।" সুরেশ তখনও অচেতন ছিল, বলিয়া উঠিল, "অশ্রু, অশ্রু, তুমি এসেচ এমনি করেই মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, এমনি ক'রেই জড়িয়ে ধ'রে থাক।"

"আমি সাবিত্রী। দিদি তো এখানে নেই।"

আবার সুরেশ বলিল,—"তুমি না হ'লে আমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না অশ্রু। সাবিত্রী আমায় মেরে ফেল্‌বে। উঃ অশ্রু, অশ্রু, কেন তুমি আমায় ছেড়ে চ'লে গেলে? কেন আর ফিরে এলে না? তোমায় যে আমি বড্ড ভালবেসেছিলুম অশ্রু! তাকি তুমি জান্তে না। তোমায় ছাড়া আমি যে আর কাউকে ভালবাসতে পারবো না অশ্রু। অশ্রু! অশ্রু! কেন তুমি আমায় এমনি করে ফেলে চলে গেলে? হ্লাই কেন তোমার মায়ের জীবনী হোক্ না, তুমি আমারই ছিলে, অশ্রু, আমারই থাকতে। যারাই কেন তোমায় ত্যাগ করুক না, আমি কখন তোমায় ত্যাগ কত্তুম না, চিরকাল হৃদয়ের মধ্যে ধ'রে রেখে দিতুম।"

আবার চক্ষের দুই কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সাবিত্রী নিজের অঞ্চল দিয়া ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিল। সুরেশ আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। সাবিত্রী একমনে ভগবানকে ডাকিতেছিল এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, "আমার স্বামীকে ভালো ক'রে দাও প্রভু, বুকচিরে রক্ত দেব। স্বামী ছাড়া আমার যে কেউ নেই। তাঁকে ফিরিয়ে দাও প্রভু। আমার প্রাণের বিনিময়ে যদি তিনি বেঁচে উঠেন তাতেও আমি প্রস্তুত আছি প্রভু। আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দাও।"

অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া ধীরে ধীরে সুরেশ ডাকিল, "সাবিত্রী।"

"কেন?" সাবিত্রীর দুইটী হাত নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এখানটা একটু হাত বুলিয়ে দাও সাবিত্রী। বড্ড কেমন ক'চ্চে।" তাহাকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "এখানেই ব'সে থাক সাবিত্রী। আমায় ছেড়ে যেন উঠে যেও না।" সাবিত্রী বলিল, "এখানেই তো ব'সে আছি। কোথাও যাব না। তুমি একটু ঘুমুবার চেষ্টা কর দিকি।"

"আমায় কখন ছেড়ে যাবে না সাবিত্রী? বল, বল, তুমি আমায় ছেড়ে গেলে আমি বাঁচবো না সাবিত্রী, কক্ষনো বাঁচবো না।"

চক্ষের জল সামলাইয়া লইয়া সাবিত্রী বলিল, "ওসব কথা এখন ভাবচ কেন? ওতে যে আরও শরীর খারাপ হবে।"

"তুমি কাছে থাক্‌লে আমার আর কখন শরীর খারাপ হবে না।"

"ডাক্তার বাবু ঘুমের ওষুধটা খাওয়াতে ব'লে গ্যাছেন; এখন খাবে কি?"

"কেন ডাক্তার বাবুকে মিছি মিছি কষ্ট দিলে? আমার ত কিছু হয়নি! একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম, না?"

"হুঁ" বলিয়া সাবিত্রী উঠিয়া গিয়া ঘুমের ঔষধের ছোট শিশিটা আনিল এবং সুরেশকে ডাক্তারের কথামত একটু খাওয়াইয়া দিল।

সকালে উঠিয়া সুরেশ বলিল,

"অন্য দিনকার চেয়ে আজ একটু বেশী কাহিল মনে হ'চ্চে সাবিত্রী।"

"কাল জ্বরটা বেশী হয়েছিল কিনা তাই বোধ হয় ওরকম মনে হ'চ্চে।" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ বলিল, "জ্বর গায়েতেই চল সাবিত্রী এখানথেকে চ'লে যাই এখানে আর মোটে ভাল লাগচে না। তাই যাবে ?"

"তা কি হয়! জ্বর ছাড়লেই যাব'খন।"

"তা হ'লে কিন্তু যে দিন আমার জ্বর ছাড়বে সেইদিন যেতে হবে। আমার আর একদণ্ডও এখানে থাকতে ইচ্ছে কচ্চে না। এখানে থাকলে বোধ হয় আমার জ্বর ছাড়বে না।" সাবিত্রী সুরেশের শেষ কথাটী শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

দুপুর বেলায় রামটহল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, "গাড়ী আয়া মাজী।"

সাবিত্রী বলিল, "আচ্ছা, তুমি প্রস্তুত হওগে যাও, আমি যাচ্ছি।" সুরেশ তখন পড়িয়াছিল। ভজুয়াকে তাহার নিকট রাখিয়া সাবিত্রী গাড়ীতে আসিয়া বসিল।

৩৭।

সাবিত্রী যেরূপ সুরেশকে বাঁচাইবার জন্য প্রয়াগ হইতে তাহাকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল অশ্রুও তদ্রূপ নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য মথুরায় পলাইয়া আসিয়াছিল। অশ্রু এবং সাবিত্রী, কেহই জানিত না যে উভয়েই কয়েকমাস হইতে মথুরাতেই আছে।

প্রয়াগে এলোকেশীর সহিত অশ্রুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া কামাখ্যা হইতে চলিয়া আসার দরুণ সে তাঁহার নিকট অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা মানুষ ছাড়া দেবতা নইতো মা। ত্রুটী তো আমাদের পদে পদে আছে। আর তোমার এ ত্রুটী তো খুবই স্বাভাবিক মা। যাঁর পায়ে নিজেকে অর্পণ ক'রেচ তিনিই তোমায় ক্ষমা ক'রবেন। সে অধিকার তো মানুষের নেই।"

তাঁহার পায়ে ধরিয়া অশ্রু শপথ করিয়াছিল যে আর কখন সে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে না এবং তাঁহারই মত সেবাধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিয়া জীবনের কটা দিন কাটাইয়া দিবে। তিনিও

তাহাতে আন্তরীক মত দিয়াছিলেন।

কিন্তু গঙ্গাস্নানের পর প্রার্থনা করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই সাবিত্রীকে দেখিয়া অন্যবারের মত সে বার তাহার সমস্ত সঙ্কল্প জাহ্নবীর তীব্র স্রোতে ভাসিয়া গেল। এলোকেশীর সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ না করিয়া সেই দিনই অশ্রু নিজেকে বাঁচাইবার জন্য মথুরায় পলাইয়া আসিল। সাবিত্রীর অর্দ্ধোচ্চারিত আহ্বানও তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু পাছে সে আবার নিজেকে হারাইয়া ফেলে এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

উদ্দেশ্য বিহীন জীবনটাকে সময়ের স্রোতের মুখে ভাসাইয়া দিয়া অশ্রু আর কেমন যেন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

আজ কাল প্রায়ই ভাবিত হালশূন্য তরীর ন্যায় শুধু ভাসিয়া ভাসিয়া আর কতদিন কাটিবে! সময়ে স্নানাহার নাই সময়ে নিদ্রা নাই। যা তা খাইয়া, যেখানে সেখানে শুইয়া তাহার শরীর এবং স্বাস্থ্য ক্রমশই খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর যমুনার ধারে বসিয়া রতন বলিল, "এমনি ক'রে আর কতদিন যাবে, দিদিমণি?" অশ্রু বলিল, "আমিও তাই ভাবছিলুম রতনদা। কিন্তু কোন উপায় তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"দিন দিন তোমার শরীর খারাপ হ'য়ে আসচে। এটা যে আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। যা হোক্ ক'রে একটা উপায় ক'ত্তেই যে হবে দিদিমনি।"

কেন উত্তর না দিয়া যমুনার নীল জলের দিকে চাহিয়া অশ্রু ভাবিতে লাগিল তাহার জীবনটাও ঠিক যমুনার স্রোতেরই মত শুধু বহিয়া যাইতেছিল। কোথায় গিয়া ইহার অবসান হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

খানিকক্ষণ পরে রতন বলিল, "কামাখ্যায় সেই মাঠাকুরুণের কাছে ফিরে চল না দিদি-মণি। তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁরই মত পরের সেবায় জীবনটা কাটিয়ে দিই গে যাই চল না কেন।"

"এ কালো মুখ নিয়ে তাঁর পায়ে আর যে আমার স্থান হবে না রতনদা'। ওপথ যে আমি নিজেই বন্ধ ক'রেচি।"

"ওপথ কখন বন্ধ হয় না মা। তোমার আমার জন্যেই যে ওপথ তৈরী হ'য়েচে," বলিয়া এলোকেশী অশ্রুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ এসময়ে এখানে তাঁহাকে দেখিয়া অশ্রু অবাক্ হইয়া গেল এবং কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তীর্থ পর্যটনে বাহির হইয়া তিনি আজ কয়দিন মথুরা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রয়াগের পর অশ্রুর সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। যমুনার ধার দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ অশ্রুর সহিত তাঁহার দ্যাখা হইয়া গেল। তিনি তাহার নিকট আসিতে আসিতে তাহার সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন।

ধীরে ধীরে অশ্রুকে উঠাইয়া বলিলেন, "পরের মঙ্গলের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করা, নিজের মত ভেবে পরকে সেবা করা—এই তো সকল ধর্ম্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মা। এ ধর্ম্মে তো সকলেরই সমান অধিকার আছে। বিশেষতঃ তোমার আমার মত লোকের কাছে—যাদের মানুষগড়া নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে হয় না, সমাজের শক্ত বাঁধন যাদের বেঁধে রেখে দ্যায় না—এই ধর্ম্মই তো শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মা। এই তো আমাদের প্রশস্ত পথ।" শান্ত হইয়া অশ্রু বলিল, "এই পথেই তো আমি যেতে চাই মা। তবে কেন অগ্রসর হ'তে পাচ্ছি না?" একটু হাসিয়া এলোকেশী বলিলেন, "যে পথে যাত্রা করবার জন্যে মনস্থ করেচ সে পথে যেতে গেলে যা পাথেয় দরকার তারই যে তোমার অভাব মা। সেই জন্যেই তো একপা এগিয়ে দু'পা পেছিয়ে আসচ। ভুলে ক'রে একবার সামনের দিকে চেয়ে দ্যাখ দিকি তোমার সামনে এখন কত কাজ প'ড়ে আছে। পেছনদিকে চেয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলচ কেন মা? শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাও। দেখবে তোমার কত কাজ বেড়ে যাবে, কত দায়িত্ব বেড়ে যাবে।"

"আমি যে বড্ড নীচ, বড্ড ঘৃণ্য মা।"

অশ্রুকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া এলোকেশী বলিলেন, "ওকথা ব'ল না মা। ভগবানের রাজত্বে নীচ ব'লে ঘৃণ্য ব'লে কিছু নেই, কেউ নেই। সব সমান। সকলেরই সমান দায়িত্ব, সমান কাজ করবার ক্ষমতা আছে মা। নিজেকে নীচ মনে ক'রে, ঘৃণ্য মনে ক'রে তাঁর কাজে অবহেলা ক'ল্লে তিনি কাউকেই মুক্তি দ্যান না মা। নিজের নিজের ক্ষমতা মত, শক্তি মত সকলকেই কাজ কত্তে হবে; সকলকে সমান ভাবে ভালবাসতে হবে, সকলকেই আপনার ক'রে নিতে হবে। ভগবানের কাছে ধনী দরিদ্র ব'লে কিছু নেই, মানুষে—বলা—ধার্ম্মিক বা পাপী ব'লেও কিছু নেই। কর্ম্মসাধনের তুলাদণ্ডে, কর্ত্তব্য-পালনের ওজনেই, তিনি পাপ পুণ্য বিচার করেন। সেই বিচারই নিরপেক্ষ বিচার। সে বিচারে উঁচু মুখে দাঁড়াবার

অন্যান্য লোকের মত তোমার আমার তো সমানই অধিকার আছে মা।"

অশ্রু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কিন্তু বাপ মায়ের কর্ম্ম ফল—"বাধা দিয়া এলোকেশী বলিয়া উঠিলেন, "তাঁদের কর্ম্মফল তো সন্তানকে এই জন্মেই ভোগ করতে হবে মা। তার সঙ্গে পর-জন্মের তো কোন সংস্রব নেই। আমি তোমায় যে ধর্ম্মের এবং যে কর্ম্মের কথা ব'লাচ সে তো পরকালের জন্যেই মা। তাঁদের কর্ম্মফলের ভোগান্তি এই জন্মেই শেষ হ'য়ে যাবে যদি পরকালের জন্যে কিছু পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিতে পারা যায়। শুধু অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে, অলসের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ালে তাঁদের মুক্তি হবে না, নিজেরও মুক্তি হবে না। তাঁদের মুক্তি না হ'লে সন্তানেরও যে মুক্তি নেই মা। তাঁদের মুক্তির জন্যে সন্তানকে ইহকালে খাটতে হবে আর সন্তানের নিজের মুক্তির জন্যে পরকালের মত পাথেয় সংগ্রহ কত্তে পারে। সন্তানের দায়িত্ব তো একটা নয় মা অনেক। নীচ বলে, ঘৃণ্য বলে, তাড়িত ব'লে নিজেকে প্রবঞ্চনা ক'রে চলবেনা মা। তাতে কখন মুক্তি পাওয়া যায় না।"

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি অশ্রুর সহিত এসব বিষয়ে আলোচনা করিলেন। অশ্রু মাঝে মাঝে দু'একটী প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং তিনি বিশদ ভাবে তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনার পর অবশেষে তিনি বলিলেন, "আমি কাল হরিদ্বার হ'য়ে কেদারনাথ বদরিকাশ্রমের দিকে যাব। তুমি যাবে মা?" অশ্রু বলিল, "যাবো।" "তাহ'লে কাল সন্ধ্যার পর প্রস্তুত হয়ে থেক। রাত্রির গাড়ীতেই বেরিয়ে পড়বো।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। রতন বলিল, "আজ রাত্রে কোথায় যাবেন মা ঠাকরুণ; এই খানেই কেন থাকুন না।" এলোকেশী বলিলেন, "না বাবা, অন্যত্র আমার কাজ আছে। এখনই আমায় বৃন্দাবনে যেতে হবে।"

পরদিন দুপুর বেলায় রতন বলিল, "সেই বেশ হবে দিদিমণি, মার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থে ঘুরে বেড়াব। আর যেন তাঁকে ছেড়ে যেও না দিদিমণি।"

'না রতনদা' আর তাঁকে ছেড়ে গেলে আমার চ'লবে না। তাঁর সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে, তাঁর মত সেবা-ধর্ম্মব্রত অবলম্বন ক'রে যথার্থই আমার কিছু পাথেয় সঞ্চয় ক'ত্তে হবে, নইলে যে পথে যাত্রা করেছি রতনদা, সে পথে কখনই চ'লতে পার্ব্বনা।' তা হ'লে তো বাবার আর মার মুক্তি হবে না এবং আমাকেও তো

তাহলে আবার এখানে ঘুরে আসতে হবে।"

রতন বলিল, "সেই জন্যেই তো ব'লচি দিদি-মণি, মাঠাকুরুণকে আর ছেড়ে দিও না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অশ্রু বলিল, "রতনদা, তুমি কেন তোমার দেশে ফিরে যাওনা। আমাদের জন্যে কেন তুমি সমস্ত জীবনটাকে এমনি ক'রে নষ্ট কচ্ছ ?"

একটু হাসিয়া রতন বলিল, "সমস্ত জীবনটাই তো তোমাদের কাছেই কেটে গেল দিদিমণি। বাকীটুকুর জন্য আবার কোথায় যাব ?"

"বুড়ো বয়সে আমার সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে পারবে রতন দা ?"

"কিছু আমাকেও তো সঞ্চয় ক'রে নিতে হবে দিদিমণি।"

"আমাদের জন্যে—নয় রতনদা ?"

"শুধু তোমাদের জন্যে কেন দিদিমণি। আমিও তো মানুষ। পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করা তো সবারই উচিৎ।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রতন বলিল, "তোমাকে ছেড়েই বা কোথায় যাব ? বুকের ক'লজে খানাকে তাহ'লে তোমার কাছে রেখে দিয়ে যেতে হয়। মা যে মরবার সময় তোমায় আমার কাছে দিয়ে গ্যাছেন দিদিমণি! আমি যে তোমায় ঐখানেই রেখে দিয়েছি। ওটাকে না সরাতে পাল্লে তো তোমায় ছাড়তে পার্ব্ব না।"

রতন কি একটা কাজে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। অশ্রু সেখানে বসিয়াই অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ভগবানের উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল, "আর যেন না ফিরে আসি প্রভু। তোমার আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে যে পথে অগ্রসর হচ্ছি, যেন সেই পথেই যেতে পারি, এই যাত্রাই যেন আমার শেষ যাত্রা হয়।"

"দিদি।"

চক্ষু মেলিয়া অশ্রু দেখিল সাবিত্রী সজল নয়নে আর্দ্র কণ্ঠে ডাকিতেছে, "দিদি।"

হিমালয়ের উচ্চতমশৃঙ্গ হইতে কে যেন অশ্রুকে ফেলিয়া দিল। সংযমের কঠিন শৃঙ্খল আবার কে যেন শিথিল করিয়া দিল। অবাক্ হইয়া অশ্রু শুধু সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল, কিছুই বলিতে পারিল না, কিছুই বুঝিতে পারিল না; স্বপ্ন কি সত্য, তাহাও অশ্রু উপলব্ধি করিতে পারিল না।

সাবিত্রী যখন মাথা নীচু করিল অশ্রুর পায়ের ধুলা লইতে গেল তখন অশ্রুর চেতনা হইল। তাড়াতাড়ী পাদুটী সরাইয়া লইয়া, পিছাইয়া গেল।

সাবিত্রী বলিল, "দিদি, তোমায় আমি নিতে

এসেছি। তুমি না গেলে তো বাঁচাতে পারবো না। তাঁর যে বড় অসুখ। কেবলই তোমার নাম ক'চ্চেন, তোমায় দেখতে চাইচেন ”

অশ্রু তখনও কিছু বলিতে পারিল না।

তাহার হাত দুটী ধরিয়া কাতর স্বরে সাবিত্রী বলিল, “দেরী ক'রো না দিদি, চল। তাঁকে একলা ফেলে এসেচি।”

অশ্রু কোন প্রতিবাদ করিল না, কোন ওজোর আপত্তিও করিল না। মন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় সাবিত্রীর সহিত গাড়ীতে আসিয়া বসিল।

রতনের নিকট হইতে সমস্ত শুনিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে একটু হাসিয়া এলোকেশী বলিয়া গেলেন, “এইবার তোমার দিদিমণির মুক্তি হবে, বাবা। মায়ার মরীচিকা এইবার সে বুঝতে পারবে। তাকে ব'লো আমি তার কাছেই থাকবো। যখনই ইচ্ছে হবে যেন আমার কাছে চ'লে আসে। আমি তাকে বুকে তুলে নেব।”

(৩৮)

সুরেশের সমস্ত ভার অশ্রুর উপর দিয়া সাবিত্রী একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। সেবা সুশ্রূষা হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধ পথ্যাদির বন্দোবস্ত করা, নিয়ম মত খাওয়ান প্রভৃতি সমস্ত দায়িত্বই অশ্রু স্বেচ্ছাতে নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইল। বিশেষ কোন দরকার না পড়িলে সাবিত্রী সুরেশের ঘরে যাইত না। যাইলেও তাহার সহিত বেশী কথা না কহিয়া নিজের কাজটী সারিয়াই চলিয়া আসিত। শুধু আড়ালে আড়ালে থাকিয়া, দূরে দূরে থাকিয়া স্বামীর আরোগ্য লাভের জন্য ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিত, কত মানৎ করিত—বুক চিরিয়া রক্ত দিবে, তারকেশ্বরে গিয়া গণ্ডী দিবে, ইত্যাদি—কত কাঁদিত কত দিন অনাহারে কাটাইয়া দিত।

পাশের ঘরে অশ্রুর সহিত সুরেশ হাসির কথা কহিত, অতীতের কত কথা, কত গল্প করিত, তাহাই শুনিয়া সাবিত্রী কত আনন্দ পাইত, কত তাহার ভরসা হইত। স্বামী ক্রমশঃই আরোগ্য-লাভ করিতেছেন, সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন এই টুকু ভাবিয়া সে শান্তি পাইত তৃপ্তি পাইত। নিজেকে সাবিত্রী একেবারেই মনে স্থান দেয় নাই; নিজের কথা মনে হইলেই নিজের সমস্ত বাসনাকে দমন করিতে চেষ্টা করিত, নিজেকে ভুলিয়া গিয়া কেবল সুরেশের কথাই ভাবিত; ভাবিত সুরেশকে বাদ দিলে তাহার জীবনের মূল্য কি? সুরেশের জীবনই তাহার জীবন,

সুরেশের আনন্দই তাহার আনন্দ। এমনি করিয়াই সাবিত্রী নিজেকে ভুলিবার চেষ্টা করিত এবং অনেকটা ভুলিতেও পারিয়াছিল।

অশ্রুকে দেখিয়া যখন তাহার আত্মদমনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হইত, অশ্রুর সহিত সুরেশের নির্ব্বিবাদ নির্বিঘ্ন, স্বাধীন আলাপে যখন অভিমানে দুঃখে তাহার চক্ষুদুটী জলে ভরিয়া যাইত, যখন ভাবিত নিজের পায়ে সেত নিজেই কুড়ুল মারিয়াছে, যে ডালে এত দিন বসিয়াছিল সে ডাল তো নিজেই ছেদন করিয়াছে তখন সাবিত্রী এই বলিয়া নিজের অদম্য অবুঝ মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে, সে সুরেশের জন্যই তো, তাহারই মঙ্গলের জন্য, তাহারই আরোগ্য লাভের জন্যই তো নিজে গিয়া অশ্রুকে একরকম জোর করিয়াই ডাকিয়া আনিয়াছে—সুরেশ তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলে নাই বরং সে তো মথুরা ছাড়িয়া অশ্লেষা মঘার দিনই চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, অশ্রুও তো স্বেচ্ছায় এখানে আসে নাই। কেন সে সুরেশকে লইয়া চলিয়া গেল না? সেইতো তাহাকে এইখানে থাকিতে বলিল।

হৃদয়ের মধ্যে এত দ্বন্দের ভিতরেও মাঝে মাঝে অশ্রুর পায়ের কাছে সাবিত্রীর মাথা আপনিই অবনত হইয়া আসিত। যখন দেখিত কিরূপ আন্তরীকতার সহিত অনাহারে, অনিদ্রায়, ঐকান্তিক পরিশ্রম করিয়া অশ্রু সুরেশের সেবা করিতেছে, নিজের নাওয়া খাওয়া ভুলিয়া গিয়া, নিজের বিশ্রামের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া দিন রাত সুরেশের শিয়রের কাছে বসিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে টানিয়া আনিতেছে, তখনই অশ্রুর প্রতি শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইত, ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। সাবিত্রী ভাবিত সে বোধহয় এতটা করিতে পারিত না, এত শীঘ্র সুরেশকে ভাল করিতে পারিত না।

অশ্রু আসার পর সুরেশ আস্তে আস্তে ভাল হইয়া উঠিল বটে কিন্তু কেমন যেন মনের সুখ পাইল না। জীবন ফিরিয়া পাইল কিন্তু শান্তি হারাইয়া বসিল। সময়ে সময়ে যখন সে রোগশয্যায় শুইয়া অশ্রুর সহিত কথোপকথনে অনেক দূর চলিয়া যাইত, অনেক দিনকার সেই সব পুরাণ কথা, পুরীর সমুদ্রবর্ণনা, গিরিডীর স্বাভাবিক দৃশ্যের আলোচনা, ইন্দুর সম্বন্ধে কথা ইত্যাদিতে বিভোর হইয়া থাকিত হঠাৎ কে যেন তখন তাহার হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া বলিয়া দিত এরূপ আলোচনায় সে কত খানি আর একজনের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত খানি তাহাকে মরণের পথে ঠেলিয়া দিতেছে; কে

যেন তখন সুরেশকে অতীত হইতে বর্ত্তমানে টানিয়া লইয়া আসিত এবং চোখে আঙ্গুল দিয়া ভবিষ্যতের দিকে দেখাইয়া দিত। হাসির মাঝখানে, আনন্দের মাঝখানে, কথাবার্ত্তার মাঝখানে সুরেশ তখন হঠাৎ থামিয়া যাইত, প্রফুল্ল-মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া যাইত। অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুর সহিত কোন কথা বার্ত্তা কহিত না। চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকিত।

অশ্রুও নিজেকে খুবই সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একটা যেন আবেগের টানেই সেদিন সাবিত্রীর সহিত অশ্রু আসিয়া পড়িয়াছিল। কোন ওজোর আপত্তিই তখন তাহার মুখে যোগায় নাই, না আসিবার কোন কারণই তখন সে দেখিতে পায় নাই। কে যেন তাহাকে জোর করিয়া সাবিত্রীর সহিত গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াছিল। অনেকে যেরূপ নিদ্রিত অবস্থাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাত্রে গ্রামান্তরে চলিয়া যায়, স্বপ্নে ব্যোম পথে বিচরণ করে, কিছুই জ্ঞান থাকে না, কিছুই বুঝিতে পারে না, অশ্রুও যেন ঠিক সেই অবস্থাতেই সাবিত্রীর সহিত চলিয়া আসিয়াছিল। তখন সে সম্মুখে এলোকেশীকে দ্যাখে নাই, নিজেকে কিম্বা সাবিত্রীকেও দ্যাখে নাই, দেখিয়াছিল সুরেশের রোগক্লিষ্ট শুষ্ক মুখখানি, ভাবিয়াছিল সে যেন পুরীতে আছে।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, স্বপ্ন তিরোহিত হইয়া গেল, যখন আবার আপনাতেই ফিরিয়া আসিল তখন অশ্রুর চেতনা হইল। আরও চেতনা হইল সাবিত্রীর স্বার্থত্যাগ দেখিয়া, সাবিত্রীর সংযম দেখিয়া এবং মাঝে মাঝে সুরেশের মুখের ভাবান্তর দেখিয়া, তাহার অনুতাপের লক্ষণ দেখিয়া। কিন্তু অশ্রু এ কয়দিনেই এমন একটা কুহকে পড়িয়া গিয়াছিল, এমন ভাবে নিজেকে মায়ায় জড়াইয়া ফেলিয়াছিল যে, কিছুতেই যেন তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছিল না। সুরেশকে দেখিয়া, সুরেশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া এ জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতেও তাহার ইচ্ছা হইত না। অশ্রু ভাবিত যদি নরকেও যাইতে হয় তাহাও সে যাইবে কিন্তু এ সুখের স্থান সে এখন কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না—বুঝি মৃত্যুও এখান হইতে তাহাকে সরাইয়া লইতে পারিবে না।

কিন্তু বিবেক যখন চেতনা ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিল যে পরের জিনিষে তাহার কোনই অধিকার নাই, সে শুধু ব্যাপার খাটিতে আসিয়াছে, প্রতিদানে কিছুই পাইবে না, সুরেশ এখন তাহার নহে

সুরেশ সাবিত্রীর, অশ্রুর তখন এলোকেশীকে মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার উপদেশগুলিও উজ্জ্বল ভাবে হৃদয়ের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনার অনুকূল যুক্তি যখন অশ্রুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে এখানে সে তো সেবা করিতেই আসিয়াছিল—ইহাতো সেবা-ধর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ—বিবেক অমনি একটু হাসিয়া বলিয়া দিল যে, যে ধর্ম্মের কথা এলোকেশী বলিয়াছিলেন তাহাতে স্বার্থ থাকিলে চলিবে না। স্বার্থান্ধ হইয়াই অশ্রু এখানে আসিয়াছিল, নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কামভাবে এখানে আসে নাই।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর, অনেক দ্বন্দ্বের পর অশ্রু যতই নিজের সংযমগ্রন্থি কঠিন করিতে লাগিল সুরেশ ততই তাহা শিথিল করিয়া দিতে লাগিল। অশ্রু কতবার চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, সুরেশ তাহাকে যাইতে দ্যায় নাই। প্রত্যেক বারেই বলিত, "আরও দুদিন থাক না অশ্রু। ইচ্ছে হ'লেই তো চ'লে যাবে। তোমায় জোর ক'রে তো কেউ এখানে রাখতে পারবে না।" অশ্রু বলিত, "আমার থাকবার তো আর দরকার নেই। সাবিত্রী আছে, সেই তো সব দেখতে পারে।" মুখখানা গম্ভীর করিয়া সুরেশ উত্তর দিত, "অভিমান করেই কি চিরকাল কাটিয়ে দেবে অশ্রু? তোমার মায়ের অনুরোধ এবং আমার মায়ের আদেশ তুমি আমাদেরই কাছে থাক। এত ক'রে তোমায় বল্লাম সে কথা তো তুমি শুনলে না। চিরকালের জন্যে যখন থাকবে না, দুদিনের জন্যে অন্ততঃ থাক অশ্রু। তা না থাকলে আমারও মনে কষ্ট হবে আর সাবিত্রীর—" শেষ করিবার পূর্ব্বেই অশ্রু ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইল।

অশ্রু ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিকে বিবেকের রক্তবর্ণ চক্ষুর এবং অপর দিকে বাসনার এবং স্বার্থের আকর্ষণে পড়িয়া অশ্রু অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিন স্পষ্টই সাবিত্রীকে বলিল, "এবার আমি যাই বোন।" সাবিত্রী অবাক্ হইয়া বলিল, "কেন দিদি?" "নিজের জিনিষ পরকে দিয়ে আর কতদিন এমন ক'রে থাকবি সাবিত্রী? মারা যাবি যে।" অশ্রুর হাত ধরিয়া সাবিত্রী বলিল, "কোথায় যাবে দিদি? তোমায় তো আর ছাড়বো না।"

"ছাড়তেই যে হবে সাবিত্রী। এত বড় পৃথিবীতে আমার একটু স্থান হ'য়েই যাবে। আমার জন্যে ভাবিস্‌নে। নিজের জিনিষ বুঝে নিয়ে, বুকের মাণিক বুকে রেখে, আমায় ছুটী দে বোন্।" "কেন এমন ক'রে ব'লচো দিদি? তোমায় আমি ছাড়বো না, সঙ্গে ক'রে

ক'লকাতা নিয়ে যাব।" মনে মনে একটু চম্‌কিয়া উঠিয়া অশ্রু বলিল, "সেখানে কার কাছে কোথায় যাব সাবিত্রী? মা তো আমার বেঁচে নেই!"

"আমরা তো আছি দিদি, তুমি আমাদেরই কাছে থাকবে। এমনি ক'রে তোমায় আর ঘুরতে দেব না।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিয়া অশ্রু বলিল, "তা হয় না বোন্।"

কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই অশ্রুকে ছাড়িয়া দিল না।

সুরেশ মুখে কিছু না বলিলেও পাকে-চক্রে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। কাজে-কাজেই তাহাকে আরও কিছুদিন সুরেশের বাটীতে থাকিয়া যাইতে হইল।

"আর্ট" সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত।

অনেকের ধারণা যে জগতে যাঁহারা বড় বড় কর্ম্মী কিম্বা মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন, তাঁহারা কলাবিদ্যার বিরোধী। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কর্ম্মী হইতে হইলে যে ভাবুক হইতে হয় না তাহা ঠিক নয়। বরং ইহা বলা যাইতে পারা যায় যে বড় বড় চিন্তা বা ভাব হইতেই অনেক সময়ে বড় বড় কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। চিন্তা বা ভাব বা সৌন্দর্য্য লইয়া আর্টিষ্টের কারবার। যে সমস্ত চিন্তা হৃদয়ের ভিতর লুকায়িত থাকে সেইগুলিকে সুন্দররূপে চিত্রে বা কাব্যে বা সঙ্গীতে প্রকাশ করাই আর্টিষ্টের কাজ। ভাবকে রূপ দেওয়া—অসুন্দরকে সুন্দর করা—অব্যক্তকে ব্যক্ত করাই আর্টিষ্টের কাজ। যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা চিন্তা বা ভাবকে কার্য্যে পরিণত করেন।

কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় পুনা সেসুন হাঁসপাতালে মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মহাত্মার সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি আর্ট সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। তাহা "বোম্বাই ক্রনিকল্" (Bombay Chronicle) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের ধারণা ছিল যে মহাত্মা সঙ্গীত প্রভৃতি আর্টের বিরোধী। ইহাতে মহাত্মা আশ্চর্য্য প্রকাশ

করিয়া বলেন যে তিনি চিরদিনই সঙ্গীত-প্রিয়। সঙ্গীত ব্যতিরেকে ভারতবাসীর ধর্ম্ম-জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইতে পারে না—ইহাই তাঁহার ধারণা। কেবলমাত্র সঙ্গীত নয়, অন্যান্য কলাবিদ্যাও তিনি ভালবাসেন। তবে "আর্ট" সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা তাহা সাধারণ লোকের ধারণা হইতে পৃথক। তাঁহার "সত্যাগ্রহ" আশ্রমের দেওয়ালগুলিতে চিত্র-বিদ্যার কিছুই পরিচয় নাই। তিনি বলেন যে, দেওয়ালের উদ্দেশ্য আমাদের আশ্রয় দেওয়া—উহা চিত্র-বিচিত্র করায় কি লাভ? নক্ষত্রশোভিত নীলিমার দিকে চাহিয়া দেখিলে আমাদের প্রাণ কি অগাধ শান্তিতে পূর্ণ হয় না? মহাত্মা বলেন যে তিনি তারকামণ্ডিত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই। ইহার অনুপম মাধুর্য্যে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন—হৃদয় অসীম রহস্যপূর্ণ আনন্দ বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। ঈশ্বরের এই অদ্ভুত শিল্পের কাছে মানুষের শিল্প কি অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় না?

কোন কোন আর্টিষ্ট বলেন যে আর্টের স্থান জীবনের উপর (Art is greater than life)। মহাত্মা এই মতের বিরোধী। তিনি বলেন যে জীবনের স্থান সমস্ত আর্টের উপর। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ জীবন যাপন করে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট। আর্ট যখন মানুষের জীবনকে সুন্দর করে, মহৎ করে, তখনই ইহার মূল্য আছে। সন্ন্যাসই জীবনের শ্রেষ্ঠ আর্ট।

মহাত্মার এই মত তাঁহারই উপযুক্ত বটে। ব্ল্যাকি এক স্থানে বলিয়াছেন যে কবিতা লেখা অপেক্ষা জীবনকে কবিত্বপূর্ণ করাই উত্তম কার্য্য। কিন্তু ইহা সহজ নয়। সুন্দর সুন্দর ভাব বা চিন্তাকে কাব্যে সঙ্গীতে কিম্বা চিত্রে প্রকাশ করা অপেক্ষা কার্য্যে পরিণত করা অধিক শক্ত। বুদ্ধদেব জগতের কল্যাণে মুক্তিপ্রয়াসী হইয়া স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য সকলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ত্যাগের যে মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্য কি "আর্টের" সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়? সৌন্দর্য্য লইয়াই যদি আর্টিষ্টের কার্য্য হয়—তাহা হইলে জীবনকে যিনি সৌন্দর্য্যে পরিণত করেন তিনিই কি শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট নন?

কঙ্কালী-তলা। *

(শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায়)

কাঞ্চি দেশে চ কঙ্কালো ভৈরবঃ।
রুরু নামকঃ, দেবতা দেবগর্ভা ॥
(তন্ত্র চূড়ামণি)

উত্তর-বাহিনী কোপাই নদীর দক্ষিণতীরে "কঙ্কালী-তলা"—সাধক সম্প্রদায়ের শক্তি-সাধনার মহাস্থান। ই, আই, রেলওয়ে বোলপুর ষ্টেশনের উত্তর পূর্ব্ব পাঁচ মাইল ব্যবধানে এই মহাপীঠ অবস্থিত। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। কোপাই নদী ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধীরগতিতে ভাগীরথী উদ্দেশ্যে চলিতেছে, এবং লতাগুল্মজড়িত বিবিধ বৃক্ষ-রাজি ইহার বক্ষোপরি সুবিস্তৃতভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্ব-শিল্পীর শিল্প নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। একাধারে স্বচ্ছন্দ বনজাত তরু-লতাগুল্মাদির নিবিড় সমারোহে অপূর্ব্ব শ্যাম শোভা, এবং বন-বিহঙ্গের কলতানে মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলিতেছে। অন্যধারে পার্শ্বস্থ মহা-শ্মশানের দৃশ্যে উদাস ভাবের সঞ্চার করিতেছে। এই বিজন পীঠ স্থানের করাল মধুর ভাব দর্শনে জ্বালাময় সংসারের শোক-তাপ-ক্লিষ্ট মানবের অন্তরাত্মা স্বতঃই পরমার্থের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষিত কত শত মহাপ্রাণ এই পুণ্যভূমিতে সাধনা করিয়া সকলকাম হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না।

দুঃখের বিষয় এহেন মহাপীঠে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই যদ্দ্বারা দেশবাসীর মাতৃ-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভূত দেবোত্তর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও দেবকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, মায়ের দ্বারে আগত সাধু সন্ন্যাসী ভোগ পায় না। তীর্থ-যাত্রীগণেরও সাময়িক বিশ্রামের জন্য কোন আশ্রয় গৃহ নাই। এবং এখানকার রাস্তা-ঘাটও সকল সময় দুর্গম না হইলেও একবারে

* কাঞ্চি দেশে চ কঙ্কালো—এই শাস্ত্রীয় বচনের বশবর্ত্তী হইলে অধুনা এখানে কাঞ্চি দেশের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এজন্য মনে হয় উক্ত কাঞ্চির নামের সহিত কাঞ্চি দেশের কোন সম্বন্ধ বিজড়িত থাকাই সম্ভব। প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষে জগতে কত প্রলয়, মহাপ্রলয়ের সংঘটন হইয়াছে, প্রাচীনের কত শত নিদর্শন বিস্মৃতির অতলে মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং কাঞ্চিদেশ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা অসম্ভব হইতে পারে না। এবং ইহা যে একটি শাস্ত্রসম্মত মহাপীঠ তাহা এখানকার দেবদেবী দর্শন করিলে আর কোন সংশয়ই থাকে না। দেবীর প্রকাণ্ড শীলামূর্ত্তি (অবিকল কাঁকালির অংশ আকারে শীলা-খণ্ড) কুণ্ডজলে নিমজ্জিত আছে। এবং বিরাটকায় ভৈরবের লিঙ্গমূর্ত্তি গুহাভ্যন্তরে এক চৌবাচ্চা মধ্যে পরিপূজিত হয়।

দুর্গম বলা চলে না। এজন্য ইহা একপ্রকার লুপ্তপ্রায় তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইতে বসিয়াছে।

দক্ষযজ্ঞে জগন্মাতা সতী প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার দেহ বিষ্ণুচক্রে কর্ত্তিত হইয়া একান্ন স্থানে পতিত হয়। ইহাই এক একটী মহাপীঠ নামে খ্যাত। এখানে সতী দেবীর কঙ্কাল (কাঁকালির অংশ) পতিত হইয়াছিল, তাই ইহার নাম হইয়াছে "কঙ্কালী-তলা"। দেবীর নাম দেবগর্ভা এবং ভৈরবের নাম রুরু। একটি কুণ্ড মধ্যে দেবীর অধিষ্ঠান হইয়াছে। এই কুণ্ডে দেবীর উদ্দেশ্যে পূজাদি হইয়া থাকে। এবং চৈত্র-সংক্রান্তিতে দেবীর বিশেষ পূজার্চ্চনা হয়। তদুপলক্ষে ৭।৮ দিন স্থায়ী একটী মেলা বসে; এবং বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

দেবীর দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে একটী নাতিবৃহৎ দালানে রুরু ভৈরব অবস্থিত আছেন। এই ভৈরব সাধারণতঃ, কাঞ্চিশ্বর নামে অভিহিত। কিন্তু এই ভৈরবের পার্শ্বেই একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে অপর একটী দেবতা রুরু ভৈরব নামে পূজিত হয়েন। কিন্তু এই দেবতাটী উক্ত কাঞ্চিশ্বরের অংশ বলিয়াই মনে হয়।

কোহিনুর বা ভারত-ভাগ্য।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-ডি)

এই স্যমন্তক ও কোহিনুর যে একই হীরক তৎসম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগে কোহিনুর হীরক সম্বন্ধে কতরূপ মতভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা ক্রমে আলোচনা করা যাইবে। যখন সমসাময়িক বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা পাঠ করিয়াও অন্যূন তিনশত বৎসরের পূর্ব্বের কোহিনুর ও মোগল হীরক একই রত্ন কি না তাহা বিশেষ গবেষণা করিয়াও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না, তখন অতীতের কোন্ যুগের স্যমন্তক ও বর্ত্তমান কোহিনুর এই দুই হীরক খণ্ডের একত্ব প্রতিপাদন চেষ্টা যে, বিংশ শতাব্দির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সহ্য করিতে পারিবে তাহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না। আবার কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, এই হীরক কুরুক্ষেত্রের মহাযোদ্ধা অধিকৃত

অঙ্গাধিপ দাতাকর্ণের অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পাদন করিত। কথিত আছে যে তিনি মসলিপটম সন্নিকটে গোদাবরী নদীগর্ভে এই হীরক প্রাপ্ত হয়েন। অর্জ্জুন কর্তৃক কর্ণবধ হইলে সম্ভবতঃ এই মণি রাজা যুধিষ্ঠির লাভ করেন। স্যার লেপেল গ্রিফিন তাঁহার "রণজিৎসিংহ জীবনী"তে এই হীরক কুরুক্ষেত্র বিজয়ী রাজা যুধিষ্ঠিরের শিরোরত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল মতবাদ কেবল অনুমান মাত্র। ইহাদের মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ক্রমে কোহিনুর উজ্জয়িনীর প্রমার বংশীয় রাজকুলের শিরোভূষণ হয়। প্রবাদ এইরূপ যে মালবরাজ সুবিখ্যাত যশোধর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্য এই হীরক অধিকারী ছিলেন। এবং তাঁহারই সন্তানসন্ততিগণ বহুদিন পর্য্যন্ত এই মহার্হ রত্ন মালবরাজকোষে রক্ষা করেন। যশোধর্ম্মদেব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিকদিগের এইরূপ অনুমান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ এই হীরক অধিকারী হয়েন।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালক্রমে বিনাশ-প্রাপ্ত হইল। হর্ষবর্দ্ধন দেব-সমরে জয়ী হইয়া রাজ্যশ্রী লাভ করিলেন। মালবদেশের অধীশ্বর হইয়া কোহিনুর ধারণ করিলেন। তদ্বংশীয় রাজারা মালবের আধিপত্য সহ কোহিনুর হীরক লাভ করেন। পরিশেষে ঘটনাবৈচিত্র্যে মালবরাজ্যসহ কোহিনুর প্রমারবংশীয় রাজপুত-দিগের হস্তগত হইল। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহারা ইহা সযত্নে রক্ষা করেন।

কতকাল পরে হিন্দুদিগের সৌভাগ্য রবি মেঘাবৃত হইয়া আসিল। ভারত আকাশে মুসলমান বিক্রমসূর্য্য চকিতে দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিল। দৃষদ্বতী নদীতীরে একবার ভারতের অদৃষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেল। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যবনের অঙ্কশায়িনী হইলেন। ক্রমে যখন মুসলমানগণ ভারতবিজয় আশায় ঘোর সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করেন তখন চন্দ্রবংশীয় অন্যতম নৃপতি এই মণির অধিকারী ছিলেন। ক্রমে ভারতে স্বাধীনতার বিলোপ হইল। মুসলমানগণ ভারতেশ্বর হইলেন। ভারত ভাগ্য কোহিনুরের ভাগ্য স্থিরীকৃত করিল। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন মালবদেশ অধিকার করিয়া এই মহারত্ন হস্তগত করেন।

কোহিনুর রহস্যের প্রথম অধ্যায় এই স্থলেই পর্য্যবসিত হইল। সেই অবধি কোহিনুর বিজয়ীর পক্ষপাতী। ক্রমে গোরী-বংশীয়েরা দিল্লীশ্বর হইলেন। কোহিনুরও তাহাদের

অধিকারে আসিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, লোদীবংশীয়দিগের রাজত্বকালে কোহিনুর প্রথম মুসলমান অধিকারে আইসে।

আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক পরাজিত মালবরাজ ও পরে বাবর কর্ত্তৃক পরাজিত গোয়ালিয়ররাজ বিক্রমাদিত্যের একজন পূর্ব্ব পুরুষ। পূর্ব্বে মালবদেশের মধ্যে উজ্জয়িনী ও গোয়ালিয়র ছিল। এক্ষণে সেই মালবদেশ, ভূপাল, ইন্দোর, ও গোয়ালিয়র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আলাউদ্দিন ১৩০৪ খৃ অঃ এই হীরক অধিকার করিলে সন্ধিসূত্রে ইহা পুনরায় মালবরাজকে প্রত্যর্পণ করেন। এবং বাবর পুনরায় গোয়ালিয়ররাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে ১৫২৬ খৃঃ অব্দে এই বহুমূল্য বিখ্যাত হীরক প্রাপ্ত হয়েন। বিক্রমজিৎ মালবদেশে একজন স্বাধীন নরপতি ছিলেন। ইব্রাহিম তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিলে, বিপুল পরাক্রমে যুদ্ধ করেন। কিন্তু অবশেষে বিক্রমজিৎ পাঠানের অধীনতা স্বীকার করেন। পানিপথ যুদ্ধে ইব্রাহিম যুদ্ধ করিবার জন্য বিক্রমজিতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই যুদ্ধে বিক্রমজিৎ সমরশায়ী হন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী কাহারও প্রতি চিরপ্রসন্না নহেন। নিয়তিনেমির নিদারুণ আবর্ত্তনে মানব সৌভাগ্যের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে। লোদীবংশীয় রাজন্যবর্গ অবশেষে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। মধ্য এশিয়া হইতে তৈমুরবংশীয় মহাত্মা বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিলেন। পানিপথের সমর ক্ষেত্রে ১৫২৬ খৃ অব্দে লোদী-বংশীয় শেষ রাজা ইব্রাহিম লোদী যুদ্ধে বাবর কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন। পাঠান রাজত্বের ধ্বংসোন্মুখী অবস্থায় ভারতের ক্ষত্রশক্তি রাজপুত-গণ যে শুভমুহূর্ত্তের আশায় অপেক্ষা করিতে-ছিলেন নববলদৃপ্ত বাবর পরিচালিত দুর্দ্ধর্ষ মোগলসেনা রাজপুতবীরগণের সেই হিন্দু স্বাধীনতার সুখ-স্বপ্ন অচিরে ভঙ্গ করিয়া দিল। শিক্রীর রণক্ষেত্রে বাবর বিজয়ী হইলেন। হিন্দুরাজ্যের আশা ফুরাইল। পাঠান রাজত্বের ধ্বংস হইলে কোহিনুর মোগলাধিকারে আসিল, সেই অবধি এই মহা রত্ন দিল্লীশ্বর মোগল বাদসাহদিগের অধিকারে রহিল। বাবর কিরূপে এই রত্ন লাভ করেন, তাহা তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে ১৫২৬ অব্দের ৪ঠা মে তারিখে এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন :—

গোয়ালিয়র অধিপতি হিন্দুরাজা বিক্রমজিৎ একশত বৎসর রাজত্ব করেন। যে যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাস্ত হয়েন (পাণিপথের যুদ্ধ ২১শে এপ্রিল ১৫২৬ খৃঃ) সেই যুদ্ধেই বিক্রমজিৎ যথাসময়ে

প্রেরিত হব। বিক্রমজিতের পরিবারবর্গ ও তাঁহার দলপতিগণ এই সময় আগ্রাতে অবস্থান করিতেছিলেন। হুমায়ুনের আগমনে, বিক্রমজিতের আত্মীয়বর্গ পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু হুমায়ুন নিযুক্ত প্রহরীগণ দ্বারা তাঁহারা ধৃত ও কারারুদ্ধ হয়েন। হুমায়ুন তাঁহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে দেন নাই। স্বেচ্ছায় তাঁহারা হুমায়ুনকে (পেস্‌কেস্) নজর স্বরূপ অনেক মণিমাণিক্য প্রদান করেন। ইহার মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক প্রাপ্ত একখানি প্রসিদ্ধ হীরক ছিল।

(ক্রমশঃ)

পলকে প্রলয়।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস)

বলরাম কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, "হাঃ ভাই! আমিই সেই কৃষ্ণের ভাই হতভাগ্য বলরাম। প্রাণের কৃষ্ণকে হারাইয়া আমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে। ওঃ হোঃ, সেই বৃন্দাবনের কথা মনে হ'লে আমার বুক ফেটে যায়!"

রাখাল কহিলেন, "তুমি তজ্জন্য দুঃখ ক'রো না। আমাদের সদাশয় রাখাল-রাজার নিকট নিবেদন করিলে—যাতে তুমি বৃন্দাবনে গমন ক'রে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হও, তার উপায় ক'রে দিবেন।"

এই কথা শুনিয়া বলরাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং রাখাল-রাজার নিকট গমন করিয়া নিজের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিলেন। যাহাতে সাধের বৃন্দাবন ও কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন, তাহার উপায় করিয়া দিতে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাখাল-রাজা সবিশেষ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আপনার তার জন্য কোন চিন্তা নাই; এখনি আমি তার উপায় করিয়া দিতেছি" বলিয়া "মৌরুবী মৌরুবী" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মৌরুবী কন্যাটী মনোহর বেশ-ভূষায় ও দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া গজগমনে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, "হাঁগা, তুমি আমায় ডাক্‌ছো কেন?"

রাখাল-রাজা কহিলেন, "দেখ্ দেখি মৌরুবী! এই দিব্য-সুন্দর বরটী তোর মনোমত

হয় কিনা ?”

মৌরুবী কন্যা কত ভাব-ভঙ্গিতে হেলিতে দুলিতে বলরামের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন “বাঃ বাঃ দিব্য বরটী তো। হ্যাঁগা! তুমি আমায় বিয়ে কর্‌বে ?”

বলরাম বিবাহের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া কহিলেন “না না, আমি কখনই বিবাহ করিব না। ভাই কৃষ্ণ, তুমি একি বিপদে ফেল্‌লে। তুমি চলিয়া যাও। আমি স্ত্রী-মুখ দর্শন করি না।”

মৌরুবী কহিলেন, “ওমা দেমাক্ দেখ। আমার মুখদর্শন কর্‌বেন না। দেমাকে মাটীতে পা পড়ে না। দেখ তুমি যদি আমায় বিয়ে না কর, তবে কখনই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। সারা জনম কেঁদে কেঁদে মর্‌বে।”

বলরাম কহিলেন, “কি বলিলে! আমি তোমায় বিবাহ না করিলে আমার সাধের বৃন্দাবন ও কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হ'ব না ?”

মৌরুবী কহিলেন, “কিছুতেই না! কিছুতেই না!”

বলরাম কহিলেন, “তোমাকে বিবাহ করিলে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হ'ব ?”

মৌরুবী কহিলেন, “নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয় প্রাপ্ত হবে।”

বলরাম তখন মৌরুবীকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। রাখালগণ ঢাক, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া, সানাই, রসনচৌকী ইত্যাদি নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া মহাসমারোহে বলরামের সহিত মৌরুবীর বিবাহ দিয়া দিলেন। মায়া কন্যা মনোমত পতি পাইয়া বাহুযুগল দ্বারা বলরামকে বেষ্টন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। বলরাম তাহাতে মোহিত হইয়া গেলেন। রাখাল-রাজা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, “মৌরুবী, তুই ত এখন মনোমত পতি পেলি; তোকে এই বাড়ী আমরা ছেড়ে দিলাম। তুই তোর বর নিয়ে এইখানে বাস কর। আমরা স্থানান্তরে চ'লে যাই।”

মৌরুবী কহিলেন, “তাই হোক গো তাই হোক। আমি আমার নাগরকে নিয়ে এখানেই থাকি, তোমরা সেই বাড়ী যেয়ে থা'কগে।”

বলরাম মৌরুবী কন্যার রূপে গুণে এতই মোহিত হইলেন যে, দিবারাত্র তাহার অঞ্চল ধরিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। কালক্রমে মৌরুবীর গর্ভে বহু সন্তানের জন্ম হইল। ক্রমে ক্রমে বলরামের বংশ বিস্তার হইতে হইতে ছাপ্পান্ন কোটী বংশের উৎপত্তি হইল। তাহাতে

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগ উত্তীর্ণ হইয়া গেল! বলরাম দারা, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র ইত্যাদি লইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন মৌরুনী কন্যা সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। তাহাতে বলরাম এতই শোকাচ্ছন্ন হইলেন যে, তিনি ভার্য্যার শোকে পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। সেই শোকাবেগ সহ্য করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভার্য্যার সহিত সহমরণ হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং মৌরুনীকে স্কন্ধে লইয়া যমুনার তীরে গমন করিয়া চন্দনকাষ্ঠের দ্বারা চিতা সাজাইয়া, মৌরুনীকে তাহার উপর শোয়াইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। চিতা হু হু করিয়া জ্বলিতে লাগিল। বলরাম "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে সপ্তবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন ঝাঁপ দিলেন, সেই ঝাঁপ চিতাতে না পড়িয়া যমুনার জলে যাইয়া পড়িল। জল হইতে মাথা উঁচু করিয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ ধড়া চূড়া হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "ভাই! তুমি এখানে কতকাল দাঁড়াইয়া আছ?"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "কতকাল কি রকম? এইত দাদা তুমি যমুনার জলে ডুব দিলে আর মাথা তুলিলে। এখনও চক্ষের পলকও পড়ে নাই।"

বলরাম কহিলেন, "বল কি ভাই! আমি যে মৌরুনী কন্যার গর্ভে ছাপ্পান্ন কোটী বংশের উৎপত্তি করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগ গত হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"দাদা! সেটা তোমার ভ্রম। বাস্তবিক এখন চক্ষের পলক পড়ে নাই।"

বলরাম কহিলেন, "কখনই আমার ভ্রম হ'তে পারে না। আমি নিশ্চয়ই ছাপ্পান্ন কোটী বংশের উৎপত্তি করিয়া আসিয়াছি। আমি তোর কথা বিশ্বাস করি না।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "দাদা! তুমি মহাভ্রমে পড়িয়াছ। যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর তাহা হ'লে মা-যশোদার ভাতের হাঁড়ী আছে ঐ —তা দেখ্‌লে বিশ্বাস করবে?"

বলরাম কহিলেন, "হাঁ! চল এখন মা-যশোদার কাছে যাই। তাঁর কাছে গেলে কার ভ্রম বোঝা যাবে।"

তখন দুই ভাই তাড়াতাড়ি বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মা-যশোদার ভাতের হাঁড়িতে ভাত কেবল টগ্‌-বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর মা-যশোদা তাড়াতাড়ি জাল দিতেছেন।

বলরাম কহিলেন, "মা! আমরা কতক্ষণ ঘাটে গিয়েছি?"

যশোদা কহিলেন, "এইত বাবা তোরা গেলি, এখন একদণ্ডও হয় নাই।"

মা-যশোদার কথা শুনিয়া বলরাম মনে মনে কহিলেন, "যাহার এক পলকে প্রলয় হয়, তাহার লীলা কখন সামান্য নয়। অতএব কৃষ্ণলীলার প্রতি আর কখন আমি সন্দেহ করিব না।" সেই হইতে বলরাম আর কখন কৃষ্ণলীলার প্রতি সন্দেহ করেন নাই।

ভাত না খাওয়াতে দুই ভাই তাড়াতাড়ি ক্ষীর সর নবনীত খাইয়া পুনরায় গোঠে গমন করিলেন। *

* এই গল্পটী কোন সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়া লিখিত।

বেলা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

(২)

পূর্ব্বেকার নোটীশমত সকলেই দুই মাসের মাহিয়ানা জমা দিতেছে। আমিও একদিন মাহিয়ানা দিতে গেলাম। সেদিন ছোট কেরাণী বাবু দুইজন আসেন নাই। শুনিলাম, তাঁহাদের শরীর নাকি অসুস্থ। তাঁহারা ছুটি লইয়াছেন। সুতরাং বড় কেরাণী বাবুর ঘাড়েই চাপ পড়িয়াছে। একে তিনি একটু স্থূলকায়, তাহার উপর গরমটা কিছু বেশী বোধ হইতেছিল। চারিদিকেই ছাত্রের ভিড়। সকলেই আগে মাহিয়ানা জমা দিবার চেষ্টায় তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিতেছে। তিনি চাদর ও পিরাণটা খুলিয়া চেয়ারের পিছনে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। তথাপি তাহার পরণের হাতকাটা ফতুয়াটা ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। তিনি বামহস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে কপালের ঘাম মুছিতেছেন আর দক্ষিণ হস্তে কলম চালাইতেছেন। আমি ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে ভিড় কমিলে মাহিয়ানার টাকা দিলাম। বড় কেরাণী বাবু টাকা কয়টি লইয়া আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, পরে ক্যাশবাক্সে রাখিয়া দিলেন। আমি রসিদ চাহিতে তিনি বলিলেন যে, রসিদবহি ফুরাইয়া গিয়াছে, আগামী কল্য পাওয়া যাইবে। আমি চলিয়া

আসিলাম।

তাহার পরদিন কলেজে আসিয়া আফিস-ঘরে যাইয়া দেখিলাম, বড় কেরাণীবাবু তথায় উপস্থিত নাই। দফ্‌তরী বলিল, তিনি অসুস্থ, ছুটি লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। আমি ভাবিলাম, তাহা হইবে; বেচারা হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় রসিদ দিয়া যাইতে পারে নাই। আর তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ঘণ্টা বাজিল। আমি ক্লাসে গিয়া বসিলাম।

একটা কথা বলিয়া রাখি। সেদিনকার সেই ব্যাপারের পর হইতে আমার সহপাঠিকা বর্ম্মা যুবতীর সহিত আমার যেন একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়া পড়িয়াছে। কাজে বা কথাবার্ত্তায় ইহার বিশেষ কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। কেবল দেখা হইলে হয়ত একটা নমস্কার, নয়ত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা, এই পর্য্যন্ত। তবে একটা বিষয় আমি বেশ লক্ষ্য করিয়াছি, আমি বা সে প্রথম ক্লাসে আসিয়াই আমি খুঁজিয়া দেখি সে আসিয়াছে কি না, সে দেখে আমি আসিয়াছি কি না। বোধ হয় উভয়ের উপস্থিতি উভয়ের প্রীতিকর, মেলামেশা বা কথাবার্ত্তা কাহারও তাদৃশ বাঞ্ছনীয় নহে। এ কেমন ঘনিষ্ঠতা? আর নয়নের এ কিরূপ আকাঙ্ক্ষা? ইহা ভাল কি মন্দ তাহাতো কিছুই জানি না, অথচ ক্লাসের মধ্যে তাহার মূর্ত্তিখানি দেখিবার লোভও সম্বরণ করিতে পারি না। আজও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ ক্লাসে আসিয়াই চারিদিকে চাহিলাম। তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। মনটা কেমন একটু দমিয়া গেল। চুলোয় যাক্। কে আসে না আসে তাহার জমাখরচ রাখিবার আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু—তবুও একবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বে যদি দেখার দোষ হইয়া থাকে। দূর্! সে না আসিলে তাহাকে দেখিতে পাইব কেমন করিয়া? যাহাকে প্রত্যহ দেখা যায়, তাহাকে সকলের মধ্য হইতে সহজেই চেনা যায়।

প্রফেসার আসিলেন। যথাকালে দাঁড়াইয়া উঠিয়া লেক্‌চার দিতে লাগিলেন। আমরা ক্ষিপ্রহস্তে নোট লিখিয়া লইতে লাগিলাম। এইরূপ ভাবে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। আমিও নিয়মিতরূপে কলেজে আসি, লেক্‌চার শুনি, ঘরে চলিয়া যাই। কিন্তু বর্ম্মা যুবতীকে আর ক্লাশের মধ্যে উপস্থিত হইতে দেখা গেল না। ভালই হইল। তাহার সহিত আমার কাল্পনিক ঘনিষ্ঠভাব ক্রমে ক্রমে মন হইতে লোপ পাইতে লাগিল। ক্রমে ক্লাশে ঢুকিয়াই তাহাকে অন্বেষণ করার অভ্যাসটা চলিয়া গেল।

একদিন ক্লাসে বসিয়া আছি। প্রফেসর মহাশয় তখনও আসেন নাই। অন্যান্য ছাত্রগণ পরস্পর গল্প করিতেছে, আপনমনে গান গাহিতেছে, থিয়েটারের এক্ট মুখস্থ করিতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কিন্তু গম্ভীর হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছি। তাহার কারণ, সেদিন কলেজে আসিবার সময় অরুর উপর রাগ করিয়া আসিয়াছি। সে আমার রুমালে এসেন্স মাখাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এই তাহার অপরাধ। এই তাহার ভালবাসা। হায় হায়, নারীর ভালবাসার পরিমাণ ও হিসাব আমি এই ভাবেই করিয়া বসিলাম। সেই জন্য মনটা খারাপ হইয়া আছে। কিছু ভাল লাগিতেছিল না। আমি যে মেকী, আসলের কদর জানি কি; কিন্তু বেশ বুঝি, আমিই কেবল খাঁটী, বাকী সব ঝুটা। এই খাঁটি-ঝুটার বিচারের মধ্যে সহসা সেই বর্ম্মা যুবতী আসিয়া দেখা দিল। আসিয়াই চকিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। আমাকে দেখিয়াই একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইল তাহার পর একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ মনের নিঝুম ভাব কাটিয়া গেল, প্রাণের উপর একটা গরম আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। এ যেন বসন্তের আগমনে শীতের জড়তা কাটিয়া গিয়া স্বচ্ছন্দ ভাবের উদয় হইল, শুষ্কতরু সহসা মঞ্জুরিয়া উঠিল। কেন এমনটা হয়? একটী প্রাণীর হৃদয়তন্ত্রীর উচ্ছ্বাস সহস্র মানবের উপর দিয়া ভাসিয়া আসিয়া শুধু আর এক নির্দ্দিষ্ট প্রাণীর হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে কেন? ইহাই প্রাণের সহিত প্রাণের মিলন! তবে কি আমি উহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি? অসম্ভব। নিজের অজ্ঞাতসারে একমুহূর্ত্তে একজন আর একজনকে ভালবাসিয়া ফেলিতে পারে কি? পারে বৈকি। সেই শুভদৃষ্টির সময়ে অরুর চোখে চোখ পড়িতেই তাহার ছবিখানি আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়েছিল, সেও তো আমার অজ্ঞাতসারে। তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিয়াছি, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই অরুও আমায় সম্পূর্ণরূপে ভালবাসিয়াছে। আমার হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনটি পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রতিধ্বনি তোলে। ছিঃ! আমার অরু—আমার প্রাণের অরু ছাড়া আমার ভালবাসা আর কেহ পাইবে না।

তবুও একি ভ্রম! সেই বর্ম্মা যুবতীর দিকে যতবার চাই ততবারই প্রাণ নব আনন্দে নাচিয়া উঠে। ইচ্ছা করিয়া চোখকে তাহার দিক হইতে ফিরাইতে পারিতেছি না। সে কিন্তু আর একবারও আমার প্রতি চাহে নাই।

আপনমনে একখানি বই পড়িতেছিল। প্রফেসার আসিলেন ; পড়াইয়া চলিয়া গেলেন। কলেজের ছুটি হইল। সকল ছাত্র হুড়াহুড়ি করিতে করিতে, এ উহার সহিত কথা কহিতে কহিতে বাহির হইয়া গেল আমি এবং আমার সেই সহপাঠিকা সকলের শেষে বাহির হইব বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি তাহাকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছি, সেও আমায় আড়চোখে দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। আমার লজ্জা হইল। ছিঃ ছিঃ! আমি দ্রুতপদে ক্লাশের বাহিরে আসিলাম। পশ্চাৎ হইতে কোমলকণ্ঠে ডাক পড়িল, "দাঁড়ান। একসঙ্গে যাইব।" অমনি পা থামিয়া গেল। লজ্জাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিলাম, "আসুন।" আবার সেই আরক্তিম বদনের উপর সলাজ চাহনি আর টিপি টিপি হাসি। কিন্তু এবার আমায় সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, নচেৎ একজন অপরিচিতার কাছে অন্তরের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হয়তো সে কি মনে করিবে, নয় তো অভদ্রজ্ঞানে ঘৃণা করিবে। আমি তাহাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এতদিন আব্‌সেন্ট হয়েছিলেন কেন? আমি না থাকিলে আপনার অনেকগুলি পার্সেণ্টেজ যাইত। অতি সন্তর্পণে আপনার গলা অনুকরণ করিয়া আপনার প্রক্সি দিয়াছি। ধরা পড়িলেই মুস্কিল হয়েছিল আর কি?"

যুবতী সাশ্চর্য্যে আমার মুখের দিকে চাহিল। তৎক্ষণাৎ মৃদুহাস্যে বলিল, "অধীনার প্রতি আপনার অনেক দয়া। অনেক দিন পরে আপনাকে আজ দেখিতেছি, আশা করি, এতদিন ভালই ছিলেন।"

আমি।—একরকম।

যুবতী।—আমি বিশেষ কাজে অন্যত্র গিয়াছিলাম, তাই কলেজে আসি নাই। শীঘ্রই কলেজ বন্ধ হইবে, আপনার সঙ্গে আবার কতদিন পরে দেখা হইবে মনে করিয়া আজ একবার কলেজে আসিলাম।

আমায় দেখিবার জন্য! তবে কি .....। আমি আর দাঁড়াইয়া কথা কহিতে পারিলাম না। চলিতে আরম্ভ করিলাম, হঠাৎ মনে হইল, আমি কি উন্মাদ! কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ একেবারে ফিরিয়া চলিলাম, তাহার নিকট একবার বিদায়ও লইলাম না। সে কি মনে করিবে। থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিলাম, "মনে কিছু করিবেন না, আমায় আজ একটু শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে। এখন আসি।"

যুবতী। নমস্কার। আচ্ছা আসুন।

আমি।—নমস্কার। (ক্রমশঃ)

সাময়িক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন।—নৈহাটীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

"হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদিপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমনভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—পঞ্চদশ অধিবেশন।—আগামী ৬ই ও ৭ই বৈশাখ (১৩৩১) ১৯এ ও ২০এ এপ্রিল শনি ও রবিবার খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের আহ্বানে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় জমিদার মহাশয় পৃষ্ঠপোষক; মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি; কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্-এ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনের বিভিন্ন ভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সাধারণ সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, এম্, এ, এফ্, আর, এস্; সাহিত্য-শাখার সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর; ইতিহাস-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল্; দর্শন-শাখার সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ; বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্, সি, বি-এ।

প্রবন্ধ লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া ২৮শে চৈত্রের মধ্যে তাঁহাদের প্রবন্ধ ও তাহার চুম্বক অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্-এ, মহাশয়ের নিকট ৭৪।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সাহিত্যিক অনুষ্ঠান ও পাঠাগার প্রভৃতি যাঁহারা সম্মিলনে প্রতিনিধি পাঠাইবেন তাঁহারা উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ২০শে চৈত্রের মধ্যে প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা প্রভৃতি পাঠাইয়া দিবেন। টাকাকড়ি যিনি যাহা পাঠাইবেন অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নিকট উপরি লিখিত ঠিকানায় অথবা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ মহাশয়ের নিকট ১৪নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে পাঠাইবেন।

ত্রিবেণী

৩৯

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।
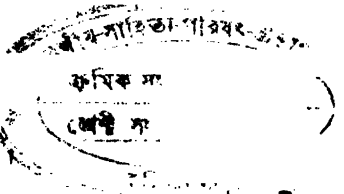
একই সঙ্গে, একই স্থানে, একই বাড়ীতে তিনজনে আছে। কথা কহিতেছে, কখন বা হাসিতেছে, কখন বা তিনজনেই এক জায়গাতে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এত নিকটে থাকিয়াও, পরস্পর পরস্পরের চেয়ে কত দূরে, পরস্পরের মধ্যে কত ব্যবধান প্রত্যেকেই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছিল; এবং প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের ব্যবধানের কারণ, দুঃখের কারণ, চিন্তার কারণ এটুকুও তিনজনেই বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সেইজন্যেই বোধ হয় নিজেদের মধ্যে আপোষে বোঝাপড়া করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ফলে, কেহই তাহাতে সক্ষম হইতে পারিতেছিল না। তিনজনের ভিতর একজনকে যে সব ছাড়িতে হইবে ইহা সকলেই বুঝিয়াছিল। সকলেই সেই চেষ্টা করিতেছিল বলিয়াই বোধ-হয় কেহই পারিতে ছিল না।

ক্রমে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে একই বাড়ীতে থাকিয়া তিনজনেই পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। কেহই কাহারো সহিত তেমন কথা কহে না, সাধ্যমত চোখোচোখী করে না। সকলেই সকলকে পাশ কাটাইতে পারিলেই যেন বাঁচে।

একদিন ঘরে ঢুকিয়া সাবিত্রী দেখিল অন্ধকারে পালঙ্কের উপরে সুরেশ একলাটী চুপ করিয়া চক্ষুবুজিয়া শুইয়া আছে। অশ্রু তখন সেখানে ছিল না। ছাদের উপর একটা কোনে বসিয়াছিল।

সাবিত্রী বলিল, "ভর সন্ধ্যা বেলায় এরকম ক'রে শুয়ে আছ কেন! আজ বেড়াতে যাও নি?"

"না, আজ আর বেরুতে ভাল লাগে নি। এখানে একটু ব'সো।" সাবিত্রীর একটা হাত নিজের হাতের ভিতর লইয়া সুরেশ-বলিল, "বড্ড রোগা হ'য়ে গ্যাচ যে সাবিত্রী!"

অশ্রু আসিবার পর হইতে এটুকু স্নেহ, এটুকু সহানুভূতি হইতে সাবিত্রী বঞ্চিত হইয়া-ছিল বলিয়া সুরেশের একথায় সাবিত্রী একটু বিস্মিত হইয়া গেল। একে চিন্তা—তাহার উপর দিনকত হইতে প্রত্যহ একটু করিয়া জ্বর হই-তেছে, ইহাতে সে তো রোগা হইবেই। কিন্তু এতদিন ইহা সুরেশের নজরে পড়ে নাই। স্বামীর কথায় সাবিত্রীর চক্ষু দুটী অজ্ঞাত কারণে আর্দ্র হইয়া উঠিল। অন্ধকারে সুরেশ ইহা দেখিতে পাইল না।

সুরেশ বলিল, "আর এখানে থাকবার দরকার নেই সাবিত্রী চল ক'লকাতায় যাই।" ভারী গলায় সাবিত্রী বলিল, "বেশ তো।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ বলিল, "এলোকেশীর খোঁজ ক'রে অশ্রুকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে—। "বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিয়া উঠিল, "সে কি! না, তা হবে না। দিদিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।"

"না সাবিত্রী তা হ'তে পারে না। অশ্রুকে তার নিজের পথেই ছেড়ে দিতে হবে।"

"মার কথা কি ভুলে গেলে?"

"জীবনে কখন ভুলবো না।"

"তবে কেন দিদিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্চ না?"

"উপায় নেই ব'লে।"

"কেন?"

"চোখের সামনে তোমায় আমি এমনি ক'রে যেতে দেখতে পারবো না সাবিত্রী। আমার জন্যে শেষকালটা তুমি কি প্রাণটা হারাবে? আমিও তো তাহ'লে বাঁচতে পারবো না সাবিত্রী।"

বেচারা সুরেশ বলিল এক ভাবিয়া সাবিত্রী তাহার অর্থ করিল আর এক। একদিনে সুরেশ ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহারা যতই কেন মনের জোরে জাঁক করুক না, পৃথিবীতে যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে সেই স্বাভাবিক নিয়মের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে তিনজনের মধ্যে কেহই পারিবে না! সাবিত্রীকে তাহার পাওনা গণ্ডা সুরেশকে বুঝাইয়া দিতেই হইবে এবং অশ্রুর সহিত দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ করিয়া লইতেই হইবে। সুরেশ যখন এই সবের মূলে তখন তাহাকেই একটা বিলিব্যবস্থা করিতেই হইবে। তাই বেচারা ওকথা সাবিত্রীকে বলিয়া ফেলিল।

সাবিত্রী ভাবিল, এক হিসাবে দেখিতে গেলে সেই তো অশ্রু এবং সুরেশের অশান্তির কারণ। সেইতো এই ব্যবধানের মূলে। যেন সম্পূর্ণ তাহার জন্যই, তাহার খাতিরেই, কর্ত্তব্যের গুরু

আদেশেই বুঝি সুরেশ তাহাকে লইয়া কলিকাত যাইতে চাহিতেছে এবং অশ্রুকে এলোকেশীর নিকট পাঠাইয়া দিতে চাহিতেছে। সুরেশের আন্তরীক ইচ্ছা বুঝি তাহা নহে। তাহার কথা শুনিয়া সাবিত্রী তখন এই ভাবিতেছিল যে সে যদি নিজেকে সরাইয়া লয় তাহা হইলে সুরেশ এবং অশ্রুর এ অশান্তি বুঝি আর থাকিবে না। সেই যখন ইহার মূলে তখন তাহাকেই ইহা করিতে হইবে।

খানিকক্ষণ পরে সুরেশ বলিল, "অশ্রুরও আন্তরীক ইচ্ছে নয় সাবিত্রী আমাদের সঙ্গে যায়। জোর ক'রে তো কোন ফল হবে না।"

সাবিত্রী কোন উত্তর করিল না। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া উঠিয়া আসিল।

এদিকে ছাদে বসিয়া অশ্রুও ঠিক ঐ কথাগুলিই ভাবিতেছিল যে, এ অশান্তির কারণ সেই। সে যদি সুরেশকে জীবনে কখন আর স্থান না দিত তাহা হইলে সুরেশও হয় তো উহাকে ভুলিয়া যাইত এবং সেও বার বার এইরূপে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িত না। সুরেশ যখন তাহার ছিল, তখন ছিল। এখন তাহার হইলেও সুরেশের উপর তো কোন অধিকার নাই। তবে কেন সে অপরের রাজত্বে অনধিকার প্রবেশ করিতেছে! পরের সম্পত্তি চুরী করিতেছে! সে সম্পত্তি এককালে হয়তো তাহার ছিল এবং এখনও তাহা নিজের মনের মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু বাস্তব জগতে, আইনের চক্ষে, সে সম্পত্তি ভোগ করিবার তাহার তো কোনই অধিকার নাই। তবে কেন সে তাহা চুরী করিতেছে। অশ্রু ভাবিল যখন সেই এসব অশান্তির মূলে তখন নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সুরেশ এবং সাবিত্রীকে বাঁচাইবে।

এমন সময়ে পেছন হইতে সাবিত্রী ডাকিল, "দিদি।"

"কেন বোন্?"

"তুমি নাকি ব'লেচ আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবে না?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"ব'লেচি তো সাবিত্রী সেখানে কারকাছে কোথায় যাব।"

"আমিও তো ব'লেচি দিদি আমাদের কাছেই থাকবে।"

সে তো তোমারই বাড়ী তোমারই ঘর।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দৃঢ়স্বরে অশ্রু বলিল, "না বোন্ আর আমায় ও কথা বলিস্‌নি। ও স্বপ্ন আমার অনেকদিন কেটে গ্যাচে। আর আমায় বাধা দিসনি। নিজের পথে

আমায় চল্‌'তে দে।"

সেই রাত্রেই সাবিত্রীর খুব জ্বর হইল। এতদিন যে জ্বরটাকে সে চাপিতে চেষ্টা করিয়া আসিতে ছিল আজ তাহা নিজের সমস্ত ক্ষমতা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। জ্বরের কারণ বুঝিতে অশ্রু কিংবা সুরেশ কাহারও বিলম্ব হইল না। তিনজনেই একব্যাধিগ্রস্ত, তবে সাবিত্রী তাহা সামলাইতে না পারিয়া জ্বরে পড়িল। সুরেশ প্রথমবারে তাহার হাত এড়াইতে পারে নাই, এবারে অনেক কষ্টে এড়াইয়া গেল! এই কয় বৎসরে অশ্রু অনেকটা শক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল বলিয়া মনের চাঞ্চল্য জ্বরে বিকাশ পাইল না।

সমস্ত রাত সুরেশ সাবিত্রীর মাথার কাছে বসিয়া রহিল। সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। অশ্রুর সহিত একটী কথাও কহিল না। সুরেশ কিছু না বলিলেও অশ্রুও সাবিত্রীর পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেও সুরেশের সহিত কোন কথাই কহিল না!

জ্বরের প্রকোপটা খুব বাড়িয়া গেলে সাবিত্রী প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল, বলিল,—"দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আর আমাদের ছেড়ে যেওনা। আমাদের সঙ্গে ক'লকাতায় চল। তুমি না থাকলে তিনি বাঁচবেন না। তুমিই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেচ দিদি, তুমিই তাঁকে বাঁচাতে পারবে। আমি পারবো না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিয়া উঠিল,—"একদিনও তাঁর মুখে হাসি দেখতে পাইনি দিদি, একদিনও সুখী কর্ত্তে পারি নি। তোমাদের সুখের পথে কণ্টক হ'য়ে আমি এসেছিলুম, একদিনের জন্যেও মনে শান্তি দিতে পারি নি।

সুরেশের চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে জড়াইয়া খালি 'সাবিত্রী সাবিত্রী' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু অশ্রুর চক্ষে একবিন্দুও জল ছিল না। তাহার এত চোখের জল সবই যেন তখন শুকাইয়া গিয়াছিল। কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত অচল এবং অসাড় হইয়া সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

খানিক্ষণ পরে একটু জ্ঞান হইলে সুরেশেকে কাঁদিতে দেখিয়া সাবিত্রী বলিল,—"কাঁদচ কেন? দিদিকে তো তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। দিদি! তোমারই জিনিষ তোমায় দিয়ে গেলুম, দেখো। এতদিন তোমার অধিকার থেকে তোমায় বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলুম ব'লে আমায় ক্ষমা ক'রো দিদি। তোমার হাতে তাঁকে দিয়ে মর্ত্তে পাচ্ছি, এইটুকু সান্ত্বনা নিয়েই

আমায় যেতে দাও। আমার জন্ম তোমরা কেঁদ না। আমি তো একদিনের জন্যেও তোমাদের সুখী কত্তে পারি নি।"

সুরেশ বলিয়া উঠিল,—"সাবিত্রী, সাবিত্রী, এমনি ক'রে আমায় একলা ফেলে যেও না, এমনি ক'রে আমায় কাঁদিয়ে যেও না। তুমিই যে আমার সব সাবিত্রী। তুমি চ'লে গেলে আমি কি নিয়ে থাকবো। আর আমি কাউকে চাইনা, তুমি শুধু ফিরে এস সাবিত্রী।"

সাবিত্রী কোনই উত্তর করিতে পারিল না। আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। অশ্রু সেই একই ভাবে নিশ্চল, নিথর পাষাণের ন্যায় বসিয়াছিল। মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্ন ছিল না, চক্ষে জলের লেশ ছিল না, হৃদয় মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল।

তখনও সম্পূর্ণ সকাল হয় নাই। সবে মাত্র উষার আলোক একটু একটু দেখা দিতেছিল। কি মনে করিয়া অশ্রু হঠাৎ সাবিত্রীর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরেশ তখনও সাবিত্রীর বুকে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিল অশ্রু তাহার পদধূলি লইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইতেই সুরেশ মুখ তুলিয়া চাহিল এবং অশ্রুর মুখের সহসা এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল—এক রাত্রেই অশ্রুর চেহারার একি পরিবর্ত্তন!

সুরেশ বলিল,—"কোথায় যাচ্চ অশ্রু?" অশ্রু কি একটা বলিতে যাইতেছিল বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুরেশ কেমন যেন হইয়া গিয়াছিল। মুখ দিয়া আর দ্বিতীয় কথাটী বাহির হইল না। খানিক্ষণ পরে জানালার ভিতর দিয়া পথের দিকে চাহিয়া দেখিল রতনের পিছনে পিছনে অশ্রু চলিয়া যাইতেছে। একবার সুরেশ মনে করিল চীৎকার করিয়া ডাকে কিন্তু কে যেন তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিল এবং ঘাড় ধরিয়া সাবিত্রীর দিকে ফিরাইয়া দিল।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে চারিদিকে চাহিয়া অশ্রুকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া সাবিত্রী বলিল,—"দিদি কৈ?" মনের আবেগকে চাপিতে চেষ্টা করিয়া সুরেশ বলিল,—"চ'লে গ্যাচে সাবিত্রী।" বিস্মিত হইয়া সাবিত্রী বলিল,—"কোথায়?"

"জানি না।"

আর কিছু না বলিয়া চক্ষু বুজিয়া সাবিত্রী শুইয়া রহিল।

খানিক্ষণ পরে সুরেশ বলিল,—"আজই চল সাবিত্রী, আমরা কলকাতায় ফিরে যাই"

চক্ষু বুজিয়া সাবিত্রী বলিল,—"চল।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহই আর কিছু বলিল না। জানালার ভিতর দিয়া নীল আকাশের দিকে সুরেশ চাহিয়া রহিল। সাবিত্রী চক্ষু বুজিয়াই শুইয়া রহিল।

সেই দিন রাত্রেই সুরেশ সাবিত্রীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

---

(৪০)

পাণ্ডুঘাটে ষ্টীমার হইতে নামিয়া নৌকায় উঠিবার সময় অশ্রু বলিল,—"এবার আর উজান যেতে ভয় ক'চ্চে না রতন-দা; না?" রতন বলিল,—"না দিদিমণি, শীতকালে আর ভয় কিসের! সেবার বর্ষা ছিল"

"সেবারে কলকাতা থেকে বেড়িয়ে এসে এইখানে প্রথমে এসেছিলুম, মনে পড়ে রতন-দা?"

"পড়ে বৈইকি দিদিমণি! এতো সেদিনকার কথা, এখন বোধহয় দু'বছর হয় নি।"

যে পথে অশ্রু প্রথমে আসিয়াছিল সেই পথে আবার ঘুরিয়া আসিল। কেবল মাত্র গোলোক-ধাঁধার ঘুর্ণিতে পড়িয়া মাঝে কয়েক মাস পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

সেবারকার মত এবার আর ব্রহ্মপুত্রের সে উদ্দাম গতি নাই, স্রোতের বেগ নাই, উল্লাসের হুঙ্কার নাই। শুধু সিরসির্ করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। বর্ষারূপ যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সে স্ফীত বক্ষ, সে সজীবতা, সে চঞ্চলতা চলিয়া গিয়াছে। আছে শুধু শান্ত, স্থির, ধীর মূর্ত্তি। ব্রহ্মপুত্রের সমস্ত হৃদয়ের উপর যেন অবসাদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, ভ্রান্তির কালিমা দূর হইয়া গিয়াছে, বিচক্ষণতার জ্ঞানা-লোকে ভরিয়া গিয়াছে।

দূরে পর্ব্বতগুলি যেন শুধু দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদেরও সে সজীবতা ছিল না, সে উৎসাহ ছিল না, সে প্রাণ ছিল না। যেমন করিয়া বুক দিয়া তাহারা সেবারে ব্রহ্মপুত্রের যৌবনের উদ্দামগতিকে, বাসনার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে, কামনার বিশৃঙ্খল উদ্দীপনাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, এবার আর সেরকম ছিল না। থাকিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। শুধু যেন কর্ত্তব্যের খাতিরেই, নেহাৎ আদেশ পালনের জন্যই, মাঝে মাঝে শুধু নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিবার জন্যই যেন তাহারা ব্রহ্ম-পুত্রের দুই পার্শ্বে সারি সারি হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল।

ডিঙ্গীর এক কোণে বসিয়া অশ্রু এই সবই দেখিতেছিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও নিজের সহিত প্রকৃতির তুলনা করিয়া অনেক স্থলে

সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছিল

খানিক্ষণ পরে রতন বলিল, "এখন মা ঠাকুরুণের সঙ্গে দ্যাখা হ'লে হয়।"

অশ্রু বলিল, "নিশ্চয়ই দ্যাখা হবে। তিনি তো আমায় ছেড়ে কোথাও যাবেন না ব'লে-ছিলেন রতনদা।" রতন কিছু একটা ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "তাতো ব'লেছিলেন।"

"তবে অত ভাবচ কেন?"

"তীর্থ পর্য্যটন থেকে ফিরেচেন কিনা তা জানানেই দিদি মণি।"

"নাই বা জানা রইল রতনদা। একদিন না একদিন তো নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।"

আবার চিন্তিত হইয়া রতন বলিল, "তাতো আসবেনই।"

"তবে আর কি ভাবচ রতনদা?"

"অত দিনে তুমি আবার না ফিরে গেলে বাঁচি।"

অশ্রু কোন উত্তর করিল না। জলের দিকে চাহিয়া রহিল।

হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে নামিয়া অশ্রু বলিল, "সে বারে কি ভীষণ ঝড় জল হ'য়েছিল রতনদা।"

"হ্যাঁ দিদিমণি।"

"সেই মাথায় ক'রেই আমাদের উঠতে হয়েছিল, না?"

"হ্যাঁ।"

"এবার আর বোধ হয় উঠতে তত কষ্ট হবে না রতনদা।"

"কি জানি। সে তো নিজের শক্তির ওপোরই নির্ভর ক'চ্চে দিদি মণি।"

খানিকটা দূর উঠিয়া রতন বলিল, "আবার কবে নাববে দিদিমণি?"

অশ্রু দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আর নাববো না রতনদা'।"

"আর তোমায় নাম্‌তে দেব না মা" বলিয়া এলোকেশী অশ্রুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনিও আজ তীর্থ পর্য্যটন হইতে ফিরিতেছেন। পর্ব্বতের অন্য পথ দিয়া তিনি উঠিতেছিলেন। এই খানেই উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তিনি দূর হইতে অশ্রু এবং রতনের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

অশ্রু আবার মথুরার মত সম্মুখে হঠাৎ এলোকেশীকে দেখিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে তুলিয়া লইয়া বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আর তোমায় ছাড়ব না মা, এই খানেই তোমায় চিরকাল ধ'রে রেখে দেব, আর নামতে

দেখ না।”

এলোকেশীকে ধরিয়া অশ্ব উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। রতন ও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। (সমাপ্ত)

ক্লান্ত হৃদয়ের গান

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

বিষ-জর্জ্জর কাল-ফণি তুমি
যাও যাও চলি' দিনমণি!
ব্যথাময় দেহ
দিয়েছ দহন এনে'
সহালে অনেক
অসহ-সহন জেনে,'
কুড়াইবে এবে দীন মণি।

সুধা-নির্ঝর সহচরী তুমি
এস' এস' ধীরে বিভাবরি!
আন' শীতলতা
স্নেহের পরশ মধু,
কর' এ আতুরে
সবল সরস বঁধু,
তোমারি নিব বিভা বরি'

কালিদাসের পার্ব্বতী-চিত্র

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি, মৈত্রী এবং সহৃদয়তা, সকল সামাজিক ধর্ম্মের মূলে প্রেম। গৃহে ইহার জন্ম, সমাজে ইহার ব্যাপ্তি, এবং পরিশেষে প্রেমময়ের পাদমূলে ইহার সমাপ্তি। যে বিশ্বপ্রেমে প্রেমিকের চরম আদর্শ, গার্হস্থ্য' ধর্ম্মেই তাহার দীক্ষা, সমাজ ধর্ম্মেই তাহার সাধনা, এবং দেবত্ব-লাভেই তাহার সিদ্ধি।

আমাদের পুরাণে এই প্রেমের মহৎচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হরপার্ব্বতী তাহার মধ্যে অন্যতম। প্রেমের তীব্রতায়, এই হর-গৃহিণী "গৌরী" দক্ষমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। প্রেমের কি উচ্চ আদর্শই না চিত্রিত হইয়াছে, ইহার স্বর্গীয় ভাবে আত্মহারা হইতে হয়। 'সতী'র এরূপ প্রগাঢ় প্রেম, যে তিনি নিজ পিতার মুখে পতির নিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না। তারপর, সেই 'সতীই আবার

"পার্ব্বতী" হইয়া সেই মহাদেবকেই পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত তপের পরাকাষ্ঠা প্রেমের প্রগাঢ়তা দেখাইলেন।

দক্ষালয়ে যিনি "সতী" এখন হিমালয়ে তিনিই "পার্ব্বতী"। সেই সতী-লীলায় যিনি পতি ছিলেন, এই পার্ব্বতী-লীলাতেও তিনিই পতি হইবেন। অন্য কাহাকেও পতিরূপে তিনি বরণ করিবেন না। শ্মশানচারী মহাদেব-কেই পতিরূপে লাভ করিবেন। স্বর্গের সুখ ঐশ্বর্য্য, এমন কি ইন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

রূপ দিয়া তাঁহাকে মিলিল না, কিন্তু তপস্যায় তাঁহাকে মিলিতে পারে। তপে যদি না মিলে, তবে তপেই বরং দেহ ত্যাগ শ্রেয়ঃ,তবু অন্য পতি চাই না। ইহাই পার্ব্বতীর প্রেমিকতা। ইহাই হিন্দুধর্ম্মে দাম্পত্যপ্রেমের "একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভাব। এই সুমহান্ ভাবটাকে মজ্জা করিয়া পুরাণের ঐ হরপার্ব্বতী পরিণয় কাহিনী গঠিত। প্রেমের পূর্ব্বরাগের অপূর্ব্ব প্রগাঢ়তাই ইহার প্রাণ! তারপর রূপের ব্যর্থতায়, এবং কামের ধ্বংসে ইহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া,অবশেষে তীব্রতাপের সাধনে ইহার উৎকর্ষ কবি কালিদাস দেখাইয়াছেন। কালিদাস তাঁহার অনুপম তুলিকায় ইহার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। কালিদাস এই মনোহর দেবীচিত্র আঁকিতে আঁকিতে তাহাতে প্রগাঢ়তা ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাকে বিচিত্র বর্ণে সমুদ্ভাসিত করিয়া, সুদক্ষ শিল্পীর ন্যায়, পার্ব্বতী চিত্র সমুজ্জ্বল ও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা প্রেমের এক পরমসুন্দর মহাচিত্র।

দক্ষরোষে "সতী"র প্রাণ ত্যাগের পর মহাদেব আসক্তিশূন্য হইয়া মহা তপস্যায় মগ্ন হইয়া হিমালয়ের এক প্রান্ত-ভাগে বাস করিতে-ছিলেন। সেই শিবের আশ্রমে সহসা বসন্তবিকাশ হইল। বসন্ত প্রাদুর্ভাবে আশ্রম বিচলিত হইয়া উঠিল। নন্দীর শাসনে চারিদিকে বসন্তের সেই বিচলতার মধ্যেও স্থাণুসদন প্রশান্ত, স্থির ও নিস্তব্ধ রহিল। মদন ঐ স্থাণুবনে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন—মহাদেব সমাধিস্থ। মহাদেবের ঐ প্রগাঢ় ও প্রশান্ত সমাধিমূর্ত্তি দেখিয়াই কামদেব ভয়ে হতজ্ঞান হইলেন। এমন সময় মদন দেখিলেন—বসন্তকুসুমাভরণ, রক্তবস্ত্র পরিহিতা পার্ব্বতী শিব সেবা ও বন্দনা করিতে যাইতেছেন। তারপর যখন দেখিলেন, মহাদেব ধ্যানে বিরত, এবং সেবামাল্য প্রদান মানসে পার্ব্বতী তাঁহার সন্নিহিতা, মদন তাঁহার পুষ্পধনুতে "সম্মোহন" বাণ যোজনা করিলেন। তখন, মহাদেব ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চাহিয়া

দেখিলেন,—

"স দক্ষিণা পাঙ্গ নিবিষ্ট মুষ্টিং
নতাংসমাকুঞ্চিত সব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃত চারু—চাপং
প্রহর্তু মভ্যুদ্যত মাত্ম যোনিম্॥"

মহাদেবের জ্বালাময় কোপাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইল। মদনের নিধন সাধন করিয়া মহাদেব পার্ব্বতীর দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করিলেন না। তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

রূপের এইরূপ ব্যর্থতায় পার্ব্বতী মর্ম্মাহতা হইলেন। যে রূপ—সৃজনে বিধাতা লাবণ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন; যে পার্ব্বতীতে কেন্দ্রীভূত জগতের সকল সৌন্দর্য্য!

"সর্ব্বপমাদ্রব্য সমুচ্চয়েন
যথা প্রদেশ বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না
দেবাস্থ সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষয়েব॥"

এরূপ অপরূপ অলোক সামান্য রূপেও শিব আকৃষ্ট হইলেন না। এই অনুপম সৌন্দর্য্যেও শিবের মনে কামনাভাব তিনি জাগাইতে পারিলেন না। কারণ, শিব যে কামজয়ী! তখন পার্ব্বতী প্রাণমন তাঁহার উপর ঢালিয়া দিলেন। এখানে কামনাধ্বংস হইয়া গেল ইহাই নিষ্কাম প্রেম। এই প্রকার দিব্যভাবপূর্ণ প্রেমের উচ্চদৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। প্রেমের এইরূপ শ্রেষ্ঠচিত্র কোন কবি চিত্রিত করিতে পারেন নাই। কালিদাস নিপুণ চিত্রকরের মত অঙ্কিত করিয়াছেন—যেন প্রেমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্ব্বতী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

তখন পার্ব্বতী তপস্যায় শিবলাভ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন প্রাণ যায় যাক্, তবুও শিবকে পতি চাইই। প্রেমের কি অপূর্ব্ব পূর্ব্বরাগ! কবির নিপুণ তুলিকার গুণে তাহা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সেই পার্ব্বতী এখন তপশ্চারিণী! সেই শিরীষকুসুম-নিন্দিত সুকুমার দেহে এখন বল্কল; সেই চামর-চিকুরদাম এখন জটাকলাপে পরিণত সেই নিতম্বে—যাহা সৃজন করিতে বিধাতারও লাবণ্যভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল সেই লাবণ্যাধার নিতম্বে এখন কর্কশ মৌঞ্জী মেখলা; অধরপল্লবে আর সে রাগরঞ্জন নাই; সুকোমল অঙ্গুলিগুলি এখন কুশাঙ্কুর সংগ্রহে ক্ষত বিক্ষত, সেই নবনীত কোমল করে এখন অক্ষমালা। রাত্রিকালে বাহুলতাকেই উপাধান করিয়া তিনি ভূমিতলে শয়ন করেন।

এ তপস্যার কোন ফল ফলিল না। তখন পার্ব্বতী গম্ভীরতর তপঃ-সাগরে অবগাহন

করিলেন। গ্রীষ্মে তিনি পঞ্চতপাঃ, অগ্নিচতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন। বর্ষায় দিবানিশি অনাবৃত স্থানে থাকিয়া, শীতে জলমধ্যে থাকিয়া, পার্ব্বতী কৃচ্ছ্রসাধ্য তপের সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাই কবি পার্ব্বতী-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চন পদ্মনির্ম্মিতং
মৃদু প্রকৃত্যাচ সসারমেব চ।"

গলিত পত্র আহার তপঃ-সাধনের পরাকাষ্ঠা বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। পার্ব্বতী তাহাও পরিত্যাগ করিয়া "অপর্ণা" হইলেন। সুমহৎ প্রেম-ব্রতের কি কঠোর সাধনা!

পার্ব্বতীর তপস্যার কথা মহাদেব জানিতে পারিয়াছিলেন। তবু পার্ব্বতীর মনপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, পার্ব্বতীর শিবানুরাগের গাঢ়তা পরীক্ষার নিমিত্ত, তিনি ব্রহ্মচারী-বেশে গৌরীশিখরে পার্ব্বতীর নিকট উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহার নিকট মহাদেবের রূপগুণের নানা নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন।—"শিবতো কেবল ছাই মাখেন, ভাঙধুঁতুরা ভক্ষণই তাঁর কার্য্য, নরকপাল গলায় ঝুলিয়ে বেড়ান, হাতে সাপ জড়িয়ে ভূতেদের সঙ্গে শ্মশানে মশানে বেড়িয়ে বেড়ান।"—এই সকল নিন্দা শুনিয়া, পার্ব্বতী সন্ন্যাসীর সকল কথারই শিবপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া যাহা বলেন, তাহার ভাব এই ছড়াতে পর্য্যবসিত। হিন্দুদের ঘরে ঘরে পার্ব্বতীউক্তি রূপে ঘোষিত এই ছড়াটী শুনিতে পাই,—

নমো দেব মহাদেব নমো রাঙ্গা পায়,
পোড়া হাড়, ভস্ম, ছাই—ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দধুঁতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায়।
ভকতবৎসল হর ভক্তে দিলেন বর,
মরতে শিবত্ব মেলে শিব সাধনায়;
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়!
খুঁজিয়া ব্রহ্মাণ্ডময়, দেখেছি সকল,
গনিয়া একটী দুটী দেবতাতে ত্রিশ কোটী,
খুঁজিয়া দেখেছি আমি সর্ব্ব রসাতল।
এমন আপন ভোলা, এমন হৃদয় খোলা,
এমন রজত গিরি শ্বেত শত দল।
পবিত্র শঙ্কর, শিব দিগম্বর,
দেখিনা যে সুধা বলি' কালকূটে খায়!
দেখিনা যে কৃত্তিবাস, শ্মশান সুখের বাস,
ভূত পিশাচের পতি, অতি মমতায়,
দেখিনা মড়ার হাড়, কে করে গলার হার!
কাল বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায়!
কার প্রাণে এত স্নেহ, প্রণয়িনী শবদেহ,
হৃদয়ে তুলিয়া মগ্ন প্রেমতপস্যায়।

ইহার ভাব কি উচ্চ, কি মহৎ! পার্ব্বতী তেত্রিশ কোটী দেবতা খুঁজিয়া, অবশেষে এই

প্রেমাবতার কামজয়ী শঙ্করকে পতিরূপে পূজা করিতেছেন। শিবের তিনি সর্ব্বইগুণ দেখিতে পাইতেছেন।

সন্ন্যাসী আবার নিন্দাবাদে উদ্যত হইলে, পার্ব্বতীর অসহ্য হইল। তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত সখীকে আদেশ করিলেন, এবং এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে চাহিলেন।

তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা পার্ব্বতীকে, মহাপ্রেমিক মহাদেব নিজরূপ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রেমভরে ধারণ করিলেন। পার্ব্বতী আরাধ্যদেব মহাদেবকে দেখিয়া সাত্ত্বিক ভাবে বিভোর হইলেন।

আদর্শ প্রেমমূর্ত্তি হর-পার্ব্বতীই এই মহাপটের কেন্দ্রস্বরূপ। পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম এই মহালেখ্যের লক্ষ্য বস্তু ও মর্ম্ম; ভাব চিত্রণে ভাবোদ্দীপনা ইহার সৌন্দর্য্য। পার্ব্বতীর বিকশিত শ্রী ও সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট বরবপুর ন্যায়, এই মনোহর চিত্রখানিও—

"উন্মীলিতং তুলি করেব চিত্রং
সূর্য্যাংশুভি র্ভিন্ন মিবারবিন্দম্।"

কালিদাসের তুলিকায় 'পার্ব্বতীর' যে মহান্ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা স্বভাব-সুন্দর অনুপম। প্রেমের এইরূপ চারু চিত্রের তুলনা জগতে আর কোথায় আছে? *

জীবকোষ ও জীবাণু।

ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র কুমার।

জীবকোষের পরিচয় ও আকার।

পয়ঃ-প্রণালীর ক্ষুদ্র শৈবাল হইতে মহা মহীরুহ এবং সূক্ষ্ম জীবাণু হইতে মহাকায় জীব-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহাদের মধ্যে যে কোনও সাধারণ সমধর্ম্মা উপাদান আছে তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকগণ বহুকাল পূর্ব্বেই ইহাদের মধ্যে একটী সাধারণ উপাদানের ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন। যেরূপ ইষ্টক-খণ্ডের সমবায়ে অট্টালিকা ও অণুর (moleculeএর) সমবায়ে পদার্থ; সেইরূপ জীবকোষের সমবায়ে প্রাণী বা উদ্ভিদ্-শরীর উৎপন্ন হয়। সুতরাং এক

* প্রেসিডেন্সী কলেজের "বাঙ্গালা সাহিত্যসভা"র অধিবেশন উপলক্ষে পঠিত।

হিসাবে জীবদেহ জীবকোষের সমষ্টি মাত্র। এই জীবকোষই সমস্ত জীবিত পদার্থের মৌলিক উপাদান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জীবকোষ আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত নগ্নচক্ষুতে ইহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। জীব জগতের মূল উপাদান এই জীবকোষ চারিদিকে সূক্ষ্ম প্রাচীর বেষ্টিত এক একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বিশেষ। সাধারণতঃ উদ্ভিদ্ জগতে ষট্‌কোন্ এবং প্রাণীজগতে গোল বা ডিম্বাকার হইলেও জীবকোষের আকারের কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। কোথাও চেপ্টা, কোথাও দীর্ঘ আবার কোথাও বা বিচিত্র শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। কিন্তু এক জাতীয় জীবকোষ সর্ব্বত্রই একই প্রকার আকার প্রাপ্ত হয়। জীব শরীরে উক্ত কোষগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত রাখিতে বিভিন্ন জীবকোষের মধ্যে এক প্রকার সংযোগ পদার্থ বা Cement Substance থাকে।

বিভিন্ন উপাদান।

এক একটী জীবকোষের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটী বিভিন্ন উপাদান থাকে। প্রথম :—জৈবী পদার্থ বা protoplasm। ইহা এক প্রকার অর্দ্ধ তরল পদার্থ। ইহাই জীবকোষের প্রধান উপাদান এবং প্রায় সমস্ত কোষটীকে পূর্ণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় :—উল্লিখিত জৈবী পদার্থের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার ঘনতর পদার্থ থাকে; উহাকে কেন্দ্রী পদার্থ বা nucleus বলা যায়। তৃতীয় :—কোষপ্রাচীর বা cell wall। এই প্রাচীর বা বেষ্টনী এক-খানি সছিদ্র ঝিল্লি বিশেষ। ঐ ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়া জৈবী পদার্থের সূক্ষ্ম সূত্রবৎ শাখা নির্গত হইয়া অপরাপর জীবকোষের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করে ও জীবকোষের জীবন-যাত্রার আবশ্যকীয় উপাদান সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ শরীরে এই কোষপ্রাচীর স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও জীবদেহে ইহা জৈবী পদার্থেরই ঘনীভূত বহিরাংশ মাত্র।

জনন ক্রিয়া।

নূতন জীবের উৎপত্তি এবং পুরাতন জীবের পুষ্টি ও বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিতে জীবকোষকে এক হইতে বহু হইতে হয়। সেই জন্যই জনন ক্রিয়ার প্রয়োজন। প্রথমে কেন্দ্রী পদার্থ nucleusটী দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এই অবস্থায় জীবকোষটীর মধ্যে দুইটী কেন্দ্রী পদার্থ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ কেন্দ্রী পদার্থ দুইটী বিযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে জীবকোষের দুই প্রান্তে অপসারিত হয়। এক্ষণে কেন্দ্রী পদার্থ দুইটী সমগ্র জৈবী পদার্থটীকে বিভাগ করিয়া লয় ও আপনাদের চতুষ্পার্শ্বে সংগ্রহ

করে। উক্ত সঞ্চিত জৈবী পদার্থের বাহ্যাংশ ঘনীভূত হইয়া কোষ প্রাচীরে পরিণত হয় এবং তৎপরে পুরাতন সাধারণ কোষ প্রাচীর স্বতঃই ধ্বংস হইয়া যায়। এইরূপ একটী কোষ হইতে দুইটী এবং ক্রমে বহুকোষ উৎপন্ন হইয়া জীব-কোষের বংশ বৃদ্ধির ধারা অটুট রাখে।

জীবাণু ও রক্তকণিকা।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে কতকগুলি জীবকোষ একত্র গ্রথিত হইলে একটী জীব বা উদ্ভিদ্ শরীর উৎপন্ন হয়। কিন্তু জীব ও উদ্ভিদ্ জগতের নিম্নতম স্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক একটী জীবকোষই এক একটী স্বতন্ত্র জীব বা উদ্ভিদ্। এই সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব বা উদ্ভিদ্ পয়ঃ-প্রণালীর দূষিত জলে, পচ্যমান্ পদার্থ, বা অন্য জীবের শরীরে পরাঙ্গপুষ্টিয় জীব (parasite) রূপে অবস্থান করে; এবং পারিপার্শ্বিক পদার্থ নিচয় হইতে আপনাদের আহার্য্য সংগ্রহ করে। এমিবা (amoeba) প্রটোজোয়া (protozoa) ও জীবাণু (Bacilli Bacteria) প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শুক্রকীট (Spermatozoa) এবং আর্ত্তবকোষ (ova) অনেকাংশে এই প্রকৃতির জীবকোষ। এই শ্রেণীর জীবকোষের মধ্যে কোন্‌টী প্রাণী এবং কোন্‌টি উদ্ভিদ্ নির্ণয় করা সহজ নহে, কারণ ইহাদের অনেকেই জীব এবং উদ্ভিদ্ উভয় জাতিরই কতক কতক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য সাধারণ ভাবে ইহাদিগকে জীবাণু, বা micro-organism বলা যায়। উক্ত জীবাণু মণ্ডলীর কতক গুলি জাতি নরদেহের কোনও অনিষ্ট করে না; আবার কতগুলি জাতি নরদেহে বাস করিয়া বিশিষ্ট প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন করে এবং নর শোনিত আহার করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে ও নরদেহের মধ্যেই আপনাদের বংশ বৃদ্ধি করে।

আবার জীবাণুর সহিত রক্ত-কণিকার অনেকটা সাদৃশ্য ও আছে। শোনিতের সাহায্যেই দেহের সমস্ত টিসু বা উপাদান মণ্ডলীর পুষ্টিও বৃদ্ধি সংসাধিত হয়। শরীরস্থ কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি দূষিত পদার্থ শোনিতের সাহায্যেই কতক নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত এবং কতক মূত্র যন্ত্র দ্বারা বিদূরিত হয় এবং শোনিতই প্রশ্বাস বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করতঃ বিভিন্ন টিসু বা উপাদানের মধ্যে বণ্টন করিয়া টিসুর অপচয় নিবারণ ও পুষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। প্রধানতঃ রক্তকনিকা (corpuscle) ও রক্তাম্বু (plasma) লইয়াই শোনিত। জীবাণু যেরূপ তরল পদার্থে, রক্ত-কনিকাও সেইরূপ রক্তাম্বুতে অবস্থান করে।

ইহারা ও জীবাণু মণ্ডলীর ন্যায় এক একটী স্বতন্ত্র জীবকোষ এবং জৈবী পদার্থ বা protoplasm ইহাদেরও প্রধান উপাদান।

জৈবী বিষ।

জীবাণু সম্পর্কে আরও একটী বিষয়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কতকগুলি পদার্থ জীবাণু ও জীবকোষের উপর বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া জৈবী পদার্থের (protoplasmএর) মৃত্যু আনয়ন করতঃ জীবাণুর ধ্বংস সাধন করিতে সক্ষম। ইহাদিগকে জৈবী-বিষ বা protoplasmic poison বলে। কুইনিন্, কার্ব্বলিক্ এসিড্, স্যালল, ন্যাপথল্ প্রভৃতি এই শ্রেণীর পদার্থ। এই শ্রেণীর ভেষজের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দ্বারা এবং কোথাও বা রক্তস্রোতের মধ্যে ইঞ্জেক্‌সন্ দ্বারা অনেক চিকিৎসক রোগ বীজাণুকে সাক্ষাৎ ভাবে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই সফলকাম হন নাই। বরং উক্ত প্রচেষ্টায় দেহের প্রাণ স্বরূপ জৈবী পদার্থ ময় বিস্তর রক্ত কণিকা বিনষ্ট করিয়া রোগীর অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

কহিনুর বা-ভারতভাগ্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-ডি)

ইহার মূল্য এত অধিক যে একজন মণিবেত্তা পৃথিবীর অর্দ্ধদিনের ব্যয় সমষ্টি ইহার মূল্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। ওজনে ইহা প্রায় আট-মিস্‌কেল (বা ৩২০ রতি)। আমি উপস্থিত হইলে, হুমায়ুন এই মনি পেশকেশ স্বরূপ আমাকে প্রদান করেন। আমি তাহাই হুমায়ুনকে পুরস্কার রূপে প্রত্যর্পণ করি।

বাবরের মৃত্যুর সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। একবার তাহার প্রিয়পুত্র হুমায়ুন সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হন। হাকিমেরা রোগ অসাধ্য বলিয়া প্রকাশ করিলে, তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন যে, পৃথিবীতে যে বস্তু আপনি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করেন, পুত্রের কল্যাণ কামনায় ভগবানকে উৎসর্গ করুন। আগ্রায় আপনি যে হীরকখণ্ড পাইয়াছেন, বোধ হয় তদপেক্ষা

আপনার রাজ কোষে অধিক মূল্য বান কোন বস্তু নাই। অতএব সেই হীরক আপনি ঈশ্বরকে দান করিয়া পুত্রের স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করুন। প্রত্যুত্তরে বাবর বলিলেন, যদি তোমার উপদেশই সত্য হয় তাহা হইলে ঐ বহুমূল্য হীরক অপেক্ষা আমার নিকট প্রিয়তর সম্পত্তি রহিয়াছে। হীরক অপেক্ষা আমি নিজ জীবনকে অধিক মূল্যবান মনে করি। পুত্রের আরোগ্য লাভের জন্য জগদীশ্বরকে আমি তাহাই উৎসর্গ করিব। এই বলিয়া তিনি, হুমায়ুনের শয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। এবং ভগবান সমীপে, পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করিলেন, ক্রমে হুমায়ুনের রোগ উপশম হইতে লাগিল এবং অচিরে তিনি রোগোন্মুক্ত হইলেন, কিন্তু মহাত্মা বাবর, ক্রমশঃ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, এবং এই ঘটনার অল্পকাল পরেই তিনি মানব-লীলা সংবরণ করিলেন। আফগান রাজ্যের রাজধানী কাবুল নগরীর এক মনোরম উদ্যানে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ হয়।

বাবরের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সম্রাট হইলেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ বাবর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের বিভিন্নাংশের আধিপত্য লাভ করিলেন। হুমায়ুনের অনবধানতায় দিল্লী সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। বঙ্গ ও বিহারে আফগান বীর সেরশাহ (১৫৩৮ খৃঃ অঃ) বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন; চুণার অবরোধ করিলেন, সেরশাহ গৌড় আক্রমণ করিয়া বাঙ্গালা ও বিহার অধিকার করিলেন। কৌশলে রোটাস দুর্গ সেরশাহের অধীনে আসিল। দিল্লীশ্বর গৌড় পুনরাধিকার করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার আলস্য হেতু সেরশাহ বিহার পুনরাক্রমণ করিলেন। ইয়ানপুর ও চুণার সেরশাহের হস্তগত হইল। আগ্রা হইতে সংবাদ আসিল যে দিল্লীশ্বরের ভ্রাতা হিন্দল মির্জ্জা বিদ্রোহী হইয়াছেন। হুমায়ুন প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। সেরশাহ রাজা হইলেন। পর বৎসর সেরশাহ দিল্লীনগরী সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। ১৫৪০ খৃঃ অঃ কণোজের যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হইয়া পাঞ্জাবাভিমুখে পলায়ন করিলেন। কিন্তু সেরশাহ কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অবশেষে সিন্ধুদেশে আশ্রয় লইলেন। হুমায়ুন সিন্ধু-দেশ নিরুপদ্রব নহে জানিয়া, মাবাবায়ের মরুভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক অমরকোট যাত্রা করিলেন। এই সময় পথি মধ্যে মহামতি আকবর জন্মগ্রহণ করেন। হুমায়ুন সিন্ধুদেশ পুনরায় আগমন করিলেন। তথা হইতে পারস্যাধিপতি সাহ টাইমাস্পের সাহায্যলাভার্থে পারস্যে গমন করেন।

পারস্যে পলায়নকালে হুমায়ুন বহুমূল্য মণি ও হীরকাদি সঙ্গে লইয়া যান। এই সকল হীরকের সহিত কোহিনুর ভারত হইতে পারস্যদেশে নীত হয়। পারস্যে তাঁহার আদর অভ্যর্থনার কিছুই অভাব না থাকিলেও দিল্লীশ্বর অন্যরূপে বিশেষভাবে অপমানিত হন। হুমায়ুন সুন্নী-সম্প্রদায়ভুক্ত; পারস্যশাহ একজন গোঁড়া সিয়া। সাহ দিল্লীশ্বরকে ভীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক সিয়া-পন্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। হুমায়ুনও উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা তাহাতেই বাহ্যিক স্বীকৃত হন; এবং সাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ২৫০ শত মূল্যবান্ মণিমাণিক্য উপহার প্রদান করেন। যে বহুমূল্য হীরক হুমায়ুন মালবরাজ বিক্রমজিতের পরিবারবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন সেই প্রসিদ্ধ হীরক-খণ্ডও তিনি পারস্যাধিপতিকে উপহার প্রদান করেন। আকবরনামাতে লিখিত আছে যে, এই হীরকের ওজন ৪ মিশকেল ও ৪ ভাগ (Akbarnama f, 60, Alemarai Abasi, f, 48)। এই সকল মূল্যবান্ উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া পারস্যসাহ হুমায়ুনকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। পারস্য সেনার সাহায্যে ১৫৪৫ খৃঃ অঃ হুমায়ুন কান্দাহার অধিকার করেন। এই ঘটনার পর কতিপয় বৎসর অনবরত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হুমায়ুন কাবুলের সিংহাসন লাভ করেন। আফগানিস্থান সুশাসিত করিয়া ১৫৫৪ খৃঃ অঃ হুমায়ুন ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন এবং পর বৎসর (১৫৫৫ খৃঃ অঃ) বিপুল বিক্রমে দিল্লীনগরী অধিকার করিলেন। ১৫৫৬ খৃঃ অঃ বিখ্যাত পাণিপথ সমরক্ষেত্রে রণাভিনয় হইল। সের বংশীয় সুলতান মহম্মদসাহের হিন্দু-সেনাপতি হিমু অদম্য বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু মোগলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। আকবর সেনাপতি হিমুকে বন্দী করিলেন এবং বৈরামখাঁ অত্যন্ত নৃশংসভাবে হিমুর মস্তক ছেদন করিয়া কাবুলে প্রেরণ করেন। নিষ্ঠুর বৈরামখাঁর এই কাপুরুষ জনোচিত আচরণের জন্য ভগবান্ তাঁহাকেও পরে অনুরূপ শাস্তি প্রদান করেন।

বিজয়ী হইয়াও হুমায়ুন বেশীদিন সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। সেই বৎসরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যু বস্তুতই বড়ই শোকপ্রদ। বহুক্লেশ ভোগের পর হিন্দুস্থানে সম্রাট হইলেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে সুখভোগ ঘটে নাই। দিল্লী-প্রাসাদের মধ্যে তাঁহার লাইব্রেরী গৃহে পাঠে নিরত আছেন এমন সময় মসজিদ হইতে নমাজের সময় জ্ঞাপক আহ্বান শুনিতে পাই-

লেন। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ব্যস্ততা-বশতঃ সিঁড়ি হইতে নামিবার সময় পড়িয়া গেলেন। গুরুতর আঘাতে তখনই তাহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল। আকবর তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক। বৈরাম খাঁর সহিত সিন্ধুদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দ্রুতবেগে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হুমায়ুনের পর মহামতি আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান ক্রমান্বয়ে দিল্লীর সম্রাট হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মত এই যে সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে মীরজুমা এই হীরক দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডা হইতে প্রাপ্ত হইয়া বাদসাহকে উপহার প্রদান করেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে নিয়ে পর্য্যটক কাটারু বার্ণিয়ার ও টাভ্যারনিয়ার * বর্ণিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

কাটারু বলেন যে মিরজুমা বা মোজিমোলী কিছুকাল সাহাজাহান বাদসাহের সেনা-বিভাগে কার্য্য করিবার পর উচ্চ সেনাপতি পদ অধিকার করেন। যুবরাজ দারা তাঁহাকে ঘৃণিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন। সেই নিমিত্ত তিনি গোল-কুণ্ডার রাজদরবারে কর বিভাগের অধ্যক্ষ (Superintendent of custom and Traffic) পদে নিযুক্ত হয়েন। এই পদে অভিষিক্ত হইয়া তিনি বিস্তর ধন সঞ্চয় করেন। প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ইউরোপ হইতে দুষ্প্রাপ্য বস্তু, চীনদেশ হইতে দারু-নির্ম্মিত দ্রব্য ও সিংহল হইতে হস্তী আনয়ন করিয়া গোলকুণ্ডাধিপতিকে উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তিনি কোহিনুরের জন্মস্থান। আকর হইতে উত্তোলন করিয়া ইহার ওজন এক হাজার সত্তর রতি বলিয়া উল্লিখিত আছে। মীরজুমা এই হীরক পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে আরঙ্গজেব বাদসাহকে উপঢৌকন প্রদান করেন। কিন্তু এই ঘটনা চাপ্যুজোঁর স্বকপোল কল্পিত বলিয়া ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ট্যাভারনিয়রের ভ্রমণ কাহিনী চাপুজোঁর পুস্তক প্রকাশের পঞ্চদশবৎসর পরে প্রথম প্রকাশিত হয় (১৬৭৫ খৃঃ অঃ)। ট্যাভারনিয়ারের ভ্রমণ-কাহিনী ও চাপ্যুজোঁর ইতিহাস—এই গ্রন্থ-দ্বয়ের বর্ণিত ঘটনার স্থানে স্থানে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়।

* ট্যাভারণিয়ার একজন মণিকার ছিলেন। তিনি পর্য্যটনোপলক্ষে এসিয়া মহাদেশে বহু বার আগমন করিয়াছিলেন। এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী অবলম্বনে চাপ্যুজোঁ। ১৬৬১ খৃঃঅঃ হিসটোরি ডি যোম্ব নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। চাপ্যজোঁ, ট্যাভার-নিয়ারের পত্রাবলী ও রোজনামচা হইতে তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেন। এই পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে যে কুলুরের এক খনি

ক্রমে একজন প্রধান ওমরাহ মধ্যে পরিগণিত হয়েন। রাজমাতার সহিত অবৈধ ঘনিষ্টতা বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে রাজাদেশে কর্ণাটিক প্রদেশের শাসনকর্তার পদে বরণ করিয়া রাজধানী হইতে দূরে প্রেরণ করা হইল। কার্ণাটিক প্রদেশেই গোলকুণ্ডার বিখ্যাত হীরকের আকর বর্ত্তমান ছিল।* খনি হইতে যে সকল বৃহৎ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হীরক পাওয়া যাইত, মীরজুম্লা তাহা নিজের জন্য অপহরণ করিয়া গোপনে রাখিয়া দিতেন। শেষে তিনি যে হীরকখণ্ড মোগল সম্রাটকে প্রদান করেন তাহার তুলনা ছিল না। এখনও ইহা সকল মণিবেত্তার বিস্ময় উৎপাদন করে।”

ক্রমশঃ

সখা।

(গান)

শ্রীরেণুপদ সমাদ্দার বি-এ, বি-এল্।
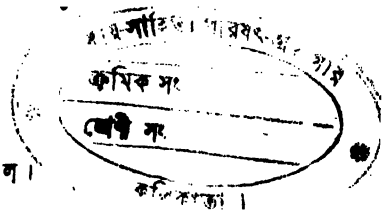
তোমায় বড় ভালবাসি ব'লে
হৃদয়ে রাখি গো তাই,—
হেরিলে তোমারে হৃদয়ের মাঝে
পুলকে ভরিয়া যাই।

ওগো, তুমি যে আমার অতি প্রিয় ধন,
হৃদয়ের রাজা মদনমোহন,—
তোমাতে স'পেছি কায়া-প্রাণ-মন,
চরণে দিওগো ঠাঁই।

তোমায় বড় ভালবাসি বলে
হৃদয়ে রাখি গো তাই।
যা কিছু আছে আপনা বলিতে
এনেছি হে সখা, তোমারে স'পিতে,
প্রেম-অর্ঘ্যে চরণ পুজিতে,
বাসনা করি সদাই।
কি আছে আমার কি দিয়া তুষিব?
মনে-প্রাণে সখা তোমাতে মজিব,

---

* গোলকুণ্ডা রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে বর্ত্তমান কাদাপা, নেল্লুর, কর্ণুল প্রভৃতি অঞ্চলে হীরকের খনি ছিল। ঐ সকল খনিতেই যে সকল হীরক পাওয়া যাইত তাহা রাজকীয় আদেশে গোলকুণ্ডার দুর্গে সঞ্চিত হইত। বৈদেশিক বণিকগণ সেই স্থান হইতে হীরক ক্রয় করিয়া নানাদেশে লইয়া যাইতেন। এইজন্য যদিও গোলকুণ্ডার চতুস্পার্শ্বে ৪০ ক্রোশের মধ্যে কোন হীরকের আকর ছিল না, তথাপি “গোলকুণ্ডার হীরক” সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

হৃদয়-আসন পাতিয়া রহিব—
(যেন) তোমারে ধেয়ানে পাই।
তুমি যে পূর্ণ, সকলি তোমার,—
স্নেহে-মাখা তুমি সুধার আধার,
নাহিক' তুলনা ভুবন মাঝার
(শুধু) তব কৃপা-রেণু চাই।

তব পদ-যুগ হৃদয়ে ধরিব,
তব ছবিখানি মরমে আঁকিব,
তোমা' আরাধনে বিভোর থাকিব—
(ওগো) তোমাতে মিশিতে চাই।
তোমায় বড় ভালবাসি বলে
হৃদয়ে রাখি গো তাই।

বেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩)

মনকে উদ্বেলিত চিন্তা-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়া কিরূপে এই দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া কখন যে বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই; অথচ প্রতিদিনের মতই যেখানে ট্রামে উঠিতে হয়—উঠিয়াছি, নামিতে হয়—নামিয়াছি, যে পথ দিয়া আসি, সেই পথেই আসিয়াছি—কৈ পথভ্রান্ত হইয়া অন্যত্র যাইয়া উপস্থিত হই নাই তো! পথে পরিচিত লোকের প্রশ্নের উত্তরও দিয়াছি (অবশ্য সংক্ষেপে), কিন্তু কে সে, কোন কথার কি উত্তর দিয়াছি, তাহার বিন্দু-বিসর্গও মনে নাই।—মনে আছে শুধু সেই সুহসীর হাসি হাসি মুখ। সকলের মধ্যে সে মুখ প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় মানস-সরোবরে ফুটিয়া আছে—চমৎকার!

বাটী আসিয়া কাপড় জামা না ছাড়িয়া অন্যমনস্কভাবে শোফাটার উপর বসিয়া পড়িলাম। যেন আমার কত সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলাম। অরু ঘরে ঢুকিয়া আমাকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘোমটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া চিবুকে হাত দিয়া স্মিতহাস্যে বলিল,—"ওমা! কখন চুপি চুপি এসে বসে আছ? আমি তো কৈ জানতে পারিনি!"

আমার চমক ভাঙ্গিল। অরুর কথা তড়িৎ-শক্তির মত আমার শরীর-মনকে জড়তা মুক্ত করিয়া সহসা সতেজ করিয়া তুলিল. চিন্তার ভার

মন হইতে মুহূর্ত্তে অপসারিত করিয়া বুকের ভিতর দক্ষিণাবাতাস বহাইয়া দিল। এ যেন এক লহমার কোন এক অজ্ঞাত দ্বীপান্তর হইতে চিরপরিচিত স্বগ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। কি ভুল! কি লজ্জা! অপরাধীর মত অরুর মুখের দিকে চোখ তুলিতে পারিলাম না। অরু আমার ভাবগতিক দেখিয়া একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল বোধ হয়। সে আরও কাছে আসিয়া কোমল-কণ্ঠে বলিল,—"কৈ ডাকনি যে? রাগ হয়েছে বুঝি? তুমি চলে যাবার পরেই আমার মনে হয়েছিল।"

কি বিপদ! অরু ভাবিতেছে যে, আমার রুমালে এসেন্স না দেওয়ায় আমি বুঝি তাহার উপর রাগ করিয়া বসিয়া আছি—যাহার যেখানে ব্যথা। আমি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলাম,—"তা' হ'লে অপরাধ স্বীকার কচ্ছ?" এই বলিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টান দিলাম। বক্ষাবরণ খুলিয়া যাইবার সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া সে সোফার হাতলের উপর বসিতে গিয়া আমার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সেই অবসরে আমিও নিজের গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া বলিলাম,—"অপরাধের এই শাস্তি!" অরু আধ লাজ, আধ হাসি-মুখের উপরে আঁচল ঢাকা দিয়া "যাও!" বলিয়া কিছুদূরে সরিয়া গিয়া বলিল,—"কতক্ষণ এসেছ? সত্যি আমি জান্‌তে পারিনি।"

আমি। সব কাজই কি তোমায় জানিয়ে কর্ত্তে হবে নাকি?

অরু। না বৈ কি! বস, জলখাবার নিয়ে আসি।

এই বলিয়া মুখের উপর হইতে এলোচুলগুলি পিছন দিকে সরাইয়া ঘোমটা টানিয়া মরালগতিতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় একবার আমার দিকে স্মিতমুখে ভ্রূকুটি-কুটীল-বক্র চাহনি হানিয়া যাইতে ভোলে নাই।

আমি তদবস্থায় বসিয়া রহিলাম। পূর্ব্বের ন্যায় চিন্তাযুক্ত না হইলেও মনের কি একপ্রকার নিঝুম ভাব হইয়া গেল,—যেন কি করি করি করিয়াও করা হইতেছে না, অথচ কাজটা যে কি তাহাও ঠিক মনে হইতেছে না। অরু আমার জন্য এক রেকাব খাবার, এক গ্লাস জল, আর এক ডিবা পান লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াই বলিল,—"এখনও কাপড় ছাড়নি, মুখ ধোওনি? ওকিগো!—ওঠ ওঠ—মুখ ধুয়ে জল খাও!" আমি "এই যাই" বলিয়া আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া উঠিলাম।

আমার সমস্ত কাজে অবসাদ ও আহারে অনিচ্ছা দেখিয়া অরু শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি অমন কচ্ছ কেন? কোন অসুখ

করেছে কি ?" এই বলিয়া আমার কপালে বুকে হাত দিয়া শরীরের তাপ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

আমি। মা অরু আমার কিছু হয় নি।

অরু। তবে কিছুই খাচ্ছ না কেন? অন্য দিন চেয়ে নিয়ে খাও। আজ তোমার সে ভাব নেই। মাথা খাও—কি হয়েছে বল না!

একটা শান্ত স্বর্গীয় আলোকপাতে মনের সে নিঝুম ভাব আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছিল। আমি অরুর চিবুক ধরিয়া কোমলকণ্ঠে বলিলাম, "সত্যি বল্‌ছি, আমার কোন অসুখ করেনি। তোমার মুখখানি দেখেই আমার পেট ভরে গেছে।"

"যাও!" বলিয়া আমার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"এমন মুখ দেখা কেন? এখন খেয়ে নাও তারপর দেখো।"

আমি। মুখ ফিরিয়ে নিলে আর খাওয়াই হবে না। একেত অরুচি, তাতে মাঝে মাঝে ঐ মুখে চাটনী না খেলে সব বমি হয়ে যাবে।

অরু। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে?

এইবার স্বহস্তে খাবার তুলিয়া আমার মুখের কাছে ধরিয়া বলিল,—"লক্ষ্মীটী খেয়ে নাও—নৈলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়বো।"

আর নিস্তার নাই। সুবোধ বালকের মত আনুগত্য স্বীকার করিলাম। খাবারের রেকাব শূন্য হইলে পর হুজুরাইন রেহাই দিলেন। পানের ডিবাটী খুলিয়া আমার সামনে ধরিয়া বলিল,—"হ্যাগা, অমন করে কি ভাবছিলে?

আমি। ও কিছু না।

অরু। তুমি কি আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে? আমি প্রথমেই তোমার মুখে একটা প্রগাঢ় চিন্তার ভাব লক্ষ্য করেছি—কি সে চিন্তা, জানতে পারি না কি?

আমি। জেনে তোমার লাভ?

অরু। লাভ! (চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, ঠোঁট দুটি ঈষৎ কাঁপিল) বল্লে তোমার যদি ক্ষতি হয় তো থাক্‌।

আমি লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি অরুর হাতখানি ধরিয়া বলিলাম,—"একটা বিষম দুর্ভাবনায় পড়েছি অরু। সে সব কথা বলে অকারণ তোমায় কষ্ট দেব না বলেই তোমার কাছে লুকোচ্ছিলাম।

অরু। দেখ, তোমরা স্ত্রীকে ছেলেখেলার জিনিষ মনে কর। তুমি ভেবে ভেবে সারা হবে, খাওয়া দাওয়া হাসি-তামাসা সব ভুলে মুখ শুকিয়ে বেড়াবে, তা দেখে মনে কর কি—আমি সুখে থাকব? আর দুর্ভাবনার কথাটাই কেবল আমার এত কষ্ট দেবে? তুমি বল। আমার

কাছে দুঃখের কথা বল্লে বুকের ভার অনেকটা লাঘব হবে। আমি তোমার সব সুখ-দুঃখের ভার হাসিমুখে বইব—কেবল যদি তোমার পায়ের কাছে বসে তোমার মুখে হাসি দেখতে পাই।

আনন্দের উচ্ছাসে আমি নিঃসঙ্কোচে বর্ম্মা-যুবতীর কথা অরুকে আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। শুনিয়া সে শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার মুখের লালিমার উপর একটা কালিমার আবরণ স্পষ্ট দেখা গেল।

আমি। বলেছি তো—শুনে তুমি অকারণ কষ্ট পাবে।

অরু। কষ্ট?—এবার তোমায় রোগমুক্ত কর্ত্তে পার্ব্ব এই আশাই আমার সর্ব্বপ্রধান সুখ।

আমি। আমি তোমায় ছুঁয়ে বলছি অরু—এখনও এ হৃদয় জুড়ে কেবল তুমিই আছ আর—

"তা জানি" বলিয়া সে তাহার কোমল হাতের ফাঁস আমার গলায় পরাইয়া দিল। যেন এ ফাঁস খুলিয়া আমি আর কোথাও পলাইতে পারিব না।

অরু। আমি তোমার হয়েছি——এই সৌভাগ্যই আমার কাছে সাতরাজার ধন এক মাণিক। তোমার উপর আমি কখনও সন্দেহ করিনি—কর্ব্বও না। আমি তো তোমা' ছাড়া নই;—তোমাকে সন্দেহ করাও যা—নিজেকে সন্দেহ করাও তা। তবে, এই যৌবনটা বড় বেইমান—বড় চঞ্চল—বড়ই উদ্দাম! একটু অসাবধান হলেই বেইমানি ক'রে বসে।

আমি। অরু! সব বুঝি। মনের সঙ্গে এতক্ষণ অনেক লড়াই করেছি। হারজিত স্থির হবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই তুমি এসে দাঁড়ালে। তোমায় পেয়েই জয় সম্পূর্ণ করেছি।

অরু। বর্ম্মা যুবতী কেন, সারা সংসার তোমায় ভালবাসুক, তুমি তা'দিকে নিঃস্বার্থ-ভাবে ভালবাস,—সে তো সুখের বিষয়। আমার গৌরব যে তুমি সকলের ভালবাসার পাত্র। কিন্তু পরকীয়া প্রেম যদি কামে পরিণত হয়—যদি কেন, অধিক স্থলে হয়েই থাকে—তাহলে যে আমার দেবতাকে পাপ অর্শাবে, এ আমি সইতে পার্ব্বো না। সে যুবতী হয়ত তোমায় নিষ্কাম প্রেম দিতে পারে, আমার মত তোমার চরণে আত্মদান কর্ত্তে পারে,—সে যদি আপনাকে বিলিয়ে দেয় তো বাধা দেবার অধিকার অপরের নাই,—কিন্তু যে সে দান নেবে তার ভেবে দেখা উচিত যে, সে দান নেবার অধিকারী কি না।

মানুষ সামাজিক জীব। সেই সমাজের শৃঙ্খলার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে,

ধর্ম্মে যে পুরুষকে যে রমণী গ্রহণের অনুমতি দেয়—তাদের উভয়ের সেই বিবাহ। অথবা হৃদয় বিনিময়ের উত্তম পাত্র এবং মার্জ্জিত নীতির অনুকূল। তাতে ভোগ আছে, উচ্ছৃঙ্খলতা নাই; তৃপ্তি আছে, অবসাদ নাই; পিপাসা আছে, প্রলোভন নাই; বন্ধন আছে, শাস্তি নাই; পুণ্য আছে পাপ নাই; উত্থান আছে, পতন নাই;—আমি তোমার সেই স্ত্রী।

মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ। অন্ততঃ জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ, এ তিনটী বিষয়ে মানুষের হাত নেই। এখন ভেবে দেখ দেখি। যে যাহার পতি-পত্নী, তাহাদের মিলন দৈবপ্রভাবেই ঘটে থাকে। স্ত্রী-পুরুষে মিলন, সম্ভোগ, প্রেম, ভালবাসা, যা কিছু, এই উভয়েব মধ্যেই হওয়া যখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন অন্যের প্রতি লোভ করায় পাপ হয়; আর সে পাপের পরিণাম কিরূপ, তা তো তুমি আমার চেয়েও ভাল বোঝ,—তুমিই একদিন ও কথা আমায় বুঝিয়েছিলে। তাই ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ হয়। আমি তোমার সেই ধর্ম্মপত্নী।

স্বার্থের দিক দিয়া দেখ,—আমা হ'তে তোমার যতখানি স্বার্থসিদ্ধ হবে বা হবার সুযোগ ঘটবে, পরনারী হ'তে ততখানি হওয়া কি সম্ভবপর? স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের উপর যে নির্ভরতা, যে ভালবাসা, তাহাতে উভয়ের পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয়; কারণ, তাহা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নির্ব্বিবাদ এবং নিঃসঙ্কোচ। কি ত্যাগে, কি ভোগে, কি সংসার-সংগ্রামে এমন ছায়ারূপিণী সেবাদাসী আর কাহারও হবার অধিকার নাই। তোমায় আমায় মুখে মুখ—বুকে বুক দিয়ে যখন হাসি—তখন আত্মীয়-স্বজন পরিতুষ্ট হন, ভগবান আনন্দে আশীর্ব্বাদ করেন। স্বামী-স্ত্রীর মিলন এমনি পবিত্র। আমি তোমার সেই দাসী।

এ আমি কোথায়? কাহার সম্মুখে? কি শুনিতেছি? শিরায় শিরায় শোণিত প্রখরবেগে প্রবাহিত হইয়া ধমনীর গায়ে আছাড়িয়া পড়িতেছে। হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনটী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। সারা বিশ্ব নিস্তব্ধ, কেবল একটা অনাহত বাণীর স্পষ্ট ঝঙ্কার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছে। কে বলিয়া দিবে—এ আমার জাগরণ না নিদ্রা? অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ঐ যে অনন্ত ধিক্কার উঠিতেছে,—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কে তাহা রোধ করিবে? বর্ম্মা যুবতী না অরু?

ক্রমশঃ
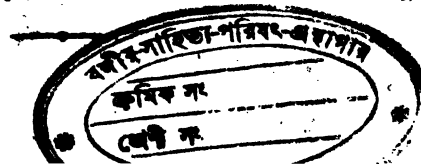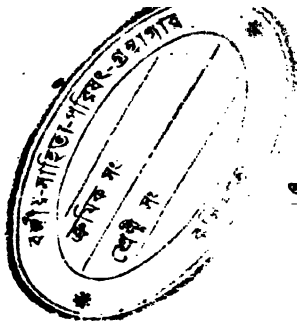
বর্ষ শেষ।

[শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।]

চৈত্র-রাতি শেষ হ'য়ে যায়,
বরষের আজ যাবার পালা ;—
এই দিনেতে আন্‌ল কেরে,
বিসর্জ্জনের বরণ-ডালা ?
লুপ্ত মধুর বসন্ত গান,
ক্লান্ত সমীর তুল্‌ছে কি তান,—
বিদায় রাতে পরায় কেরে
বরষ-গলে জয়ের মালা ?
নবীন আজি সুর তুলেছে,
ঝঙ্কারিয়া আকাশ পাতাল,—
ধরণীর এই হিন্দোলাতে
দোল দিয়ে রে কর্‌লে মাতাল।

প্রাণ্যার-লোটা বিলোল-বেশে,
তরুণ-তানে ধর্‌ল হেসে
বিদায়-বেলায় স্বাগত-গান!—
যাবার রাতে মিল্‌ল সকাল।
জীর্ণ বরষ নূতন সাজে
উড়িয়ে দিলে জয় পতাকা,
(যেন) দিগন্তরের চক্ররেখায়
রঙীন্ পাখায় ধায় বলাকা।
ঐ নীলিমা অসীম-নভের,
ঐ লালিমা দিগ্‌বলয়ের,
ব্যক্ত করে বিরাট্ ছবি
অনন্তেরি বিস্ময়-আঁকা।

মতিভ্রম।

(শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী)

সে দিন শ্রাবণের সন্ধ্যায় যখন আকাশে মহাপ্রলয়ের একটা তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা হইতে- ছিল, ঘোষেদের বৈঠকখানার ভিতর সেই সময়ে বাহিরের এই দুর্য্যোগকে অতিক্রম করিয়া ঠিক

সমানভাবে কোলাহল চলিতেছিল। তাহারা যেন প্রকৃতির এই অশ্রান্ত গর্জ্জনকে তাহাদের বিরাট বাগ্বিতণ্ডায় ডুবাইয়া দিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল। কিন্তু মানবের সব বস্তুই যে সীমাবদ্ধ প্রমান করিবার জন্য এই তাণ্ডব নৃত্যের অন্যতম অভিনেতা পবনদেব জলের ঝারি হস্তে সেই গৃহস্থিত যুবকবৃন্দের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করিবার নিমিত্তই ঈষদুন্মুক্ত বাতায়ন পথ ও দরজা দিয়া মধ্যে মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহার এই স্নিগ্ধ স্পর্শে তাহাদের তর্ক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়া দুরে থাকুক, উত্তরোত্তর উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল।

তর্ক হইতেছিল প্রেম সম্বন্ধে।—

মনতোষ সবেগে দরজা বন্ধ করিয়া ঠিক তেমনি সবেগে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা—বলুন ত সজনী বাবু—উপন্যাসে যে সব প্রেমের কথা পড়া যায় তার সবগুলিই কি কল্পনা প্রসূত নয়? বাস্তব জীবনে ওরকম কি একটাও দেখেছেন?

সজনীবাবু অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তেমন না থাকলেও, সাহিত্যিক মহলে তাঁহার একটু খ্যাতি ছিল। তিনি পদোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন—কি জান মনু সবই কল্পনা স্বীকার করি, তবে ওরকম কল্পনা ভাল। কারণ সমাজ সংস্কারের পথে ওরকম কল্পনা অনেক কাজে লাগে। আর—রমণী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল মধ্য পথে বাধা দিয়া বলিল—আচ্ছা স্বীকার করলুম সমাজ সংস্কার করতে হ'লে ওরকম কল্পনা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কল্পনা মানে ভাবনা প্রসূত যা চাক্ষুষ সত্য নয় অর্থাৎ মিথ্যা। যে গ্রন্থকার এই মিথ্যা কল্পনার সাহায্যে আজ বঙ্গ বিখ্যাত হ'য়ে উঠলেন, তিনি নিজেই কঠোপনিষদের একটা অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলে সমস্ত উপনিষদকেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, ব্যাসদেব হয়ত উপনিষদকে সুখপাঠ্য করবার জন্য এবং জন সাধারণের মনে যাহাতে উপদেশগুলি সহজেই অঙ্কিত হ'য়ে যায় এই জন্যই কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। কল্পনা বিরোধী গ্রন্থকারের ইহাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নিজের কল্পনাগুলি অর্থাৎ মিথ্যাগুলিকে ঢাকবার এই প্রচেষ্টাকে কি একটা নিছক পাগলামি বলা চলে না।

সজনী বাবুর মর্ম্মে আঘাত পড়িয়াছিল—তিনি শরৎবাবুর উপন্যাসের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁহারই সম্মুখে শরৎবাবুকে এরকম ভাবে আক্রমণ করায় ক্রোধে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইল। কিন্তু এই উদ্ধত যুবকের বাচালতায় যে কি সদুত্তর থাকিতে পারে তাহা একটাও

তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে জোগাইল না, তখন তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরেই বলিলেন—তোমরা অত্যন্ত ছেলেমানুষ। তোমাদের সঙ্গে বকা মিছে। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করাতেই মনতোষ অকালে সভাভঙ্গ হয় দেখিয়া সকাতরে বলিল—সজনীদা এরই মধ্যে পালালে চলবে না। আর পালাবেনই বা কি ক'রে। আজ যে ক্ষিতীশের আত্ম কথা শোনবার দিন। আপনারা যে রকম তর্ক লাগালেন তাতে ওর কাহিনী ত আর শোনা হয় না।

সজনীবাবু দরজার বাহিরে একবার উঁকি মারিয়া বসিয়া পড়িলেন—বলিলেন আত্মকথা কি রকম? পরে ক্ষিতীশের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বিনোদ বলিল—ও গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে। তার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায়—সজনীবাবু মধ্য পথে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ লিখছিলে ত। কোন মাসিকে দাও নি কেন? নাম বেরিয়ে যেত।

বিনম্র কণ্ঠে ক্ষিতীশ বলিল—আজ্ঞে গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছি।

কেন?

কেন যে ছেড়েছি তাই শোনবার জন্য আমার বন্ধু মহল এত উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছেন।—সজনীবাবু অতিশয় উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—কি এমন ঘট্‌ল যে জন্যে তুমি সাহিত্য-সাধনা ছেড়ে দিলে।

পূর্ব্ববৎ বিনম্র কণ্ঠে ক্ষিতীশ বলিল—সাহিত্য সাধনা ছেড়ে দিইনি। সাহিত্য সাধনা আমি করি এবং চির কালই করে থাকব। তবে উপন্যাস বা গল্প লেখাকেই যদি আপনি সাহিত্য সাধনা বলেন, তা হ'লে আমার সাহিত্য সাধনা হয় না বটে, এবং সেটা না হওয়াই আরও বাঞ্ছনীয়।

উপস্থিত সকলেই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কেন হে! গল্প লেখায় তোমার এত ঝোঁক ছিল, এখন একেবারে এত তাচ্ছিল্য ভাব কেন?

ক্ষিতীশ বলিল—কেন যে হ'য়েছে বল্‌লে আপনারা হয় ত বিশ্বাসই করবেন না। আর বিশ্বাসই যদি বা করেন তা হ'লে আমাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখবেন। কিন্তু তা হ'ক আপনাদের যখন শোনবার ইচ্ছা হয়েছে বলি শুনুন। সারাজীবন নিজের কাছে হেয় হ'য়ে থাকার চেয়ে নিজের পাপ নিজের মুখে ব্যক্ত করাই ভাল। তাতে পাপের ভারও কমবে

নিজেও একটু শান্তি পাব।

পঠদ্দশাতেই বঙ্কিমবাবুর ও অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থকারদের প্রায় সমস্ত উপন্যাসগুলি নিঃশেষ করেছিলুম। তাঁহাদের সমস্ত উপন্যাসের কোন চরিত্রই আমার মনে তখন কোন দাগ কাটতে পারে নি। তার পর উপর্য্যুপরি তিনবার প্রবেশিকার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত না পেয়ে যখন বিমুখ হলুম, তখন সেটা অতিক্রম করবার প্রবল ইচ্ছাও যেমন আর রইল না, মাতৃভাষার সাধনা ক'রে তাকে আরও পরিপুষ্ট করবার ইচ্ছা ঠিক তেমনি প্রবল হ'ল। কিন্তু মূর্খ আমি মাতৃভাষার পরিপুষ্টি সাধন করতে গেলে যে কতখানি শিক্ষার প্রয়োজন তা তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন বেশ অনুভব কচ্ছি। তা যাক্ উপন্যাস পাঠকেই সাহিত্য-সাধনার চরম উপাদান মনে করে নবীন লেখকদের যাবতীয় বই সংগ্রহ ক'রে একে একে নিঃশেষ করতে লাগলুম। নবীন যুবক আমি—শরৎ বাবুর উপন্যাসগুলির প্রত্যেক চরিত্রগুলিই আমার মনে গভীর আঁক কাটিতে লাগল। তার উপর তাঁর নারী চরিত্র ফোটাবার অসীম দক্ষতা দেখে আমি একেবারে বিমুগ্ধ হলুম। এমনি না হ'লে লেখা, এমন না হ'লে প্রেম, যে প্রেম আত্মপর সব ভুলিয়ে দিয়ে একটা অনাবিল শান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। একটু আধটু লেখবার ইচ্ছা বরাবরই আমার ছিল। তাই শরৎ বাবুকে আমার এই সাহিত্য-সাধনায় গুরুবরণ করে কলম হাতে করে দেখি যে তাঁর মত লেখার কিছুই বার হচ্ছে না উপরন্তু সব চরিত্রই যেন একটা বিকট বীভৎসতাতে ভরে উঠছে। তিনি যে যায়গায় দেখিয়েছেন নারী নারীত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ বজায় রেখেও পুরুষকে ভালবাসার জোরে নিজের দিকে টানছে—ঠিক সেইরকম জায়গাতে আমি হয়ত বরে ফেল্লুম নারী নিজে আত্মপ্রকাশ করে তার ব্যর্থপ্রেমের-দরুণ হৃদয়ে নরকাগ্নি জেলে ফেলেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য তা আমার তো ছিল না। নিজের এই সাধনা কি করে সফল হবে তাই দিবারাত্রি আমার ঘরের নিভৃত প্রান্তে বসে ভাবতুম। বাবা ত ভেবে চিন্তে সাংসারিক সব বিষয়ে আমার ঔদাসীন্য দেখে এক সুন্দরী ষোড়শীর সহিত বিয়ে দিলেন। স্ত্রীর সহিত আমার প্রায় মনোমালিন্য হতে লাগল। আমি যখন রাত্রিবেলায় কাগজ কলম নিয়ে বসতুম সে হয়ত তখন এমন একটা প্রয়োজনীয় বস্তু অপহরণ ক'রত যার জন্য লেখা আমার কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হ'ত। ইহাতে আমার অসন্তোষের মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও উদ্ধারের উপায় কিছু ছিল না অথচ নিজের মানসিক বৃত্তির একটা কুটস্ত

ছবি তোলবার অদম্য স্পৃহাকে আমি কিছুতেই ত্যাগ করতে পাচ্ছিলুম না। আমার স্ত্রীর একান্ত বাসনা ছিল রাত্রির নির্জ্জনতাটুকু সে নীরবে আমাকে লইয়া স্বচ্ছন্দে উপভোগ করে। কিন্তু আমার অন্তর যে নিয়তই কল্পনার রাজ্যে বিচরণ ক'রে তার অসীম শোভাসম্পদগুলি একান্তই আপনার ক'রে নিচ্ছে তার বিন্দুমাত্রও সে জানত না। সুতরাং তাহার এইরূপ বৈরী আচরণে আমি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হ'লেও,ক্রোধ করবার কারণ কিছুই ছিল না। আমার এই একান্ত চেষ্টাকে সফলতার মুখে টেনে আনবার যখন অন্য কোন উপায় আর ছিল না তখন বাস্তবিক আমি একরকম ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে পড়েছিলুম। দিনেরবেলায় সকলের সামনে এইরকম ভাব-বিহ্বলতা লোকে ক্ষিপ্ততা ছাড়া আর কিছুই মনে করবে না। অথচ রাত্রির নিস্তব্ধতায় আমার এই নির্জ্জন সাধনা পত্নীর অত্যাচারে দিনের দিন নিপীড়িত হচ্ছিল। নিরুপায় আমি যখন নিজের এই ব্যর্থকামনাকে পূর্ণ কর[illegible] নানাবিধ উপায় উদ্ভাবনে রত [illegible] মনে জাগ্রত দেবতাদের নি[illegible] [illegible] ক[illegible]ছিলুম তখন এই মানতের ফলেই হউক, কিম্বা সৌভাগ্যের সূত্রপাতেই হ'ক পত্নী আমার কি একটা ক্রিয়া উপলক্ষ্যে, পিতৃভবনে যাত্রা করলেন। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আমি পুনরায় অপহৃত খাতাগুলি বার ক'রে গল্পলেখায় মনঃসংযোগ কল্লুম। অতি অল্পদিনেই একটা নাতিদীর্ঘ গল্প শেষ ক'রে ফেলে একজন প্রবীণ লেখককে পর্য্যালোচনার জন্য আমার সেই লেখাটি দিয়ে বল্লুম আপনি দয়া ক'রে ইহার দোষ গুণ আমার কাছে সব প্রকাশ ক'রে বলবেন, যাতে ভবিষ্যতে আমি শুধরে নিতে পারি। গল্পটী এমন কিছুই না—একটী পতিতা নারীর ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী। দুদিন পরে তার কাছে যেতেই তিনি বেশ সহজ ভাবে বললেন—গল্প লিখতে গেলেই প্রথমেই দুইটী জিনিষ শিক্ষার একান্ত দরকার এক্ ফিলজফি অপরটী সাইকোলজি অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান। ১ কিন্তু এ দুটার কোনটার অস্তিত্ব তোমার গল্পে নাই। কেবল প্রলাপের মত কতকগুলি যা তা লিখে গেছ। অবশ্য প্লট হিসাবে ধরতে গেলে নেহাৎ মন্দ হয় নি। আমি তাঁহার নিকট হইতে মনোবিজ্ঞানের আভাষ যা পেলুম তা আমার গল্পলেখার পক্ষে যথেষ্ট না হ'লেও, তাহারই তৃপ্তিতে আমার সমস্ত অন্তরটা ভরে গেল! আশা হ'ল এইবার আমার গল্প সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হবে এবং সেইজন্যই মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে সকলের অন্তরের ছবিকে নিজের কাছে

একট ক'রে নেবার চেষ্টা করতে লাগলুম। প্রত্যেক লোকের বাক্যের ধারাতে বুঝতে লাগলুম তাহার অন্তরে কি বাসনা লুক্কায়িত থাকতে পারে। এই সবের জন্য আমি সুপ্ত পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কত রজনী বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়াছি।

মনতোষ অস্থির হইয়া বলিল "এত তোমার কে শুনতে চাইছে। আসল ব্যাপরটা কি বলে ফেল না।"

ক্ষিতীশ কিছুমাত্র বিরক্ত না হ'য়ে বলিতে লাগিল—সব কথা খুলে বলাই ভাল। আর এ পর্য্যন্ত আমি কখনও কোন কথা কারুর কাছে কিছুমাত্র অপ্রকাশ রাখিনি। তার পর একটা গল্প লিখতে বসে আমার এই সাধনার গুরুদেবের একটা বচনই কেবলই মনে পড়তে লাগল পতিতা নারীকে আমি কখনও সাধারণের চক্ষে দেখতে শিখি নি। বাস্তবিক তাহাদের সম্বন্ধে মনে অন্য কোন রকম জঘন্য ভাব পোষণ করা আর মাতৃত্বের অমর্য্যাদা করা একই কথা। কারণ যতই অসচ্চরিত্রা হ'ক না কেন তবু সে নারী মাতৃত্বের অধিকারী। সামান্য ভুলের বশে যৌবনের একটা দিনের প্রবল লালসায় যদিই পা পিছলে থাকে তবে সেই একটা দিনের অসাবধানতায় আজীবন, তাকে সমাজে এইরূপ ঘৃণ্য হ'য়ে থাকতে হবে? যাক্ আমার উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি কিন্তু ফুটিয়ে তোলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলুম। যতদূর সম্ভব মাতৃত্বের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখিবার সহস্র প্রয়াস পেলেও কেবলই মনে হ'তে লাগল বরং মর্য্যাদা খর্ব্ব করেছি। আপনার এই দুর্ব্বলতার কি যে কারণ থাকতে পারে কিছুই স্থির করিতে পারছিলুম না। নারী-চরিত্র সম্বন্ধে একরূপ নিতান্ত অজ্ঞ, এটা স্বীকার করি, কিন্তু কল্পনার সাহায্যে যতদূর আয়ত্ত করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে বিন্দু-মাত্র ত্রুটী হচ্ছিল না, অথচ মনের ভিতরকার খট্‌কা আমার কিছুতেই যাচ্ছিল না। অন্য উপ-ন্যাস লেখকদেরও কল্পনার সাহায্য ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই বটে কিন্তু তাদের আর আমার লেখায় স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ হচ্ছিল। কেন? একটা বিষয়ে সন্দেহ হ'ল তাঁরা হয়ত ভিন্ন ভিন্ন নারীর সহিত মেলামেশা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেই অবসরে তাঁরা তাদের গতিবিধি কার্য্যকলাপ দর্শনে এবিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হ'য়ে উঠেছেন কিন্তু অদৃষ্টক্রমে অতটা অবাধ সংমিশ্রণ আমার জীবনে কখনও ঘটিয়া উঠে নাই আমার সলজ্জস্বভাব সকলেরই নিকট একটু সম্ভ্রমপূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে ফিরে আসত। তাদের নারীত্বের ক্ষুদ্রতম অংশটুকুও এই জন্যই

আমার চোখে পড়েনি হয়ত। বোধ হ'ল ইহার জন্যই উপন্যাস আমার সম্পূর্ণ অঙ্গহীন হয়ে পড়েছে এবং এই সমস্যার পূরণ করিবার নিমিত্তই একদিন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নে সেই প্রবীণ লেখকটীর শরণাপন্ন হইলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন তিনি বাড়ী ছিলেন না। প্রায় দু'ঘণ্টা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া যখন গৃহাভিমুখী হলুম, তখন দেখি অস্তগমনোন্মুখ তপনদেবের ক্ষীণ রশ্মিটুকু গ্রাস করিয়া একখণ্ড কালো মেঘ তাহার স্বল্পপরিসর দেহ ত্রেতাযুগের হনুমানের মত বিরাট আকারে পরিণত করিয়া বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে তার ক্ষুধিত জঠরের ভিতর পোরবার উপক্রম করছে। ঝড় ও জল যে অবশ্যম্ভাবী ইহা প্রকৃতির নিশ্চল নিস্তব্ধভাব দেখিয়া বুঝিতে বাকী রহিল না। বাড়ীর দূরত্ব স্মরণ করিয়া মনে যেরকম ভয়ের সঞ্চার হইল ঠিক সেই অনুপাতে আমার গতির বেগও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করলুম। দুটো মোড় ফিরতেই একটা দমকা বাতাস ধুলো বালি নিয়ে আমার চোখের উপর এসে এমনি আছাড় খেয়ে পড়ল যে চোখের উপর আমার একজোড়া পাথর না থাকলে হয়ত দৃষ্টি শক্তির কাছ থেকে আমাকে শেষ বিদায় নিতে হ'ত। কিন্তু ভগবানই যে এই দিনটী আমাকে রক্ষা করবার জন্য আমার দৃষ্টি শক্তিকে ক্ষীণ করে পাঠিয়েছেন, ইহাই মনে করিয়া তাঁর অসীম অনুকম্পার নিমিত্ত আমার মাথা নত হ'য়ে পড়ল। সকল কাজেরই তাঁর একটা না একটা কিছু রহস্য আছে, কিন্তু অবোধ আমরা সব সময়ে সে রহস্যভেদ করতে পারি না বলেই নিতান্ত মূর্খের মতই তার প্রতি দোষারোপ করি। দু'পা যেতে না যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল। ছত্রহীন আমি একান্ত নিরুপায় হ'য়ে পাশের বাড়ীর বারাণ্ডায় আশ্রয় নিয়ে প্রকৃতির এই রুদ্র মূর্ত্তি বিভোর হ'য়ে দেখতে লাগলুম। কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিলুম বল্‌তে পারি না। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল দরজা খোলার শব্দে। পিছন ফিরে দেখি একটী অনিন্দ্য সুন্দরী ষোড়শী কুঞ্চিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বল্‌ছে—বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন। ভিতরের ঘরে এসে বসুন না। জল থামলেই চলে যাবেন। প্রথমে আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। তারপর নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবেই বল্লুম—না বেশ আছি কই ভিজিনি ত। চাপা হাসিতে সে বল্‌লে ভেজেন নি কি রকম। কোঁচার কাপড় খানা দেখুন দেখি। বাস্তবিক যাহা এতক্ষণ আমার দৃষ্টিতে পড়েনি, অনুভব করতেও পারিনি, ঐ নারী এক নিমিষের দৃষ্টিতে

কি ক'রে বুঝতে পারলে। আশ্চর্য্য! শান্ত নিজের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফিরে আসতেই আমার এই নিঃসঙ্গ দুরবস্থার বিষয় মনে পড়িল। সেই অপরিচিতা নারীর কাতর অনুরোধ-যদিও ঠেলতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল না কিন্তু তাহার এই আত্মীয়তায় আমার কেমন সংশয় হ'ল। ঘূর্ণীপাক বায়ুর মত নানা অসংলগ্ন চিন্তা এসে আমার মস্তিষ্ক একেবারে ওলট পালট করে দিয়ে গেল। আমাকে বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে চাইতে দেখে সে বেশ পরিষ্কার ভাবে বল্লে—

আসতে লজ্জা করছে। তা করবে বই কি। ভদ্রলোকের ছেলে আপনারা—কিন্তু যতই আমরা ঘৃণ্য হইনা কেন—আমাদের ভিতর এমন পশু কেওই নেই যারা এমন অবস্থাতে বিশেষতঃ আপনাদের সঙ্গে কুৎসিত বিদ্রূপ ক'রে। তাহার এই স্পষ্ট নির্ভিক উক্তিতে স্মরণ হ'ল ঝড় জলের আশঙ্কায় অপেক্ষাকৃত শীঘ্র যাবার ইচ্ছায় এই ঘৃণিত পল্লীর ভিতর দিয়া আসছিলুম, আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় একটী বেশ্যারই বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি। তীব্র আত্মগ্লানিতে অন্তর আমার ভরে গেল। হায় হায়—যদি পরিচিত কেউ আমাকে এই রকম একটা অস্পৃশ্যার সঙ্গে নির্জ্জনে আলাপ করতে দেখে তাহ'লে আমার অকলঙ্ক চরিত্রের উপর কটাক্ষ করেই যে শান্ত হ'বে তা নয় আমাকে, চির জনমের মত লোকের কাছে অপদার্থ এবং ঘৃণ্য করে রাখবে। মনে হ'ল কেন আমি ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলে গেলুম না। তাহলে ত এমন যাতনা সহ্য ক'রতে হত না। নিজের ভীরুতায় নিজের উপরই আমি শতবার ধিক্কার দিতে লাগলুম। শীতল জলকণা স্পর্শেও শরীর আমার ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে উঠল। পলায়ন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না, কিন্তু রাস্তায় সেই বিপুল জল স্রোত দেখে পলায়নের আশাও আমার তিরোহিত হ'ল। আমাকে নির্ব্বাক নিস্পন্দ দেখে ষোড়শী মিনতি পূর্ণ কণ্ঠে বল্লে—একান্তই যদি না আসেন—একটা ছাতি এনে দিই। জলের ঝাট থেকে কতকটা রেহাই পাবেন। পরুষ কঠোর কণ্ঠে উত্তর দিতে গিয়া সেটা এমন নম্র আকার ধারণ করবে, আমি ধারনা করতেই পারি নি। বল্লুম আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু কিছুরই দরকার নেই। জল এখুনি থেমে যাবে একটুখানি হেসে সে বল্লে—দুঘণ্টায় থামল না, আর আপনার কথাতেই এখনই থেমে যাবে। দেখুন এই দাঁড়িয়ে কথা কওয়ার চেয়ে, ভিতরে এসে বসলে ভাল হত। কারণ এখানে এরকম ভাবে দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লোকে

যে আপনাকে ভাল মনে করবে এ আমার মনে হয় না। বরং ভিতরে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে খানিকক্ষণ বসুন—আসন পাতা আছে এই রমণীর বাক্যের যথার্থ্য বুঝতে আমার বিলম্ব হল না।—নিজের এই অসহায় বিপন্ন অবস্থার কথা স্মরণ ক'রে আমি অনন্যোপায় হ'য়ে জুতো খুলে নেমে পড়বার উপক্রম করতেই, ষোড়শী আমার গতিরোধ করে এসে দাঁড়াল। সকাতরে বল্লে—যদি একান্তই যেতে চান তাহ'লে একটা ছাতি দিচ্ছি নিয়ে যান। তাহার এই অযাচিত দয়া আমি কিছুতেই অসঙ্কুচিত হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারলুম না—অথচ তাহাকে অতিক্রম ক'রে যে চলে আস্‌ব সে শক্তিও আমার ছিল না। ইহার ভিতর শারীরিক দুর্ব্বলতা না থাকলেও মানসিক দুর্ব্বলতা যথেষ্ট ছিল। আর তা না হলেই বা অন্তরে গুপ্ত মরুভূমিটা তখন ক্রমে ক্রমে সরস হ'য়ে উঠছিল কেমন ক'রে। তার সুগঠিত দেহের পূর্ণ সুষমা আমার অন্তরের উগ্রমূর্ত্তিকে আমারই অজ্ঞাতে পলে পলে নিস্তেজ করে দিচ্ছিল কেমন ক'রে। নিস্পন্দ অবস্থায় অনিমেশ নয়নে তার দিকে চেয়ে আমার চক্ষু লজ্জায় আপনি নত হ'য়ে এল।

কতক্ষণ যে সে রকম ভাবে ছিলুম জানি না। কিন্তু আমার সে বিহ্বলভাব কাটল যখন সে শান্তমুখে স্থির কণ্ঠে বল্‌লে—যেতে আপনাকে এখন কিছুতেই দেব না। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকাটাই কি ভাল হ'চ্ছে। কি বিপদ—এই স্বেচ্ছাচারিণী কি শেষকালে এই নির্জ্জন নিশীথে একটা নিলর্জ্জ কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে। ইহার প্রভাব এখানে যে অক্ষুন্ন, অপ্রতিহত তাহা তার স্থির কণ্ঠেই আমি বুঝতে পেরে ছিলুম, কিন্তু আত্মরক্ষার উপায় ত আমার কিছুই ছিল না। অথচ বলপ্রকাশে আমার নির্দ্দোষিতা রূপান্তরিত হয়ে একটা বিকট ব্যভিচারে পরিণত হ'বে তার আশা গোল আনাই ছিল। অগত্যা আত্মসম্ভ্রম রক্ষার্থে আমি নিতান্ত কাতর হ'য়ে তার নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলুম। আমার বুকপকেটে একতাড়া কাগজকে নোট মনে ক'রে সে বল্লে আপনার মত ত বোকা লোক আমি দুনিয়ায় দেখি নি। এই দুর্য্যোগে আপনি এই একতাড়া নোট নিয়ে বেরিয়েছেন। আমার মনের মধ্যে তখন যে কি ঝড় বইছিল তা আমার অন্তর্য্যামিই জানেন। আমি নিতান্ত ক্ষুব্ধভাবে বল্লুম বোকা বই কি। তা না হ'লেই এখানে এসে পড়ব কেন। তবে ওগুলো নোট নয়। সামান্য কাগজ। সে মনে করলে যে আমি বোধহয় গোপন করবার জন্যেই সামান্য

কাগজ নয়ুন। তাই সে ঈষৎ বক্রহাসি হেসে বল্লে ভয় নেই কেড়ে নিচ্ছি না। কতগুলি টাকা নিয়ে বেরিয়েছেন বলুন দেখি। আমি নিতান্ত ভীতভাবে বল্লুম দোহাই আপনার আপনি যা ভাবছেন তা নয়! ওগুলো কতগুলো গল্প লিখেছি। একজনকে দেখাতে গেছলুম। ফিরে আসার পথে এই দুর্ঘটনা। সে নিতান্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্লে একবার আপনি ঐ কথা বলে আমাকে বিঁধছেন কেন বলুন দেখি। আপনি এখানে এসে জলে পড়ে নেই ত, আর আমরা কিছু বাঘিনীই নয় যে একগালে আপনাকে খেয়ে ফেলব। বরং বাইরে জলে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন, ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছি। এতে আর কি দোষ হ'য়েছে। মনে মনে বল্লুম— বাঘিনী নও বটে কিন্তু সেই রকম গোষ্ঠের কিছু। তারা মুহূর্ত্তের মধ্যে পেটে পোরে—আর তোমরা পলে পলে তিল তিল ক'রে মারতে থাক। কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। বেরুলে হয় ত আজ নিজেকে এতখানি ঘৃণ্য হ'তে হ'ত না। বাহিরে পবনদেব তখনও অশ্রান্ত-গর্জ্জনে হা হুতাশ ক'রে কিসের ব্যর্থ অনুসন্ধান করছিল। বৃষ্টির ধারাও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হ'য়ে উঠছিল; ষোড়শী মুচকে হেসে বল্লে— "আজ যে রকম আকাশের অবস্থা দেখ্‌ছি— বোধ হয় বা এইখানেই রাত্রিবাস করতে হয়।" বলেই উচ্চহাস্যে আমার বুকের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দমিয়ে দিলে। আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌ল। আমি কেবল তার চপল হাসি-বিচ্ছুরিত মুখের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলুম। এ নারী বলে কি? ইহার কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস পূর্ণমাত্রায় থাকলেও সেটাকে উপেক্ষণীয় বলা ত চলে না। ইহাকে বাক্য সফল করতে বিশেষ বেগ পেতেও হবে না। কিন্তু আমার এরূপ অবস্থায় মাথাটা ঘুরে গেল। "চা হয়েছে মা" তার চাকরের তীব্র কণ্ঠস্বরে যখন আমার এই ঘৃণিত অবস্থা চিন্তা করবার পুনরায় চেতনা পেলুম, তখন দেখি— ষোড়শী এক কাপ গরম চা ও কিছু বিস্কুট নিয়ে ত্বরিতপদে আমার দিকে আস্‌ছে। আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই সে বল্লে—"আমি তাড়াতাড়ি আসছি, ভয় হ'য়েছিল পাছে আপনি চলে যান্! নিন্ বড্ড মিইয়ে গেছেন। শরীরটাকে একটু তাজা করে নিন। আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার কার্য্যকলাপ দেখতে লাগলুম। ইহার ভিতর কোন সময়েই বা চা করতে আদেশ দিয়েছিল, কোন সময়েই বা উঠে গিছল, কিছুই আমি ধারণা করতে পারছিলুম না। আমার কুহেলিকাচ্ছন্ন অন্তরে কিছুতেই এই কথার কোন সদুত্তর এল

না। কেন এই নবীনা আমাকে এরূপ আদর যত্ন করছে। এর পিছনে কি যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে,—আমি তাহার কিছুই ঠিক করতে পারছিলুম না! আমার এই বিমুগ্ধ ভাব দেখে সে নির্ব্বিকারচিত্তে বল্লে—"বেশ্যার হাতে খেতে ঘৃণা হ'চ্ছে? কিন্তু আজকালকার সমাজ-সংস্কারকগুলি এতে তো কোনও দোষ দেখেন না। আপনি যখন সেই দলের লোক, তখন ইহাতে আপনার শরীর গরম করা ছাড়া আর অন্য কিছু গরম ক'রবে না। এখন খেয়ে নিন।" কি আশ্চর্য্য! যে সব সমস্যা সমাধান ক'রতে গিয়ে আজ আমি এই দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হ'য়েছি—এ নারী সে সমস্যা আরও জটিল ক'রে দিচ্ছে। এর পূর্ব্বে আমি কখনও আত্মীয় ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত নিঃসঙ্কোচে কোন কিছু কথা কই নি, কিন্তু আজ এই নারীর এতক্ষণের এই সরল কথা-বার্ত্তায় আমার অন্তরে সাহস একটু একটু ক'রে পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছিল। তাহাকে অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করলুম—"জান যদি এ পথটা এত পিচ্ছিল, তবে সাধ ক'রে এ পথে পা দিলে কেন।" সে বিবর্ণমুখে উত্তর দিলে—"দেখুন, ও কথা জিজ্ঞেসা ক'রে কেন আমার ক্ষতের জ্বালা বাড়িয়ে দেন। সে কথা আমি বলবও না, আর-বলতে পারবও না।"

তাহার এই নির্ভীক উত্তরে আমি কৌতূহলী হলুম; বল্লুম—"ক্ষতটা ত করেছ নিজেই, তবে জ্বালার ভয় করলে চলবে কেন? নিজের অতৃপ্ত বাসনাকে পূর্ণ ক'রতে গিয়ে, এখন তার ফলভোগ করছ। এখন যত দিন যাবে, ক্ষতের জ্বালা বাড়বে বই কমবে না। কথাগুলি যে তাকে এত আঘাত দেবে তা পূর্ব্বে জানতুম না। দেখলুম, তার লজ্জারুণ মুখখানি একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। সে কতকাল চুপ ক'রে থেকে অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হ'য়ে বল্লে—'কমবে না জানি কিন্তু সেটা আপনাদের শাস্ত্রকারদের অসীম অনুকম্পার বলে। দেখুন দেখি সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কাল—এই চার যুগেই নারীজাতিকে শাস্ত্রকারগণ কি রকম অবজ্ঞার চক্ষে দেখে গেছেন, কি রকম কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিয়ে গেছেন। যে নারী সমস্ত জগৎ সৃষ্টির মূলাধার, বিশ্ব মাতৃকার পূর্ণ স্বরূপ, তাঁদের এ রকমে নিগৃহীত ক'রে লাভ হচ্ছে কি—দেশে যথেচ্ছারিতা প্রকাশ্যে না হ'ক, গোপনে যথেষ্ট বেড়ে উঠেছে। তাদের কিছুতেই সামান্য একটুও স্বাধীনতা দেন নি।" তার ভাবের সমুদ্রে বাণ ডেকে উঠেছিল, অনর্গল বকে যেতে লাগল। আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়ছিলুম। কারণ

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, এবং পশ্চিম আকাশে পাতলা মেঘের ফাঁক দিয়ে খণ্ড চাঁদের ম্লান আলো দেখা যাচ্ছিল। উঠে দাঁড়াতেই সে একটা ছাতি আমাকে দিয়ে উচ্ছাস ভাবটা চেপে বল্লে—"আজ আপনি চা খেলেন না। কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, আর একদিন না খাইয়ে ছাড়ব না।" আমি নিতান্ত অন্যমনস্ক হ'য়েই ছাতিটা হাতে করে বেরিয়ে পড়লুম।

মনতোষ বলিল—"আর কেন ভায়া, এইবার কলঙ্ক স্নান করে ফেল; তারপর ছাত দিবার অছিলায় নারীর সংসর্গে আসিয়া নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্খাও মিটল, আর সাহিত্য-সাধনার পথে মনোবিজ্ঞানের প্রধান খোরাক্ জুটিয়ে নিলে। কিছুদিন পরে বিবেকের চাবুক খেয়ে আবার যে ক্ষিতীশ সেই ক্ষিতীশ—কেমন এইত।

ক্ষিতীশ নিরুত্তরে অধোমুখে বসিয়া রহিল

প্রথমপর্ব্ব সমাপ্ত।

মিলনে।

[শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী]

আজি মধু মাসে,
আকাশে বাতাসে
উছলি উঠিছে মধুর ধারা।
নিখিল ভুবন,
পুলক মগন,
আবেশে বিহ্বল আপন হারা,
কোকিল ধরেছে
মোহন ছন্দ
কুসুম ঢালিছে মধুর গন্ধ,
আকুল পাপিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
ছড়াইছে পূত পীযুষ ধারা।
লহরে লহরে সুধা উথলায়,
প্রকৃতি হাসিছে আলো সুষমায়,

এ শুভ লগনে পাইয়া তোমায়,
পুলকে হয়েছি পাগল পারা।
সার্থক হয়েছে সব আয়োজন,
পেয়েছি অতিথি মনের মতন,
মাতায়ে সুবাসে হৃদয় কানন,
বাসনা কুসুম ফুটিল সারা।
একি আনন্দ একি প্রেম ঢালা,
দিলে প্রীতি রাশি নিভে গেল জ্বালা,
নাহি আকিঞ্চন জুড়ায়েছে আলা,
হরষে নাচিছে হৃদয়ে তারা।
নিখিলের এই বিকাশ ধরায়,
কি দিয়ে কিরূপে তুষিব তোমায়,
আছে শুধু প্রেম, অনাবিল হেম,
হৃদয়ে নিঙাড়ি লহ গো সারা।

কহিনুর বা ভারত ভাগ্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-ডি।

ট্যাভারনিয়ারের বর্ণিত বৃত্তান্তে জানিতে পারা যায় যে, মোগলের বিখ্যাত হীরক খণ্ড আমীরজুম্লা কর্ত্তৃক কলুর খনি (Coulour or kolur) হইতে সংগৃহীত হয়। ডাক্তার বল (V. Ball), ভারতবর্ষে জিওলজিক্যাল সার্ভে সংক্রান্ত কার্য্য করিতেন। পরে তিনি ডবলিনের বৈজ্ঞানিক যাদুঘরের পরিচালক (Director of the Science and Art Museum) হন। ভারতবর্ষে অবস্থান কালে তিনি ট্যাভারনিয়ার বর্ণিত পন্থা অনুসারে কলুর গ্রামে উপনীত হয়েন। কৃষ্ণা নদীতীরে এই গ্রাম অবস্থিত আছে। ইহার উত্তর (অক্ষাংশে) অক্ষ ১৬২৪০ ৩০" ও (দেশান্তরে) দ্রাঘিমা ৮০' ৫"।...... মসলিপটম হইতে গোলকুণ্ডা (হায়দ্রাবাদে) যাইবার একটী পুরাতন পথের পার্শ্বে কলুর গ্রাম; এই স্থানে যে পূর্ব্বে খনির কার্য্য হইত তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই হীরক প্রাপ্তির ঠিক সময় নির্দ্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ১৬৫৬ বা ১৬৫৭ খৃঃ-অঃ মীরজুম্লা সম্রাট সাজাহানকে এই হীরক উপহার প্রদান করেন। সেই সময়ে এই হীরকের ওজন ৯০০ রতি।

পুরাকালে কলুর খনি হইতে যে হীরক সংগৃহীত হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমীরজুম্লা যে কলুর খনি হইতেই এই বহুমূল্য হীরক প্রাপ্ত হয়েন তাহার কোন নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। মীরজুম্লা, কলুর খনি ব্যতীত হিন্দুদিগের উপাস্য অনেক দেবদেবী মুর্ত্তি ভগ্ন করিয়া বহুমূল্য মণি-মাণিক্য অপহরণ করেন। কর্ণাটিক অধিবাসীদিগকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তাহাদের সমস্ত গুপ্ত ধন সম্পত্তি অধিকার করেন। সুতরাং কোহিনুর বা মোগল হীরক কলুর খনি হইতে প্রাপ্ত বা কোন দেবমুর্ত্তি হইতে গৃহীত তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

"He plundered the temples of their writs; he seized upon all precious stones with which the statues were ornamented, he compelled the inhabitants of the Karnatic ,to surrender to him whatever they possessed of gold

and jewels, and he caused those who according to the custom of the country had buried their treasures to expire under the severity' of the lash."

—Catron.

মিরজুম্লা যে সাহাজান বাদসাহকে একখণ্ড বৃহৎ হীরক উপহার প্রদান করেন, তাহা বার্নিয়ার নিজ বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কতিপয় বৎসর মোগল দরবারে চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার বর্ণিত বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, মীরজুম্লা যখন বাদসাহ সাহাজানের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়েন, সেই সময় তিনি এই বহুমূল্য রত্ন দিল্লীশ্বরকে উপহার প্রদান করেন। সম্রাটের সেনাপতি পদে নিয়োজিত হইবার পূর্ব্বে মীরজুম্লা গোলকুণ্ডাধিপতীর সেনানায়ক ছিলেন এবং গোলকুণ্ডা হইতেই তিনি কোহিনুর হস্তগত করিয়াছিলেন। হুমায়ুণ পারস্যে অবস্থান কালে পারস্যসাহ টাহামাস্পকে যে একখণ্ড বৃহৎ হীরক প্রদান করেন তাহা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। টাহামাস্প সাহ এই হীরক অকিঞ্চিৎকর বোধে দাক্ষিণাত্যের কোন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীকে প্রদান করেন। এই রূপে সেই হীরক পারস্য দেশ হইতে পুনরায় ভারতবর্ষে নীত হয়। পরে এই হীরক মীরজুম্লার হস্তগত হয়। তিনি সাহাজানকে উপঢৌকনস্বরূপ ইহা প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রলেণ্টাইন "বল" কর্ত্তৃক লিখিত বৃত্তান্ত বিশ্বাস করিয়াছেন যে, "কলুর খনি হইতেই মোগলের হীরক মীরজুম্লা প্রাপ্ত হয়েন।" কিন্তু ষ্টানলি পুল তাঁহার বাবর নামক গ্রন্থে ১৬৭ পত্রের টীকা রূপে লিখিয়াছেন যে, বাবর যে সেই হীরক পুনর্ব্বার দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতেন না।

সাজাহান দিল্লীর সম্রাট হইলে, জগদ্বিখ্যাত ময়ুর-সিংহাসন নির্ম্মিত হইল। সহস্র হীরকখণ্ডে সেই আসন ঝলমল করিতে লাগিল। কোহিনুর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল। ইংরাজলেখকেরা বলেন যে ময়ুর-সিংহাসনে মহামূল্য হীরক সকল ইউরোপীয় স্থপতিবিদ্‌গণের দ্বারা গ্রথিত হয়। ইউরোপীয়গণ যে সর্ব্ববিদ্যায় ও সর্ব্ববিষয়ে সুনিপুণ তদ্বিষয়ে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ প্রমাণ না থাকায় তাঁহাদের বর্ণিত বৃত্তান্তে অবিসংবাদিত রূপে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। কুতবমিনার, জুম্মা-মস্‌জিদ ও তাজমহল নির্ম্মাতাগণের পক্ষে

ময়ুর-সিংহাসন নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। *

সাজাহানের রাজত্বের শেষ অবস্থায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রাজ্যলিপ্সা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার পরিণাম স্মরণ করিলে এখনও মানব মনে দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হয়। বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ, ভ্রাতৃগণকে হত্যা, এমন কি নিরপরাধ ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রাণসংহার করিয়া দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিখ্যাত ফরাসী-পর্য্যাটক ট্যাভারনিয়ার দিল্লীনগরীতে আগমন করেন।

১৬৬৪ বা ১৬৬৫ খৃঃ অঃ আরঙ্গজেব পর্য্যাটক ট্যাভারনিয়ারকে তাহার আগ্রার ধন-ভাণ্ডারে ধন-রত্ন প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। আরঙ্গজেব তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সম্রাট সাজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া বহুরত্ন সহ কোহিনুরও হস্তগত করেন। সেই সকল বহুমূল্য রত্নমধ্যে তিনি মোগলের বিখ্যাত হীরক দেখিতে পান! ফরাসী পর্য্যাটকের বর্ণনা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, এই হীরকের আকার অর্দ্ধ ডিম্বের ন্যায়। ওজন ২৭৯$\frac{9}{16}$ কয়রাট (২৬৮$\frac{1}{2}$ ইংরাজী ক্যারাট) ৩ ৯$\frac{1}{2}$ রতি বা ৬$\frac{1}{2}$ ভরি। পূর্ব্বে ইহার ওজন ৭৯৩$\frac{5}{8}$ ক্যারাট, ৯০৭ রতি বা ১৮ ভরি ছিল। ট্যাভারনিয়ার তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই হীরকের একখানি প্রতিকৃতি দিয়াছেন। ইহার মূল্য ৮৭৯,২৪৫ প', ১৮ শি, ১$\frac{1}{2}$ পে, এইরূপ তাঁহার অনুমান। কিরূপে এই হীরক পূর্ব্বাপেক্ষা ওজনে অল্প হইল তাহা ট্যাভারনিয়ারের বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইউরোপে এই হীরক থাকিলে ইহা বিভিন্ন প্রথায় কর্ত্তিত হইত ইহার মধ্য হইতে কতিপয় ভাল অংশ বাহির করিয়া লইলে ইহার ওজন বিশেষ অল্প হইত না। তাহা না করিয়া এই হীরককে ঘর্ষণ দ্বারা এইরূপ আকৃতি দেওয়া হইয়াছে। হোর্টেনাসও বর্দি'ও নামক একজন ভিনিসবাসী মণিকার ইহার কর্ত্তন কার্য্য সম্পন্ন করেন। কার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই বলিয়া তিনি পুরস্কার পাওয়া দূরে থাকুক, সহস্র মুদ্রা জরিমানা প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন। বর্দি'ও যদি তাঁহার ব্যবসা ভালরূপে জানিতেন তাহা হইলে

* চাপুজ্যো ট্যাভারনিয়ারের ভ্রমণকাহিনী, তাঁহার দৈনন্দিন বৃত্তান্ত ও পত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া (১৬৬১ খৃঃ অঃ) হিসটোরি ডি মোগ্ল নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ট্যাভারনিয়ার তখন ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার পঞ্চদশ বৎসর পরে ট্যাভারনিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রথম প্রকাশিত হয়।

এত ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ঘর্ষণ না করিয়া তন্মধ্য হইতে একখণ্ড বৃহৎ হীরকাংশ বাহির করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তিনি বিশেষ সুদক্ষ মণিকার ছিলেন না।* কিং ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ, "ট্যাভারনিয়ারের এই শেষোক্ত বাক্যগুলি বাদশাহকে প্রতারণা করিবার জন্য" এইরূপ মন্তব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু "ডাঃ বল" মূল বিবরণী বিশেষ গবেষণাদ্বারা পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ উক্তি অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ট্যাভারনিয়ার উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিনা ঘর্ষণে এই হীরক হইতে সহজেই ইহার দানা বাহির করিতে পারিতেন। এবং সেই বহিষ্কৃত হীরকাংশ বাদসাহের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

আরঙ্গজেবের কুট রাজনীতি ক্রমে মোগল সাম্রাজ্যকে হীনবল করিয়া তুলিল। জিজিয়া কর স্থাপন প্রভৃতি অত্যাচার হিন্দুদিগের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিল। মোগল-কুল-রত্ন আকবরের উদার রাজনীতির কৌশলে হিন্দু ও মুসলমানের হৃদয় হইতে জিত ও জেতা ভাব লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, ইঁহার রাজত্বকালে তাহা শতধা প্রবল হইয়া উঠে। আওরঙ্গজেব অত্যন্ত পরিশ্রমী, নিরতিশয় বুদ্ধিমান ও প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। শৌর্য্যে-বীর্য্যে আকবরের বীরত্ব-গরিমাও ইঁহার নিকট হীনপ্রভ হইয়াছিল। স্বহস্ত রোপিত বিষবৃক্ষের বিষময় ফল ভোগ ইঁহার শুভাদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার জীবিতাবস্থায় যে বিদ্রোহানল অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা ঘোর দাবানলে পরিণত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মোগলের পক্ষে সে তেজ অসহনীয় হইল। তাঁহার সন্ততিগণ সর্ব্বপ্রথমেই সেই অনল স্পর্শে পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইলেন। গৃহবিচ্ছেদে ভারত পুনরায় বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে আফগানবীর নাদেরসাহ ভীষণ নাদে ভারতে প্রবেশ করিলেন। জীর্ণপ্রায় ভারতসাম্রাজ্য একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। দিল্লী অনায়াসেই নাদেরসাহের অধিকৃত হইল। ধনাগার লুণ্ঠিত হইল। দিল্লীর রাজপথে নিরপরাধ নগরবাসীদের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। একমাসকাল ব্যাপিয়া এই ব্যাপার চলিতে লাগিল। এক মাসের অত্যাচারে দিল্লী নগরী ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। ময়ূর-সিংহাসন ও কোহিনুর ভারত হইতে আফগানিস্থানে নীত হইল।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতায়

অদ্ভুত জুয়াচুরি।

রহস্যপূর্ণ ঘটনা।

(শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র)

আজকাল চাকুরি মেলা যে এক প্রকার দুঃসাধ্য, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু Service Securing Agency, Bureau, Mart প্রভৃতি নামধেয় অসংখ্য আড্ডা ভারতবর্ষের নানাস্থানে চা'য়ের দোকানের মত গজাইয়া উঠিতেছে। এই সকল এজেন্সির পনর আনা রকম জুয়াচোর। ইহারা চাকুরীপ্রার্থী ব্যক্তিদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া "Registration or Enrolment fee" বাবত মোটামুটি কিছু প্রথমেই আদায় করিয়া লয়, তৎপরে কতকগুলা ভবঘুরে গাঁটকাটার সহিত একটা জুয়াচুরি আড্ডা (Bogus firm) সৃষ্টি করিয়া তথায় তালিকাভুক্ত কর্ম্ম-প্রার্থীদিগকে চাকুরি দিবে বলিয়া আশা দিয়া প্রথম মাসের সমস্ত বেতন অথবা অর্দ্ধেক বেতন আগে আদায় করিয়া লইয়া থাকে। আজকাল সংবাদ পত্রাদিতে টাকা জমা রাখিয়া চাকুরি খালির বিজ্ঞাপন মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা নাম ও ঠিকানা গোপন রাখিয়া "International Trading Coy, Universal Trading Association" প্রভৃতি নাম দিয়া এবং একটা Post Box নম্বর দিয়া দুই এক মাসের জন্য একটা জাঁকাল রকমের অফিস খাড়া করে। পরে চাকুরি সংগ্রহকারী আড়কাটির মারফত অগ্রিম টাকা জমা দিয়া চাকুরী প্রার্থীদিগকে নানাপ্রকার designation দিয়া নিযুক্ত করিতে থাকে। জমার টাকা যথেচ্ছাভাবে খরচ করিয়া যখন "ভাঁড়ে মা ভবানি" হয়, তখন গা আড়াল দেয়। এই প্রকার জুয়াচোরের দল আজকাল কলিকাতায় ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। পুলিশ কি করিতেছে? প্রতারিত ব্যক্তিগণ আদালতে ফৌজদারি বা দেওয়ানি মকদ্দমা রুজু না করিলে, সাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া এই সকল বাটপাড়ের দল অবাধে কিছু মোটামুটি মারিয়া সরিয়া পড়ে! বলিহারি আজব সহর কলিকাতা! তোমার অনন্ত মহিমা বুঝে এমন সাধ্য কাহার আছে?

বেশীদিনের কথা নয়, দীননাথ মজুমদার

নামক একজন স্কুলের মাষ্টারের মাথায় খেয়াল চাপে যে সে একটা Bank স্থাপন করিয়া মস্ত মস্ত বড় লোক হইবে। অবশ্য তাহার পিছনে একটা বড় রকমের Service Securing Agency ছিল। মাষ্টারি বুদ্ধিতে জুয়াচুরি কুলাইবে না বলিয়া সে কতিপয় নামজাদা লোককে তাহার পরামর্শ দাতা নিযুক্ত করিয়া একদিন প্রভাতে সত্য সত্যই কলিকাতা সহরের বুকের উপর ২১নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে, "The Labourers Union Bank Limited" নাম দিয়া এক Bank খুলিয়া বসিল। দীননাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী যুবক, বয়ঃক্রম ৩৫এর উর্দ্ধ হইবে না। Bank খুলিবার পূর্ব্বেই Share application form প্রায় এক লক্ষ ছাপাইয়া ফেলিয়াছিল। Prospectus ছাপা হইতেও বিলম্ব হইল না। কিন্তু এই ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টারগণের নাম জানিলে কেহ হঠাৎ অবিশ্বাস করিতে পারিবে না—অন্ততঃ কাহারও অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিতে প্রবৃত্তিও হইবে না। তবে পড়ুন—

পরামর্শদাতা—মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ বি, এল'

ডাইরেক্টরগণ—১। রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, হুগলী ২। মিঃ বি, কে, সরকার বি-এস-সি (লণ্ডন) মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার কলিকাতা। ৩। মিঃ রামবিলাস রামনারায়ণ, মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার কলিকাতা ৪। মহম্মদ হবুবুল্লা, ইশাপুর, কলিকাতা ৫। মিঃ ডি, এন মজুমদার এম এ, এম আর এ এস (লণ্ডন) মার্চেণ্ট, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং প্রভৃতি।

হিসাব পরিদর্শক—মিঃ এস সি দত্ত, চারটার্ড এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট।

সলিসিটার—মিঃ এচ এন দত্ত এম এ বি এল।

ব্যাঙ্কর্স—টাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড, এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলা (লালবাতি জালিয়াছে) ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিগত ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে সংস্থাপিত হইয়া ১৯২২ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কটী দীননাথ মজুমদার এবং তাহার কতিপয় পরামর্শদাতা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। এই ব্যাঙ্কের কাহিনী অতি অদ্ভুত। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডি, এন মজুমদারের বিরুদ্ধে অন্যূন ৩০।৪০টী দেওয়ানি ও ফৌজদারি মকদ্দমা বিভিন্ন আদালতে দায়ের হওয়ায় মজুমদার নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার পশ্চাতে সরকারী Proclamation এখন ঘুরিতেছে, কিন্তু বড়ই

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, Labourers Union Bank Limited নামধের Sign Boardটী ২১নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে এখনও শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কেন Registrar of Joint Stock Company কি এখন কিছু জানেন না?

(ক্রমশঃ)

ওপারের কথা।

(শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

দিনের পর দিন যায়,—জীবনের এক একটী অঙ্ক শেষ করিয়া যায়, অবশেষে একটি অভিনয় সম্পূর্ণ হইলে একদিন কালের যবনিকা অন্তরালে জীবাত্মা চলিয়া যায়। রাখিয়া যায় এই অস্থি-চর্ম্ম-সার রঙ্গমঞ্চ, পড়িয়া থাকে এই নশ্বর কলেবর। তখন মুখ আর বলে না, চরণ আর চলে না, নয়ন আর দেখে না, হস্ত আর গ্রহণ করে না। কিসে এমন হইল, কে সে শক্তি হরণ করিল। নাটের নট গেল কোথায়?

তোমরা এই আত্মাহীন জড়দেহটার জন্ত শোক কর, বল যে লোকটী জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে; তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে ইহ জগৎ হইতে পর জগতে চলিয়া গিয়াছে। দেহটী যতক্ষণ পড়িয়া রহিল, তাহার অভাব-সূচক কত কথা কহিলে, পরে সেই দেহ দাহ করিয়া পঞ্চভূতে মিশাইলে। চিতা নিভিল প্রত্যক্ষ শেষ স্মৃতিটুকু দূর হইল; সকলে হাহাকার করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে, সব শেষ হইল।

কিন্তু কি ফুরাইল, কিসের অভাব-জনিত হাহাকার তুলিলে, ইহ-পর-জগতের ব্যবধান কতটুকু—সে সকল কথা কি একবারও ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে? সত্যই কি দেহের বিকার পরিবর্ত্তন বা মৃত্যু ঘটিলে সে দেহের আশ্রয় স্থল, শক্তি সঞ্চারক আত্মা ধ্বংস হয়? তোমার শাস্ত্র বলিবে, না তাহা কখনও নহে। প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞানী বলিবেন, না তাহা হইতে পারে না। বিশ্ব-ব্যাপী বিরাট সত্যে প্রতিধ্বনিত হইবে—না, আত্মার বিনাশ নাই।

বেশ কথা, যদি এতটুকু জানা গেল যে, আত্মাই দেহের শক্তি সঞ্চারক, আত্মার দেহস্থিত অবস্থায় দেহের ক্রিয়া হইয়া থাকে, সেই ক্রিয়া-জনিত সুখ-দুঃখ দেহের কর্ত্তা আত্মা অনুভব করেন এবং সেই আত্মা, জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নব দেহ ধারণ করে; তবে কিসের জন্ত শোক

কাহার অভাবজনিত হাহাকার? প্রভেদ এই যে ইহজগতে যে আত্মা যে ভাবে জড়দেহে বাস করিতেছিল পরজগতে সে আত্মা আপন অনুরূপ সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া সেইভাবে বাস করিয়া থাকে। তবে ইহজন্মে যাহা স্থূল জড়, পর-জগতে তাহাই সূক্ষ্ম কারণ জড়বস্তু পারলৌকিক বিধানের কোন সংস্রবই রাখে না একথা কে না জানে? বিজ্ঞানের বস্তু-পরীক্ষায় ইহা নিত্য প্রমাণিত হইতেছে, সেইজন্য মৃত্যুর পর অর্থাৎ আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিবার পর দেহটী নষ্ট হইয়া যায়।

হরিচরণ মরিয়া গেল, তাহার জড়দেহ দাহ করিয়া ফেলিলে তোমরা কাঁদিয়া বলিলে আহা হরিচরণ নাই। কিন্তু তোমাদের সম্মুখে তোমাদের মতন হইয়া হরিচরণ নাই বলিয়া কি তাহার অস্তিত্ব লোপ হইল? সেকালের বৈজ্ঞানিক কপিল ঋষি, সাংখ্য-দর্শনে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আর আজকালের পাশ্চাত্য জগতের পাসকেল, নিউটন্, গ্যালিলিও প্রভৃতি মাথা ঘামাইয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছেন তাহা কি জান না? তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বে যাহা আছে, তাহা চিরকালেই আছে; কোন বস্তুর অস্তিত্ব লোপ হয় না। অর্থাৎ পদার্থে আকার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র,একশ্রেণী অন্য শ্রেণীতে পরিণত হয় মাত্র, সেই পরিবর্ত্তনকে লোকে ধ্বংস বলিয়া থাকে। ধ্বংসের পূর্ব্ব ও তৎপরবর্ত্তী অবস্থার যে ব্যবধান, তদনুসারে নাম ও রূপের পার্থক্য আসিয়া পড়ে। যাহা ছিল কুঁড়ি তাহা হইল ফুল, যাহা ছিল ফুল তাহা হইল ফল—একই পদার্থে অবস্থা পরিবর্ত্তন অনুসারে একের ধ্বংস ও অপরের উৎপত্তি হইল। বাহ্যিক স্থূল আকারের ধ্বংস হইল কিন্তু অন্তর্নিহিত শক্তি সকল অবস্থার সমানভাবে সুপ্ত থাকিয়া বাহিরে যাহা প্রকাশ করিল তাহাই দেখিতে পাওয়া গেল। ফল হইতে সেই শক্তি আবার বীজে পরিণত হইল।

মানব জীবনেও সেইরূপ। হরিচরণের জড়দেহ হইতে যে আত্মা বাহির হইয়া গেল তাহার অস্তিত্ব লোপ হইল না তাহা অন্য আকারে পর জগতে প্রকাশ পাইল। সে প্রকাশ তুমি আমি জড় চক্ষে দেখিতে পাই না বলিয়া কি পর-জগতের ব্যাপার হাসিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে?

একবার অমেরিকার পানে চাহিয়া দেখ, পাশ্চাত্য সভ্য-জগতের পানে চাহিয়া দেখ,—তাহারা পরজগতের ব্যাপার লইয়া কি অভিনব আন্দোলন করিতেছে, কি অদ্ভুত রহস্য সকল প্রকাশ করিতেছে জীবন ও মরণের ব্যবধান স্থলে কেমন একটী মধুর ভাব স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা মরণকে ধ্বংস বলে না রূপান্তরিত জীবন বলিয়া থাকে, তাহারা মৃত ব্যক্তির অভাবে আকুল হয় না, পরজগৎ হইতে তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া কি আনন্দের সম্বাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

এ শক্তি এককালে তোমাদের দেশে ছিল, আজ আলোচনার অভাবে বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু চিরতরে বিস্মৃত হইও না; পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তোমরাও সে সাধনায় প্রবৃত্ত হও। তাই বলি যাহা তোমাদেরই শক্তির অন্তর্গত, যাহা তোমাদের সাধনার ফলরূপে নিরূপিত তাহাতে সন্দেহ বা বিদ্রূপ না করিয়া

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, তুমি এ জগতে কেবল পশুর ন্যায় আহার বিহার করিতে আইস নাই, কেন না তাহা হইলে জগতে মানুষের আবির্ভাবের আবশ্যকতা ছিল না। তোমার অন্তর্হিত যে মহাশক্তি, যাহা পশুদের নাই, তাহাকে উজ্জীবিত কর; দেখিবে জগৎ-সংসার তোমার পরিচর্য্যার জন্য কি অমৃত ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

সে অমৃত তোমাদেরই। তোমরাই সে অমৃতের যথার্থ অধিকারী। অহঙ্কার, গর্ব্ব, মায়া পাশ ছেদন কর, অমর্থক খেয়াল হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়াইও না। চিন্তাস্রোত সংযত কর, সেই সংযত-চিন্তা-প্রবাহ আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে ধাবিত কর। দেখিবে, মৃত্যু-রহস্য কি অনির্ব্বচনীয়। এ জীবন কেবল হাস্য কৌতুক ও আহার বিহারে ব্যয়িত হইবার নহে। ইহার অন্তরালে কত মহৎ হইতে মহত্তর কার্য্য তোমার প্রতি নির্ভর করিতেছে। [ক্রমশঃ।]

বিবিধপ্রসঙ্গ ও সমালোচনা।

তারকেশ্বর—

তারকেশ্বরে ব্যাপার ক্রমে জটিল হইতেছে। শান্ত সত্যাগ্রাহীদিগের উপর নির্ম্মম অত্যাচার হইতেছে। বালক বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে তারকেশ্বরের পথে চলিয়াছে সত্যাগ্রহ দ্বারা তাহাদের ন্যায্য অধিকার গ্রহণ করিতে। এই ভীষণ পরীক্ষায় বাংলার জনমত যদি জয় লাভ করে তবে সমগ্র ভারতের দেবস্থানের অনাচার সমূলে নষ্ট হইবে। সমুদ্র মন্থনে যেমন হলাহল উত্থিত হইয়াছিল তেমনই সুধাও সংগৃহিত হইয়াছিল। কে বলিতে পারে সত্যাসন্ধ বাঙ্গালী সত্যাগ্রহীদের এই দুঃখ বিপদের হলাহলের সহিত পরে শান্তি সুধা সংগৃহীত হইবে না যে শান্তি সুধা পান করিয়া বাঙ্গালী নবজীবন লাভ করিবে, বাংলা হইতে দেবস্থানের অনাচার অত্যাচার সমূলে দূর করিবে?

নারী নিগ্রহ—

আজকাল আমরা সংবাদ পত্রে প্রায়ই নারী নিগ্রহের সংবাদ পাইতেছি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ স্থলে নির্য্যাতিত রমণী হিন্দু এবং নির্য্যাতন, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমাদের মনে এই প্রশ্নই উদয় হয়—আমরা কি ক্রমে এত হীন বল হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের স্ত্রী কন্যা ভগিনীর জননীর ধর্ম্ম মান ও ইজ্জত দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক দলিত মথিত হইবে আর আমরা দূর হইতে তাহা দেখিব এবং পরে ভাগ্যের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইব। দেশের শাসন কার্য্য যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত তাঁহাদের এ দিকে দৃষ্টিদিবার অবসর নাই। তাহারা, কোথায় কে নিরুপদ্রব অসহোযোগ নীতি প্রচার করিতেছে, কে মদের দোকানে পিকেটিং করিতেছে, কে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিবার জন্য লোককে উৎসাহিত

করিতেছে সেই সব অনুসন্ধানে তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি চেষ্টা অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন। দুর্ব্বত্ত গুণ্ডারা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে। দেশের এ দুর্দ্দিনে আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রত্যেক গ্রামে কিংবা ২।৩ টী গ্রাম লইয়া এক একটী সঙ্ঘ গঠিত করিতে হইবে, এবং গ্রামস্থ কিংবা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দুর্ব্বৃত্তগণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুবিধা বা সুযোগ [illegible] পূর্ব্বাহ্নে নিকটবর্ত্তী সঙ্ঘ হইতে সাহায্যের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যাঁহারা সহরে কিংবা নিরাপদ স্থানে বাস করেন তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। তাঁহারা আজ মনে করিতেছেন আমরা বেশ নিরাপদে দূরে বাস করিতেছি। কিন্তু তাহা নয় দুর্ব্বৃত্তগণ সংখ্যায় ও শক্তিতে যেরূপ দিন দিন বাড়িতেছে তাহাতে অত্যাচার একদিন সহরে তাঁহাদের উপরও হইতে পারে। তাহাদিগকে এই সব অনুষ্ঠানে উৎসাহ ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে হইবে। দুর্ব্বৃত্তগণের দুষ্কার্য্যে প্রাণপণ বাধা দিতে হইবে প্রায়ে যাহাতে আইনমত চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয় তাহার বিধিমত চেষ্টা করিতে হইবে।

টাকার মোহ—শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম-এ বি-এল মূল্য ১।০

আমরা বইখানি পড়িলাম পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ভাষা বেশ ঝর ঝরে এবং প্লটটীও সুন্দর ও করুণ। আজকালকার দিনে বরের বাজার যেরূপ দুর্ম্মূল্য এবং বরের বাপেদের যেরূপ “খাঁই” তাহাতে এরূপ ধরণের বই যত দেখিতে পাওয়া যায় ততই ভাল। আমরা যে সব বরের বাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধী ধারী পুত্রের বিবাহে কিছু “দাঁও” এর আশায় বসিয়া আছেন তাঁহাদের একবার এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

শান্তি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল্য ৸০ আনা।

এক খানি কবিতার বই, সরল স্বচ্ছ অনাড়ম্বর ভাষায় লিখিত। পড়িতে আনন্দ হয়। কতগুলি কবিতা গানের মতই মধুর।